বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

লোকসংস্কৃতির উৎস সন্ধানে

(জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক বিবর্তনের ধারা)

(১)

সমাজ ও সভ্যতা মানুষের সৃষ্টি। তাই সমাজ ও সভ্যতার বুনিয়াদ এবং অগ্রগতিকে উপলব্ধি করতে হলে তার পশ্চাৎবর্তী পটভূমিকাকে সতত চলমান অনুশীলনের দ্বারা জানতে হবে—এই হল ইতিহাসের শিক্ষা। সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের উন্নতি বা অবনতি ঘটে সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র করে। কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সমাজ গঠিত হয় না বা একদল ছন্নছাড়া জনসমষ্টিকেও সমাজ বলা যায় না। সমাজ হল মানুষের সংহত জীবনযাত্রার একটা গতিশীল স্তর এবং ঐ স্তরগুলি ঐতিহ্য পরম্পরায় জনগোষ্ঠীর আয়ত্তাধীন থাকে। জনজীবন বা লোকজীবনের প্রয়োজনে বৈচিত্র্যপূর্ণ উপকরণ ও উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত লোকসমাজ হতে লোকসংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—'সংস্কৃতি যদি সভ্যতা বৃক্ষের একটি পুষ্পিত শাখা হয়, তাহলে লোকসংস্কৃতি হল সেই বৃক্ষের শিকড় যা মাটিকে আশ্রয় করে আছে এবং যে মাটি থেকে রস আহরণ করে বৃক্ষকে ফল ও ফুলে সজ্জিত করে শোভা বৃদ্ধি করে।' তাই অনেকের মতে, 'সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হল লোকসংস্কৃতির গোড়ার কথা।'

লোকায়ত শব্দের অর্থ বিচার প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,[১] —'লোকেষু আয়তো লোকায়তঃ' অর্থাৎ লোকায়ত-মত লোকে আয়ত অর্থাৎ লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পরার জন্য এই সংজ্ঞা লাভ করেছে। সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের মন্তব্যটির আক্ষরিক অর্থ হল,—'জনসাধারণের মধ্যে যার পরিচয় পাওয়া যায়।' লোকায়ত শব্দের দ্বিবিধ অর্থের মধ্যে এই তাৎপর্যটি লোকসংস্কৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থবহ। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যাকে জনসাধারণের দর্শন বলেছেন, সেটি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হল লোকসংস্কৃতির গোড়ার কথা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ লোকায়ত শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,[২]—'This word which denotes properly belonging to the world of sense, is the Indian name for the materialisation system whose adherents are termed Lokayatikas or Laukayatikas or more usually Charvakas from the name of the founder of their doctrinal system. There are clear indication of the presence in India, as early as Pre-Buddhistic times of teachers, of a pure materialism and undoubtedly these theories have had numerous adherents in India from that period

বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি

তৃতীয় খণ্ড

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

পরিবেশক

পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ১৯৯৪

প্রকাশক ঃ
শ্রীমতী আনন্দময়ী চৌধুরী
৫এ, শান্তি নগর বাই লেন,
পোঃ ভদ্রকালী (উত্তরপাড়া),
জেলা-হুগলী
পিন-৭১২২৩২

প্রচ্ছদ ঃ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
ওয়েলনোন প্রিণ্টার্স
১২৪বি, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
৩২ বিডন রো
কলিকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ পত্র

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সামন্ত
ও
শ্রীমতী আরতি চৌধুরী-র
প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ
তৃতীয় খণ্ড উৎসর্গ করা হ'ল।

ভূমিকা

"বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে যথাসময়ে প্রকাশিত হ'লেও তুলনামূলকভাবে তৃতীয় তথা শেষ খণ্ডটি প্রকাশের যথেষ্ট বিলম্ব ঘটেছে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর ছয় মাসের মধ্যে শারীরিক অসুস্থতাই এই বিলম্বের অন্যতম কারণ। তবে কারণ যাই থাক না কেন বিলম্বের জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কিন্তু নিরুপায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর বিভিন্ন স্থানের সুধী ব্যক্তিগণের নিকট হতে যেরূপ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি তা আমার ন্যায় একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর "বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি"-র শেষ খণ্ড পাঠক সমাজে তুলে ধরতে পারায় আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করি। গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা অনুযায়ী তৃতীয় খণ্ডের বিষয় সূচীতে বর্ধমান জেলার স্থান বিবরণী প্রাধান্য পেয়েছে। বর্ধমান হ'ল একটি প্রাচীন জনপদ, সেকারণে আমি দাবী করতে পারি না যে, বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনা এখানেই শেষ হয়েছে। জেলার সামগ্রিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে আরও তিনটি অন্যতম প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনার অভাব থেকে গেল। প্রথমতঃ কৃষি, শিল্প ও খনির উপর জেলার অর্থনীতির বনিয়াদ নির্ভরশীল এবং সেকারণে ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে "অর্থনীতি বিকাশের ধারা" শীর্ষক অধ্যায়টি রচিত হলেও এ বিষয়ে আরও বিশদভাবে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়তঃ ২৬৭৯টি মৌজা নিয়ে বর্ধমান জেলা গঠিত হয়েছে এবং লোকসংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান জেলার অভ্যন্তরে বিভিন্ন গ্রামে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রূপে ছড়িয়ে আছে। যদি মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির আগ্রহশীল ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তায় লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহ সংগ্রহ করে বিষয়ভিত্তিক ভাগে উক্ত উপাদানগুলিকে সম্যকরূপে পর্যালোচনা করা যায়, তাহ'লে জেলার লোকসংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সার্থক হবে। গতানুগতিকভাবে পূর্ববর্তী সংগ্রাহকদের আলোচনার পুনরালোচনা করে লাভ নেই। আসল উপাদান সংগ্রহ হ'ল মুখ্য উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে অধ্যাপক ডঃ মিহির কামিল্যা চৌধুরী হ'লেন অন্যতম পথ-প্রদর্শক। সর্বশেষে জানাই যে, কোন একক ব্যক্তির পক্ষে এই বিশাল জেলার পুরাকীর্তির তালিকা ও বিবরণ প্রস্তুত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এই কাজের প্রধান বাধা হ'ল অর্থ সংস্থানের। সারা জেলা পরিভ্রমণ করে গ্রামে-গ্রামান্তরে পুরাকীর্তির নিদর্শন সংগ্রহের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা ব্যক্তিগতভাবে বহন করার ক্ষমতা ক'জনেরই বা আছে। এই শুভ প্রচেষ্টাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করতে হ'লে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা পরিষদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হ'বে। সাধারণভাবে নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট গ্রাম বা কয়েকটি অঞ্চলের

পুরাকীর্তির সমীক্ষা করে কোন লাভ নাই। সমগ্র জেলার পুরাকীর্তি ও নিদর্শনাবলীর প্রামাণ্য তালিকা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজ সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হ'লে বর্ধমান জনপদের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিককালের বাস্তুবিদ্যা ও মন্দির-শিল্পের উৎকর্ষতার তুলনামূলক বিচারের দ্বারা আঞ্চলিক ইতিহাসের বলিষ্ঠ ধারার সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হ'বে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় বর্ধমানের মানুষেরও গ্রাম সম্পর্কিত আগ্রহ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। গ্রাম হতে গ্রামে ঘোরার সময় লক্ষ্য করেছি যে, প্রাচীন নিদর্শনসমূহ ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। গ্রাম ও গ্রামীণ জনবসতি হল বর্ধমান তথা রাঢ়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিস্থল। তাই সংরক্ষণ ও সঙ্কলনের মাধ্যমে গ্রামসমূহের অতীতকে ধরে রাখার প্রচেষ্টাকে বলবতী করা আশু প্রয়োজন। একথা ভুললে চলবে না যে, জনবসতি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম পত্তনের ইতিহাস জড়িত এবং লোকসংস্কৃতি, লোকধর্ম ও লোকবসতির তথ্য আহরণ করে ভাবীকালের গবেষকদের জন্য গ্রাম-সমীক্ষার প্রয়োজন আছে। তথ্য বা উপাদান একবার লুপ্ত হলে তাকে ফিরে পাওয়া দুষ্কর। সেই কারণেই প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ও স্বীয় সাধ্যানুসারে গ্রাম পরিক্রমার ফসলগুলি এই খণ্ডে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

আলোচ্য খণ্ডের বিষয়সূচী দেখে অনেকে হয়ত মন্তব্য করতে পারেন যে, কেবলমাত্র গ্রাম বিবরণ প্রাধান্য পেয়েছে কেন? বর্ধমানের লোকসংস্কৃতির ধারাকে জানতে হ'লে বা লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক পর্যালোচনা করতে হ'লে গ্রামে-গ্রামান্তরে গিয়ে উপাদান সংগ্রহ করতে হ'বে। লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্থানের জনজীবনের ধারা, তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য, লোকধর্মের বিবর্তন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, লোকশিল্প, লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি উল্লিখিত বিষয়ের আলোচনা করতে হ'লে গ্রামে যাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। জেলার সমস্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করা কোন একক ব্যক্তির পক্ষে বা কোন গবেষকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। লোকসংস্কৃতির উপাদান গ্রামগুলির মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। গ্রাম বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্য হ'তে উপাদান সংগ্রহের স্থানগুলিকে নির্দেশ করা যায়। গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী উপাদান সংগ্রহের প্রাথমিক ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কে অযথা কালক্ষেপ না করে যাতে সহজেই উৎস স্থলগুলির সন্ধান লাভে সক্ষম হ'ন, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই গ্রাম সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একসময়ে মন্তব্য করেছিলেন, "বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাস একটি বাঞ্ছিত পদার্থ। ইতিহাসের উপকরণ দেশের বিভিন্ন স্থানে ধ্বংসস্তূপরূপে, প্রাচীন মন্দির মসজিদরূপে বা দীঘি ইত্যাদি প্রাচীন কীর্ত্তিরূপে কিম্বা লোকমুখের ছড়া ও কিম্বদন্তীরূপে ছড়ান রহিয়াছে।" সামগ্রিকভাবে একথা বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসের পক্ষে যেরূপ প্রযোজ্য, আঞ্চলিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনুরূপ ধারাকে অনুসরণ করতে হবে। মহানগরীর গ্রন্থাগার কক্ষে বসে এ সকল

উপাদান সংগ্রহ করা যায় না। গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে খোলামনে এই সকল উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমানকালে এরূপ দুরূহ কাজে সহানুভূতিসম্পন্ন ও সমমনোভাবাপন্ন সহযোগী পাওয়া যায় না। ১৩২১ সালে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করে তাদের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কথা বললেও একালে কেবল হতাশার চিত্র দেখি। অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই কাজের জন্য যে মননশীলতার প্রয়োজন, ছাত্র-ছাত্রীরা সেরূপ প্রশিক্ষণও লাভ করে নাই।

আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার গোড়ার কথা হল মানুষকে নিজ অঞ্চলের বিষয়ে সম্যক-রূপে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করা। ইতিহাস সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে সংস্কৃতিকে রক্ষা করার অনুপ্রেরণা পাওয়া যাবে না। অক্ষয়কুমার মৈত্রের কথার পুনরুক্তি করে বলা যায় যে, বর্ধমানের ইতিহাসের প্রধান কথা হল বর্ধমানের জনসাধারণের কথা। মানুষ যদি অতীতকে না জানে তাহলে ভাবীকাল সম্পর্কে কোন ধারণা সৃষ্টির সহায়ক হবে না। ইতিহাস না জানলে দেশকে ভালবাসা যায় না। বর্ধমান জেলার ইতিহাসের পরিকাঠামোর মধ্যে অত্র স্থানের সংস্কৃতি, জীবনধারণের উপায় ও সমাজবিন্যাস নিহিত আছে। তাই ইতিহাস চর্চার বিমুখিতাকে দূরে সরিয়ে পাশ্চাত্যের ন্যায় Historiography বা ইতিহাসদর্শন আলোচনার ধারা অব্যাহত রেখে নিজ নিজ ঐতিহ্যকে স্মরণ করা সম্ভবপর হলে এর চেয়ে শ্লাঘার বস্তু আর কি হতে পারে।

তৃতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ বিষয়ে কিছু সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে জনগোষ্ঠীর বিবর্তনের পরিচয় সহ জনজীবনের সমাজবিন্যাস ও আদিমকাল হতে রাঢ়ের মানুষের সামাজিক বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাচীন অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক জীবনের বন্ধুর পথে বহু ঐতিহ্য লুপ্ত হলেও পারিবারিক ও গোষ্ঠীবদ্ধ ধর্মীয় চেতনার একটা ক্ষীণ ধারা আজও পরিমার্জিত হয়ে বলবৎ আছে। সেকারণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে লোকধর্মের আলোচনার পরিশিষ্টে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'বাঙালী ও দ্রাবিড়' প্রবন্ধটি সংযোজিত হল। গ্রাম ও গ্রামীণ সভ্যতা হল বর্ধমানের সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক। গ্রামনাম হতে আদিম জনগোষ্ঠীর বসবাসের ইঙ্গিত মিলতে পারে। লোকবসতি অধ্যায়ে সেই প্রচেষ্টার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। অতীতে গ্রামীণ সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে ছিলেন গ্রাম্য দেব-দেবীরা। একটির গ্রাম্য দেবীকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট গ্রামের সমাজবিন্যাস ও নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্থান পেয়েছে আমার জন্মস্থান 'ক্ষীরগ্রাম'।

'লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্য' অধ্যায়ে গুরুত্ব অনুযায়ী ২০টি বিশিষ্ট স্থানকে বেছে নেওয়া হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্যের আঙ্গিকরূপে। এ ক্ষেত্রে জেলার প্রত্যেকটি গ্রাম নিয়ে এই ধরনের পর্যালোচনা করা সম্ভবপর নয়। নমুনাস্বরূপ যে ২০টি গ্রাম

সম্পর্কে আলোচনা করা হল, অনুরূপভাবে 'লোকসংস্কৃতির বিচিত্র ধারা' অধ্যায়ে বর্ণিত গ্রামগুলি সম্পর্কে সহজেই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা সম্ভব হলেও গ্রন্থের কলেবরের কথা স্মরণ রেখে উক্ত কর্ম হতে বিরত থাকাই শ্রেয় মনে করেছি। বর্ধমান শহর হল জেলার মধ্যে আকর্ষণীয় প্রাণকেন্দ্র ; তাই জেলার সদর শহরের দ্রষ্টব্য স্থল ও বস্তুসমূহ বর্ণিত হয়েছে 'দেখি পুরী বর্ধমান' অধ্যায়ে। পরিশিষ্টে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মন্দিরের একটি তালিকা সংযোজিত করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের ন্যায় শেষ খণ্ডেও তারাপদ সাঁতরা ও ডাঃ সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর (স্বর্গত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রহ) নিকট কয়েকটি আলোকচিত্র ব্যবহারের অনুমতি লাভ করায় গ্রন্থের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। এজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

তৃতীয় খণ্ডে কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত ঘটান হয় নাই। অত্যন্ত সহজবোধ্য ও সাধারণভাবে চার শতাধিক গ্রামের বিবরণ তুলে ধরার উদ্দেশ্য হল এই যে, একদিকে সাধারণ পাঠকদের নিকট জেলার সহজবোধ্য চিত্রকে উপস্থাপন করা এবং অপরপক্ষে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহে আগ্রহশীল ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট গ্রাম সম্পর্কে আকৃষ্ট করা। আবার অনেকের মনে হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে যে, গ্রামবিবরণী পর্যায়ে লোকধর্মের কথা অধিক আলোচনা করা হয়েছে। এই শ্রেণীর সমালোচকদের প্রতি সবিনয় নিবেদন এই যে, লোকধর্মকে বাদ দিয়ে প্রাচীন কোন তথ্যই সংগ্রহ করা যাবে না, যদ্দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে লোকসংস্কৃতির আলোচনা সম্ভবপর। এমনকি পারিবারিক ও গোষ্ঠী জীবনের ধারাবাহিক ঐতিহ্য লোকধর্মকে আশ্রয় করে টিকে আছে, তাই লোকসংস্কৃতিতে ধর্মের প্রাধান্য এত অধিক এবং গ্রাম সম্পর্কিত আলোচনায় লোকধর্ম এত অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। আঞ্চলিক ইতিহাসের কোন গ্রন্থে এত অধিক সংখ্যক গ্রামের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইতিপূর্বে বর্ধমান জেলার গ্রাম, গ্রামীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সে সকল গ্রন্থে গ্রাম সম্পর্কিত বিবরণ অত্যন্ত অপ্রতুল এবং প্রচলিত ধারা অনুযায়ী সকলেই কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রসিদ্ধ গ্রামকে বেছে নিয়ে যথাকর্তব্য সমাপ্ত করেছেন। অশোক মিত্রের (আই. সি. এস.) সম্পাদিত ও সেন্সাস বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা' (৫ম খণ্ড) গ্রন্থে বহু গ্রামের কথা বলা হলেও বর্ধমান জেলা সম্পর্কিত অংশটিতে না বলার কথা অধিক। আশা করি আলোচ্য খণ্ডে গ্রাম সম্পর্কিত বহু জিজ্ঞাসার অভাব পূরণ করবে। ভবিষ্যতে বর্ধমান জেলার পুরাকীর্তি রচিত ও প্রকাশিত হলে এই জেলার একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রামীণ চিত্র পাওয়া যাবে।

প্রায় ৭০২৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বিশিষ্ট জনপদের ভাণ্ডারে অফুরন্ত তথ্যরাজি আশ্রয় করে আছে। অবসর সময়ে ও ছুটির দিনে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে গ্রাম সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে উত্তরসূরীদের জন্য পাথেয়স্বরূপ কিছু নমুনা প্রকাশিত হল। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণের সময় জেলাবাসীদের সাগ্রহ আতিথেয়তা, পথনির্দেশ,

আহার, বাসস্থান ও আংশিক সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হই নাই। আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে প্রেরিত তথ্যগুলিকে যাচাই করে নিয়ে তৃতীয় খণ্ডে সংযোজিত করা হয়েছে। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন, গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাঁদের নামোল্লেখ করে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি। ভ্রান্তিবশতঃ যদি কোন নাম অনুল্লেখ থেকে যায় তাহলে তাঁদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। গ্রাম পরিক্রমাকালে যাঁদের নিকট বিশেষ সাহায্য লাভ করেছি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বৈদ্যনাথ সিংহরায় ও সমীর সিংহরায় (চকদীঘি), সুধীরকুমার দাস (কামারপাড়া), পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (মসাগ্রাম), নজরুল রহিম (নবগ্রাম), অধ্যাপক অমিয়কুমার ভট্টাচার্য (নাসিগ্রাম), দুলাল চট্টোপাধ্যায় (গলসী), সুকুমার মিস্ত্রী (কৈতারা), আসগর আলি (কুড়মুন), ডাঃ বিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (গলসী), মদনমোহন বসু (শঙ্করপুর), দীপঙ্কর চৌধুরী ও সনৎকুমার চক্রবর্তী (ক্ষীরগ্রাম) প্রমুখ ব্যক্তিগণ। বর্ধমান শহরের সঙ্গে রাজবাড়ী সম্পর্কিত বিষয়ে সাহায্য পেয়েছি রাজকুমার ডঃ প্রণয়চাঁদ মহ্‌তাব-এর নিকট। এঁদের প্রত্যেককে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। গলসী অঞ্চল পরিক্রমাকালে আমার বাল্যবন্ধু অসিত চৌধুরী ও বন্ধুপত্নী শ্রীমতী ভারতী চৌধুরীর যেরূপ সহযোগিতা লাভ করেছি তজ্জন্য তাঁদের শুষ্ক ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না। "বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি" রচনার প্রারম্ভিক পর্ব হ'তে আমার কর্মস্থল ইউকো ব্যাঙ্ক-এর-সহকর্মীবৃন্দ নিরন্তর অনুপ্রেরণা জুগিয়ে এসেছেন। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশনার সময় যাঁদের নিরন্তর উৎসাহ আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে তাঁদের মধ্যে অগ্রজপ্রতিম সঞ্জীবকুমার বন্ধু, অমিয়কুমার ঘোষ, নির্মলচন্দ্র চৌধুরী এবং সহকর্মী অরুণকুমার ভট্টাচার্য ও সুবলচন্দ্র দাসের কথা ভোলবার নয়। এঁদের সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

মূল পাণ্ডুলিপি ও প্রেস কপি তৈরী করার কাজে নারায়ণচন্দ্র সিংহ-এর সহযোগিতার জন্য কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স-এর সত্বাধিকারী নারায়ণচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর সহযোগিবৃন্দের সহায়তার জন্য মুদ্রণ যন্ত্র হ'তে গ্রন্থটি সত্বর নিষ্কৃতি লাভ করেছে। প্রুফ সংশোধনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বন্ধুবর অরুণচাঁদ দত্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। এতদ্‌সত্বেও মুদ্রণ-জনিত ত্রুটির সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব আমার। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুস্তক বিপণি'র সত্বাধিকারী অনুপকুমার মাহিন্দরের সহযোগিতার জন্য প্রকাশনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য সর্বাগ্রে মনঃসংযোগ ও উপদ্রববিহীন সুদীর্ঘ সময়-কালের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন গ্রামে তথ্য সংগ্রহ ও গ্রন্থ রচনার সময় অতীতের ন্যায় এক্ষেত্রেও সকল প্রকার সাংসারিক দায়দায়িত্ব হ'তে অব্যাহতি দিয়ে আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী আনন্দময়ী চৌধুরীর অনুপ্রেরণা বন্ধুর পথকে মসৃণ করেছে। নির্ঘণ্ট ও অন্যান্য তালিকা প্রস্তুতের কাজে আমার কন্যা কুমারী শুভ্রা চৌধুরী ও পুত্র শ্রীমান

জ্যোতির্ময় চৌধুরীর সাহায্য লাভ করেছি।

'আদ্যের অমরাবতী শ্রীবর্ধমান'-এর ইতিহাস ও সংস্কৃতির তিন খণ্ড বঙ্গভাষাভাষী সুধীবৃন্দের হাতে অর্পণ করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি। গ্রন্থারম্ভে তিন খণ্ডের বিষয়সূচী ঘোষিত হয়েছিল এবং একক প্রচেষ্টায় সীমিত-সাধ্যে এরূপ দুরূহ কাজের পূর্ণ রূপদান করা যে সহজসাধ্য নয়, তা দায়িত্বশীল ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। সাধারণভাবে যে কোন গ্রন্থের সমালোচনা করা যায় এবং ইতিহাস রচনার আধুনিক সংজ্ঞানুসারে আলোচ্য গ্রন্থকে সামগ্রিকভাবে আঞ্চলিক ইতিহাসরূপে গণ্য করার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকলেও স্বীয় শক্তি ও আর্থিক দায়বদ্ধতার কথা বিবেচনা করে নিজস্ব ভাবনাচিন্তাকে যথাসম্ভব রূপদানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। জন্মভূমির ঋণ কখন পরিশোধ করা যায় না। এতৎসত্ত্বেও জন্মভূমির পুরাবৃত্তকে লোকসমাজে তুলে ধরার ইচ্ছা বলবতী থাকায় বহু দুরূহ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিকতাকে সম্বল করে বর্ধমান জনপদের একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচনার দ্বারা দীর্ঘদিনের অভাব মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। মাতৃস্বরূপা বর্ধমানের রত্নভাণ্ডারে বহু অমূল্য সম্পদ সঞ্চিত আছে; যার অংশমাত্র স্বীয় প্রচেষ্টায় আহরণ করে সুধীবৃন্দের হস্তে অর্পণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। জন্মভূমির কথা শেষ হতে চায় না—তাই কাশ্মিরী পণ্ডিত কলহান-এর উক্তি স্মরণ করে সীমারেখা টানা গেল,—

> 'কথা দৈর্ঘ্যানুরোধেন বৈচিত্র্যেপ্যপয়পক্ষিতে।
> তদত্র কিঞ্চিদস্ত্যেব বস্তু যৎ প্রীতয়ে সতাম্॥
> শ্লাঘাঃ স এব গুণবান্ রাগদ্বেষ বহিষ্কৃতা।
> ভূতার্থকাননে যস্য স্থেয়স্যে সরস্বতী॥
> পূর্বে বদ্ধং কথাবস্তু ময়ি ভূয়ো নিবধ্নতি।
> প্রয়োজনমনাকর্ণ্য বৈমুখ্যং লোচিতং সতাম্॥ (রাজতরঙ্গিণী)

ভদ্রকালী (উত্তরপাড়া)
মহালয়া
৪ঠা অক্টোবর, ১৯৯৪

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

প্রথম খণ্ড

৩১। জগৎগৌরী মূর্তি ঃ মণ্ডলগ্রাম (মেমারী)
৩২। নৃত্যরত গণেশ মূর্তি (পাল যুগ) ঃ কেতুগ্রাম
৩৩। বহুলাদেবী ঃ কেতুগ্রাম
৩৪। কঙ্কালেশ্বরী মূর্তি ঃ কাঞ্চননগর
৩৫। মনসা মূর্তি ঃ মণ্ডলগ্রাম (মেমারী)
৩৬। ইন্দ্রাণী মূর্তি ঃ কুড়মুন (বর্ধমান)
৩৭। মাসির সেতু ঃ নৈহাটী,-সীতাহাটী (কেতুগ্রাম)
৩৮। শিল্পীর তুলিতে বর্ধমান রেলষ্টেশন উদ্বোধনের দৃশ্য (৩. ২. ১৮৫৫)
৩৯। কঙ্কালেশ্বরীর নবরত্ন মন্দির (১৮শ শতক) ঃ কাঞ্চননগর
৪০। হোসেনশাহী মসজিদের ধ্বংসাবশেষ (১৬শ শতক) ঃ নূতনহাট
৪১। বলরামের পীড়া-দেউল (আঃ ১৭শ শতক) ঃ বোড়ো বলরাম
৪২। রাজগঞ্জ অস্থল (১৮শ শতক) ঃ বর্ধমান শহর
৪৩। সর্বমঙ্গলা মন্দিরে উৎকীর্ণ টেরাকোটা ফলক ঃ বর্ধমান শহর
৪৪। টেরাকোটা ফলক ঃ বৈদ্যপুর (কালনা)
৪৫। যোগাদ্যা দেবীর মন্দির (১৮শ শতকের ২য় দশক) ঃ ক্ষীরগ্রাম
৪৬। গোপালের শিখর মন্দির (১৬শ শতক) ঃ আমাদপুর (মেমারী)

দ্বিতীয় খণ্ড

১। প্রত্ন-শিল্পকলা। নিদর্শন ঃ পাণ্ডুরাজার ঢিবি (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ)
২। প্রত্নযুগের নিত্যব্যবহার্য মৃৎপাত্র ঃ বাণেশ্বরডাঙ্গা (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ)
৩। রামগঞ্জ তাম্রশাসন (নবম-দশম শতক)
৪। গোপীনাথ বিগ্রহ ঃ অগ্রদ্বীপ (ষোড়শ শতক)
৫। বলরামের দারুবিগ্রহ ঃ বোড়োবলরাম
৬। হোসেনশাহী মসজিদের টেরাকোটা ভাস্কর্য, কুলুট, (ষোড়শ শতক)
৭। মধ্যযুগের মসজিদ ঃ কুসুমগ্রাম, থানা-মন্তেশ্বর (অষ্টাদশ শতক)
৮। পীরবহরাম সক্কার সমাধিক্ষেত্র ঃ বর্ধমান শহর (ষোড়শ শতক)
৯। জুম্মা মসজিদ ঃ বর্ধমান শহর (১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দ)
১০। ইছাই ঘোষের দেউল ঃ গৌরাঙ্গপুর, থানা-কাঁকসা (ষোড়শ শতক)
১১। জোড়াশিখর দেউল ঃ কালিকাপুর,
১২। কীর্তিচাঁদ-এর সমাজবাড়ী ঃ দাঁইহাট (১৭৪০ খ্রীস্টাব্দ)
১৩। বদরশাহের মাজার ঃ দাঁইহাট (সপ্তদশ শতক)
১৪। পঁচিশ রত্নমন্দির ঃ কালনা রাজবাড়ী চত্বরে কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির (১৭৫১ খ্রীস্টাব্দ)
১৫। সারিবন্ধ শিখর দেউল ঃ বনকাটি-অযোধ্যা, থানা-কাঁকসা

১৬। শিবক্ষেত্র, বৃত্তাকারে ১০৯টি শিবমন্দির ঃ কালনা (১৮১০ খ্রীস্টাব্দ)
১৭। কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির গাত্রে টেরাকোটা ফলক ঃ কালনা (১৭৫১ খ্রীস্টাব্দ)
১৮। একরত্ন মন্দির ঃ খণ্ডঘোষ
১৯। গোপাল মন্দির ঃ কুলিনগ্রাম (ষোড়শ শতক)
২০। পার্বতী মূর্তি ঃ দিগনগর (আউসগ্রাম)
২১। চণ্ডী মূর্তি ঃ কাঞ্চননগর
২২। শিবানী দেবীর মূর্তি ঃ কুলিনগ্রাম
২৩। মন্দিরলিপি ঃ সীতাহাটি, থানা কেতুগ্রাম (১৭৬০ শকাব্দ)
২৪। টেরাকোটা ফলক ঃ আঝাপুর, থানা-জামালপুর
২৫। টেরাকোটা ফলক ঃ বৈদ্যপুর, থানা-কালনা
২৬। টেরাকোটা ফলক ঃ শ্রীধরপুর, থানা-মেমারী
২৭। টেরাকোটা ফলক ঃ দেবীপুর, থানা-মেমারী

তৃতীয় খণ্ড

১। বিজয়তোরণ, বর্ধমান (১৯০৩ খ্রীস্টাব্দ)
২। সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, কালনা (১৬৬৩ শকাব্দ)
৩। জৈন মন্দিরের অলঙ্করণ, সাতদেউলিয়া (৯-১০ শতক)
৪। প্রতাপেশ্বর শিবমন্দির, কালনা (১৭৭১ শকাব্দ)
৫। প্রতাপেশ্বর শিবমন্দিরের টেরাকাটা অলঙ্করণ (১৭৭১ শকাব্দ)
৬। বর্ধমানেশ্বর শিবলিঙ্গ, বর্ধমান
৭। পঁচিশচূড়া মন্দির ঃ লালজি, কালনা (১৬৬১ শকাব্দ)
৮। জুম্মা মসজিদের শিলালিপি, বর্ধমান (১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দ)
৯। পঞ্চরত্ন মন্দির, এরুয়ার (অষ্টাদশ শতক)
১০। প্রস্তর দেউল জগদানন্দপুর (১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ)
১১। মসজিদ লিপি, কালনা (পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক)
১২। মসজিদের টেরাকোটা অলঙ্করণ, মঙ্গলকোট (ষোড়শ শতক)
১৩। টেরাকোটা অলঙ্করণ রাসলীলা, মৌখিরা (১৯শ শতক)
১৪। রাসমঞ্চ, বৈদ্যপুর (১৯শ শতক)

প্রচ্ছদ চিত্র ঃ

১৬৬১ শকাব্দে (১৭৩৯-৪০ খ্রীস্টাব্দ) চাকলা বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদ রায়-এর জননী ব্রজকিশোরী দেবী কর্তৃক কারুকার্য খচিত ও পোড়ামাটির অলঙ্করণে অলঙ্কৃত পঁচিশরত্ন বিশিষ্ট 'লালজি'র মন্দিরটি কালনা শহরে রাজবাড়ীর চত্বর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

onwards to the present day. The Lokayata allows only perception as a means of knowledge and rejects inference.'

'ভারতীয় সংস্কৃতির মূল তত্ত্বটি হল সমন্বয়',—আচার্য সুনীতিকুমারের মন্তব্যটি আর একটু পরিষ্কার করলে বোঝা যাবে যে, সমগ্র জাতির ভাবাদর্শ ও জীবনচর্যার উন্নতির সোপান, ধর্ম, উৎসব, সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজচিন্তা, দর্শন, জীবন-দর্শন, ব্যবহারিক আচার-আচরণ ইত্যাদির মিলিত রূপ নিয়ে একাকার হয়ে যায় সংস্কৃতি শব্দটিতে। কিন্তু উপরোক্ত স্তর সমূহের মূল শক্তি বা অনুপ্রেরণা আসে জনজীবনের জীবনযাত্রার প্রণালী বা ধারা থেকে। সুদক্ষ প্রশাসক ও শিল্পকলা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অশোক মিত্র আই. সি. এস. (অবসরপ্রাপ্ত) মন্তব্য করেছেন,[৩] 'লোকসংস্কৃতির প্রতি যথার্থ ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা সহসা আসে না। যাবতীয় সুশিক্ষার মত ছেলেবেলা থেকেই এই শ্রদ্ধার অনুশীলনের বিশেষ প্রয়োজন।' তাঁর অপর মন্তব্যটিও অনুধাবন-যোগ্য,[৪]—'লোকসংস্কৃতি নিয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আধুনিক মাতামাতিতে বিশেষ আশঙ্কার কারণ হল, লোকসংস্কৃতির এই ব্যবহারগত আকার, ঋজুতা, সারল্য, স্বল্পতা অগ্রাহ্য করে তার উপর তাঁরা বাহুল্য এবং অযথা অলঙ্কারের বোঝা চাপিয়েছেন, যা লোকসংস্কৃতির স্বধর্মের পক্ষে বিশেষ হানিকর। আরো বিশেষ হানিকর লক্ষণ হল, যে জিনিষের যা নিজস্ব ব্যবহার স্থান তা অস্বীকার করে শুধু মাত্র সজ্জা বা অলঙ্কার হিসাবে গণ্য করা।'

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হতে ও চিন্তাধারাকে মিলিয়ে বিশেষজ্ঞগণ বহু আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে গোপাল হালদারের অভিমত হল,—'লোক-সংস্কৃতি হচ্ছে মৌলিক বিদ্যা…মানুষের সেই প্রাচীন কাল থেকেই যে জীবিকোপায়, জীবনযাত্রা চলছে তা সবই লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।' এ বিষয়ে আর একটু বিশদরূপে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,[৫]—'লোকসংস্কৃতির মধ্যে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অনুভূতি ও এষণা স্বতঃস্ফূর্তরূপে প্রকাশ লাভ করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনা এবং বিভিন্ন-রূপে প্রচলিত সংজ্ঞাসমূহের পর্যালোচনায় বলা যায় যে, লোকসংস্কৃতি লোকায়ত জীবনের সামগ্রিক কৃতি—যা মৌখিক ধারায় বিবর্তিত সাহিত্য, অনুকরণের মাধ্যমে প্রচলিত চারুকলা ও কারুকলা এবং কারুকলার যাবতীয় সম্পদ, ঐতিহ্যানুসারী বিশ্বাস-আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব-পার্বণ-ঔষধ-পথ্য-ক্রীড়া-নৃত্য-অভিনয়-খাদ্য-যানবাহন ইত্যাদিতে বিস্তৃত।'

লোকসংস্কৃতি বা Folklore শব্দটি যেভাবেই ব্যবহার করা হোক না কেন, এর মূল কথা হল লোকায়ত মানুষের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা। ইংরাজী Folklore শব্দের পরিভাষা হিসাবে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পণ্ডিতগণ প্রয়োগযোগ্য কয়েকটি শব্দের ব্যবহার করেছেন,—

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — লোকযান।

ডঃ সুকুমার সেন	—	লোকচর্যা।
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	—	লোকশ্রুতি।
ডঃ শহিদুল্লাহ	—	লোকবিজ্ঞান।
বিনয় ঘোষ	—	লোকসংস্কৃতি।
ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়	—	লোককৃতি।

আদ্য পদ নিয়ে কোন মতপার্থক্য নাই; অন্ত্য পদে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ এক হলেও শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্র পার্থক্য দেখা যায় এবং ব্যাপক অর্থে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে।

লোকসংস্কৃতির বিষয় বৈচিত্র্য অত্যন্ত ব্যাপক। অঞ্চল বিশেষের লোকসংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে হলে সর্বাগ্রে আর প্রেক্ষাপট অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের পরিবেশ, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি বা জীবিকার উপায় ও আচার-আচরণ সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধান ও অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। জনগোষ্ঠী বা লোক সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আহরণের পর তাদের জীবনচর্যার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি কারণে মহৎ ও ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছে তার অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। এরপর আলোচ্য বিষয় হল, লোকসংস্কৃতির অঙ্গ বা উপাদান সম্পর্কে খুঁটিনাটি আলোচনা, যদ্দ্বারা সামগ্রিক রূপকে খুঁজে পাওয়া যাবে। লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি হল,—

১। পুরাকাহিনী
২। লোককাহিনী
৩। লোকগাথা
৪। কিংবদন্তি
৫। উপকথা ও রূপকথা
৬। লোক প্রবচন ও প্রবাদ

উৎসব

১। লোক উৎসব
২। লোক মেলা
৩। লোক সঙ্গীত
৪। লোক নৃত্য ও বাদ্য
৫। লোক ক্রীড়া

আচার ও অনুষ্ঠান

১। লোক আচার ও রীতি নীতি
২। লোকধর্ম
৩। লৌকিক দেবদেবী ও পূজা
৪। ব্রতকথা
৫। পাল-পার্বন

ব্যবহার

১। লোক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার
২। লোক রন্ধন
৩। লোক যান

তন্ত্র ও যাদু

১। লোক চিকিৎসা
২। লোক সংস্কার ও বিশ্বাস
৩। তন্ত্রমন্ত্র

লোকসাহিত্য	লোকশিল্প
১। লোককথা	১। চিত্রাঙ্কন ও আল্পনা
২। ছড়া, বাঁধা ও হেঁয়ালী	২। কারুশিল্প
৩। লোক ভাষা	৩। বাস্তুগৃহ নির্মাণ
৪। লোকসাহিত্য	৪। আসবাবপত্র
৫। লোকগীতি	৫। দেবায়তন—স্থাপত্য ও ভাস্কর্য
৬। লোকনাট্য	

প্রতিটি অঞ্চলে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করলে অঞ্চলভেদে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়। অঞ্চলভেদে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য হল লোকসংস্কৃতি আকর্ষণীয় বস্তু। গোষ্ঠীভেদ ও পরিবেশ ভূগোলের পার্থক্যহেতু আচার-আচরণ, লোকধর্ম, লোক-শিল্প, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্যে তারতম্য দেখা দেয়। উপাদানগুলি সর্বত্রই আছে—কিন্তু তারতম্য সূচিত হওয়ার কারণ হল, গোষ্ঠীবদ্ধ লোকের উৎস অর্থাৎ যে সকল গোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি আলোচনা করা হবে তারা নৃতত্ত্বগতভাবে কোন্ জনগোষ্ঠীর মানুষ এটা নির্ণয় করতে সক্ষম হলে লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের পরিচয় জানা যাবে। এই পরিচয়ই হল লোকসংস্কৃতির গোড়ার কথা। বর্ধমানের লোকসংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বর্ধমানের লোকের উৎস নির্ণয় করা। 'লোক উৎস' সন্ধানের পর লোকের আচার-আচরণ ও ধর্ম আচরণের মাধ্যমে তাদের পূর্বপুরুষের উৎপত্তির সময়কালের সঙ্গে একালের মানুষের সামাজিক জীবনের ক্রমবিবর্তনের ধারা প্রতিটি অনুসন্ধিৎসু মানুষের মনকে নাড়া দিতে সক্ষম হবে। লোকসংস্কৃতির প্রতিফলন ক্ষেত্র হল গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায়। গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সমাজ, পূজা-পার্বণ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, জীবন ধারণের মান ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য আহরণ করতে হলে গ্রামগুলির বিবরণ সংগ্রহ করাও অত্যন্ত আবশ্যক। একই অঞ্চলে অবস্থিত হলেও বিভিন্ন গ্রামের মানুষের আচার-অনুষ্ঠানের বাহ্যিক রূপটি সমপর্যায়ভুক্ত হলেও অন্তঃসলিলা ধারাটিতে হয়ত বিশেষ পার্থক্য সূচিত হবে। তাই গ্রামবিবরণী হল লোকসংস্কৃতির চিত্তাকর্ষক পর্যায়। লোকসংস্কৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে নরগোষ্ঠী ও তাদের বসবাসের স্থানকে তাই এ আলোচনায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল সংগ্রহ ও প্রচারের। সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ করলে প্রতিটি জেলার লোকসংস্কৃতির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতির যথাযথ মৌলিক রূপগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারের (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৪) আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এবারের আলোচনায় 'লোক' ও তার আবাসস্থল 'গ্রাম'-এর আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

অনেকের মতে তুলনামূলকভাবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হ'তে বঙ্গদেশের লোক-

সংস্কৃতি বিকাশের ধারা ছিল সমৃদ্ধতম। লোকসংস্কৃতি বিকাশের পশ্চাতে যে সক্রিয় কারণগুলি সামগ্রিকভবে আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে অর্থাৎ সে সকল পশ্চাৎবর্তী পটভূমিকার উপব লোকসংস্কৃতির বিকাশ বহুলাংশে নির্ভরশীল, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপকরণগলি হল,—

১। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ বা সামাজিক ভূগোল।

২। জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বিবর্তন ও তাদের ভাষা।

৩। প্রাচীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও স্থায়ী বসতি স্থাপন।

উপরোক্ত প্রাথমিক পর্যায়ের উপাদানগুলি অনুসন্ধান ও সংগ্রহের পর নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ধারা উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর হলে, যে কোন আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি ও তার বিবর্তনবাদকে জানা যাবে। "আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদগণ লোকচর্যার আদিমতম ধারায় সংরক্ষক গোষ্ঠী-চরিত্রে সংহত আদিবাসী সমাজের সান্নিধ্যকে, লোকসংস্কৃতি বিকাশের পক্ষে অন্যতম সহায়ক শক্তিরূপে বিবেচনা করেন। প্রত্যেক সমাজ তার বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে বাস করে এবং প্রতি সমাজেরই এমন কতকগুলি সামাজিক-ঐতিহাসিক পরিবেশ থাকে যা তার বিকাশকে প্রভাবিত করে। এই পরিবেশগুলির মধ্যে প্রতিবেশী সমাজের প্রভাব অন্যতম।"[৬] নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতি বিবর্তনের ধারা অনুসন্ধানকল্পে অনুসন্ধানের কর্মসূচী বর্ধমান জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হলে সেটি হবে একদেশদর্শী দোষে দুষ্ট ও অসম্পূর্ণ। কারণ বর্ধমানের ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে রাঢ়ের অধিকাংশ অঞ্চলের সাদৃশ্য তথা যোগসূত্র অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং এই অঞ্চলের অবস্থানগত সান্নিধ্যহেতু ভৌগোলিক পরিবেশ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকেও নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করেছে বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

লোকসংস্কৃতির উৎস সম্পর্কে ওয়াকিল আহমদ মন্তব্য করেছেন[৭]—'বাংলার লোক-সংস্কৃতি বাংলায় বসবাসকারী উপজাতীয়দের আদিম সংস্কৃতির বংশধর; এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। এরা অনার্যদেরই উত্তরপুরুষ। বাঙালীর দেহে যেভাবে অনার্য রক্তধারা সঞ্চারিত হয়েছে, তাদের সমাজ-সংস্কৃতিতেও সেভাবে অনার্য-উপাদান সঞ্চালিত হয়েছে। সুতরাং বাংলার লোক-সংস্কৃতির প্রকৃতি ও তাৎপর্য নির্ণয় করতে হলে আদিম অনার্য সংস্কৃতির পরিচয় জানা দরকার। এ সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক ও ভাষা-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা যায়।' উপরোক্ত মন্তব্যটি যেমন সমগ্র বঙ্গদেশের পক্ষে প্রযোজ্য, অনুরূপভাবে আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আদিম মানবগোষ্ঠীর বসতি ইতিহাসের উপাদান বৃহত্তর রাঢ়ের জনগোষ্ঠীর বিবর্তনের প্রাচীন ধারার বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে বর্ধমান জেলার পক্ষে প্রযোজ্য উপাদান-গুলির আলোচনা করলে এ প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে।

(২)

বর্ধমান জেলা সহ রাঢ়ের ভৌগোলিক পরিবেশের কথা প্রথম খণ্ডের

'ভূমিপরিচিতি' ও 'নদীপরিচিতি' অধ্যায়ে বিশদভাবে পরিবেশিত হয়েছে। সেকারণে এ ক্ষেত্রে উক্ত আলোচনাটির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আলোচনার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভৌগোলিক পরিবেশের উপাদান ও তার তাৎপর্যের মূল নির্দেশিকাগুলি উল্লেখ করা হল, যথা—চতুঃসীমা, আয়তন, ভূ-তত্ত্ব ও ভূ-পরিবেশ, জীবনযাত্রার ধারা (কৃষি, বন, খনি, শিল্প), অর্থনীতির আঞ্চলিক বিভাজন, বসতি ভূগোল (শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের বিস্তৃতি) ইত্যাদি।

বর্ধমান জেলার জনগোষ্ঠী হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে গঠিত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রত্যক্ষভাবে কোন সাক্ষাৎ পাওয়া না গেলেও বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও তান্ত্রিকদের মধ্যে তাঁরা হয়ত প্রচ্ছন্নভাবে আছেন। এছাড়া ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ও বাইরে রয়েছে প্রায় এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা, যাঁরা তপসিল-গোষ্ঠী ও উপজাতীয় গোষ্ঠী বা আদিবাসীরূপ চিহ্নিত। নেগ্রিটো হতে আরম্ভ করে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, অ্যালপাইন, নর্ডিক আর্য জাতি এই অঞ্চলে তাদের নিজস্ব সত্তা রক্ষা করতে পারে নাই—বরং তারা নিজস্ব সত্তা বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু তারা নিজেদের গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেয় নাই। তাই যথার্থ লোকসংস্কৃতি এই পরিবেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল। নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একথার সদুত্তর মিলবে। সামগ্রিকভাবে বর্ধমানের জনগোষ্ঠী হল বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ বর্ধমানের মানুষ হল মিশ্র জনগোষ্ঠীর। কিন্তু এর বাইরে আছে আদিবাসী গোষ্ঠী বা কয়েকটি তপসিল-ভুক্ত উপগোষ্ঠী, যাদের রক্তের মধ্যে মিশ্রণ ঘটলেও তারা নিজস্ব পূর্বতন সংস্কৃতির ধারাকে বজায় রেখেছে এবং তাই আদিবাসী সমাজে লোক-সংস্কৃতি উপাদান সংগ্রহের কাজটি সহজ হয়েছে।

রাঢ়ের উচ্চবর্ণের জনগোষ্ঠীর ধারা অনুসরণ করে প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর বসতি ইতিহাস ও তাদের আচারআচরণ জানার উপায় নাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় রাঢ়ের প্রাচীন মানব সমাজ সম্পর্কে জানতে হলে তাদের ব্যবহৃত প্রস্তরায়ুধ ও অন্যান্য প্রত্ন-বস্তু সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। নব্যপ্রস্তর যুগে ও তাম্রাশ্মীয় পর্বের মানুষের জীবনযাত্রার নিদর্শন এই উপায়েই সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ঐ সকল জনগোষ্ঠীর প্রকৃত নৃতাত্ত্বিক পরিচয় আবিষ্কৃত হয় নাই। নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নর-কঙ্কাল ও মাথার খুলির ; কিন্তু এই উপাদানটি সমগ্র বঙ্গদেশে অপ্রতুল। কেবলমাত্র পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত ১৪টি নর-কঙ্কাল নিয়ে এ বিষয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে নর-কঙ্কাল ও মাথার খুলি অত্যন্ত ভঙ্গুর হওয়ার কারণে নৃতত্ত্ববিদগণ আশানুরূপ ফল লাভে সক্ষম হন নাই।

নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত উপাদানের অভাবের ফলে প্রাচীন ভাষা ও একালের জীবিত মানুষের অবয়ব নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এ সকল বিচার-বিশ্লেষণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলশ্রুতি হল যে, বাঙলা তথা রাঢ়ের

আদিম মানব সমাজ ও তাদের বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী আর্য জাতি বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়—এমনকি তাঁরা আর্য ভাষাভাষী গোষ্ঠীভুক্ত নয়। রাঢ়ের কয়েকটি স্থানের অধিবাসীদের দৈহিক গঠন পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষেই অধিকাংশ পণ্ডিতেরা উপনীত হয়েছেন।

বাঙালী জাতীর উৎপত্তি নিরূপণ প্রসঙ্গে স্যার হারবার্ট রিজলে বাঙলার অধিবাসীগণকে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু রিজলের মতবাদ যে ভ্রান্ত, সে কথা প্রমাণ করলেন রমাপ্রসাদ চন্দ্র তাঁর 'Indo Aryan Races' গ্রন্থে, যা পরবর্তীকালে ডঃ বিরজাশঙ্কর গুহ, ঐ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে বাঙালী জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচিতির উপর নূতনভাবে আলোকপাত করেছিলেন।

জাতিতত্ত্ব আলোচনার গোড়ার কথা হল কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বয় ও সংহতি বজায় রাখার রীতিনীতি উপলব্ধি করা। আচার্য সুনীতিকুমারের অভিমত হল,[৮] 'As a matter of fact, from time immorial peoples of different races and languages and cultures have come to India and after an initial period of hostile contact in some cases, finally settled down for a peaceful commingling and cultural as well as racial with their predecessors in the land.' একথা আঞ্চলিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, অনুরূপভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ করা যায়।

জনবসতি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর। মানুষের দৈহিক কাঠামোর গঠনপ্রকৃতি, বর্ণ, খাদ্য বিচার ও আচার ব্যবহার মূলত নির্ভর করে বাসস্থানের মৃত্তিকা ও আবহাওয়ার উপর। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের অভিমত হল,[৯]—'Professor Ridgeway considers that physical type depends far more on environment than on race. From the evidence already to hand there is high probability that intermarriage can do liltle to form a new race, unless the parents on both sides are of races evolved in similar environments.' দুটি গোষ্ঠীর মিলন-মিশ্রণের ফলে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে যে সঙ্কর গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় তাদের আচার ব্যবহারে গোষ্ঠী দুটির রক্তধারা বলবৎ থাকলেও আঞ্চলিক পরিবেশজনিত কারণে তারা সমগোত্রীয় হতে সক্ষম হয় না। যেমন ওড়িষার খন্দ জাতি ও রাঢ়ের মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠীর সৃষ্টির মূলে ছিল অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় রক্তের মিলন ও মিশ্রণ। কিন্তু জাতিতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের দিক হতে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচুর প্রার্থক্য আছে। পৌরাণিক বিবরণে সমস্ত অরণ্যচারী গোষ্ঠী নিষাদ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে কথিত আছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আরও ভয়ঙ্কর জনগোষ্ঠীকে অসুর নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। একালের ভীল, গোণ্ড, খন্দ, মুণ্ডা,

শবর, জুয়াঙ্গ, ওঁরাও, সাঁওতাল নরগোষ্ঠী প্রাচীন নিষাদ জাতির প্রতিভূ হলেও অঞ্চল-ভেদে বা পরিবেশজনিত কারণে তাদের আচার-ব্যবহার ভিন্ন এবং বিভিন্ন নামে উপগোষ্ঠীগুলির পরিচিতি আছে।

প্রাচীন ভারতের বসতি ইতিহাসে নবাগত হল আর্যভাষাভাষী গোষ্ঠীরা—যারা 'বৈদিক আর্য' নামে অভিহিত হয়েছে এবং নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় 'নর্ডিক' নামে পরিচিত। ইতিপূর্বে আরও চারটি জাতি এদেশে এসেছিল, তন্মধ্যে নিগ্রটো গোষ্ঠী হল সর্বপ্রথম। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত তাদের কোন অস্তিত্ব অন্যত্র পাওয়া যায় না। আর্যশাস্ত্রে বর্ণিত 'নিষাদ' গোষ্ঠী ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং এ যুগেও তাদের একাংশকে ভারতবর্ষ হতে আরম্ভ করে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ডে বসবাস করতে দেখা যায়। নিষাদ জাতির কোন এক শাখা স্থান পরিবর্তন করতে করতে ওড়িশা, দক্ষিণ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী স্থান সমূহে বসবাস শুরু করে। নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় এরা হল আদি অষ্ট্রাল বা অষ্ট্রিক জাতি। নব্য-প্রস্তর যুগের পর পশ্চিম দিক হতে অষ্ট্রিক ভাষাভাষী অপেক্ষা উন্নত প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠী ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হতে কোন এক সময়ে পূর্বভারতে চলে আসে। আদি অস্ট্রলয়েড ও প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সংমিশ্রণেই গঠিত হয়েছে ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলের জনগোষ্ঠী। রাঢ়ের অধিবাসীদের রক্তে আদি অস্ট্রলয়েডদের অবদান সর্বজন স্বীকৃত—তাই সমাজে তাদের আচার অনুষ্ঠানও নির্বিধায়ভাবে প্রবেশ লাভ করেছে। সভ্যতার আদিপর্বে কোন এক সময়ে নিষাদ জাতির অন্তর্ভুক্ত কোল, মুণ্ডা, শবর, পুলিন্দ, মালপাহাড়ী, লোধা প্রভৃতি আদি-অস্ট্রলয়েড উপগোষ্ঠীরা রাঢ়ে পাকাপাকি বসবাস শুরু করে। প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠী যে রাঢ়ে বসবাস শুরু করেছিল তার ব্যাপক প্রভাব দেখা যায় বাঙলা ভাষার মধ্যে। রাঢ়ে এমন অজস্র গ্রামনাম আছে সেগুলি আদি বা অন্তপদ প্রাক-দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অনেকে প্রাক-দ্রাবিড় শব্দ যুক্ত গ্রাম-নামকে সংস্কৃত ভাষায় রূপ দানের চেষ্টা করলেও সংস্কৃত ভাষায় ঐ সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি মেলে না। অথচ প্রাক-দ্রাবিড় ভাষার অর্থ ধরলে সহজে ঐ সকল শব্দ বোধগম্য হয়। সম্ভবতঃ বাঙলায় মনসা পূজার প্রচলনের ক্ষেত্রে প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রভাব ছিল। প্রাক-ঐতিহাসিক পর্বের পূর্বে অর্থাৎ প্রত্ন-ইতিহাসের যুগে রাঢ়ের জনগোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল, আদি-অস্ট্রলয়েড ও প্রাক-দ্রাবিড় (পূর্বাঞ্চলীয় শাখা) গোষ্ঠীর মিলন মিশ্রণের ফলে।

অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী গোষ্ঠীই যে, বৃহত্তর রাঢ়ের আদি বাসিন্দা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাদের নিজস্ব আচার আচরণ ও বিধি অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল এবং কর্মকুশলতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জীবিকার উপায় ও বাসস্থান নির্মাণ করে গ্রাম পত্তন করেছিল। তাই রাঢ়ের সভ্যতা ও লোকসংস্কৃতি বিকাশে অষ্ট্রিক ভাষাভাষীরা গ্রাম কেন্দ্রিক ও প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেরা সম্ভবতঃ নগর সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। বিশেষজ্ঞ ভাষায় বলা যায়,[১০]—'Anthropologists

as noted before, assume at least three varieties or modifications of the Mediterranean race as having come to India, and all of these would appear to have been speakers of Dravidian, at least in India —the palaeo-Mediterranians, the Mediterrancans proper, and the so-called 'orientals'. They were all long-headed, and they came to India with a fairly high level of civilization. As contrasted with the Proto-Australoids or Austries, whose culture was mainly a village culture based on agriculture, these Dravidian—speaking Mediterrranean peoples (in their various ramifications) in India were responsible for cities and a city culture—for a real civilization, in the true sense of the word, including international trade.' ছোটনাগপুর অঞ্চলে সাঁওতাল, মুণ্ডা, খয়রা, ভূমিজ ও হো জাতি বিভিন্ন উপভাষাভাষী হলেও তারা আদিতে কোল ভাষা ব্যবহার করত এবং এই সকল উপভাষা একালেও পরস্পরের নিকট সহজবোধ্য। এটা সম্ভবপর হওয়ার একমাত্র কারণ হল এই যে, তারা আদিতে এক মহাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১১]

রুক্ষ, বনানী ও পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে রাঢ়ের ল্যাটারাইট ভূমিখণ্ডে যে জনবসতি গড়ে উঠতে শুরু হল তাকে একালের সংজ্ঞায় গ্রামীণ বসতি বলা যায় এবং আদিম পর্বে জীবিকার জন্য আহার অন্বেষণ অপেক্ষা আহার্য দ্রব্য উৎপাদনে তারা আগ্রহশীল হয়। শুরু হল কৃষির জয়যাত্রা। এই ভাবেই প্রাচীন শিকারী গোষ্ঠীর মানুষেরা যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক পশুপালন ও কৃষি নির্ভর গ্রামীণ সভ্যতার উন্মেষ ঘটায়। 'কৃষি মূলক গ্রাম্য সমাজের সংহতির উৎসই অস্ট্রেলয়েডদের প্রবল উপস্থিতির কথা বিশেষরূপে স্মর্তব্য।' অস্ট্রিক গোষ্ঠীর কৃষি মূলক সংস্কৃতিই এদেশের সভ্যতার বনিয়াদ হলেও উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত হতে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেরা ক্রমাগত দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও অস্ট্রেলয়েডগণ ছিল সংখ্যাধিক।[১২] রাঢ়ের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর বিবর্তনের ইতিহাস ও বসতি-ভূগোলের প্রেক্ষাপটে এতদঞ্চলের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি কৃষিভিত্তিক ও গ্রামকেন্দ্রিক সমাজের পটভূমিকা ও বিকাশ ঘটিয়েছিল আদি অস্ট্রেলয়েডরা। অবশ্য সুসংহত উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা গঠনের ক্ষেত্রে প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।

জাতি গঠনের ক্ষেত্রে অস্ট্রিক ও প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অবদান কি একমাত্র বিচার্য বিষয়? প্রাথমিক পর্বে অস্ট্রিক ও প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেরা এখানে বসবাস করলেও পরবর্তীকালে আরও উন্নততর জাতি গোষ্ঠী এখানে এসেছিল। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে পশ্চিম দিক হতে অ্যালপাইন পর্যায়ভুক্ত গোষ্ঠীরা কোন এক সময়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হতে এশিয়া মাইনর ও বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে সিন্ধুপ্রদেশ, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশ অতিক্রম করে বিহার, ওড়িশা ও রাঢ়ে আসে।

'অ্যালপাইন পর্যায়ভুক্ত বিস্তৃত-শিরস্ক জাতি সমূহ বৈদিক আর্যগণের অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে এসে আর্যাবর্তের দেশসমূহ বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক অধিকৃত দেখে পশ্চিম উপকূল ধরে নেমে এসে মধ্যভারতের মালভূমির ভিতর দিয়ে গঙ্গা নদীর নিম্ন-উপত্যকায় গিয়ে বসবাস শুরু করে।'[১৩] প্রকৃতপক্ষে বাংলায় যে লোকবসতি ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তা সমস্তটাই অষ্ট্রিক, প্রাক-দ্রাবিড় ও অ্যালপাইন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলে। 'পরবর্তীকালে আগত আর্য ভাষাভাষী আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ ও সংস্কৃতি তার উপরের স্তরের একটা ক্ষীণ প্রবাহ মাত্র এবং এই প্রবাহ বাঙালীর জীবন ও সমাজ-বিন্যাসের উচ্চতর স্তরেই আবদ্ধ; ইহার ধারা বাঙালীর জীবন ও সমাজের গভীর মূলে বিস্তৃত হ'তে পারে নাই।'[১৪] একথা বাঙলার সকল অঞ্চল সমূহের পক্ষেই প্রযোজ্য। রাঢ়ের জনগোষ্ঠীর উপর মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। কেবলমাত্র উত্তরবঙ্গ হতে আগত কয়েকটি ভাসমান উপগোষ্ঠী জীবিকার সন্ধানে বা রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে এতদঞ্চলে চলে এসে-ছিল; যাদের মধ্যে রাজবংশী উপগোষ্ঠী ছিল প্রধান।

বর্ধমান জেলার প্রত্ন-ইতিহাসের সাক্ষ্য হতে খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার অব্দের কাছা-কাছি কোন এক সময়ে বীরভানপুরে ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ ব্যবহারকারী শিকারজীবী এক মানব গোষ্ঠীর সন্ধান মেলে। সম্ভবত তারাই হল রাঢ়ের আদি গোষ্ঠীবদ্ধ বাসিন্দা। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের বাসিন্দাদের শেষ প্রত্নশ্মীয় কালের বলে অনুমান করা হলেও উপযুক্ত নিদর্শনের অভাবে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পেঁছান যায় নাই। পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নর-কঙ্কাল ও মাথার খুলি নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তাতে অনুমান করা যায় যে, ঐ গোষ্ঠীর সঙ্গে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর কিছুটা মিল থাকলেও তারা একালের সাঁওতাল বা মুণ্ডা উপজাতি গোষ্ঠী হতে কিছুটা স্বতন্ত্র; অথচ তারা অ্যালপাইন গোষ্ঠীভুক্ত নয়। ইতিপূর্বেই অষ্ট্রলয়েড ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয় শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং ঐ মিশ্র জাতি স্থায়ীভাবে গ্রামীণ সভ্যতার পত্তন করেছিল। তাম্র ও তাম্র নির্মিত দ্রব্য এবং মৃৎপাত্রের আবিষ্কার হল এই সভ্যতার প্রধান অবদান। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার সঙ্গে এদের যোগসূত্রের প্রমাণ মিলছে। অন্যত্র নর-কঙ্কাল পাওয়া না গেলেও মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূমের তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা একই যোগসূত্রে গাঁথা ছিল।

নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জাতি গঠনের ক্ষেত্রে রাঢ়ের মূল অর্থাৎ আদি মানবগোষ্ঠীর সকলেই ছিল বহিরাগত। নিম্ন সম্প্রদায়ের উপজাতি গোষ্ঠীর একদিকে অষ্ট্রলয়েড ও প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটেছে; অনুরূপভাবে অ্যালপাইন নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণের কথা জানা যায়। তবে রাঢ়ের উচ্চ শ্রেণীর অধিবাসীগণের মধ্যে অ্যালপাইন গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলির আধিক্য দেখা যায়। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মিলন-মিশ্রণে বাঙালী জাতির সৃষ্টি এবং সেকারণে আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় ধ্যানধারণা বা চেতনা ও সামাজিক জীবন মিলন-

মিশ্রণের বনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছে। কিন্তু উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যে সংমিশ্রণ এত বেশী হয়েছিল এবং তার উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রলেপ এত অধিক পরিমাণে পড়েছিল যে, এই সকল বর্ণের মধ্যে নিজস্ব উপজাতীয় গোষ্ঠীচেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পাল যুগের অব্যবহিত পরে বা সেন আমলে আদিশূর নামক রাজার কাহিনী গড়ে উঠেছিল বহিরাগত ও স্থায়ী বসবাসকারী উচ্চবর্ণের মানুষের সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত। কিন্তু যাদের নিম্নশ্রেণী বা তপসিলভুক্ত জাতি ও আদিবাসী বলা হয় তারা ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে নিজস্ব উপ-জাতীয় গোষ্ঠীচেতনা বজায় রেখে চলেছে এবং এটাই হল জাতি গঠনের ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ঘনরামের 'শ্রীধর্মমঙ্গল' কাব্যে ডোম, কোটাল, চণ্ডাল, বাগদি প্রভৃতি উপগোষ্ঠীভুক্ত লোকদের নিয়ে ইছাই ঘোষের সৈন্য বাহিনী গঠনের উল্লেখ আছে। উক্ত বর্ণনায় একালের অস্পৃশ্য বা নিম্নবর্ণের লোকেদের বীরত্বে কাহিনী কেবলমাত্র কবিকল্পনা নয়। এখনও প্রাচীন ঢেকুরগড়ের সন্নিহিত অঞ্চলে 'আঁকুড়ে ডোম' জাতির বসবাস আছে। সমাজ বিন্যাসের ক্ষেত্রেও নিম্নবর্ণের ব্যক্তিরা শাসক শ্রেণীর সহযোগী ছিল। বহিরাগত সেন রাজশক্তির বাংলায় আবির্ভাবের পর বর্ণ বা শ্রেণী ভিত্তিক অভিজাত শ্রেণী গঠনের ফলে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে স্মৃতি শাসিত উচ্চ-নীচ বর্ণের ভেদাভেদ গড়ে তোলা হয়।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে পূর্ব-ভারতে আর্যধর্মের প্রসার বা অনুপ্রবেশ লাভ ঘটে নাই এবং বৈদিক আর্যগণের নিকট 'মধদেশের' পূর্ব দিকের বাসিন্দারা ছিল অপাংক্তেয় অর্থাৎ এসকল অঞ্চলের অধিবাসীগণ বৈদিক আর্যগণের কর্তৃত্ব মেনে নেয় নাই। সম্ভবতঃ এদের নেতৃত্ব দিয়েছিল অ্যালপাইন নরগোষ্ঠীভুক্ত অপর একদল আর্য গোষ্ঠী, যারা ইতিপূর্বেই অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়গণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে, আছে,—'প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীযুর্নান্যা অর্কমভিতো' (৮/১০১/১৪) অর্থাৎ তিন প্রজা আর্যসীমা অতিক্রম করে [অন্যত্র] গমন করেছিল অন্য প্রজাগণ অর্চনীয় অগ্নির চতুর্দিক আশ্রয় করেছিল। প্রজা শব্দটি অত্যন্ত অর্থবোধক। অষ্ট্রিক বা দ্রাবিড় গোষ্ঠীরা দাস, দস্যু, অসুর ও নিষাদ নামে হেয় প্রতিপন্ন হত—তার প্রমাণ মেলে বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে। 'প্রজা' শব্দ হতে এই ধারণা করা যায় যে, প্রাক-আর্য জনগোষ্ঠী ও বৈদিক আর্যগণের ন্যায় কোন সভ্য ও বিশিষ্ট জাতি ছিল, যারা মধ্যদেশ (আর্যাবর্ত) অতিক্রম করে অন্যত্র বসবাস করছিল। অপর একটি ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়, যে সকল গোষ্ঠী অগ্নির আশ্রয় অবলম্বন না করে বা হোমাগ্নির আশ্রিত না থেকে বৈদিক আর্যগণের বাসভূমি হতে দূরে সরে গিয়েছিল। রাঢ়ের জাতি গঠনের অবদান প্রসঙ্গে অ্যালপাইন জনগোষ্ঠীর পশ্চিম ও মধ্যভারত অতিক্রম করে পূর্ব ভারতে আগমনের কথা ইতি-পূর্বেই বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ তারা বৈদিক আর্যগণের প্রভুত্বকে অস্বীকার করে স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিল, উপরোক্ত শ্লোকে তাদের কথা বলা হয়েছে।

পূর্ব ভারতের জনগোষ্ঠীকে হীন বা হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ঐতরেয় আরণ্যকে উল্লেখ করা হয়েছে,—'বায়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপদাঃ' অর্থাৎ বঙ্গ, বগধ (মগধ ?) ও চের-পাদ (সম্ভবতঃ রাঁচি অঞ্চলের 'চেরো' নামক উপজাতি) হল পক্ষী বিশেষ বা যাযাবর। বায়াংসি শব্দে পক্ষী বিশেষ বা অবজ্ঞা সূচক অর্থ প্রতিফলিত হলেও এটা মনে করার কারণ আছে যে, ঐ শব্দের দ্বারা অস্ট্রিক ভাষাভাষী কোন গোষ্ঠীর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করছে ; কারণ আদিম বহু উপজাতির টোটেম ছিল পক্ষী। এখনও রাঢ়ের নিম্ন বর্ণের লোকেদের ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর পক্ষী বিশেষের উপর ট্যাবু আছে। তাছাড়া, 'বৈদিক ব্রাহ্মণগণের পূর্বদেশের উপর বিদ্বেষের প্রধান কারণ হল, বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধ, আজীবক ও জৈন ধর্মের প্রচারকগণ এখানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আর্যাবর্তে ঋষি বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের নামে গোত্র গ্রহণ করার রীতি ছিল। কিন্তু আর্যসীমার বহির্ভাগে ছিল টোটেমবাদ। বেদে বর্ণিত 'কুকুর', 'মৎস্য' প্রভৃতি জাতি ঐ সকল জীব হতে জন্মায় নাই। প্রাচীনকালে সকল আদিম জাতির মধ্যে টোটেমবাদ বিদ্যমান ছিল। অনুরূপভাবে রাঢ়ের অরণ্যের মধ্যে সিংহ কর্তৃক কলিঙ্গ রাজকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণের ফলে সিংহবাহু নামক রাজপুত্রের জন্মের ঘটনাকে রূপক আখ্যা দেওয়া যায়। মহাবংশে উল্লিখিত 'সিংহ' পশুরাজ নয়, সিংহ কোন গোষ্ঠী বিশেষের টোটেম ছিল। বাউরী সম্প্রায়ের টোটেম হল কুকুর। ছোটনাগপুরের 'গো-বংশীয়' বা 'নাগ বংশীয়'গণ গরু অথবা সর্প হতে জন্মায় নাই। এগুলিকে প্রাচীন কৌমের টোটেমরূপে গণ্য করতে হবে।[১৫] চেরো জাতির মূল বাসস্থান ছিল বিহারের গাঙ্গেয় অববাহিকায় এবং আর্য সভ্যতা প্রসারের সময় বিন্ধ্য অঞ্চলের দিকে তারা বাসস্থান নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছিল।[১৬] রাঢ়ের পশ্চিমভাগে অবস্থিত মগধ জনপদকে ঋগ্বেদে কীকট দেশ বলা হয়েছে এবং যাস্কের নিরুক্তে আছে[১৭]—'কীকটা নাম দেশে অনার্য নিবাস।' সর্বপ্রথম এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসার লাভ হয়েছিল। তাই স্বাভাবিক কারণে বৈদিক আর্যগণ এই সকল জনপদের অধিবাসীদের মেনে নিতে পারে নাই।

প্রাচীন জনবসতির প্রেক্ষাপটে একটি বৃহত্তর ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ও পরিবেশ বিচার করলে দেখা যায় যে, পশ্চিমে বাঘেলখণ্ড ও মৈকাল পর্বতের পূর্বশাখা, দক্ষিণে পূর্বঘাট পর্বতের উত্তরাংশ সহ নিমিগিগি ও মেঘাসিক পর্বত, পূর্বে বিন্ধ্যপর্বতের ছোটনাগপুর শাখা ও উত্তরভাগে গঙ্গানদী অববাহিকার দক্ষিণে রুক্ষ, পর্বতময় ও অরণ্য বেষ্টিত স্থানে আর্য বসতির কোন প্রাচীন অস্তিত্ব ছিল না। এই বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে রাজমহল ও গয়াশির পর্বত যেখানে নিষাদ বা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করত। অথবা বলা যেতে পারে যে, মধ্যদেশ বা আর্যাবর্ত হতে বিতাড়িত হয়ে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও অ্যালপাইনগণ এই অঞ্চলকে বসবাসের স্থান হিসাবে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যে প্রাচীন রাজ্য বা শহরের অবস্থিতি ছিল মাত্র দুটি। গয়া ও রাজগৃহের প্রাচীন উপাখ্যান ও ইতিহাস হতে প্রমাণিত হয় যে,

মগধরাজ জরাসন্ধ ও গয়াশুর উভয়েই ছিলেন বৈদিক আর্যগণের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতীক। বৈদিক আর্যধর্মের বিরুদ্ধবাদী ভগবান বুদ্ধদেব ও মহাবীর ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও তপস্যা ও ধর্মপ্রচারের উপযুক্ত স্থানরূপে নিষাদ জনপদকে বেছে নিয়েছিলেন। নব্যপ্রস্তর বা প্রত্নপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার অধিক সংখ্যক আবিষ্কৃত হয়েছে এই অঞ্চলে। তাম্রাশ্মীয় যুগের সভ্যতার নিদর্শন ও প্রাচীন গ্রাম পত্তন এতদঞ্চলেই অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের সাক্ষ্য হতে প্রমাণিত হয় যে, বৃহত্তর রাঢ় ছিল প্রাচীন নিষাদ জাতির বাসস্থান। মহাবীর ও বুদ্ধদেবের আমলে গয়া, রাজগৃহ মল্লপর্বতে (পার্শ্বনাথ পাহাড়) ও তার পূর্বভাগে আর্য সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও স্মৃতিশাস্ত্র গ্রন্থ—প্রণেতাগণ চতুর্বর্ণের পরিকাঠামোর মধ্যে সমগ্র ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে তাঁদের প্রভাবাধীনে রাখার চেষ্টা করলেও সুদূর অতীতে বৃহত্তর রাঢ়ে তাঁদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। তাই বোধায়নের মতে আর্য প্রভাবাধীন সীমার বহির্ভাগে এই সকল অঞ্চলে ছিল সঙ্কর বর্ণের মানুষের বসবাস এবং এতদঞ্চলে আগমন করলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল। উক্ত অভিমতটিকে মনু-সংহিতায় কিঞ্চিৎ সরলীকৃত করার প্রচেষ্টা হয়। মনু বলেছেন,—

'অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেসু চ।
তীর্থ যাত্রা বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥'

অবশ্য মনুসংহিতার সকল সংস্করণে এই শ্লোকটি পাওয়া যায় না। মনুসংহিতায় আর্য সীমা বাইরে বসবাসকারীগণকে 'বাহ্য জাতি' রূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে—তারা সাধুভাষী বা ম্লেচ্ছ ভাষী যাই হোক না কেন, সমাজে 'দস্যু' আখ্যাপ্রাপ্ত মনুষ্যরূপে গণ্য হবে (১০।৪৫)।

মগধরাজ জরাসন্ধের আবির্ভাবকাল হল আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব দশম শতকে এবং তিনি কোন আর্যগোষ্ঠীর প্রতিভূ ছিলেন না। বার্হদ্রথ বংশের পর শিশুনাগ—বংশীয়গণ ছিলেন প্রাচীন নাগগোষ্ঠীর কোন এক শাখা। মহাপদ্ম নন্দ ছিলেন জাতিতে নাপিত এবং মৌর্যগণও ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত নহেন। তাহলে দেখা যায় যে, পূর্বভারতে অন্ততঃপক্ষে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত কোন আর্য নৃপতির আধিপত্য ছিল না। পূর্বভারতে পরিমার্জিত রূপে আর্যসভ্যতার প্রসারকাল হল গুপ্তরাজাদের আমলে —যার সর্বপ্রাচীন প্রমাণ আছে শুশুনিয়া পাহাড়ের গিরিকন্দরের একটি খোদিত লিপিতে।

মগধ, রাঢ়, বঙ্গ ও পৌণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসীগণকে বশীভূত করতে ব্যর্থ হওয়ায় আর্যসাহিত্যে এতদঞ্চলকে অসুর ও বর্বরগণের বসবাসের স্থান বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কল্পসূত্র ও মহাভাষ্যে বর্ণিত, সুহ্মগণ ছিল দুর্ধর্ষ ও বলবান অথচ আর্য প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত নয়। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রোপ-কূলে বসবাসকারীগণ ছিল কর্বট জনগোষ্ঠীর এবং কিকট্র দেশ ছিল আর্যসীমার

বহিভাগে। জৈন প্রজ্ঞাপনা সূত্রে ওড্র বা ওড়িশা পুণ্যদেশ নামে কথিত হলেও মনুস্মৃতি ও পদ্মপুরাণ মতে এটি ছিল ম্লেচ্ছ দেশ। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ মন্তব্য করেছেন যে, ওড্রবাসীগণ ছিল অসভ্য। মহাভারতের বর্ণনা হতে আরও জানা যায় যে, প্রাগজ্যোতিষপুরের কিরাতগণ আর্য গোষ্ঠীভুক্ত না হলেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় আর্যগোষ্ঠীর প্রতিভূগণ কিরাতগণের সহায়তা লাভ করেছিল। বৌধায়নের মতে বঙ্গের অধিবাসীগণ ছিল অরণ্যাচারী এবং তারা শূদ্র। অধ্যাপক সুলিভান লেভীর মতে,[১৮] এই সময়ে বঙ্গজনপদ অর্থে একালের বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলাকে বোঝাত। বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্য হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, অঙ্গদেশ অর্থাৎ রাজমহল পাহাড় হতে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে দীর্ঘকাল আর্যসংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে নাই। এমন কি মল্লপর্বত বা পরেশনাথ পাহাড় অঞ্চলের বসবাসকারীগণ হল অবৈদিক মল্লজাতি। সম্ভবতঃ একটি গোষ্ঠী পরবর্তীকালে মল্লরাজ নামে বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, যারা হল একালের বাগদি উপজাতি বলে গণ্য। এছাড়া মলদ, কারুষ, চের, চেদী প্রভৃতি জাতি আর্যগোষ্ঠীভুক্ত ছিল না।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে শুঙ্গবংশের রাজত্বকালে পুণ্ড্র ও সুহ্মে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার শুরু হয় এবং গুপ্ত রাজাদের আমলে সমগ্র বঙ্গদেশ বিজিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্পূর্ণভাবে এতদঞ্চলের আদি লোকধর্মকে গ্রাস করে। কপিলাশ্রম স্থাপন ও ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়নের কাহিনীটি সম্ভবতঃ আর্যসংস্কৃতি প্রসারের রূপক বা লোককথা।

গুপ্ত আমলে রচিত মহাভারতের পরিশিষ্ট পর্ব অর্থাৎ 'হরিবংশে', আর্য ও অসুর গোষ্ঠীর পারস্পরিক সহাবস্থানের কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। কাহিনীটি হল, পুরাকালে দানবরাজ বলির কোন সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ দীর্ঘতপার স্মরণাপন্ন হন এবং দীর্ঘতপার ঔরসে ও বলি পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচজন মহাবলশালী ক্ষেত্রজপুত্র জন্মলাভ করে। রাজা বলি পঞ্চ পুত্রকে পাঁচটি রাজ্য প্রদান করেন। অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রক নামক পাঁচটি রাজ্য যথাক্রমে তাঁর পুত্রদের অধিকারে ছিল এবং পুত্রদের নামানুসারে রাজ্যগুলির নামকরণ করা হয়েছিল (হরিবংশ-৩১/৩৪-৪২)। হরিবংশের কাহিনী অনুসারে আর্যঋষির ঔরসে ও অসুর পত্নীর গর্ভে জাত পুত্রগণ সমাজে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন এবং তাঁরা বালেয় ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হন। আবার হরিবংশের একত্রিংশ অধ্যায়ের অন্তর্গত ৩৫নং শ্লোকে বালেয় ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। উপরোক্ত কাহিনী হতে জানা যায় যে, বৌধায়ন ও অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত যে সকল জনপদে গমন করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত, সেই সকল দেশ ক্রমশ আর্য শাস্ত্রে স্বীকৃতি পেয়েছিল। 'বালেয় ক্ষত্রিয়' ও 'বালেয় ব্রাহ্মণ'গণ খাঁটি আর্য-রক্ত সম্ভূত নহেন। বৈদিক আর্যগণের অসুর পত্নী গ্রহণ সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণের সমাজে উচ্চ স্থান ছিল। এরূপ একজন পুত্রের অধিকৃত সুহ্মজনপদের অন্তর্গত 'বর্ধমান' অঞ্চল এবং এই জনপদ সৃষ্টির উপাখ্যানের সঙ্গে আর্য ও অসুর গোষ্ঠীর সমন্বয়ের প্রাথমিক পর্বের কথা পুরাণে বলা হয়েছে।

বাঙালী জাতি গঠনের ক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সঙ্গে হরিবংশে উল্লিখিত বিবরণের একটা মিল রয়েছে। এই উৎপত্তির মূল সূত্র একটি মিশ্র জাতিকে নির্দেশ করছে। একথা উত্তরবঙ্গ, বাংলাদেশ ও রাঢ় অঞ্চলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। তবে মিশ্র জাতির দৈহিক অবয়বের গঠনপ্রণালী ও লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রভাব ও নিম্নবর্ণের উপজাতীয় গোষ্ঠীর বসবাস লক্ষ্য করার বিষয়। একথা যেমন কোন আঞ্চলিক বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট জেলা সীমানাতেও বাঙালী জাতির মূল নৃতাত্ত্বিক ভিত্তির উপর স্থানীয় আদিবাসী ও উপজাতীয় গোষ্ঠী-গুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঐ সকল জেলার লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে বা জেলাভেদে পার্থক্যও সূচিত বা চিহ্নিত হয়েছে। জাতি গঠনের ক্ষেত্রে রাঢ়ে বা সুহ্মে চতুর্বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রচলন ছিল না। রাঢ়ের মূল জাতি হল—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। তবে মধ্যে মধ্যে অবাঙালী বণিকগোষ্ঠী (প্রধানতঃ গুজরাটী ও পাঞ্জাবী) ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে রাঢ়ে বসবাস শুরু করে। তারা নিজ নিজ গোষ্ঠীতে বৈশ্য বা ক্ষেত্রীরূপে চিহ্নিত হলেও এদেশে শূদ্র গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছিল। অবশ্য অনেকে এদেশের সমাজ ব্যবস্থা মেনে নিয়ে বাঙালী বলেও পরিচয় দিচ্ছে।

ভট্টভবদেবের আমল হতে রঘুনন্দনের সময়কাল পর্যন্ত বহু স্মৃতিশাস্ত্র ও সমপর্যায়ভুক্ত গ্রন্থ রচিত হলেও সমাজ বিন্যাসের ক্ষেত্রে রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মুখ্য প্রভাব ছিল। একালের জাতিতত্ত্বের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের পরবর্তীকালের রচিত বলে মনে করা যায়। সমাজে কৃষক, শিল্পী ও বণিকরা যাতে সম্পদ আহরণ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পরিচালন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ না করতে পারে তার জন্যই ঐ সকল গোষ্ঠীকে অবদমিত বা পতিত করা হয়েছে। পাল আমলের পর 'বর্মন রাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়াই এই ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বাঙলাদেশে প্রসারিত হতে আরম্ভ করে। ভূমি প্রস্তুত হয়েছিল। রাষ্ট্রের সহায়তা ও সক্রিয় সমর্থন পেয়ে সেই ভূমিতে এই শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে বিলম্ব হয় নাই। এই শাসনের প্রথম কেন্দ্রস্থল হ'ল একদিকে রাঢ়দেশ এবং কিছু পরবর্তীকালে আর একদিকে বিক্রমপুর।'[১৯]

বৃহদ্ধর্মপুরাণে বর্ণিত শ্রেণীবিন্যাসের চিত্র হতে জানা যায় যে, রাঢ়ে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতিসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—উত্তম সঙ্কর বর্ণ, মধ্যম সঙ্কর বর্ণ ও অন্ত্যজ বর্ণ। কোন নৃতাত্ত্বিক জাতি গোষ্ঠী উক্ত বিভাগের অন্তর্গত ছিল না। বর্ণ বিন্যাস প্রসঙ্গে চতুর্দশ শতকে রচিত পুরাণোক্ত কাহিনীর সঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রীয় বাক্যের মিল নাই। এদেশে শাসক ও ব্রাহ্মণের দ্বারা নূতনভাবে বর্ণবিন্যাস সৃষ্টির ফলে, পূর্বের অনেক জাতি উচ্চ শ্রেণীর স্তর থেকে নীচু শ্রেণীতে অবনমিত হয়। 'জনশ্রুতি অনুসারে সুবর্ণবণিক, ধোপা ও চাষা জাতিগুলি বল্লালসেনের দ্বারা তাদের পূর্ব সামাজিক পদ থেকে অবনমিত হয়ে যায়, কৈবর্তদের একাংশ জলচল হয়। ডোম, বাগদী, হাড়ি প্রভৃতি বৌদ্ধজাতিগুলি যারা বৌদ্ধযুগে উঁচু স্তরাভিষিক্ত

ছিল তারা সমাজের অতি নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত স্তরে অবনমিত হয়ে পতিত হয় এবং নবশায়ক নামে কতকগুলি জাতি অপরদিকে উন্নীত হয়ে যায়। গোয়ালাদের একদল হয় 'জলচল' অপর একদল নীচু শ্রেণীরই রয়ে গেল। কিন্তু আসলে এই জাতিগুলি 'শ্রেণী' (guild) ছিল।[২০] এমনকি আদিবাসী বা পার্বত্য উপজাতীয় গোষ্ঠীর জনগণ উক্ত শ্রেণীবিন্যাসে স্থান পায় নাই। অথচ উপজাতীয় গোষ্ঠীর মানুষেরা নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও লোকসংস্কৃতির উৎস সন্ধানের প্রধান অবলম্বন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের সেন্সাসের পর হতে উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলিকে রাঢ়ের জনগোষ্ঠীর একাংশ বলে স্বীকৃতি দেওয়া শুরু হয়েছে। সঙ্কর বর্ণ সৃষ্টির মূলে কোন বিজ্ঞানসম্মত নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মেলে না—এটি হল সুবিধাবাদী সমাজ ব্যবস্থায় দুর্বলকে অবদমনের প্রচেষ্টা।

রাঢ়ের মানব সমাজের নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ গঠিত হয়েছিল অ্যালপাইন, দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে এবং এ কথার প্রতিধ্বনি করে মন্তব্য করা যায় যে, বর্ধমান জেলার মানুষের নৃতাত্ত্বিক গঠনের সঙ্গে তার কোন প্রভেদ নাই। জাতি বিন্যাসের ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলায় অধিবাসীগণের আচার ব্যবহার হতে এরা যে একটি মিশ্র জাতি তার প্রমাণ মেলে নৃতত্ত্বে ও সমাজ বিন্যাসে—যাদের সঙ্গে আর্যাবর্তের মানুষের সামাজিক আচার ব্যবহারের সঙ্গে সাদৃশ্য অপেক্ষা অমিলই অধিক।

ত্রয়োদশ শতকে রাঢ়ের রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজ ব্যবস্থার উপর চরম আঘাত আসে। সমাজের উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের লোকেরা বাধ্য হয়ে অথবা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তবে ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চল অপেক্ষা পূর্বভাগে ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা অধিক ছিল। মনে হয় রাঢ়ের সামাজিক গঠন ছিল দৃঢ়। রঘুনন্দন, মুকুন্দরাম ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণের উল্লেখ হতে রাঢ়ের সুবিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় জানা যায়। বিধ্বস্ত সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য একদিকে যেমন সঙ্কর বর্ণের সামাজিক স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল, অপরপক্ষে আদিশূর ও বল্লালসেনের নামে প্রচলিত কৌলিন্য প্রথার কাহিনী গড়ে উঠল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনে সঙ্কর বর্ণকে শ্রেণী বিভাগ করে স্ব স্ব বিভাগের কার্যও নির্দিষ্ট করা হল। তিনটি উপবিভাগে মোট ৩৬টি উপজাতিতে সঙ্কর বর্ণের বিভাগ নির্দিষ্ট করা হল—আবার কোথাও উপবিভাগের সংখ্যা হল ৪১টি। এই উপবিভাগের ফলে বংশপরম্পরায় কৌলিক বৃত্তি ও কৌলিক আচার অনুষ্ঠান, ধর্ম, বিবাহ ইত্যাদির প্রচলন নির্দিষ্ট করা হল। মধ্যম ও অধম সঙ্কর বর্ণের অন্তর্গত উপগোষ্ঠী সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছু কিছু লোককথা প্রচলন চালু আছে। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সেন্সাস রিপোর্টে উপজাতি বা উপবর্ণ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে কৌলিক বৃত্তিগুলিকেও নির্দিষ্ট করা হল। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী বর্ধমান জেলায় মোট উপগোষ্ঠী বা উপবর্ণের সংখ্যা ছিল ৮২টি।

জনমুখী শিক্ষা ও শাসক শ্রেণীর পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ঊনবিংশ শতকে নবজাগরণের যুগে ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে শুরু হয়। উত্তম

মধ্যম ও অধম সঙ্কর বর্ণ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের প্রদর্শিত জনতত্ত্বের নৃতাত্ত্বিকে ব্যাখ্যা ও ভারতীয় জনসমষ্টির উপর তার প্রয়োগ শুরু হল ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের পর হতে। অবশ্য বর্ণ বিন্যাস তত্ত্বের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সঙ্গে এদেশীয়গণের বৃটিশ রাজ আনুগত্য নির্ধারণ করাও ছিল অন্য একটি কৌশল। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে উপগোষ্ঠী বিভাগ বা বর্ণবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটান হয়। স্বাধীন ভারতের জনগণনা বা সেন্সাস শুরু হয় ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে এবং ঐ সময় হতে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রে উপগোষ্ঠী বিভাগ অনুসারে জনগণনা রদ করা হয়। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে বর্ধমান জেলায় তপশিল-ভুক্ত উপগোষ্ঠী ও তপশিল-ভুক্ত উপজাতির সংখ্যা ছিল, যথাক্রমে ৪৯টি ও ৪টি। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলার জনগণনার সময় কোড়া উপগোষ্ঠীকে তপশিল উপজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এইভাবে কৌমাবস্থা ভেঙ্গে গিয়ে বৃহত্তর সমাজের অঙ্গীভূত হওয়ায় গোষ্ঠী সত্তা শিথিল হতে শিথিলতর হয়ে যাচ্ছে। ইবেটসনের মতে caste বা জাতি হচ্ছে একটা status group বা জাতি একটি পদ বা মর্যাদা সম্পন্ন লোকসমষ্টি মাত্র।

বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতি আলোচনা ও সামাজিক তথা অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিটি বর্ণ বা উপগোষ্ঠীর যথেষ্ট অবদান আছে। এ জেলায় প্রধান প্রধান উচ্চবর্ণভুক্ত গোষ্ঠীগুলি হল—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয়, সদগোপ, বৈদ্য প্রভৃতি; আবার বৃত্তিধারী বা কৌলিক বৃত্তি অবলম্বনকারীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—ভাস্কর, কামার, কুমোর, সূত্রধর, কলু, তাঁতী, গোয়ালা, মোদক, মালি, তাম্বুলি, স্বর্ণকার, কাংসকার, শঙ্খকার ইত্যাদি। এছাড়া বহিরাগত ব্যবসায়িক সম্প্রদায়গণের সংখ্যাও নগণ্য নয়—যাঁরা অতীতে ব্যবসাসূত্রে বর্ধমান জেলায় বসবাস শুরু করলেও বর্ধমানের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় অত্যন্ত নিপুণভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল। কিন্তু এসকল জাতি বহুকাল ধরে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার অংশীদার হয়ে গেছে—কৌলিক বৃত্তি অবলম্বনকারীগণ ব্যতীত অন্য সকলে তাদের আদি উৎপত্তি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বিস্মৃত হয়েছে এবং আর্য সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে তারা গৌরবান্বিত। স্মৃতি শাসিত হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হিন্দু সমাজে প্রবেশের ফলে আদিবাসীগণ ও তাদের ট্যাবু ও টোটেম ধারণা হতে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু কৌলিক বৃত্তিধারীগণ পঞ্চাশ বছর পূর্বেও অত্যন্ত গোষ্ঠী সচেতন ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আনুকূল্য লাভ করলেও সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তারা নিজ নিজ পরিধির মধ্যে জীবিকা অবলম্বনের উপায়গুলিকে বংশানুক্রমিকভাবে অনুশীলনের দ্বারা সমাজ নির্দিষ্ট বৃত্তি সমূহের ঐতিহ্য নিজ নিজ গোষ্ঠী উৎপত্তির কথা পুরুষানুক্রমে বজায় রেখেছিল। কিন্তু পরিবর্তিত অর্থনীতি ব্যবস্থায় বহু প্রাচীন সামাজিক বিধান এযুগে অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে।

তপশিল ভুক্ত উপগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বাগদী, বাউরী, ডোম, শুঁড়ী, মুচি, চামার, জেলেকৈবর্ত, ধোপা, নমশূদ্র, হাড়ী, ভুঁইয়া, কোটাল, লোহার, পাশী,

দোশধ, খয়রা, মাল, নুনিয়া, কেউট ইত্যাদি এবং উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতাল, কোড়া, মুণ্ডা, ওঁরাও, ভূমিজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান জেলায় আদি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হয়েও মোঙ্গলীয় শাখার রাজবংশীগণের বসবাসও নগণ্য নয়। দুলক্ষের অধিক সাঁওতাল এ জেলায় বসবাস করলেও ১২০ বৎসর পূর্বে সাঁওতাল জনসংখ্যা ছিল নগণ্য। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সাঁওতাল অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৪৪৮৭ এবং ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে এই জনসংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ হল ভাসমান জনগোষ্ঠী অর্থাৎ জীবিকার তাগিদে তারা পাশ্বর্বর্তী বিহার রাজ্য হতে বর্ধমানে এসেছিল অথবা সুলভ শ্রমের জন্য তাদের আনা হয়েছিল। অনুরূপ একটা ভাসমান জনগোষ্ঠী হল সুন্দরবন অঞ্চলে মধ্যপ্রদেশ হতে আগত একটি উপজাতি যাদের নূতন চাষযোগ্য জমি হাসিল ও আবাদের জন্য আনা হয়েছিল। সাঁওতাল জাতি কৃষিকার্যে বিশেষ পারদর্শী—তাই জনবিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মোট সাঁওতাল জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ লোক শিল্প-অঞ্চলে এবং প্রায় ৭৫ শতাংশ লোক কৃষি অঞ্চলে বসবাস করছে। সাঁওতালদের ন্যায় ওঁরাও গোষ্ঠীর লোকেরা জেলার পশ্চিমাংশে বসবাস করলেও ১৯৫১ সালে ওঁরাও জনসংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অপরপক্ষে মুণ্ডারা এ জেলায় স্থিতিশীল জনগোষ্ঠী। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মোট ৭২৬ জন কোড়া উপগোষ্ঠীর লোক বসবাস করলেও ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে কোড়া উপজাতীর গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩৩৬ জনে।

বর্ধমান জেলায় ১৮৭২-১৯৭১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ১০০ বছরের মধ্যে তপশিল-ভুক্ত জাতি ও তপশিল-ভুক্ত উপজাতির জনসংখ্যার তালিকা হতে গোষ্ঠীগতভাবে লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি নমুনা পাওয়া যাবে (পরিশিষ্ট—১)।

বর্ধমান জেলার তপশিল-ভুক্ত জাতি ও তপশিল-ভুক্ত উপজাতীয় গোষ্ঠীর ভাষা, দৈহিক গঠন, গায়ের রং, মস্তিষ্কের ও নাসিকার গঠন হতে ঐসকল উপগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বুনিয়াদ সম্পর্কে বহু আলোচনা হলেও বর্ধমানের মানুষের মস্তিষ্ক ও নাসিকার পরিমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নাই। কেবল-মাত্র উপজাতি ভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক আলোচনার দ্বারা বর্ধমানের লোকসংস্কৃতির উপর ঐ সকল নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর প্রভাব জানা যাবে। হারবার্ট রিজলে ও ডব্লু. বি. ওল্ডহাম বর্ধমানের কিছু উপজাতীয় গোষ্ঠীর আচার ব্যবহার ও সামাজিক রীতিনীতি দেখে তাদের নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী নির্ধারণের চেষ্টা করেছিলেন,[২১]—

উপগোষ্ঠী	নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী
বাগদি	প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠী
বাউরী	অনার্য গোষ্ঠী
ডোম	প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠী
মুচি, চামার	অনার্য গোষ্ঠী

ভুঁইয়া	অনার্য গোষ্ঠী
হাড়ি	ঐ
শুঁড়ি	ঐ
ধোপা	ঐ কিন্তু দ্রাবিড় গোষ্ঠীর পেশা।
দোসধ	প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠী
থয়ড়া	ঐ
কোটাল	ঐ
কপালী	ঐ
রাজওয়ার	ঐ
জেলেকৈবর্ত	ঐ
কেওড়া	ঐ
মাল	ঐ
নুনিয়া	ঐ
মল্লা	ঐ
লোহার	অনার্য গোষ্ঠী
নুনিয়া	প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠী
কেওট	অনার্য গোষ্ঠী
টিয়র	প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠী
তুরী	দ্রাবিড় গোষ্ঠী (মুণ্ডা জাতির উপগোষ্ঠী)
সাঁওতাল	প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠী, কিন্তু কোল ভাষাভাষী
মুণ্ডা	প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠী, কিন্তু কোল ভাষাভাষী
ওঁরাও	প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠী এবং প্রাক-দ্রাবিড় ভাষাভাষী
মালপাহাড়িয়া	প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠী
ভূমিজ	অনার্য গোষ্ঠী

(নৃতাত্ত্বিক অষ্ট্রিক গোষ্ঠীকে অনার্যরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।)

এছাড়া কোল ভাষাভাষী বহু উপগোষ্ঠী আছে যাদের নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করতে না পারায় বিবিধ গোষ্ঠীর মধ্যে স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। উপরোক্ত উপগোষ্ঠীগুলির নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ধারা দুটি প্রধান জাতির সমন্বয়ে গঠিত হলেও একালের মিশ্র উপগোষ্ঠীগুলিতে তাদের সামাজিক আচার-আচরণ, ধর্ম, বিবাহ ইত্যাদিতে বিশেষ পার্থক্য সূচিত হয় এবং নিজ নিজ উপগোষ্ঠী সৃষ্টির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম না হওয়ায় কিছু লোককথা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে নিজেদের গোষ্ঠী সত্তা বজায় রেখে চলেছে। অপরপক্ষে উচ্চ বর্ণের মানুষেরা বহুকাল ধরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ছত্রছায়ায় বিধিবন্ধ সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় নিজস্ব প্রাচীন গোষ্ঠী সত্তা বজায় রাখার পরিবর্তে স্মৃতিশাস্ত্র

নির্দিষ্ট জাতিতত্ত্বের তালিকাভুক্ত হতে অধিক আগ্রহশীল ছিল। সীমাবদ্ধ সাংস্কৃতিক গণ্ডীর মধ্যে অবস্থানের ফলে যারা নিজস্ব উপজাতীয় আচার-আচরণ ও অনুশাসন মেনে চলত তাদের জাতি হিসাবে মিশ্র হওয়ার সম্ভাবনা কম হওয়ায় নিজস্ব সত্তা অনেকাংশে বজায় আছে। কিন্তু একালের জটিল অর্থনৈতিক কারণে উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলিকে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ অধিকভাবে আকৃষ্ট করায় তাদের উপজাতীয় ঐতিহ্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে চলেছে। হিন্দু সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার প্রধানতম কারণ হল এই যে, সীমাবদ্ধ সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে বসবাসকারী উপজাতীর গোষ্ঠীর মূল পেশা কৃষি ও অরণ্য সম্পদ আহরণের মধ্যে নির্দিষ্ট হয়ে ছিল। কিন্তু হিন্দু সমাজে প্রচলিত বহুমুখী বৃত্তি অপেক্ষাকৃত সচ্ছল জীবনযাত্রা ক্রমশঃ উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলিকে আকৃষ্ট করার একটি প্রধান কারণ ; অপরপক্ষে সুলভ শ্রম ও শ্রমিকের আশায় হিন্দু সমাজও তাদের গ্রহণ করেছে। এতদসত্ত্বেও বলা যায়, 'আর্যসংস্কৃতির এই বিলম্বিত সম্প্রসারণে বাংলার মৌলিক সংস্কৃতির লৌকিক চরিত্র দীর্ঘদিন নিজস্ব ধারায় বিবর্তিত হতে পেরেছে, বরং আর্য-অনার্য সংঘাত-সমন্বয়ের কালে ব্যাপকরূপে আর্যস্মার্ত সমাজকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে মিশ্রসংস্কৃতির প্রক্রিয়ায় বাংলা সংস্কৃতির সামগ্রিক বিকাশের লৌকিক উপাদানের প্রাচুর্য সম্প্রসারিত হয়েছে এবং জনসমাজে লোকসংস্কৃতি বিশেষরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। উচ্চ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে উপজাতীয় গোষ্ঠীর সংস্কৃতির মিল ও অমিল দুই রয়েছে। বর্ধমানের লৌকিক সমাজে ও লোকসংস্কৃতিতে উপজাতীয় প্রভাব দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চারিত হয়ে আসছে।

জাতিতত্ত্ব বা শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলায় পাঁচটি গোষ্ঠী / শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা যায়। জনসংখ্যার আধিক্য ও দীর্ঘকাল একই অঞ্চলে বসবাসের ফলে ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয়, সদগোপ, বাগদী ও বাউরী জাতির মধ্যে এই প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জাতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তাদের আঞ্চলিক প্রাধান্য এবং আঞ্চলিক প্রাধান্যের ধারা লক্ষ্য করে তাদের মূল আবাসস্থলে ঐ সকল জাতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একক অঞ্চল হিসাবে বাগদী জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক বসবাস করে বর্ধমান-হুগলী-হাওড়া অঞ্চলে এবং জেলা হিসাবে বর্ধমান জেলায় সর্বাধিক বাগদী সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস আছে। গ্রীক পর্যটকদের বিবরণ হতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় অব্দে বাগদী জাতি ছিল রাঢ়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি।[২২] Oldham-এর মতে—"The Bagdi are an infinitely purer and more settled race and passes and suggest points of connction with other tribes which are not to be found in the Bauri."[২৩] রিজলে ও ওল্ডহাম উভয়েই বাগদী জাতিকে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বাংলায় অন্যতম প্রতিনিধি বলে অনুমান করেছেন। সর্পপ্রিয়তার জন্য দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে বাগদী জাতির মিল আছে এবং এরা অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়। কর্ণেল ডাল্টন মন্তব্য করেছেন যে, বাগদী

জাতি হল রাঢ়ের একটি আদিম গোষ্ঠী যা কোন নিম্ন পর্যায়ের উপগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত ও মিশ্রিত হয়ে নিজেদের নিম্নগামী করেছে। তাঁর মতে,[২৪]—"The Baoris and Bagdis are, I conceive, the remnant of an aboriginal race by inter-marriage with Low-Caste Hindus have nearly effaced their primitive lineaments."

বাগদী জাতি যে টোটেম বিশ্বাসী ছিল, তা তাদের উপগোষ্ঠীগুলির নাম হতে প্রমাণিত হয়, যথা,— তেঁতুলিয়া, ওঝা, মেছুয়া, কুশমেটে মল্লমেটে, দাঁড়ামাঝি, দুলে, কাঁশাইকুল ও গুলে মাঝি। বর্ধমান জেলায় অধিকাংশ উপগোষ্ঠীর সন্ধান মেলে। বাগদী জাতির মল্লমেটিয়া বা মল্লমেটে উপগোষ্ঠী এক সময়ে এত প্রবল হয়েছিল যে, তারা স্থানীয় শাসকের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে নিজেদের ব্যাগ্রক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিত। মল্লমেটে উপগোষ্ঠী হতে বিষ্ণুপুরের বাগদী রাজবংশের উৎপত্তি বলে অনুমান করা হয়।[২৫] মল্ল উপজাতির বাসস্থান হতে মল্লভূম নামক ক্ষুদ্র জনপদের উৎপত্তি হয়েছে। নন্দলাল দে ও বিমলাচরণ লাহার মতে পরেশনাথ পাহাড়ের নাম ছিল মল্ল-পর্বত। সম্ভবতঃ মল্ল জাতির বাসস্থানের জন্য এরূপ নামকরণ করা হয়েছিল এবং মধ্যযুগে কোন এক সময়ে এই জনগোষ্ঠী বিষ্ণুপুর অঞ্চল অধিকার করার জনপদটির পর মল্লভূমি নামে পরিচিত হয়।

বাগদী ও বাউরী জাতি হল রাঢ়ের দুর্ধর্ষ জাতির মধ্যে অন্যতম। প্রাচীনকালে বাঙালীর সৈন্যদল গঠিত হত এদের নিয়ে। বাগদী জাতির প্রধান উপজীবিকা ছিল মৎস্য শিকার, কিন্তু মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে বহু প্রতিযোগী গোষ্ঠীর আবির্ভাবের ফলে তারা কৃষিকার্যকে অন্যতম উপজীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে। অতীতে তারা খাল-বিল-নদী-নালায় মৎস্য শিকার করতে গিয়ে সর্পদংশনের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হত এবং সেকারণে সর্প-ভীতি হতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত বাগদী ও সমপর্যায়ের মৎস্যজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে সর্পকুলের দেবী মনসা পুজার এত অধিক সমারোহ ছিল। এই বীর গোষ্ঠীর মধ্যে কালীপুজার আধিক্য যথেষ্ট এবং কালীপুজার দিন তারা পুরাতন হাঁড়ি ফেলে দিয়ে নূতন হাঁড়িতে রান্না শুরু করে। বাগদী জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের প্রচলন আছে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পর সাঙা / সাঙ্গা বা দ্বিতীয়বার বিবাহ এই সমাজে অনুমোদিত। বর্ধমান জেলায় বাগদী জাতির প্রধান বসবাস হল কৃষি অঞ্চলে।

রাঢ়ের দুর্ধর্ষ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বাউরী জাতির স্থান অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের মোট বাউরী জনসংখ্যার তা শতকরা ৭৫ভাগ বসবাস করে বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় এবং তম্মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় এরা হল সর্বাধিক। রিজলে ও ওল্ডহাম উভয়েই বাউরী উপগোষ্ঠীকে অনার্যগোষ্ঠী সম্ভূত বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু কর্নেল ডাল্টনের মতে সামাজিক মিলন-মিশ্রণের ফলে বাউরীরা নিম্নগামী হয়েছে। মেগাস্থিনিসের আমলে উবেরি (Uberrae) জাতি হল একালের বাউরী গোষ্ঠী। বর্ধমানের বাউরী

জাতি সম্পর্কে ওল্ডহ্যামের মন্তব্য হল,[২৬] "But the Bauris, though semi-Hinduized and calling themselves Hindu and so called by their low-caste neighbours, are not admitted to be Hindu by the Hindu Aryans, but pronounced by them to be unmitigated chuars. These Bauris are supposed to be a section of a great tribe of the uberrae mentioned by Megasthenes. This is the purest conjecture."

বাউরী জাতির উৎপত্তি বিষয়ে প্রচলিত লোককথা হল,—তারা বাহক ঋষির বংশধর। অপর একটি প্রচলিত মত হতে জানা যায় যে, ঋক্ মুনির বংশধরগণ শিবের বিবাহের সময় পালকিতে বরকে নিয়ে কন্যাগৃহে যায় এবং পাত্রকে কন্যাগৃহে পৌঁছে দিয়ে বাহকেরা ঐ পালকি বিক্রি করে দেয় এবং প্রাপ্ত অর্থে প্রচুর মদ্য পান করে। ফলে দলপতি কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে মর্তে বাউরী জাতিতে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বাউরী জাতি ৯টি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত, যথা,—মল্লভূমিয়া, শিখরিয়া, পঞ্চকোটি, মোলা, ধুলিয়া, মালুয়া, ঝাটিয়া, কাঠুরিয়া ও পাথুরিয়া। বাউরীরা উপগোষ্ঠীয় রীতিনীতি মেনে চলে। বিবাহ বন্ধন ও বিবাহ বিচ্ছেদ-এর সামাজিক নিয়মকানুন কঠোর নয়। তবে উপগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করার প্রথা কঠোরভাবে মানা হয়। বক ও কুকুর তাদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র এবং এদের হত্যা করলে সমাজচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। গৃহপালিত কুকুর মারা গেলে অশৌচ পালনের বিধি আছে। বক পক্ষীকে বাউরী জাতির টোটেমরূপে গণ্য করা হয় এবং হিন্দুদের নিকট গাভী যেরূপ পবিত্র জন্তু, অনুরূপভাবে বাউরী সমাজে কুকুরের স্থান নির্দিষ্ট আছে। জীবিকার ক্ষেত্রে বাউরীরা পালকী-বাহক ও কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়। বর্ধমান জেলায় প্রায় দু'লক্ষাধিক বাউরী জাতির বসবাসের মধ্যে কৃষি ও শিল্প অঞ্চলে তাদের সংখ্যা অল্পবিস্তর প্রায় সমান সমান। শিল্পাঞ্চলে তারা প্রথমতঃ কয়লাখনিতে মজুরের কাজে নিয়োজিত হয়। বাউরীরা সাধারণতঃ শক্তির উপাসক এবং তাদের উপাস্য দেব-দেবীর মধ্যে মনসা, ভাদু, মানসিং, বড় পাহাড়ী, ধর্মরাজ ও কুদ্রাসিনী উল্লেখযোগ্য। বড় পাহাড়ী ও কুদ্রাসিনীর আরাধনা, সম্ভবতঃ প্রাচীন অষ্ট্রিক সংস্কৃতির ফল্গুধারা বাউরী সমাজের মধ্যে লুক্কাইত আছে।

রাঢ়ের সঙ্কর বর্ণের জাতিগুলির মধ্যে 'সদ্‌গোপ' জাতি হল উত্তম-সঙ্কর বর্ণের পর্যায়ভুক্ত। সদ্‌গোপ জাতির উৎপত্তি বিষয়ে বহু প্রবাদ বা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বর্ধমান জেলার গোপভূম পরগণা হল সদ্‌গোপ জাতির আদি উৎপত্তিস্থল। সদগোপ জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসীগণের ধারণা এই যে, রামগঞ্জ তাম্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষ ছিলেন জাতিতে সদ্‌গোপ। আবার অনেকে ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত ইছাই ঘোষকে সদগোপ জাতির প্রতিভূ বলে মনে করেন। কিন্তু এসকল তত্ত্বকথার কোন প্রাচীন প্রমাণ নাই। স্বকল্পিত কিছু কাহিনী খাড়া করে এই গোষ্ঠীর প্রাচীনত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। সদগোপ জাতির উৎপত্তির সঙ্গে গোপভূমের রাজা মহেন্দ্রনাথের সম্পর্ক

জড়িত আছে। প্রকৃতপক্ষে মহেন্দ্রনাথের সময় হতে এই জাতির পরিচয় জানা যায়। আঞ্চলিক বসবাসের স্থান হিসাবে সদগোপ জাতি দু'ভাগে বিভক্ত, যথা,—পশ্চিম কুলিয়া ও পূর্ব কুলিয়া। সাধারণভাবে গোষ্ঠীর মধ্যে পশ্চিম কুলিয়াদের স্থান হল উচ্চ; কারণ তারা গোপভূমের শাখাজাত বলে নিজেদের দাবী করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তারা গোপভূমের রাজধানী অমরারগড় হতে ভালকি, দিগনগর, কাঁকসা, ভরতপুর, কর্ণগড়, নাড়াজোল, নারায়ণগড়, দিগড়া, শিউড়, কির্ণাহার প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে দাবী করেন যে, এই জাতি আদিতে ছিল ক্ষত্রিয়। আবার কোন এক গোষ্ঠীর দাবী হল এই যে, সদগোপ জাতি বৈশ্য বংশোদ্ভূত। পেশা ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান হতে প্রমাণিত হয় যে, এই গোষ্ঠীর সঙ্গে ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য জাতির কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃতপক্ষে এই গোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল কৃষিকার্য। কিন্তু বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেও এরা পিছিয়ে ছিল না। অতীতে লেখকের বৃত্তি ছিল সদগোপ জাতির। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে, ধর্ম ও বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন মৌলিকত্ব নাই; অন্যান্য উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের ন্যায় তারা ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে বসবাস করে।

সদ্গোপতত্ত্বে বিশ্বাসীগণ মনে করেন যে, গোপ জাতির সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু 'সদগোপ' শব্দটি হতে এই ইঙ্গিত মেলে যে, এক সময়ে গোপ জাতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক জড়িত ছিল। গোপ জাতির সামাজিক অনুন্নত অবস্থার জন্য সদগোপেরা এক সময়ে অতীত সম্পর্ক মানতে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসনে ব্যর্থহীন ভাষায়,—'শ্রীবালঘোষ ইতি ঘোষ-কুলান্বজজাত' ও শ্রীধর্মমঙ্গলে 'ইছাই গোয়ালা' উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সদগোপ জাতিভুক্ত করার প্রধান কারণ হল এই যে, শ্রীবালঘোষ ছিলেন শাসক ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। জন বক্সওয়েলের মতে সদগোপ গোষ্ঠী কোন প্রাচীন জাতিভুক্ত নয়; প্রকারান্তরে বলা যায় যে, এই গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে মধ্যযুগের শেষ পর্বে। সদগোপ জাতি সম্পর্কে ওল্ডহামের মন্তব্যটির যথেষ্ট মূল্য আছে,[২৭]—'They now utterly repudiate connection with the goala, and with the profession of cowherding or milking. Though they must have been Gops before they were Sadgop, and though Gopbhum is more pastoral than agricultural, they assert that they were the lords, not the attendants of cattle, and the only profession they acknowledge for themselves is agriculture.' ওল্ডহামের মতবাদের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করলে সম্ভবতঃ জানা যাবে যে, রাঢ়ের আদিম অধিবাসীগণ শিকারীজীবী পর্যায় হতে পশুপালন ও কৃষিজীবী পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার সময়ে একই গোষ্ঠী পশুপালন ও কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মের ক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাগ শুরু হলে পশুপালন ও কৃষিকার্য পৃথক কর্মে পরিণত হয় এবং কর্মের দ্বারাই বৃত্তি ও জাতি

নির্দিষ্ট হয়ে গোপ ও সদ্‌গোপ জাতিরূপে হিন্দু সমাজে প্রবেশ লাভ করে। অতীতে পশু শিকার ও পশু পালন অপেক্ষা কৃষিকর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হত। তাই কর্ম নির্দিষ্ট হয়ে গোপ ও সদ্‌গোপ পৃথক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। এই পৃথকীকরণের মূল কথা হল[২৮]—'The economic, Political and cultural achievements of the dissident Gops appears to have improved their social position and helped them to build up superior status in the eye of the people.' গোপ ও সদগোপ জাতির পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ডঃ সান্যালের অপর মন্তব্যটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[২৯]

বর্ধমান জেলার জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরী জাতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বর্ধমান ব্যতীত বীরভূম, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলায় উগ্রক্ষত্রিয় জাতির বসবাস থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের মোট উগ্রক্ষত্রিয় জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ বসবাস করে বর্ধমান জেলায়। উগ্রক্ষত্রিয় জাতি দুটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত, যথা—সুত ও জানা। রিজলে যেভাবে আগুরি জাতির উপগোষ্ঠী বিভাগ দেখিয়েছেন তা ভুল। সংখ্যাগতভাবে বিচার করলে ব্রাহ্মণের পরেই উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরী জাতির স্থান। এরা স্বাধীনতাপ্রিয়, কৃষিজীবী ও মূলতঃ শক্তি দেবদেবীর উপাসক। তবে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীভুক্ত বহু পরিবারকেও দেখা যায়। আগুরী জাতির পূজা বা উপাসনায় বলিদানপ্রিয়তা দেখা যায়। সম্ভবতঃ তাদের রক্তে প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির প্রভাব থাকায় উত্তরসূরী হিসাবে পশুবলিকে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে বেছে নিয়েছে। মনে হয় অতীতে এই জাতির প্রধান বৃত্তি ছিল সৈনিকের এবং সৈনিকের কার্যের প্রয়োজন শেষ হলে তৎকালীন সমাজে জীবন ধারণের প্রধান ও সম্মানজনক উপায় হিসাবে কৃষিকার্য ছিল তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। আগুরী জাতির ধর্মের বহিরঙ্গ রূপটিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য থাকলেও তাদের নিত্যনৈমিত্তিক আচার অনুষ্ঠান, লোকধর্ম ও বিবাহের ক্ষেত্রে অন্তর্মুখী আচরণগুলিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুমোদিত বলে মনে না করার যথেষ্ট কারণ আছে। উগ্রক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। তবে অগ্রহারিক শব্দ হতে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি অথবা বর্ধমান রাজবংশের আদিপুরুষগণের সঙ্গে আগত—তত্ত্ব দু'টি একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। বেশান্তর জাতকে উল্লিখিত "উগগা চ রাজপুত্তা চ বেসিয়ানা চ ব্রাহ্মণা" শ্লোকে 'উগগা' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ই বি. কওয়েল মন্তব্য করেছেন যে, 'উগগা' শব্দটি উগ্রক্ষত্রিয় জাতির সমার্থক। (বিশেষ বিবরণ—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯-৩০)। কিন্তু John Boxwell-এর মতের সমর্থনে ওল্ডহাম মন্তব্য করেছেন,—'The case of the Aguri is a Valuable one in caste enquiries in Bengal, where castes are so multiplied and sometimes so inexplicable, because the caste is so respectable, its formation so recent and its origin so well verified.'[৩০]

উচ্চবর্ণের মধ্যে বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণ বসতি হল মোট জনসংখ্যার একটা

উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী। পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক ব্রাহ্মণ বসতি হল বর্ধমান জেলায়। এ জেলার ব্রাহ্মণগণ চারটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত, যথা—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ, সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ও বৈদিক ব্রাহ্মণ। সংখ্যাধিক্যের বিচারে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ হলেন সর্বপ্রধান। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ সূর্যপূজা ও গ্রহ পূজায় পৌরোহিত্য করার জন্য বাঙলার বাহির হতে এসেছিলেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ কতকাল পূর্বে বর্ধমান জেলায় বসবাস করছেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় না। তবে বৈদিক যাগযজ্ঞে তাঁরা পৌরোহিত্য করতেন তার নিদর্শন এখনও আছে। মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত নিগন গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বসবাস আছে। পূর্বস্থলী থানার চুপী গ্রামের রায় বংশ (দেওয়ান রঘুনাথ রায়) পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর অন্তর্গত। সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ হলেন বহিরাগত এবং এককালে বহু সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বর্ধমানে বসবাস করার জন্য এসেছিলেন। অনেকের মতে বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে যে অঞ্চলে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ প্রথম বসবাস শুরু করেন তা সাতসৈকা পরগণা নামে পরিচিতি লাভ করে। মধ্যযুগে মঙ্গলকোট থানার যবগ্রামে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের বসবাসের উল্লেখ আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা কালনা থানার সিঙ্গারকোন গ্রামে বসবাসের জন্য চলে আসেন।

গুপ্তযুগে বর্ধমানে ব্রাহ্মণ বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায় গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসনে। কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বসবাসের সঙ্গে আদিশূরের নাম জড়িত আছে; তবে এর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। কুলশাস্ত্র মতে আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূর রাঢ়ের ব্রাহ্মণগণকে তাঁদের বসবাসের জন্য ৫৬টি (মতান্তরে ৫৯টি) গ্রাম দান করেন। এই সমুদয় গ্রামের নাম হতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের গাঁঞীর উৎপত্তি হয়েছে। রাঢ়ের মোট ৫৬টি গ্রামে ব্রাহ্মণ বসতির মধ্যে ২৪টি গ্রামের অবস্থিতি ছিল বর্ধমান জেলায়।[৩১] গ্রামনাম অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্ধমান জেলার সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদের উপর। আদিম জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যা, ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আর্য ভাষা এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রলেপ পড়ে মিশ্র জনগোষ্ঠীর মিশ্র সংস্কৃতি উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তাই প্রাচীন জনবসতি ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যার বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করার জন্য এই জেলার মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান অধ্যায়ের প্রস্তাবনা।

পাদটীকা ঃ

১। লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১।

২। *Encyclopaedia of Religion and Ethics*—Vol. VIII, p. 138.

৩। গণকণ্ঠ (বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৫), পৃঃ ২০।

৪। গণকণ্ঠ (বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৫) পৃঃ ১৯।

৫। গণকণ্ঠ (বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৫) পৃঃ ৪৬-৪৭।

৬। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি (প্রবন্ধ—লোকসংস্কৃতি বিকাশের পশ্চাৎপট ও বঙ্গদেশ —ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়), পৃঃ ৪।

৭। বাংলার লোকসংস্কৃতি—ওয়াকিল আহমদ, পৃঃ ৩১।

৮। *Kirata-Jana-Krti*—Suniti Kumar Chatterji (The Many racial and Linguistic Elements behind the unity of India), p. 2.

৯। *The Indo-Aryan Races*—Ramaprasad Chanda, p. 34.

১০। *The History and Culture of the Indian People* (Vol. 1, The Vedic Age, Ch. Race Movements and Prehistoric Culture—S. K. Chatterji), p. 157.

১১। *Descriptive Ethnology of Bengal*—E. T. Dalton, p. 154 (ch. relating to '*The kolarians*').

১২। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি (প্রবন্ধ—লোকসংস্কৃতি বিকাশের পশ্চাৎপট ও বঙ্গদেশ —ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৩।

১৩। বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়—অতুল সুর, পৃঃ ২৩।

১৪। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৪৩।

১৫। বাঙ্গলার ইতিহাস (সামাজিক বিবর্তন)—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৩। (আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ রূপে চিহ্নিত 'আর্যযুগ' নামক নিবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা)।

১৬। *Descriptive Ethnology of Bengal*—E. T. Dalton, p. 154.

১৭। *Vedic Index of Names and Subjects*—A. A. Macdonell and A. B. Keith, Vol. I, p. 159.

১৮। *Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India*—Syllvain Levi and others (Translated from French by Prabodh Chandra Bagchi), p. 74.

'Anga corresponds to the district of Bhagalpur and Vanga to the district of Birbhum, Murshidabad, Burdwan and Nadia in Bengal.'

১৯। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ২৯২।

২০। বাঙলার ইতিহাস (সামাজিক বিবর্তন)—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৪৫।

২১। *The Tribes and Castes of Bengal*—H. H. Risley, Vol. I & II & Some *Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District* —W. B. Oldham.
প্রত্যেকটি জাতির নৃতাত্ত্বিক গঠন ও বৈশিষ্ট্যের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনাগুলি দ্রষ্টব্য।

২২। *Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District*—W. B. Oldham p. 2.

২৩। *Ibid*, p. 3.

২৪। *Descriptive Ethnology of Bengal*—E. T. Dalton, p. 328.

২৫। *Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District* —W. B. Oldham, p. 15.

২৬। *Ibid*, p. 2.

২৭। *Ibid*, p. 26.

২৮। *Social Mobility in Bengal*—Hitesranjan Sanyal, p. 93.

২৯। *Ibid*, p. 83.

৩০। *Some Historical and Ethnical Aspect of the Burdwan District*—W. B. Oldham, p. 28.
কিন্তু মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে আছে,—
'আগরি নিবসে পুরে আপনার বৃত্তি করে
অনুচিত না করে কথন।'
উপরোক্ত বর্ণনার পর 'so recent' মন্তব্যটি অর্থহীন।

৩১। *History of Bengal* (Dacca University)—Ed. R. C. Majumdar, Vol. I, p. 634 ; বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃঃ ২৯৯ ; বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড—প্রথম ভাগ)—নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ ১১৪-২৭।

পরিশিষ্ট—১

তপশিলী জাতি ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি

	১৮৭২	১৮৯১	১৯১১
বাগদি	২,০৫,০৭৪	১,৪৯,৪৬১	১,৯৫,৮৭৪
বাউরী	৭০,৫৯৮	৯২,৩২২	১,১৪,৩০২
ডোম	৫২,৩২৭	৩৯.৬৮৯	৩৯,৩৯৬
জেলেকৈবর্ত	১০,৫৩৩	২৬,৬৫৬	৩,৪৬৯
মুচি-চামার রুইদাস	৫৩,৪৭৭	৫১,২৮০	৬৫,৬৮৫
নমশূদ্র	৩৩,৩২৬	১৮,০৭৫	১৪,৯১৯
ভুঁইয়া	১,৬২৫	৪,১৪৭	৭,৬৬৮
হাড়ী	২৭,২৫৪	২২,৯৭৬	২৩,২৪৮
শুঁড়ী	২২,২৫৯	২০,২৯৪	১৯,৯১৭
ধোপা	৭.১৫২	৩,৮৪৫	৩,৯৩৩
রাজবংশী	—	৩,৫৯৫	২,৫২৯
মাল	৩,০৭৮	১,৭২৯	১,৮৯২
পাশী	৩১৮	—	১,০৪৬
নুনিয়া	—	—	৯২২
খয়রা	—	—	২,০০০
কোটাল	—	৮,৪৪৫	—
দোসধ	৫৬৩	—	২,২৮৮
তুরী	৪৭	—	৩৮৭
লোহার	—	২০.৩৭১	১.৯৫৮
সাঁওতাল	৪,৪৮৭	২২,২৫৬	৬৫,৯৭৯
কোড়া	৭২৬	৫,৩৩৬	১৩,০২৯
মুণ্ডা	৯৯১	—	১,৩০২
ওঁরাও	—	—	৫১৫
ভুমিজ	২৯৩	—	১,৯৬৫
মহলি	—	—	৫৮৫
মালপাহাড়িয়া	৫৪৯	সম্ভবতঃ	মাল উপ
বিবিধ	১৮,৮৭১	সুনির্দিষ্ট	কোন

১৯৩১	১৯৫১	১৯৭১	কৃষি ও শিল্পাঞ্চলের লোকবসতির অনুপাত (১৯৭১)	
১,৮৫,১৭২	১,৮৯,৬৭১	২,৫২,০৪৫	৯৬	৪
১,২৩,৮৬৪	১,২৪,১৬২	১,৬৬,২১০	৪৭	৫৩
৩৪,৯১০	৩১,৯৪৯	৪১,৪১৬	৭২	২৮
৮,৯৬৮	১১,০৪৩	১৭,১৩৭	৭৭	২৩
৭০,১৬৯	৭৮,১৫৯	১,১৫,৬১৯	৭৭	২৩
১৪,৮০৯	৩১,০১৭	১৪,৬৮৫	৯৩	৭
৯,৯০৪	১৫,৪৭৬	১৬,৮২৯	১৫	৮৫
২০,১৫২	২০,৭৪৬	২৯,৪৮৮	৮১	১৯
১২,০০৫	২,৪৪৯	২৯,৯৪৮	৫২	৪৮
৩,৯৫১	৪,৫৮৯	১২,৯৪৩	৭২	২৮
৩,৪৬২	৩,৪০৮	১৩,২৮৭	৯৬	৪
১,৪৭৪	৩,৬২২	৭,৫৩৭	৯৫	৫
১,৪১১	২,৯৩৫	৪,৭২৬	২৫	৭৫
২,০৬৫	৪,৩২১	২,৭৪৬	২	৯৮
২,৬৫১	৪,৯১৫	৮,৫৯৬	৯৩	৭
৬,০৬০	৪,৩০৯	৯,৭০৯	৯৯	১
২,৯১১	৬,২০০	৫,০২৪	৫	৯৫
৪৬৬	৩,৫১১	৩,৪৭৫	৪২	৫৮
৪,৭৬১	৫,৩১৪	৭,৫৯৫	৮৮	১২
১,০১,৫২২	১,২৭,৪৪১	১,৮০,২৮০	৭৪	২৬
১৪,৫৫৭	১৪,৬০১	১৯,৯৩০	৬৩	৩৭
৪৯৪	২,৪৪৭	২,৯৫৬	৬০	৪০
১,২৯০	৪,৫৫৫	২,৮৭৯	৬৮	৩২
২,৪৫৫	১,৫৫১	১,৩০২	৯৯	১
৭৮১	১,৪১৬	১,৫৫০	৫৮	৪২
গোষ্ঠীর সঙ্গে	মিশে	গেছে।	×	×
জনসংখ্যার তথ্য	পাওয়া	যায় নাই।	৫১	৪৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

লোকধর্ম

(১)

রাঢ়ের মার্গধর্ম ও লোকধর্মের ইতিহাস সামাজিক ইতিহাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল। লোকধর্মের প্রচলন বা ঐতিহ্য শুরু হয়েছিল এতদঞ্চলে জনবসতি গঠে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। আদিম মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা তথা জীবিকার উপায়কে অবলম্বন করে লোকধর্মের জয়যাত্রা শুরু হল — যা গোষ্ঠীবিশেষে একালের মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন-রূপে আশ্রিত হয়ে আছে। প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর কোমবদ্ধ জীবনযাত্রা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে একালের উপজাতীয় ধ্যান-ধারণায় বহিরঙ্গের পরিবর্তন দেখা গেলেও মূল বিষয়টি কিন্তু গোষ্ঠী উদ্ভবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে আছে। আজও রাঢ়ের উপগোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন জাতি টোটেম, ট্যাবু ও গোষ্ঠীর ঐতিহ্য অনুসারে গোষ্ঠী-বিশেষে ধ্যান-ধারণাকে অবলম্বন করে আছে। উচ্চবর্ণের ধর্মের প্রভাব ও আকর্ষণের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহ্যিক রূপ তারা গ্রহণ করেছে একথা সত্য; কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও উৎসবগুলিও পালিত হচ্ছে। 'এদেশে বহুসংখ্যক ডোম, কাপালী ও হাড়ী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে ধর্মপুজা হয় বা গাজন চড়ক প্রভৃতি অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্ম থেকে উৎপন্ন না হয়ে আদিম জাতীয় ধর্ম যাকে ইংরাজীতে বলা হয় "ট্রাইব্যাল রিলিজিয়ান" তা থেকে উদ্ভূত হতে পারে। বৌদ্ধেরা আদিম জাতিগুলোর ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি "লৌকিক ধর্ম" বলে স্বীয় পদ্ধতির মধ্যে জীর্ণভূত করে নিয়েছে। মজার ব্যাপার এই যে, তাদের দেখাদেখি ব্রাহ্মণেরাও লৌকিক ধর্মের প্রতি উদারতা দেখিয়েছে।'[১] লৌকিক ধর্মের বিচার বিশ্লেষণ মানব গোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের আলোচনা অপেক্ষা জটিল। 'ধর্ম-কর্ম-ভাবনা ও সংস্কার বর্ণ, শ্রেণী ও কোমভেদে পৃথক; একই কালে একই বিশ্বাস বা একই পুজা ইত্যাদির রূপ সমাজের সকল স্তরে এক নয়, বিভিন্ন দেশ খণ্ডে তো নয়ই।'[২]

রাঢ়ের সভ্যতা ও জাতি গঠনের ন্যায় রাঢ়-সংস্কৃতি তথা লোক-সংস্কৃতি ও সমাজ গঠিত হয়েছে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও অ্যালপাইন নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলে। আদিতে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রাচীন সমাজব্যবস্থার সঙ্গে পশ্চিম দিক হতে আগত অ্যালপাইন গোষ্ঠীর প্রভাবের ফলে সামাজিক অবস্থা আরও উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং সুদীর্ঘকাল ধরে মিশ্র সামাজিক কাঠামোর মধ্যে রাঢ়ের মানুষ বসবাস করছিল। সম্ভবতঃ এই সামাজিক অবস্থার পরিপেক্ষিতে গ্রামীণ সভ্যতা তথা তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। পরবর্তীকালে উত্তর ভারত হতে আগত বৈদিক আর্যগণের দ্বারা সমাজ গঠন ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে রাঢ়ের মানুষকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল সত্য; কিন্তু সংস্কৃতির

তলদেশে বা সমাজচেতনার মূলে আর্যসংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সর্বক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করতে সক্ষম হয় নাই। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ছিল আদি লোকধর্মের বহিরাবরণ যা উচ্চবর্ণের মানুষেরা রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য গ্রহণ করেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা মার্গধর্ম রাঢ়ের আদিম লোকধর্ম হতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক ও বিরুদ্ধবাদী। এতদসত্ত্বেও আদিম লোকধর্ম ও মার্গধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের রূপটি ধরা পড়ে। এটাই হল রাঢ়ীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। রাঢ়ের আদিম জাতিসমূহ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে ধর্মোৎসব পালন করত এবং আদিবাসীদের মধ্যে ঐ প্রথা আজও বলবৎ আছে। কিন্তু একালের বারোয়ারী পূজা হিন্দুধর্মের অনুমোদিত নয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রয়ীদের পূজার বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিগতভাবে অথবা ব্যক্তির জন্য উপাসনা। ধর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের ফলে আদিম গোষ্ঠীগত পূজা বারোয়ারী পূজায় রূপান্তরিত হয়ে হিন্দুধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

জাতি গঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রাঢ়ের মানুষ হল মিশ্র গোষ্ঠীর—তাই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দুটি ধারা পাশাপাশি বয়ে চলেছে। "কিন্তু আদিম মানব কুলের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানসমূহকে হিন্দুধর্ম বিশেষভাবে অঙ্গীভূত করেছে। সুতরাং বর্তমান হিন্দুধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ভাব ও ক্রিয়াকাণ্ডের বিদ্যমানতা বিশদভাবে প্রকটিত। হিন্দুধর্মের স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে দুই প্রধান স্তর নির্ধারণ করা যায়—যাজকতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও লৌকিক হিন্দু ধর্ম। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির প্রকৃত স্বরূপ এই লৌকিক হিন্দুধর্মের মধ্যেই বিন্যস্ত রয়েছে। পল্লীঅঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুধর্ম লোকধর্ম নামে অভিহিত। প্রচলিত লোকধর্মের অনুষ্ঠানাদির মধ্যেই বাংলার সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনার স্বরূপ বিন্যাস অনুধাবন করা সম্ভবপর।"[৩]

লোকধর্ম হল সম্পূর্ণরূপে ঐতিহ্যগত—একথা সর্বকালে ও সর্বদেশের পক্ষে প্রযোজ্য। এ ধর্মে শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের বাহ্যিক রূপ দিতে বিশেষ কোন বিধি-নিষেধ নাই। গোষ্ঠীভেদে ও স্থানভেদে আচার-অনুষ্ঠানের পার্থক্য দেখা দিলেও কোন গণ্ডী বা সীমারেখা টানা যায় না। এ বিষয়ে ডঃ সুধীররঞ্জন দাসের মন্তব্যটি অত্যন্ত অর্থবহ—'লোকধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠানের প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা সম্ভব নহে। এমন কি, লোকধর্মের অনুষ্ঠানাদির প্রকারভেদ নিরূপণ করাও সাধ্যাতীত। কারণ, লোকধর্ম প্রধানত গ্রামিক ও আঞ্চলিক। অপরপক্ষে লোকধর্ম সম্পূর্ণরূপে আঞ্চলিক—পরিবেশজাত। উপরন্তু, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভিত্তিক। সুতরাং বিভিন্ন গ্রামের ও অঞ্চলের লোকধর্মীয় অনুষ্ঠান অভিন্ন নহে। সাধারণত, লোকধর্মে দেবদেবীর অর্চনার প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। জনসাধারণই সর্বপ্রকার লৌকিক দেবদেবীর সৃষ্টি করেছে। লোকধর্মে দেবদেবীর অর্চনা ও প্রকৃতি-পূজা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম, ব্যাধি, পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল, নদ-নদী, বাস্তব পদার্থ প্রভৃতি

সংক্রান্ত পূজা-পার্বণও লোকধর্মের অন্তর্ভুক্ত। পিতৃপূজা, বীরপূজা, অপদেবতা ; পিশাচ-পূজা, ভূত-প্রেতাদির বশীকরণ, নিরোধকরণ, ঋতু উৎসব, কৃষি-বিষয়ক ও উর্বরাশক্তি বৃদ্ধিকারক অনুষ্ঠানাদিও লোকধর্মের অঙ্গীভূত। এই সকল লোকধর্ম-অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্রত-উদ্‌যাপন সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ সর্বপেক্ষা তত্ত্বপূর্ণ। কারণ নানাবিধ ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যেই লোকধর্মের এবং লোকসংস্কৃতির আদি স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়।'[৪] আবার মানুষের মধ্যে ভয়-ভীতি বা ভয় মিশ্রিত বিশ্বাস হল ধর্মের উদ্ভবের মূল কারণ, একথা Sir James Frazer উল্লেখ করেছেন,[৫]—"The fear thus entertained of alien visitors is often mutual. Entering a strange land the savage feels that he is treading enchanted ground, and he takes steps to guard against the demons that haunt it and the magical arts of its inhabitants. Thus on going to a strange land the Maoris performed certain ceremonies to make it 'common', lest it might have been previously 'sacred".

প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর বসতি ভূগোল, পরিবেশ ও জীবিকা নির্ধারণের অবলম্বনকে আশ্রয় করে সর্বপ্রথম উপজাতীয় ধর্মবিশ্বাস শুরু হয়। সেকালে জীবন ধারণের অবলম্বনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা,--(১) পশু শিকার, (২) খাদ্য সংগ্রহ ও (৩) কৃষির উদ্ভাবন ও পশু পালন। আদিম উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্বে অধিবাসীগণের কোন সামাজিক বন্ধন বা রাষ্ট্রীয় চেতনা ছিল না। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অপর গোষ্ঠী হতে আত্মরক্ষা ও বন্য জীবজন্তুর আক্রমণ হতে রেহাই পাবার তাগিদে তারা একত্র বসবাস শুরু করে। কৃষিকার্য ও পশুপালন আয়ত্তাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীগতভাবে লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়—তাই তারা যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব স্থায়ী অধিবসতি গড়ে তোলে। গ্রামীণ সভ্যতা বা গ্রাম পত্তনের মূল কথা হল স্থায়ী উৎপাদন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা ও তার সঙ্গে জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করা। কিছু লোকের একত্রে বসবাসের ফলে গড়ে উঠল গোষ্ঠী এবং গ্রামীণ বসবাস গোষ্ঠী কেন্দ্রিক রূপে শুরু হয়েছিল একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। যাকে একালের সমাজবিজ্ঞানীগণ বলেছেন 'কৌম'। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্বতন্ত্রভাবে বসবাসকারী কৌম বা গোষ্ঠীগুলি অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে এবং কোন এক সময়ে যৌথ নেতৃত্বের প্রয়োজন দেখা দেয়। গ্রামীণ সংগঠনের ক্ষেত্রে গ্রাম্য-পুরোহিত নিযুক্ত করার প্রথা ছিল অধিবাসীগণের মধ্য হতে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবের ফলে যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণগণ উক্ত পদ গ্রহণ করলেও ধর্মরাজ, গাজন, মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর পূজায় উক্ত প্রথার ব্যতিক্রম দেখা যায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের সাহায্য ব্যতীত নিম্নবর্গের মানুষেরা পূজার্চনা করে থাকেন। অঞ্চল বিশেষে ব্রাহ্মণদের উপর অপরাপর গোষ্ঠীও যে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল সে বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ মন্তব্য পাওয়া যায়, "যে সকল গ্রামে

পরবর্তীকালে একটি কিংবা দু'টি ব্রাহ্মণ পরিবারের বসতি স্থাপিত হয়েছে, তারা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার পরিবর্তে গ্রামের অন্যান্য অধিবাসী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, নিজেদের কৌলিক আচার বিসর্জন দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লৌকিক আচার-আচরণ পালন করেছে। এইভাবেই পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যেও ডোম পূজিত ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন হয়েছে।'[৬]

(২)

আদিম মানব সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় বা জীবনধারণের উপায় নির্ধারণে গুণগত পরিবর্তন ঘটে। শিকারীজীবী পর্যায়ের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কিত কিছু আচার-অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। ভক্ষ পশুগুলির উপর কিছুটা পবিত্রতা আরোপ করা হয় এবং সমবেত নৃত্যগীতমূলক আচার-অনুষ্ঠান সহকারে সেগুলিকে নিহত ও ভক্ষণ করা হয়। পরবর্তীকালের যাগযজ্ঞে শিকারজীবী পর্যায়ের এই আচার-অনুষ্ঠানগুলির পল্লবিত রূপ লক্ষ্য করা যায়।[৭]

অনুরূপভাবে কৃষি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী আবাসস্থল গঠনের প্রয়োজনে অরণ্যের কোন নির্দিষ্ট বৃক্ষকে অবলম্বন করে জনবসতির প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছিল। J. D. Bernal তাঁর Science in History (p. 61) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, কৃষিকার্য মেয়েদের আবিষ্কার ও তাদের দ্বারাই বর্ধিত হয়েছিল ; তাই আদিম কৃষিজীবী মানব সমাজে মেয়েদের প্রাধান্য ছিল এবং যার ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা।[৮] আর একটু নূতন ধারণার বশবর্তী Starbuk বললেন,[৯] **'Female deities have often enjoyed the highest place among the Gods. This depends upon the nature of the social organisation and the respect in which women are held clan life in which the mother is the head of the group is likely to lift the Mother Goddess into a supreme position, provided the nation has risen above the stage on magic.'**

পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর 'ভোলগা থেকে গঙ্গা' গ্রন্থে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিকাশ ও বৈশিষ্ট্যগুলির বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। অন্যান্য গবেষকগণের মতে[১০]—'সামাজিক বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরগুলিতে তাই এই মাতৃত্বেরই ভূমিকা ছিল প্রধান, জীবনদায়িনী মাতৃদেবীই ছিলেন ধর্মের কেন্দ্রবস্তু। উন্নততর কৃষি ও পশুপালন প্রচলিত হবার পর থেকে, অর্থাৎ সমাজ বিকাশের কিছুটা উন্নততর পর্যায়ে, জন্মদানের ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা একটু একটু করে স্বীকৃত হতে শুরু করে।'

পশু শিকার ও খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তর পর্যায়ে জাদু বিশ্বাসের ধারণা জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এবং জাদু বিশ্বাস হতে সৃষ্টি হল গোষ্ঠীগত বিধিনিষেধ বা ট্যাবু। এরূপ নানা ধরনের বিধিনিষেধ বা ট্যাবু আজও রাঢ়ের বিভিন্ন উপজাতীয়

গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত আছে। এই বিধিনিষেধ আবার অনেক সময়ে সমগ্র গ্রামের পক্ষেও যে প্রযোজ্য হয় পরবর্তী আলোচনায় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। রাঢ়ের মিশ্র মানবসমাজকে সমষ্টিগতভাবে প্রাচীন কৌম বা টোটেম গোষ্ঠীগুলির মিলন-মিশ্রণের ফল বলে গণ্য করা যায়; তাই এই অঞ্চলের ধর্মীয় ব্যবস্থা কৌম ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য তথা পৌরাণিক ধর্মের ছত্রছায়ায় বর্ধিত হলেও হিন্দুধর্মের মধ্যে আদি কৌমধর্ম অবচেতনভাবে ফল্গুস্রোতের ন্যায় সতত প্রবহমান। মাতৃদেবী শস্যদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে শস্যদেবীর উদ্দেশ্যে বর্ধমানের মানুষের উপাসনার ধারা সুদূর অতীত কাল হতে আজও চলে আসছে। নৃতত্ত্ববিদ টাইমার-এর মতে আত্মার সঙ্গে জীবিত ও মৃত মানুষের সম্পর্ক কল্পিত হওয়ার ফলে মানুষ সর্বদাই পরিবার ও গোষ্ঠীর অমঙ্গল কামনা করে থাকে এবং নিষ্কৃতি লাভের আশায় বৃক্ষপূজা, প্রেতপূজা, অপদেবতার পূজা, জীবজন্তুর পূজা, পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক ক্রিয়া ও তাঁদের প্রীতির জন্য হোম, পিণ্ডদান, এমন কি কোথাও কোথাও বলিদান প্রথাও ছিল। ঊনবিংশ শতকে রক্সিণী মহল্লা ও ব্রাহ্মণী তলায় এবং তৎপূর্বে ক্ষীরগ্রামে নরবলিদানের কথা বিভিন্ন সূত্র হতে জানা যায়। পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের মূলে ছিল দ্রাবিড় প্রভাব।

টোটেম বিশ্বাস হতে আরও দুটি প্রথার উদ্ভব হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন—(১) স্বজনপ্রীতি—যা আদিতে ছিল নিজ টোটেমের বা গোষ্ঠীর কোন মানুষকে হত্যা করে ভক্ষণ না করা ও (২) নিজ টোটেমের কোন মেয়েকে বিবাহ না করা—স্মৃতিশাস্ত্রের নজীর দেখিয়ে এই ব্যবস্থা রাঢ়ের সর্বত্র আজও প্রচলিত আছে। প্রায় সকল সমাজবিজ্ঞান একমত যে, গোত্র ব্যবস্থা প্রচলনের মূলে ছিল টোটেমের প্রভাব এবং একালে যে সকল গোত্রের পরিচয় জানা যায় তাদের অধিকাংশই পশু-পক্ষীর নামে—যদিও গোত্রগুলিকে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করে ঋষি-নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এমনকি উপনিষদগুলির নামও কয়েকটি পশু-নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

আদিম ধর্ম-বিশ্বাসের উদ্ভব প্রসঙ্গে বলা যায় যে, অতীতে মানুষ 'একটা ব্যাপক অনির্বচনীয়, রহস্যময়, নৈর্ব্যক্তিক শক্তির অস্তিত্বের প্রতি আদিম মানুষের ভয় মিশ্রিত বিশ্বাস' এবং গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষেরা বাধা-বিপত্তিগুলিকে অতিক্রম করার জন্য নানা প্রকার জাদু-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ও তন্ত্রমন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে।[১১] তাই আদিম ধর্ম-বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে Sir James G. Frazar তাঁর ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'The Golden Bough' গ্রন্থে ধর্ম ও জাদু-বিশ্বাসের পরস্পর সম্পর্কের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। আবার জাদু-বিশ্বাস ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কথাও তিনি আলোচনা করেছেন।[১২]

(৩)

আদিপর্বে বর্ধমানের মানুষ ক্ষেত্রপূজা, বৃক্ষপূজা, নদীপূজা, নাগপূজা, পশু-পূজা ও বাস্তুপূজা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মানুষ্ঠানের প্রচলন করেছিল। পারলৌকিক

ক্রিয়াকলাপের নিদর্শনাবলি বা নমুনা মেলে পাণ্ডুরাজার ঢিবি, সাঁওতালডাঙ্গা প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্রে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু হতে। প্রকৃতিপুজো, কৃষির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি ও প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত পুজো-অর্চনা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহ্যিক আবরণের মধ্যে থেকেও এগুলি বর্ধমানের মানুষের লোকধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ সকল পুজো পদ্ধতিতে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের পার্থক্য দেখা না গেলেও গোষ্ঠীগতভাবে বা অঞ্চল-বিশেষে আচার-অনুষ্ঠানের পার্থক্য সূচিত হয়। রাঢ়ের বিবাহ পদ্ধতির সঙ্গে বৈদিক বিবাহ পদ্ধতির প্রভাব অপেক্ষা উপজাতীয় গোষ্ঠীর বিবাহ পদ্ধতির মিল আছে। বরানুগমন, বিবাহের পূর্বে কন্যার পিতৃগৃহে আহার গ্রহণে অসম্মতি, শাঁখা-লোহার ব্যবহার, সিঁদুর দান ইত্যাদি লোকাচারগুলি অবৈদিক। প্রকারান্তরে বলা যায় যে, আদিবাসী সমাজের লোকাচার এগুলির মধ্যে নিহিত আছে।

কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে হিন্দু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ভূমিকা থাকলেও তা গৌণ। বিবাহের দিন পাত্র ও পাত্রীরা অভিভাবকগণ সহ দলবদ্ধভাবে মন্দির প্রাঙ্গণে ও মন্দির সংলগ্ন স্থানে বিবাহের আসর বসায় এবং বিবাহে দেওঘরিয়া নামক ব্রাহ্মণ পরিবার পৌরোহিত্য করেন। বিবাহের পর ঐস্থানেই আহারাদি সম্পন্ন হয়। অবস্থাপন্নদের বিবাহ তাঁদের স্বগৃহে সম্পন্ন হলেও বিবাহের কিছু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান মন্দির প্রাঙ্গণে সম্পন্ন করার রীতি আছে। ১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মার্চ এখানে ৭০টি গণবিবাহ হয়েছিল। বরাকরের বেগুনিয়া মন্দির সংলগ্ন একটি উঁচু ঢিবিতে ইষ্টক নির্মিত বেদীর উপর একটি নারীমূর্তি শায়িত আছে। স্থানীয় লোকের নিকট তিনি ব্রাহ্মণীদেবী নামে পরিচিতা। পূর্ব-পশ্চিমে শায়িত বেলে পাথরে নির্মিত পীনোন্নত পয়োধরা ও স্ফীতোদরা দেবীকে স্থানীয় হিন্দু ও আদি-বাসীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। এতদঞ্চলের লোকেরা বিবাহের পর অষ্টমঙ্গলা অনুষ্ঠানের দিন পুজো ও ছাগ বলিদান দিয়ে দেবীর গায়ে রক্ত মাখিয়ে দেয়। মনে হয় দেবী আদিতে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে প্রজনন ও উর্বরশক্তির প্রতীকরূপে পুজিত হতেন। এই মূর্তিটি বহুকাল পূর্বে নিকটবর্তী জঙ্গল হতে আনা হয়েছিল।

বাস্তুপুজোর বিধি আর্য-ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত হলেও অস্ট্রিক ও প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠী-ভুক্ত সমাজে বাস্তু নির্মাণ ও বাস্তুপুজোর প্রচলন ছিল। সেকারণে ময় ও বিশ্বকর্মা আর্যগোষ্ঠীভুক্ত না হয়েও বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন এবং 'ময়মত' হল বাস্তুশাস্ত্রের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বাস্তুবিদ্যা ও মূর্তিনির্মাণ বিদ্যা অসুর ও দ্রাবিড় জাতির নিকট হতে আর্যগণ গ্রহণ করেছিল। অনেকের মতে আদিতে মূর্তি কল্পনা শুরু হয়েছিল দ্রাবিড় গোষ্ঠীর দ্বারা এবং মূর্তিকে সাজানোর জন্য ফুলের ব্যবহারও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর। পুজো শব্দটিই দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে। দ্রাবিড় শব্দ 'পুজু অর্থাৎ ফুল। তেলেগুতে ছিল পু-উ। মনে হয় পুষ্প শব্দের জন্মরহস্য ঐখানেই নিহিত।'[১৩]

আদিবাসী সমাজে লোকধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য অতীতে কোন পুরোহিত শ্রেণীর

উদ্ভব হয় নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু সমাজের আদর্শ ও অনুকরণ করা শুরু হলে পাহন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কয়েকটি স্থানে 'বাভন' নামক এক সম্প্রদায়ের কথা ওল্ডহাম সাহেব উল্লেখ করেছেন। আবার অনেক সময় তারা নিজেরাই দেবতার আরাধনা করে থাকেন। বর্ধমান জেলায় ধর্মপূজা বা মনসা পূজায় ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণগণ পুরোহিতের কাজ করেন। আবার শিবের গাজনে সমন্বয় সাধনের রূপটি চোখে পড়ে। গাজনে কামানের পর সন্ন্যাসী বা ভক্তগণ পাঁচ দিনের জন্য স্বগোত্র পরিত্যাগ করে শিবগোত্র গ্রহণ করে গলায় উত্তরীয় পরিধান করেন। এখানে উচ্চ-নীচ বর্ণের ভেদাভেদ থাকে না। সকলেই শিবগোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বর্ধমান জেলায় 'গাজুনে ব্রাহ্মণ' নামক ব্রাহ্মণগণ শিবের গাজনে পূজা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান করে থাকেন। আবার কোথাও উচ্চ বর্ণের পুরোহিতগণ শিবের গাজনে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় পৌরোহিত্য করেন। গ্রহ পূজায় শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের পৌরোহিত্য করার প্রথা থাকলেও সকল স্থানে শাকদ্বীপি বা গ্রহবিপ্রগণ বসবাস করেন না। সেকারণে দেখা গেছে যে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ গোষ্ঠী গ্রহ পূজায় পৌরোহিত্য করছেন।

এইভাবে গোষ্ঠীবিশেষ ও অঞ্চলবিশেষে নিজস্ব দেবদেবী কল্পনার উদ্ভব হল অর্থাৎ লোকধর্মের বহিরঙ্গের ভাবটি ধর্মীয় আচার-আচরণ এবং গ্রাম্য দেবদেবী বা লৌকিক দেবদেবীর মাধ্যমে সমাজের উপর প্রভাবিত হয়ে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। আলোচ্য পর্যায়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর না হলেও গ্রাম বিবরণ পর্যায়ে প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য গ্রাম্য ও লৌকিক বা আঞ্চলিক দেবদেবীগণের গ্রামীণ সংস্কৃতির উপর তাঁদের প্রভাব ও পূজা প্রকাশের আলোচনা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রাম-দেবতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায়—'প্রত্যেক গ্রাম এক একটি বিশিষ্ট সামাজিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত—এই মনোভাবের ভিত্তিতেই গ্রাম-দেবতার পরিকল্পনার উদ্ভব হয়েছে। গ্রাম-দেবতাকেই তাই গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক ঐক্যের আধার বলে মনে হয়। গ্রাম-দেবতা সমগ্রভাবে গ্রামের অধিবাসীর মঙ্গলের জন্য দায়ী।'[১৪] গ্রাম-দেবতার আধিপত্য বিশেষ গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে—তার বাইরে কোন কর্তৃত্ব, প্রভাব বা মর্যাদা নাই।

অধ্যাপক ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা, তাঁর 'রাঢ়ের গ্রাম দেবতা' ও 'আঞ্চলিক দেবতা' গ্রন্থে 'গ্রামদেবতা' 'লোক বা আঞ্চলিক দেবতা' সম্পর্কে মনোজ্ঞ অথচ সুন্দর ব্যাখ্যার দ্বারা বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করে তুলেছেন।[১৫] মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, গ্রাম-দেবতা ও আঞ্চলিক দেবতার পূজা পদ্ধতি এক। তবে গ্রাম-দেবতা কোন বিশেষ গ্রামের গ্রাম্য দেব-দেবী এবং অপরপক্ষে আঞ্চলিক দেব-দেবী বলতে বোঝায়, বহু গ্রামে যখন একটি দেবতা বা দেবীর আরাধনা করা হয়। আঞ্চলিক দেবতার পূজার ব্যাপ্তি একটা অঞ্চল জুড়ে আছে। বর্ধমানে ধর্মরাজ হচ্ছেন একাধারে গ্রাম-দেবতা যিনি ভিন্ন ভিন্ন নামে বহু গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু জামালপুরের বুড়োরাজ

হচ্ছেন আঞ্চলিক দেবতা। পশ্চিম বর্ধমান অঞ্চলে দিদিঠাকরুণ হচ্ছেন আঞ্চলিক দেবী। ঝাঁকলাই ও জগৎগৌরী কয়েকটি বিশেষ গ্রামের গ্রামদেবী হলেও মধ্য বর্ধমান ও বেহুলা নদীর সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে তিনি আঞ্চলিক দেবী। বোঁয়াইচণ্ডী বোঁয়াই গ্রামের নিজস্ব আরাধ্যা দেবী হলেও দক্ষিণ বর্ধমান অঞ্চলে চণ্ডীপূজা আঞ্চলিক রূপ লাভ করেছে। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর পূজো-আচারে আঞ্চলিক ও গ্রামদেবীর সমন্বয়ের রূপটি সারা বৎসরের পূজোপদ্ধতির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

গ্রাম্য দেবদেবী ও লৌকিক বা আঞ্চলিক দেবদেবী তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন হল পর্যবেক্ষণের এবং পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা যাচ্ছে যে, এই সকল দেবদেবীর উদ্ভবের পশ্চাতে স্থানীয় লোককথা প্রচলিত হয়ে আছে এবং পূজার বহিরঙ্গে বৈদিক, পৌরাণিক তথা ব্রাহ্মণ্য বা তান্ত্রিক ধর্মের আবরণ থাকলেও আদিম অনুষ্ঠান ও সমন্বয়ের রূপটি সহজেই ধরা পড়ে।

লোকধর্ম হল ঐতিহ্যাশ্রয়ী ও পরিবেশজাত, ইতিপূর্বে একথা আলোচিত হয়েছে। নদী বেষ্টিত বর্ধমানের পলিমাটি ও ল্যাটেরাইটের অরণ্যে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মাশ্রয়ী সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। বর্ধমান ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হতে জানা যায় যে, আজ হতে প্রায় ৩৫০০ হাজার বছর পূর্বে বর্ধমান জেলায় অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়-অ্যালপাইন মানবগোষ্ঠীর মিলন-মিশ্রণ সম্ভূত নরগোষ্ঠী অজয় দামোদর উপত্যকায় বসবাস করত। সম্ভবতঃ দামোদর নদের ভয়াবহতার জন্য তারা ক্রমশঃ দামোদরের তীরবর্তী অঞ্চল হতে দূরে সরে গিয়ে অজয় উপত্যকাকে তাদের প্রধান বসবাসের স্থান হিসাবে বেছে নেয়। সেকারণে অধিকাংশ তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার প্রত্নস্থলের সন্ধান মিলেছে অজয় উপত্যকায়। নব্যপ্রস্তর যুগের শিকারীজীবী মানুষের সন্ধান মিলেছে বীরভানপুরের মৃত্তিকার ২০ ফুট নীচে। নরগোষ্ঠীর স্থায়ী বসবাসের পর হতেই লোকধর্মের উদ্ভব বা পরিকল্পনা হয়েছে। আদিম জনগোষ্ঠী এই পরিকল্পনা এমন এক সময়ে করেছিল 'যখন বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে মানুষ বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করেছিল। বাংলার কোন কোন অংশে বিশেষতঃ পশ্চিম-সীমান্তবঙ্গে এই প্রকার গ্রাম সংগঠনের দৃষ্টান্ত এখনো পাওয়া যায়।'[১৬]

খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে অজয় নদ উপত্যকায় বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর মধ্যে মৃতদেহের সমাধি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং মৃতদেহগুলির মাথা পূর্ব দিকে ও পদদ্বয় পশ্চিম দিকে লম্বভাবে প্রসারিত করার প্রথা ছিল। এছাড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর মৃতদেহের অস্থি সংগ্রহ করে কলস সমাধি দেওয়ার রীতিও ছিল। কলস সমাধির প্রমাণ মিলেছে পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও খড়্গেশ্বরী নদীর তীরে সাঁওতালডাঙ্গাতে। সমাধির মস্তকের দিকে রক্ষিত প্রত্নবস্তু হতে অনুমান করা যায় যে, ঐগুলি মৃতের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়েছে। মৃতদেহের সন্নিকটে সচ্ছিদ্র মৃৎভাণ্ড হতে অনুমান করা যায় যে, ঐ সময়ে সহস্রধারার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত

পিলসুজ, কোশীপাত্র, মাদুলির সমগোত্রীয় বস্তু, পশুপক্ষীর মূর্তি ইত্যাদি দ্রব্য সকল ধর্মীয় উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হত বলে অনুমান করা হয়। তৃতীয় স্তরে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পোড়ামাটির মাতৃকামূর্তি যা উর্বরতার প্রতীকরূপে গণ্য হত। বাণেশ্বর ডাঙ্গায় প্রাপ্ত কোশীপাত্র ও সাঁওতাল ডাঙ্গার পোড়ামাটির পুতুল তাদের ধর্মবোধের পরিচয় বহন করছে। ভরতপুরে বৌদ্ধস্তূপের নিম্নভাগে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার অন্যান্য নিদর্শনের সঙ্গে ধর্মকর্মে ব্যবহৃত দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। মঙ্গলকোটে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তিগুলি সমসাময়িক কালের অধিবাসীগণের ধর্মীয় চেতনার প্রতি ইঙ্গিত করছে। কলস সমাধি, মৃৎপাত্র ও যক্ষিণী মূর্তি হতে এই ইঙ্গিত মিলছে যে, প্রাচীনকালে বর্ধমানের মানবগোষ্ঠী এক বিস্তৃত অঞ্চলে অনুরূপ ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, প্রত্নক্ষেত্রে পোড়া চাল, মাছের কাঁটা ও পশু শিকারের অস্ত্র মিলেছে এবং এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, ঐ যুগের বর্ধমানের অধিবাসীদের প্রধান আহার্য বস্তু ছিল ভাত, মাছ ও মাংস।

বঙ্গদেশের যে কোন অঞ্চল অপেক্ষা বর্ধমান জেলায় মনসাদেবীর পুজোর প্রাধান্য অধিক। মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত 'চম্পকনগরী' বা আধুনিক কসবা চম্পাইনগরের অবস্থান হল বুদবুদ থানায়। মনসাপুজোর বহুল প্রচলন হল বর্ধমান, মেমারী ও কালনা থানায় এবং এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বেহুলা নদী প্রবাহিত হয়েছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের বর্ণিত মৃতপতিসহ বেহুলার যাত্রাপথে দুবরাজপুর, নবখণ্ড, জুজুটি. বর্ধমান, গোবিন্দপুর, গাঙ্গপুর, দেপুর, হাসানহাটি, বৈদ্যপুর, নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামগুলির অবস্থান হল এই জেলাতে। মনসাদেবীর অধিষ্ঠান হল সিজবৃক্ষে—তাই সিজবৃক্ষের ডাল বিনা কারণে ভাঙ্গা নিষেধ। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে দশহরার সময় সর্পভয় নিবারণের নিমিত্ত গৃহে সিজবৃক্ষের ডাল পোঁতা হয়। আবার সিজবৃক্ষের পাতা চক্ষুরোগের প্রতিষেধক। এই পাতা আগুনে ঝলসিয়ে নিয়ে শিশুদের চোখে লাগিয়ে চক্ষুরোগ নিরাময় হতে দেখা গেছে।

বহু প্রাচীনকাল হতে, বিশেষতঃ বৌদ্ধ যুগে মনসা বা জাগুলির পুজো বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল। বর্ধমানে কয়েকটি স্থানে তিনি লৌকিক দেবীতে পরিণত হয়েছেন। মঙ্গলকোট থানার পোষলা ও আরও তিন চারটি গ্রামে ঝাঁকলাই বা ঝঙ্কেশ্বরী নামে এক বিশেষ প্রজাতির সর্প দেখা যায়। এই প্রজাতির সর্পের বৈশিষ্ট্য হল, এরা বলশালী, নির্বিষ ও স্ব-চক্র। এই বিশেষ প্রজাতির সর্পকুলের অবস্থানের জন্য কোন বিষধর সর্পের সাক্ষাৎ এই সকল গ্রামগুলিতে মেলে না। এছাড়া জগৎ-গৌরী কঙ্কনাগ, কর্কটনাগ, নন্দনাগ, ব্রাহ্মণী, শঙ্খিণী, বিষহরি ও মনসা নামে বর্ধমান জেলায় (প্রধানতঃ মধ্যভাগের থানা অঞ্চলগুলিতে) লৌকিক দেবী মনসার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পরিবারস্থ বা গ্রামস্থ যে কোন শুভকর্মে নিজেদের কল্যাণ কামনায় কার্য আরম্ভ করার পূর্বে লৌকিক দেব-দেবীর পুজো-অর্চনা করা হয়।

ক্ষেত্রপালকে ক্ষেত্রের অধিষ্ঠিত দেবতা রূপে কল্পনা করা হলেও আসলে ইনি হচ্ছেন অপদেবতা। তাঁর আবির্ভাব হল স-গোষ্ঠীতে 'ঊনকোটী দানা লয়ে আসে ক্ষেত্রপাল' এবং গ্রাম প্রদক্ষিণের সময় বলা হয়,—'গিজো, গিজো, গিজো / রাত পোহালে কাল আমাদের ক্ষেত্রপালের পূজো।' এই ধ্বনি যে দেবতার উদ্দেশ্যে করা হয় তাঁর সম্বন্ধে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, তিনি কোন আর্যদেবতা নন; যদিও অনেকে ক্ষেত্রপালকে বৃক্ষপূজার সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন। অপদেবতা-গণের আবাসস্থল হল প্রধানতঃ বৃক্ষের উপর। তাই গাছতলায় তাঁর উদ্দেশ্যে পূজা ও বলিদান হয়। রাঢ়ের ইঁদ ও করম পূজা আদিতে ছিল বৃক্ষ পূজা। পানাগড়ের কাছে মিলিটারী এলাকার ভিতর হাঁসুয়াতে তেঁতুলবাগানের মধ্যে ক্ষেত্রপাল, চণ্ডী ও ভৈরব একত্রে পূজিত হচ্ছেন। সন্তান কামনা ও সন্তানের মঙ্গলের জন্য স্থানীয় লোকে ক্ষেত্রপালের পূজা ও ছাগ বলিদানের মানত করেন। মানত শোধের জন্য পিতলের ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হয়। বৃক্ষ পূজার রীতি উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যেও বহুল প্রচলিত আছে। সাঁওতালরা হল অস্ট্রিক ভাষাভাষী নৃতাত্ত্বিক উপগোষ্ঠী এবং তারা উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য স্থান হিসাবে বেছে নেয় কোন শাল বৃক্ষকে।

বর্ধমানের লোকধর্মের প্রাচীনতম বৈশিষ্ট্য হল বৃক্ষপূজো। তাদের বিশ্বাস যে, দেবতা বা অপদেবতা বৃক্ষকে আশ্রয় করে অবস্থান করছেন, তাই কয়েকটি বৃক্ষকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করা হয়। আবার বৃক্ষই ছিল সে যুগের নিশানদারী এবং যে যে বৃক্ষকে অবলম্বন করে বা আঞ্চলিক প্রাচুর্যের কারণে গ্রাম পত্তন হয়েছিল, গ্রাম-নামটিও ঐ বৃক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। মন্দির ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার ন্যায় বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা ছিল লোকধর্মের অন্তর্গত। নিম, বিল্ব, অশত্থ, তুলসী, শাল, মহুয়া ইত্যাদি বৃক্ষের ডালপালা ছেদন বা ভাঙ্গার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধগুলি আজও বলবৎ আছে—যার নিদর্শন বৈদিক ধর্মে নাই। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই আছে অশ্বত্থ ও বিল্ববৃক্ষ এবং আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে শাল বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা ও পূজা করা রীতিটি সুপ্রাচীনকাল হতে চলে আসছে। অবশ্য বৃক্ষপূজার রীতি বৈদিককালেও ছিল। গীতায় বর্ণিত আছে,—'অশ্বত্থ সর্ববৃক্ষানাম্'। গাছের গোড়াটি মাটি বা ইঁট দিয়ে বেদীর মত করা হয় এবং গ্রামস্থ মহিলাগণ গঙ্গাজল, ফুল, আতপচাল, ডাল ও সশিষ কাঁচা আম সমস্ত বৈশাখ মাস ধরে নিবেদন করেন। প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষের ডালপালা ভাঙ্গা নিষেধ এবং ঐ গাছের কাণ্ড হোম বা যাগযজ্ঞ ব্যতীত পোড়াতে নাই। ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে নিম, বিল্ব ও যজ্ঞডুমুরের কাণ্ড পোড়ান নিষেধ। সাধারণের ধারণা এই যে, বিল্ববৃক্ষে ব্রহ্মদৈত্যের আবাসস্থল। তাই অশুচি অবস্থায় ও তিথিবিশেষে বিল্ববৃক্ষে আরোহণ ও ডাল ভাঙ্গলে অমঙ্গল হতে পারে। এতদঞ্চলের লোকবিশ্বাস হল, সেওড়াগাছ বজ্রনিরোধকের প্রতীত এবং ১৩ই বৈশাখ নূতন মেঘের সঞ্চার হয়। একারণে বাল্যকালে স্বর্গীয় পিতৃদেবকে ১৩ই বৈশাখ তারিখে খড়ের ঘরের চালের ভিতর দিকে সেওড়ার ডাল রাখতে দেখেছি। বর্ধমানের অন্যতম লৌকিক দেবী মনসার অধিষ্ঠান হচ্ছে সিজবৃক্ষে—তাই মনসামঙ্গল

কাব্যে পাওয়া যায় 'জাগিয়া জাগুলি নাম সীজ বৃক্ষে স্থিতি' (বিপ্রদাস)। সেকারণে দশহরা ও মনসা পঞ্চমীর দিন গৃহিণীরা সিজবৃক্ষের সামনে ঘট স্থাপন করে দেবীর আরধনা করেন।

রাঢ়ের আদিম জনগোষ্ঠী নদী ও বৃক্ষকে অবলম্বন করে তাদের বসবাস শুরু করেছিল। অরণ্যাচারী আদিম মানব-সমাজ প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অরণ্যের জীবজন্তুর সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ-বন্দনা শুরু করে। এইভাবে মানুষের অজ্ঞতা ও ভয় হতে মুক্তি লাভের নিমিত্ত বৃক্ষপূজা শুরু হয়। বৈদিক আর্যগণ বৃক্ষ বন্দনা কালে প্রার্থনা করতেন—হে দেবগণ, গুল্ম ও অরণ্যের বৃক্ষসমূহ আমাদের কল্যাণ করুন। বৌদ্ধধর্মে বৃক্ষকে দেবতা বা দেবাধিষ্ঠান চিন্তা করে বৃক্ষপূজা প্রবর্তন করা হয়েছে। আদিবাসী সমাজে বৃক্ষকে টোটেমরূপে মান্য করা হয় এবং টোটেম হতে বিভিন্ন বৃক্ষ সম্পর্কে ট্যাবু বা বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল।

লৌকিক ও পৌরাণিক প্রথা মিলেমিশে গেছে বৃক্ষ বন্দনায়। দুর্গোৎসবের সময় দেবী মূর্তির পাশে নূতন বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে নবপত্রিকার পূজা করা হয়। বহু গ্রামে মহিষমর্দিনী মূর্তির নিত্য পূজা হয়। সেকারণে দুর্গাপূজার সময় মাটির মূর্তির পরিবর্তে চার দিন ধরে নবপত্রিকার পূজা হয় দুর্গার ধ্যান মন্ত্রে। নবপত্রিকার মধ্যে দেবীর বিভিন্ন রূপ কল্পনা করা হয়েছে। চণ্ডীতে বর্ণিত দেবী শাকম্বরী হলেন উদ্ভিদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবীর রূপ হল,—কদলীতে ব্রাহ্মণী, কচুতে কালিকা, হরিদ্রাতে দুর্গা, জয়ন্তীতে কৌমারী, বিল্বে শিবা, দাড়িম্বে রক্ত দন্তিকা, অশোকে শোক রহিতা, মানগাছে চামুণ্ডা ও ধান্যে লক্ষ্মীদেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। তাই মন্ত্রে বলা হয়েছে,—

"রম্ভা কচ্চী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িম্বৌ।
অশোক মানকশ্চৈব ধান্যেতি নবপত্রিকা ॥"

মন্ত্রে যে নয়টি বৃক্ষের উল্লেখ আছে, সেগুলি মানুষের আহার ও ঔষধ দুভাবে ব্যবহৃত হয়।

বৃক্ষপূজা মার্গধর্ম ও লোকধর্মে স্থান লাভ করেছে ধন, মান, যশ, শান্তি, ক্ষুধানাশ, শোকনাশ, ভয়নাশ প্রভৃতির জন্য ; তাই বিভিন্ন বৃক্ষকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। নবপত্রিকার স্নানমন্ত্রে একই রূপ কল্পিত হয়েছে,—

'কদলী তরুসংস্থাপি বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলাশ্রয়ে।
নমস্তে নবপত্রি ত্বং নমস্তে চণ্ডনায়িকে ॥
কচ্চি ত্বং স্থাবর স্থাসি সদা সিদ্ধি প্রদায়িণী।
দুর্গারূপেণ সর্বত্র স্নানেন বিজয়ং কুরু ॥
হরিদ্রে হররূপাসি শঙ্করস্য সদা প্রিয়ে।
রুদ্ররূপাসি দেবী ত্বং সর্বশান্তিং প্রযচ্ছমে ॥
জয়ন্তি জয়রূপাসী জগতাং জয়কারিণী।

স্নাপয়ামীহ দেবি ত্বাং জয়ংদেহি গৃহে মম ॥
শ্রীফল শ্রীনিকেতোসি সদা বিজয় বর্ধনঃ।
দেহি মে হিত কামাংশ্চ প্রসন্না ভব সর্বদা ॥
দাড়িম্যঘবিনাশায় ক্ষুন্নাশায় সদা ভুবি।
নির্মিতা ফলকামায় প্রসীদ ত্বং হরপ্রিয়ে ॥
স্থিরা ভব সদা দুর্গে অশোক শোকহারিণি।
ময়া ত্বং পূজিতা দুর্গে স্থিরা ভব হরপ্রিয়ে ॥
মান মান্যেষু বৃক্ষেষু মাননীয়ঃ সুরাসুরৈঃ
স্নাপয়ামি মহাদেবীং মানং দেহি মনোহস্তুতে ॥
লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী।
স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব ॥'

নিত্যনৈমিত্তিক পূজা আচারে বিভিন্নভাবে বৃক্ষ ও ফলের ব্যবহার আছে। পূজা ও শুভ কার্যে আম্র-পল্লব, কদলী বৃক্ষ ও সশিষ ডাব হল অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য। নারিকেল বৃক্ষকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। কোন কোন স্থানে বনদুর্গার পরিবর্তে সেওড়া গাছের পূজা হয়। বাঁশ গাছের পাতা মন্থন ষষ্ঠী পূজার অন্যতম উপকরণ। বিবাহের ছাঁদনাতলা সাজাতে চারটি বাঁশের কঞ্চির প্রয়োজন হয়। দূর্বা না হলে পূজা ও আশীর্বাদ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বৃক্ষের ফল ও পাতার ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। তাই লোকধর্মে বৃক্ষের সম্মানও সর্বাধিক।

শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শাকম্ভরীর পৌরাণিক পূজা পদ্ধতির সঙ্গে লৌকিক ধর্মাশ্রয়ী শাকম্ভরী দেবীর পূজার উদ্ভব হয়েছিল। হরপ্পায় প্রাপ্ত শীলমোহরে একটি স্ত্রীমূর্তির গর্ভদেশ হতে লতা বা বৃক্ষ বহির্গত হচ্ছে এরূপ চিত্র খোদিত আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লিখিত দেবীবাক্য হল,—

'ততোহহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরা শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণ-ধারকৈঃ ॥
শকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম ॥' ১১/৪৮-৪৯।

মাজিগ্রামের শাকম্ভরী দেবীর পূজা লক্ষ্মীতন্ত্র অনুসারে হলেও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানগুলি হল লোকধর্মাশ্রয়ী।

শিখরভূমের কল্যাণেশ্বরী দেবীর পূজা রঙ্কিণী দেবীর পূজার রূপান্তর। রঙ্কিণী দেবী ছিলেন আদিবাসী সমাজের রক্ষাকর্ত্রী—তিনি দুই ঊর্ধ্ববাহুতে দুটি হস্তীকে ধারণ করে আছেন। কল্যাণেশ্বরীতে দেবীর উদ্দেশ্যে পোড়ামাটির হাতী মানত করা হয়। এতদঞ্চলে একটি লোকগাথায় পাওয়া যায়,—

'ধলেতে রঙ্কিণী মাগো শিখরে কল্যাণী'—অর্থাৎ ধলভূমের রঙ্কিণী দেবী শিখর-ভূমে কল্যাণেশ্বরী নামে পূজিতা। গলসী থানার কয়েকটি গ্রামে ধর্মরাজের থানে

পোড়ামাটির হাতী-ঘোড়া নিবেদন করার রীতি আছে।

বর্ধমানের বিভিন্ন গ্রামে ধান কাটার পর মাঠ পুজো অনুষ্ঠিত হয়। একালে অনেক জায়গায় ঐ উপলক্ষে বনভোজনের ন্যায় 'মাঠ পোষলা' উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মাঠপুজোর ধারা ক্ষীণ হয়ে আসছে—কিন্তু মাঠপোষলার রীতিটি বজায় আছে। মাতৃস্বরূপা নদী হল প্রাণদাত্রী তথা শস্যদাত্রী। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রধানতঃ কাটোয়া ও পূর্বস্থলী থানায় গঙ্গাপুজো—নদীপুজো অনুষ্ঠিত হয় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে দশহরার দিনে। আবার অনেকে মন্তব্য করেন যে, দশহরা উৎসবটি হল বৌদ্ধ ধর্মে বর্ণিত দশবল বা দশ প্রকার জ্ঞান অর্জনের উপায় এবং দশ প্রকার দুঃখকে হরণ করার জন্য দশহরা উৎসব প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু বর্ধমানে ঐ দিন গঙ্গাপুজো—নদীপুজো বা স্থানে স্থানে মনসা পুজো অনুষ্ঠান দেখে অনুমান করা যায় যে, আদিতে ছিল এটি প্রকৃতিপুজো।

কৃষিভিত্তিক রাঢ়-সভ্যতা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কৃষি হল অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর প্রধান অবদান। তাই সারা বৎসর পাল-পার্বণ ও বিভিন্ন পুজোর মধ্য দিয়ে কৃষি দেবতাকে অর্ঘ নিবেদন করা হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নির্দেশানুসারে কৃষি বা সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী দেবীর পুজো সারা বৎসর ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং পুরোহিতের সাহায্য ব্যতীত কিছু মেয়েলী ব্রত বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে সারা বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়; সেগুলি হল কৃষি দেবতার মৌলিক রূপ, যথা—পুণ্যিপুকুর, যমপুকুর, ইতু, হরিচরণ, ভাদু, তুষ-তোষলা ও সাঁজপুঁজনী। পৌষ-পার্বণ উৎসবটি যে সম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক ও এতে যে বাড়ীর মেয়েদের কর্তৃত্ব অধিক সে বিষয়ে 'সংস্কৃতির রূপরেখা' অধ্যায়ে (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪১-৪৩) বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্ধমান হল পশ্চিমবঙ্গের 'শস্যভাণ্ডার'; তাই এই জেলায় 'নবান্ন' উৎসবটি রাজসিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। এই উৎসবের প্রধান দেবতা হলেন শিব ও অন্নপূর্ণা এবং পুজো হয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সহায়তায়। কিন্তু অনুষ্ঠানের আচার আচরণগুলির মধ্যে গ্রাম বা অঞ্চলভেদে পার্থক্য সূচিত হয়। নবান্নের আচার অনুষ্ঠানে মেয়েদের কর্তৃত্ব যথেষ্ট প্রকাশ পায় এবং এই সকল অনুষ্ঠানে পুরুষের ভূমিকা হল গৌণ অর্থাৎ কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য অনুষ্ঠানের রীতিনীতির ন্যায় কৃষিদেবতার রাজসিক উৎসবেও মেয়েরা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। নবান্ন পর্বের দিন পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রথাও জেলার প্রায় সর্বত্র প্রচলিত আছে। আউস ধান ঘরে তোলার পর কার্তিক সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয় 'মুঠ্‌পুজো' এবং ১লা অগ্রহায়ণ হতে জেলার কৃষি অঞ্চলে উৎসবের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। আউস ধান ঘরে তোলার পর এবং আমন ধান কাটার পূর্বে এক বিশেষ শ্রেণীর ধানের চাষ হয়; অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগে ফসল পাওয়া যায়। নবান্ন উৎসবটি আসলে শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তথা জীবকে যিনি আহার যোগান এবং মূর্তি কল্পনায় বিশ্বপিতা দেবাদিদেবও তাঁর নিকট

অন্ন ভিক্ষা করছেন।

হলকর্ষণ সম্পর্কিত বিধিনিষেধগুলিও ধর্মীয় রূপ নিয়েছে। বিশেষতঃ অম্বুবাচীর সময় পৃথিবীকে ঋতুমতী নারীরূপে কল্পনা করে চার দিন হলকর্ষণ করা হয় না। আবার এই সময়ে কামরূপে দেবী কামাক্ষ্যার বিশেষ পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অম্বুবাচী ব্যতীত বৎসরের কয়েকটি বিশেষ তিথিতে হলকর্ষণ নিষিদ্ধ। ক্ষীরগ্রামে প্রচলিত রীতি হল,—'সমস্ত বৈশাখ মাসে না বহিবে হাল' অর্থাৎ বৈশাখ মাসে এই গ্রামে হলকর্ষণ নিষিদ্ধ এবং দেবীমুখ নিঃসৃত এই বাক্যটি লোকধর্মে পরিণত হয়েছে।

লোকধর্মের অপর এক প্রচলন দেখা যায় লোক-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। পৌষ-পার্বনকে উপলক্ষ করে লৌকিক আচার লক্ষ্মীপূজা, গৃহস্থালি ও কৃষিকর্মে ব্যবহৃত সাজ-সরঞ্জামের খোঁজখবর রাখার বিধি এই সময়ে করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র বিষদ আলোচনা করা হয়েছে (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯-৪৩)। বহু গৃহস্থের বাড়ীতে পৌষ লক্ষ্মীর পূজা ব্যতীত ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসের বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মী পূজার বিধি আছে—যেগুলিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পর্যায়ভুক্ত মনে না করে লৌকিক ধর্ম বলাই শ্রেয়। সাঁওতালদের বাঁধনা পরবের ন্যায় পশুপূজা প্রচলিত না থাকলেও গোয়াল-ঘরে ভগবতী পূজার বিধি আছে—যা প্রাচীনকালের পশু পূজাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার বৎসরের কয়েকটি বিশিষ্ট দিনে এবং বাড়ীতে ধান আনার শেষ দিনে 'গৃহপালিত' পশুর পায়ে জল ঢেলে ও তাদের মাথায় তেল-সিঁদুর-হলুদ লেপন করে বরণ করার প্রথা প্রচলিত আছে। বিভিন্ন মাঙ্গলিক কর্মে তেল-হলুদ ও সিঁদুর দিয়ে মাছ বরণ করার প্রথা থাকলেও মাছ পূজার প্রচলন নাই, কিন্তু মাছ আহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আছে। কিন্তু বরাকরের তৃতীয় মন্দিরের মধ্যে যোনীপট্ট বা গৌরীপট্টের পরিবর্তে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট দীর্ঘ পাথরের উপর একটি মৎস্য খোদিত আছে এবং ঐ খোদিত মৎস্যের উপর পাঁচটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়েছে। মৎস্যরূপী গৌরীপট্টের নিদর্শন অপর কোন স্থানে আছে কিনা সে কথা জানা যায় নাই।

লোকধর্মের সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট। আবার অনেক স্থানে পৌরাণিক দেবদেবী লৌকিক দেবদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। লৌকিক দেবদেবীর পূজা হয় মূর্তিতে অথবা প্রতীক চিহ্নে। বর্ধমানের প্রধান লৌকিক দেবদেবী হল ধর্মরাজ, মনসা ও চণ্ডী, যাঁদের পূজা হয় প্রধানত বৃক্ষতলে বা সাধারণ মন্দিরে এবং শিলাখণ্ড, মাটির ঘট ও সরায় প্রতীক চিহ্ন এঁকে সিঁদুর লেপা হয়। আবার পৌরাণিক দেবদেবীর লৌকিক রূপ হল শাকম্বরী, যোগাদ্যা, ঘাঘরা বুড়ী, খাঁদুরাণী। যোগাদ্যা ও শাকম্বরী হলেন কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। উভয় পূজার লৌকিক আচারগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আদিতে এঁরা অস্ট্রিক অথবা প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর উপাস্য দেবী ছিলেন; পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে এই সকল দেবী পূজায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রলেপ পড়েছে। সিন্ধু সভ্যতার ধারা বেয়ে লিঙ্গ ও

যোনি পূজার প্রচলন রাঢ়ে বিকাশ লাভ করেছে। শিবের গাজন উৎসবে অংশগ্রহণ-কারী ভক্তগণ অধিকাংশ হলেন নিম্নবর্ণের মানুষ এবং যে কোন ব্রাহ্মণ গাজনের শিব পূজা করেন না। কুড়মুন অথবা কেতুগ্রামের গাজন উৎসব দেখে মনে হয়েছে যে, এই পূজার বাহ্যিক অংশটুকু ব্যতীত সমস্ত আচার অনুষ্ঠান হল প্রাক-ব্রাহ্মণ্য যুগের আদিবাসীগণের। শিবের গাজনে একটি ক্ষুদ্রাকার শিবলিঙ্গকে মাথায় করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। কিন্তু সর্বত্র এ নিয়ম প্রচলিত নাই। সেকারণে কাঠের পাটার উপর লৌহ নির্মিত বাণ বা শূল বিদ্ধ করে এই পাটা কাঁধে বা মাথায় করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। এই শূল বা বাণবিদ্ধ পাটাটি শিবজ্ঞানে বাণেশ্বর রূপে পূজিত হন। বর্ধমান জেলায় লৌকিকধর্মের অন্তর্গত অত্যন্ত প্রভাবশালী দেবতা হলেন ধর্মরাজ। ধর্মরাজ শিলাখণ্ডের প্রতীকে পূজিত হলেও কয়েকটি গ্রামে কূর্মমূর্তি আছে। দিগনগরে প্রস্তরখণ্ডের উপর খোদিত পুরুষ মূর্তিকে ধর্মরাজ (বাঁকুড়া রায়) জ্ঞানে পূজা করা হয়। শিব ও ধর্মের গাজন বর্ধমানের অন্যতম প্রধান লোক উৎসব হলেও ধর্মের গাজনে ভাঁড়াল নাচ ও বলিদান হল পূজার আবশ্যিক অঙ্গ। শিবের গাজন হয় চৈত্র মাসের নির্দিষ্ট সময়ে। কিন্তু বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মের গাজন হলেও এরূপ বহু গ্রাম দেখা গেছে যেখানে ধর্মের পূজা বৎসরের যে কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। পশুপালন ও কৃষিপ্রধান অঞ্চলে শৈবধর্মের ব্যাপ্তি পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্মকে আশ্রয় করে আছে। গলসী থানার সাঁকো গ্রামে একটি দালান মন্দিরে 'ঊষাদিত্য' নামক সূর্য বিগ্রহের নিত্য-সেবা পূজা হচ্ছে। সূর্য হলেন একাধারে কৃষিদেবতা ও অপরদিকে দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হতে মুক্তি লাভের ক্ষেত্রে ধর্ম, শিব ও সূর্য পূজা এক হয়ে গেছে। (বিশেষ বিবরণ 'জামালপুর' দ্রষ্টব্য)।

ধর্মরাজ হলেন রাঢ়ের সার্বজনীন দেবতা। তাই ব্রাহ্মণ জাতি (অবশ্য একালে ব্রাহ্মণগণ অনেক স্থানে পৌরোহিত্য করেন বা তাঁদের গৃহে ধর্মরাজের নিত্যপূজা হয়) ব্যতীত সকলেই তাম্রদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ময়ূর ভট্টের 'ধর্মপুরাণ'-এ একথার সমর্থন মেলে,—

'সদগোপ কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বলি।
উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি॥
যোগী ও আশ্বিন তাঁতী মালী মালাকর।
নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর॥
হাড়ি মুড়ি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি।
মাজি ও বাগদি মেটে নাহি ভেদ জাতি॥
স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক কর্মকার।
সূত্রধর গন্ধবেনে ধীবর পোদ্দার॥
ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা।
পরিল তাম্রের বালা কায়স্থ কেওরা॥'

এই একই চিত্র বর্ধমানের গ্রামে-গ্রামান্তরে দেখা যায়। এমন কি ব্রাহ্মণের গৃহেও ধর্মরাজ নিত্য পূজা পেয়ে আসছেন।

লোকধর্মের সঙ্গে লোকশিল্প বিকাশের সম্পর্ক জড়িত আছে, তাই মূর্তিতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,[১৭] 'The symbols and images in their case analogically did the same sort of seivice as was done by Fire (Agni) in Vedic ritualism. Fire was specially sacred to the Vedic Priests, because it was the carrier of the sacrificers oblations to their respective gods : in the case of sectary, the image or icon or any such visible symbols of his diety was the handy medium through which he could transfer his one—souled devotion (ekatmika bhakti) to his god. ভক্তি-অর্ঘ নিবেদনকারীগণ যে দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা-অর্ঘ প্রদান করবেন সেই দেবতার রূপ কল্পনা হতে মূর্তি নির্মাণের চিন্তা মানুষের মনে প্রথম উদিত হয়। আবার মূর্তির অভাবে প্রতীক পূজার প্রচলনও বহুকালের।

সম্প্রদায় ভেদ হতে দেবতার রূপ ভেদ দেখা যায়। বৃহৎ সংহিতায় বরাহমিহির সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন,—

'বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শম্ভো সভস্মাদ্বিজান।
মাতৃণামপি মণ্ডলক্রমবিদো বিপ্রান্ বিদুর্ব্রাহ্মণঃ॥
শাক্যান্ সর্বহিতস্য শান্তমনসো নগ্নান্ জিনানাংবিদু—।
যে যং দেবমুপাশ্রিত্য স্ববিধিনা তৈস্বস্য কার্যা ক্রিয়া॥

অর্থাৎ বিষ্ণুর (মূর্তি) ভাগবতগণ, সূর্যের মগেরা, শিবলিঙ্গের ভস্মমণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, মাতৃকাদিগের শক্তিগণ, ব্রহ্মার বেদবিদ ব্রাহ্মণগণ, বুদ্ধের বৌদ্ধরা, জিনদিগের জৈনগণ—এই বিভিন্ন মূর্তি সকল তৎ তৎ দেবতা পূজকেরা সেই সেই দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা নিজ নিজ সম্প্রদায় নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী করিবেন। বরাহমিহিরের উক্তি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নির্দেশানুযায়ী হলেও তিনি সম্প্রদায়ভেদের কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন।

মূর্তিতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে পুনরায় সম্প্রদায়, জাতি-গোষ্ঠী ও নৃতত্ত্বের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। বৈদিক আর্যগণ হোম ক্রিয়ার দ্বারা দেবতার আরাধনা করত। অনুরূপ-ভাবে অষ্ট্রিকগণ প্রতীক ও বৃক্ষপূজা এবং দ্রাবিড় জাতি দেবতার রূপ কল্পনার সাহায্যে মূর্তিপূজা শুরু করে। সমগ্র রাঢ়ে প্রতীক ও মূর্তিপূজা আজও বহুল প্রচলিত। পূজা আচারের বহিরঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ছাপ থাকলেও গ্রাম-দেবতা, থানপূজা, গরামপূজা ও বারাম ইত্যাদি এতদঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কুমারী ব্রতের দশ পুতুল নির্মাণের ঐতিহ্য এসেছে পাণ্ডু রাজার ঢিবির মাতৃকা মূর্তি ও রাঢ়ের অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার সময়-

কাল হতে। বৃক্ষপূজো ও প্রতীক পূজো হল অষ্ট্রিক পূজোর অবদান এবং লিংগ ও যোনি পূজো শুরু হয়েছিল অষ্ট্রিক সভ্যতার ধারক ও বাহকগণের দ্বারা।

বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে দিদিঠাকরুণ, খাঁদু বুড়ী, বসন্ত চন্ডী প্রভৃতি লৌকিক দেবীর পূজো প্রচলিত আছে এবং শিলা প্রতীকে এই সকল পূজো অনুষ্ঠিত হয়। নুড়ি বা পাথর প্রতীক হতে প্রতীয়মান হয় যে, শক্তি স্বরূপিণী চন্ডীপূজো আদিবাসী ও ব্রাহ্মণ শাসিত হিন্দু সমাজের মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছে। আদিবাসীদের ধর্মীয় চেতনায় মূর্তি নির্মাণ প্রসংগে সুহৃদকুমার ভৌমিক মন্তব্য করেছেন,—'ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোল বা অসুর গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় অবদান হল বিমূর্ত (abstract) শক্তির উপাসনা। কোন দেবতার মূর্তি নির্মাণ করে সেই দেবতার আরাধনা এঁদের বিধানে নাই। এঁরা মনে করেন যে, চাঁন্দো বঙ্গার শক্তি বা অস্তিত্ব অনু-পরমাণুতেও বিরাজিত।'[১৮] বাংলায় প্রচলিত দুর্গা মূর্তি পৌরাণিক—ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুশ্রয়ী নয়। দুর্গা প্রতিমা বাঙালীর নিজস্ব পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী নির্মিত হয়। সিজ বৃক্ষ প্রতীকে মনসা পূজো, শিলাখন্ডে ধর্মরাজ জ্ঞানে পূজো, দিদিঠাকরুণ পাথরের নুড়িতে, পৌষলক্ষ্মী গোবর নির্মিত গোলাকার বস্তুতে, বাস্তুদেবতা ঘটে পূজো পেয়ে আসছেন। এখানকার প্রচলিত কালী মূর্তি বাংলার বাইরে অচল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রীতি অনুযায়ী দেবদেবীর মূর্তি নির্মিত হলেও দক্ষিণ বা মধ্য ভারতে নির্মিত মূর্তির সংগে মিল নাই। মানুষের অবয়ব দেখে শিলার কাঠামোর পরিকল্পনা করা হয়; সেকারণে দ্রাবিড় দেশের মূর্তির কাঠামো অপেক্ষা বংগদেশে নির্মিত মূর্তির কাঠামো অপেক্ষাকৃত কোমল ও ক্ষুদ্রকায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, লোকধর্মের অষ্ট্রিক ভিত্তিস্তরের উপর দ্রাবিড় সংস্কৃতি বিবিধ উপাদানে ধর্মীয় সৌধ নির্মাণ করেছে।[১৯]

ষোড়শ শতকে ব্যাপকভাবে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচলনের সময়ে বর্ধমান জেলায় বহু বৈষ্ণব শ্রীপাট স্থাপিত হয়। প্রথম প্রথম বৃন্দাবন হতে মূর্তি আনয়ন করলেও পরবর্তীকালে বর্ধমানের কয়েকটি গ্রামে-গঞ্জে মূর্তি নির্মাণ শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠে। কাষ্ঠ নির্মিত বিগ্রহেরও অভাব ছিল না। বর্ধমানের মন্দিরে বাঁকুড়া ও বর্ধমানের শিল্পীরা যে সকল টেরাকোটা অলঙ্করণের মাধ্যমে দেবদেবীর মূর্তির কল্পনা করেছিল তা হল লৌকিক ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ধারা। নূতন গ্রামের 'মামি ডলস্' শিল্পীদের নির্মিত লক্ষ্মী পেঁচা ও নিতাই-গৌর মূর্তি গৃহস্থের ঠাকুরঘরে পূজো পাচ্ছে। উপজাতীর শিল্প-চেতনার ঐতিহ্যবাহী দরিয়াপুরের ঢোকরা কামারগণের নির্মিত দেবদেবীর মূর্তি ও পূজার সামগ্রী লোকধর্মে ধর্মীয় সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বর্ধমানের লোকধর্মে আদিম নৃতাত্ত্বিক জাতি-গোষ্ঠীর অবদান নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই বা এর কোন প্রচেষ্টাও ছিল না। এ জেলার লোক-সংস্কৃতির গোড়ার কথা নির্ণয় করতে হলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়ামিকে বর্জন করে সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বিশ্লেষণ করলে নিশ্চয় এর

সদুত্তর পাওয়া যাবে। বিশেষজ্ঞের ভাষায় লোকধর্মের আলোচনার বৈশিষ্ট্যগুলির সারাংশ হল—'প্রধানতঃ অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা এবং অনুষ্ঠানাদির সমন্বয়ে বাংলার লোকধর্ম রূপায়িত হয়েছে। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গঠিত লোকধর্ম সৌধকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী আর্য-সংস্কৃতি সুসজ্জিত করেছে। নূতন তত্ত্ববাদ, ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতি প্রবর্তন করে আর্যগণ লৌকিক ধর্মকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। আর্য-সংস্কৃতি অনেক নূতন দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তন করে লোকধর্মের বহিঃপ্রকাশকে রূপান্তরিত করেছে। মন্ত্র, কথা ও উপকথা প্রভৃতি প্রচলন করে লোকধর্মের অনেক অনুষ্ঠানকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত করতেও সক্ষম হয়েছে। কিন্তু লোকধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবরণ উন্মোচন করলেই অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির স্তরদ্বয় পরিস্ফুট আকারে প্রতীয়মান হয়।[২০] এ কথা যেমন বর্ধমান জেলার লোকধর্মের বিষয়ে প্রযোজ্য, অনুরূপভাবে রাঢ়ের অন্যান্য জেলার উপর প্রযোজ্য। কারণ লোকধর্মের গোড়ার কথা হল আদিতে অবৈদিক কৌমের লোকেরা নিজেদের নর-তাত্ত্বিক-ধর্ম (Anthropological Religion) অর্থাৎ জাতি উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমাবস্থার বিশ্বাস, সংস্কার ও রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে লৌকিক ধর্ম ও আচার উদ্ভাবন করেছিল। আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে হলে পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত বর্ধমান জেলার গ্রাম-নামের ক্ষেত্রে অষ্ট্রিক ভাষা ও দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবকে বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

বর্ধমানের লোকধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে লোকসংস্কার বিষয়ে দু'এক কথা আলোচনা করলে বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ বিষয়ে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে যে, লোকধর্ম হতে লোকসংস্কার—না লোকসংস্কার হতে লোকধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। আবার লোকসংস্কার এসেছে কতকগুলি বিশ্বাসের উপর। লোকসংস্কার ও বিশ্বাস সামাজিক জীবন, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে অনেকে লোকসংস্কারে বিশ্বাসী; কিন্তু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের মধ্যে লোকসংস্কার বা লোকবিশ্বাস সমভাবে প্রভাব বিস্তার করে না। অশিক্ষিত ব্যক্তি পুরোহিত বা সমপর্যায়ের ব্যক্তির কথা নির্বিধায় মেনে নেয়। আবার এর মধ্যে ধর্মের ছোঁয়া থাকলে ত কথাই নাই। সম্প্রদায়গতভাবে লোকসংস্কারের পার্থক্য দেখা দেয়—একই অঞ্চলের আধিবাসী হলেও হিন্দু ও মুসলমানদের সংস্কারে পার্থক্য রয়েছে। আবার একই সম্প্রদায়ের মধ্যে অঞ্চলভেদে পার্থক্য দেখা যায়। গোষ্ঠীভেদ ত বটেই। বর্ধমানের পূর্বাঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষের সংস্কার খনি ও শিল্প অঞ্চলের মানুষের সংস্কার ব্যবহারিক অর্থে এক নয়। পেশাগতভাবে লোকসংস্কারের পার্থক্য আছে। নৃতাত্ত্বিকগোষ্ঠীর সংস্কার পৃথক।

বিশ্বাস হতে সংস্কার আসে। ভীতি হতে সংস্কারের জন্ম নেয়—সাপ মেরে ফেললে পোড়াতে হয়। কারণ হল প্রবাদ যে সাপ বায়ুভুক। কোন সাপকে নিদারুণভাবে আহত করে ফেলে রাখলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সাপটি বেঁচে উঠতে পারে এবং

তারা প্রতিশোধপরায়ণ হয়। এইজন্য আহত সাপকে পুড়িয়ে ফেলার বিধি আছে।

স্যার জেমস ফ্রেজার ধর্মের সঙ্গে জাদু-বিশ্বাসের সম্পর্ক বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তাঁর 'The Golden Bough' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে। তিনি অনুকরণ মূলক কৃষি অপদেবতার পূজা প্রসঙ্গে জাদু-বিশ্বাসের বহু উদাহরণসহ বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীর যে কোন উন্নততর ধর্মের সঙ্গে নানা ধরনের জাদু-বিশ্বাস জড়িত আছে ; যদিও তিনি মন্তব্য করেছেন যে, ধর্ম ও জাদু-বিশ্বাস হল পৃথক এবং জাদু বিশ্বাস সর্বক্ষেত্রে ধর্মের পূর্বগামী।[২১]

বর্ধমান জেলার জনগোষ্ঠী বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মিলন মিশ্রণ হতে উদ্ভূত। তাই লোকধর্মের মধ্যে বৈদিক আর্য, অষ্ট্রিক—প্রাক-দ্রাবিড় ও অ্যালপাইন গোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে। আবার লোকসংস্কারের ক্ষেত্রে বৈদিক আর্য ও অবৈদিক গোষ্ঠীর ধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রথাগতভাবে চলে আসছে। লোকসংস্কারের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না মিললেও ঐতিহ্য-আশ্রিত সংস্কার, বিধি-নিষেধ ও বিশ্বাস সমাজ জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। লোকসংস্কার বা বিশ্বাসগুলি প্রধানতঃ মহিলারা বংশপরম্পরায় ধারক ও বাহক হয়ে আছেন। লোকসংস্কার হতে কিছু কুসংস্কারের জন্ম নেয়। আবার অর্থবোধ বা ব্যবহারবোধ না হওয়ায় যেগুলিকে আমরা কুসংস্কার বলে থাকি সেগুলি আসলে হয় একসময়ে প্রচলিত ছিল যেগুলির একালে অর্থবোধ হয় না বা মূল সূত্র জানা যায় না। তিথিবিশেষে কয়েকটি তরিতরকারী আহার নিষিদ্ধ আছে—যা ধর্মীয় রূপ নিয়েছে। মনে হয় বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ দ্রব্য আহার করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। তাই অতীতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই সূত্রটি সংস্কারের রূপ নিয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের বাধা-বিপত্তি হতে সংস্কারের জন্ম নেয়। প্রত্যেক জাতি বা উপগোষ্ঠীর নিজস্ব রীতিনীতি অনুযায়ী জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে লোকাচার ও বাধা-বিপত্তি থেকে প্রধানতঃ লোকসংস্কারের জন্ম নেয়। লোকধর্ম ও লোকবিশ্বাস বা লোকসংস্কারের আদি উৎস এক এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত হয় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীয় গঠন প্রকৃতিতে। রাঢ়ের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বর্ধমান জেলার সমাজ বিন্যাসের সঙ্গে লোকধর্ম ও বিশ্বাস সতত পরিবর্তনশীল। লোকধর্মের উৎস ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের অভিমত হল,[২২]—'কোন শ্রেণীগত বা কোমগত বিশ্বাস বা সংস্কার একান্তভাবে সেই শ্রেণী বা কোমের মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ হয়ে থাকে না ; অন্যান্য শক্তি ও পরিমাণ অনুযায়ী এক শ্রেণী ও কোমের স্তর ও অংশের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, অনুষ্ঠান প্রভৃতি অন্য শ্রেণী ও কোমে স্তর ও অংশের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, অনুষ্ঠান প্রভৃতি সঞ্চারিত হয় এবং দ্রুত বা দীর্ঘ মিলন—বিরোধের ভিতর দিয়া অনবরতই নূতন নূতন ধ্যান-ধারণা, ভক্তি-বিশ্বাস, অনুষ্ঠান-উপাচার প্রভৃতি সৃষ্টি লাভ করে থাকে।' এখানেই বর্ধমানের সঙ্গে বীরভুম, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার জনগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণার মিল রয়েছে।

পাদটীকা :

১। বাঙ্গালার ইতিহাস (সামাজিক বিবর্তন)—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৩০।
২। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৫৭৪।
৩। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি (প্রবন্ধ : বাংলার লোকধর্ম—ডঃ সুধীররঞ্জন দাস), পৃঃ ১৯৪।
৪। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ১৯৫।
৫। *The Golden Bough* (Abridged Ed.)—Sir James George Frazer, p. 259.
৬। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা (শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৯৫) প্রবন্ধ : গ্রাম-সমীক্ষা —ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২।
৭। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩।
৮। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃঃ ৪।
৯। *Encyclopaedia of Religion and Ethics*—Ed. James Hastings (1981 Edition), Vol. V, p. 828.
১০। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃঃ ৬।
১১। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃঃ ১৩।
১২। *The Golden Bough* (Abridged Ed.) গ্রন্থে ফ্রেজার 'Magic and Religion' (p. 63-79) অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
১৩। পূর্বাদ্রি, দশম বর্ষ, ১৯৮৯, লোকধর্ম সঙ্কলন সংখ্যা (প্রবন্ধ : আদিবাসী দর্শন ও বাঙালী হিন্দুর ধর্মচেতনা—সুহৃদকুমার ভৌমিক, পৃঃ ২৯৭।
১৪। বাংলার লোকসংস্কৃতি—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৬।
১৫। আঞ্চলিক দেবতা (লোকসংস্কৃতি)—মিহির চৌধুরী কামিল্যা, পৃষ্ঠা সতের। (এই গ্রন্থের উপক্রমণিকা অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)।
১৬। বাংলার লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ৩৬।
১৭। *The Development of Hindu Iconography*—Dr. J. N. Banerjea, p. 78.
১৮। পূর্বাদ্রি, দশম বর্ষ, ১৯৮৯, লোকধর্ম সঙ্কলন সংখ্যা (প্রবন্ধ : আদিবাসী দর্শন ও বাঙালী হিন্দুর ধর্মচেতনা—সুহৃদকুমার ভৌমিক, পৃঃ ২৯৬।
১৯। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ২০১।
২০। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ২০২।
২১। *The Golden Bough* (Abridged Ed.), p. 69.
'The same confusion of Magic and Religion has survived among peoples that have risen to higher levels of culture.'
২২। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৫৭৪।

পরিশিষ্ট—১

বাঙালী ও দ্রাবিড়

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

[লোকধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙালীর ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতিতে অবৈদিক সংস্কার এরূপ দৃঢ়ভাবে ধর্ম ও সমাজ-বিন্যাসে প্রভাবিত হয়ে আছে যে, এখানে বৈদিক রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত করা কঠিন। উচ্চবর্ণের মানুষের ধর্মের উপর আদিবাসী গোষ্ঠীর ধর্মীয় প্রভাব সম্পর্কে বহু আলোচনা হলেও এতদঞ্চলের ধর্ম-বিশ্বাসের উপর দ্রাবিড় প্রভাব বিষয়ে সীমিত আলোচনা হয়েছে। সমাজ সম্পর্কে বাঙালী জাতির উপর দ্রাবিড় প্রভাব অতি অল্প হলেও ধর্মের ক্ষেত্রে দ্রাবিড় প্রভাব তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচিত 'বাঙালী ও দ্রাবিড়' প্রবন্ধের আলোচনাটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত অর্থবহ। প্রবাসী, ১৩২৮ সাল, পৃষ্ঠা ৪৫৫-৫৯।]

দ্রাবিড় জাতির কতকগুলি পূজাপদ্ধতি, রীতিনীতি নিম্নস্তরের ভিতর দিয়া বাংলার নানা স্থানে বিশুদ্ধাকারে পরিণত হইয়াছিল। দ্রাবিড়দিগের উপদেবতা প্রভৃতি বাঙালীদিগের মধ্যে দেবতায় পরিণত হইয়াছে। শীতলা, কালভৈরব প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্তস্থল। বাসুদেব ও যুগলমূর্তির পূজা বাংলা দ্রাবিড়দের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। শক্তি পূজার বীজ দক্ষিণ ভারতেই প্রথম উপ্ত হয়। বাঙালীর পূজায় বলি দ্রাবিড়েরই অনুকৃতি। শিবপূজা, কালীপূজা ও হোলিকোৎসব দ্রাবিড় হইতেই বাংলা গ্রহণ করিয়াছে। আমরা এই বিষয়টি একটু বিশেষ করিয়া আলোচনা করিব।

বাংলায় কালভৈরবের পূজা হয়। পূর্বে হিন্দু ধর্মে ইহার পূজা ছিল না। দক্ষিণাপথে কুনবী কৃষকেরা ভৈরোঁ নামে এক দ্রাবিড় দেবতার পূজা করে। ইঁনি ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান মূর্তি। ইঁহার অপর হস্তে ঢক্কা—আশেপাশে সর্প ইঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। ভারতের কোন কোন স্থানে ইনি ক্ষেত্রপাল নামে পরিচিত। বাংলায় ইনি কালভৈরবের আকার ধারণ করিয়া অষ্টাবিংশ-হস্ত-সমন্বিত হইয়াছেন। ইনি নর-কপাল মালাবিভূষিত।

বাংলাদেশে বলির প্রথা খুব প্রচলিত। সাধারণ বলির প্রথা সকলে জানে। আমাদের দেশে বাঁকুড়ার গোয়ালারা বলি দিতে হইলে একটা শূকরকে একপাল মহিষের মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। মহিষগুলো শূকরটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে। তিয়রেরা দীপালীতে কালী দেবীর নিকট ছাগ বলি দিবার সময় একটা খুব তীক্ষ্ণ কাঠের ছুরি দিয়া তাহার কণ্ঠদেশে আঘাত করে, ইহাতেই ছাগের মৃত্যু হয়। এই বলির ব্যাপার

দ্রবিড়দের প্রথমাবস্থার কীর্তি, শনৈঃ শনৈঃ তাহা কালে বাংলায় সংক্রামিত হয়। দ্রবিড়দের কালী দেবীর নিকট বলি দিবার প্রথা প্রথম হইতেই চলিয়া আসিতেছে। মধ্যযুগের শেষে আরণ্য জাতির ভিতর দিয়া বাংলায় কালীপূজার প্রবর্তন হইয়াছে। দ্রবিড়দের মধ্যে অতি পূর্বকালে যে নরবলির প্রথা ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

গৃহ-দেবতার পূজা দ্রবিড়গণের মধ্যে গৃহস্বামীই করিয়া থাকেন। এই প্রাচীন পদ্ধতিটি ইহারা এখনও পরিবর্তন করে নাই। বাংলায়, মলেয়া যে ধর্মের গোঁসাইয়ের পূজা করিয়া থাকে, তাহার পুরোহিত হন গ্রামের মণ্ডল। এটিও দ্রবিড়-প্রথা-সঞ্জাত।

যাহাকে হিন্দুধর্ম বলা যায় তাহা আর্যজাতির ধর্ম। বাংলাদেশে অন্যান্য সকল ধর্ম অপেক্ষা হিন্দু ধর্মের প্রভাব অধিক। কিন্তু হিন্দু ধর্ম বাংলাদেশের প্রাচীন ধর্ম নয়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে এই ধর্ম বাংলাদেশে আসিয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু সে ধর্ম বাংলাদেশের প্রাচীন ধর্মকে একেবারে মারিয়া ফেলিতে পারে নাই। এ ধর্ম বাংলাদেশের ধর্ম-বিশ্বাসের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেও, বাংলায় প্রাচীন ধর্ম ভিতরে ভিতরে এখনও জীবন্ত রহিয়াছে। প্রাচীন বঙ্গে অনেক জাতীয় লোক আসিয়া নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে দ্রবিড়, মঙ্গোলীয় ও আর্য-প্রভাব উল্লেখযোগ্য। দ্রবিড়েরা অতি প্রাচীন জাতি। অতি প্রাচীনকালে ইহাদের কয়েকটি শাখা বাংলাদেশের অধিবাসী ছিল বলিয়া মনে হয়। মরণমর জাতি বাংলাদেশ হইতে দক্ষিণ ভারতে গমন করিয়া পাণ্ড্যরাজ্য সংস্থাপন করে, পঙ্গলজাতি চোড় রাজ্য এবং বানবর জাতি চেররাজ্য স্থাপন করে। ইহারা দ্রবিড়দিগের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, এই দ্রবিড় জাতি এককালে সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত ছিল; ইহারা আর্যদিগের উপর কিয়ৎপরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আর্যেরাই দ্রবিড়দিগকে অধিক পরিমাণে অভিভূত করিয়াছিল। দ্রবিড়েরা ঠিক কোন ধর্মাবলম্বী ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে এ দেশের একটা খাঁটি দেশীয় ধর্ম ছিল, তাহার প্রায় সমস্তটা চলিয়া গেলেও প্রাণ এখনও আছে। এই সুপ্রাচীনকালের বাংলার ধর্মের কোন নাম ছিল কিনা জানিতে পারা যায় না; কিন্তু এখন তাহার কোন নাম নাই। বৈদিক ধর্মের মূলে যে ভাব, এদেশীয় ধর্মমত এককালে সেই ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল। যাহার নড়িবার শক্তি আছে তাহারই প্রাণ আছে। প্রাণ না থাকিলে নড়িবে কেমন করিয়া? বাতাস নড়ে, নদী বহে, বৃক্ষ বাড়ে, সুতরাং ইহাদের সকলেরই প্রাণ আছে। আমাদের সঙ্গে যাহাদের কোন সম্বন্ধ আছে, যাহারা আমারের ক্ষতি করে ও মঙ্গল সাধন করে, তাহারা সকলেই জীবনবিশিষ্ট, মানুষ স্বভাবত এই ভাবই পোষণ করিয়া থাকে। প্রাচীন বাঙালীরা সকল বস্তুতেই প্রাণের কল্পনা করিত। বাংলাদেশের মত উর্বরভূমি আর কোথাও নাই। উদ্ভিদ-জাতি এদেশে যেমন প্রশ্রয় পায়, এমন আর কোথাও পায় না। কাজেই বন-দেব-দেবীর আদর এদেশে বড়ই বাড়িয়া গিয়াছিল। বন যেমন উপকারে আসিত, তেমনি ইহা ভয়েরও কারণ ছিল। হিংস্র জন্তু-সমাকীর্ণ পার্বত্য-বন তাহাদের জাগ্রত দেবতা ছিল।

বাংলায় আজও বট অশ্বত্থের পূজা হইয়া থাকে, উৎসর্গ হইয়া থাকে, এমন কি লক্ষ্মী-নারায়ণ বলিয়া বট-অশ্বত্থের বিবাহও হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে বটগাছের গুঁড়ি হন ব্রহ্মা, শাখাপ্রশাখা হন বিষ্ণু, বৃক্ষের পত্র হন অন্যান্য দেবতাগণ। বৃক্ষের পূজা বাংলায় এক সময়ে খুব চলিত। বর্তমান বাংলায় তার নিদর্শন বিরল নয়। বাঙালীর বাস্তু পূজায় ডাল পুঁতিয়া পূজা হয়। অরণ্য-ষষ্ঠীতেও গাছে সিন্দুর মাখাইয়া পূজা দিতে হয়। যূপ-কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রস্তুত কালে কুঠার ও গাছের মাঝখানে কোন কোন স্থানে দূর্বাদল দিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হয়। সুন্দরবনের কাঠুরিয়ারা বনদেবতাকে খুব মানে। তাহাদের বিশ্বাস কাঠ কাটিতে গেলে অরণ্য দেবতা তাহাদের অনিষ্ট করিবে। তাই তাহারা নিজেদের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবার জন্য একজন দরবেশকে আগে না পাঠাইয়া জঙ্গলে যায় না। বৈষ্ণবেরা তাহাদের আখড়ার গাছের ডাল ভাঙিতে দেয় না। আখড়ার গাছও কাটিতে কাহাকেও দেয় না। তুলসীগাছ উপড়াইতে দেয় না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ শ্রীফল বা বেলকাঠ জ্বালাইয়া রন্ধন করিতে পারে না। বাঙালীর শাস্ত্রে, নারিকেল বৃক্ষ কিছুতেই কাটিতে নাই।

ক্রুক ও ফ্রেজার বহু পরিশ্রম করিয়া নানা জাতির পূজা-পদ্ধতি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদের লেখা হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহের সুবিধা হইয়াছে; তাঁহাদের লেখা হইতে পাওয়া যায় যে, বাংলার অসভ্য জাতিদের মধ্যেও গাছ-পূজা আছে। ওরাওঁদের পহান বা গ্রাম্য পুরোহিতগণ পুরানো জঙ্গল হইতে শাল গাছের ফুল সংগ্রহ করে। তাহারা এইরূপ প্রাচীন জঙ্গলকে 'সর্ণাবুড়ী'র বাড়ী বলে বা "সর্ণা" বলে। মুণ্ডাদেরও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা আছে। বৃক্ষ-পূজায় ওরাওঁদের বনভোজনের ব্যবস্থা থাকে। গাছ পূজার সঙ্গে বনভোজন প্রায় সকল অসভ্য জাতিরই আছে। খারওয়ার, সাঁওতাল, মাঝি, বিন্ধ্য ও কৈমুর পাহাড়ের পশ্চিমাঞ্চলের অনার্য জাতির মধ্যেও এই-রূপ ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত জাতির যুবক-যুবতী সকলে মিলিয়া বনভোজনের সময় নৃত্য করে। বাংলাদেশে যেমন ঝোপের অভাব নাই, তেমনিই ঝোপের পূজারও ক্ষান্তি নাই। গাছের ঝোপে মনসাতলা, কলাগাছের ঝোপে শীতলাতলা অনেক জায়গায় আছে। প্রাচীন জঙ্গল কাটিয়া দেখা গেছে, সামান্য ঝোপ রাখিয়া দিয়া সেখানেও কোন গ্রাম্য কাঁচা-খেকো দেবতার পূজা হইতেছে। এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শীতলা দেবীর নিকট পায়রা, ছাগ বলি দেওয়া হয়। চেরোরা ঝোপের কাছে মহিষ ও অন্যান্য পশু বলি দেয়। প্রত্যেক গ্রামে কৃষকদের একটা করিয়া ঝোপ থাকে; সেই ঝোপগুলিকে তাহারা খুব পবিত্র মনে করে। ভুঁইয়ারা এইরূপ ঝোপকে 'দেওতা সরা' বলে। তাহাদের এই পবিত্র স্থানে চারিজন গ্রাম্য দেবতার পূজা হয়। মুণ্ডাদের বিশ্বাস তাহাদের "দেশৌলী"র (ঝোপ) কোন বৃক্ষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে দেবতারা অনাবৃষ্টির দ্বারা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে। জঙ্গল আবাদ হইয়া গেলে পর প্রত্যেক গ্রামে জঙ্গলের ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন-স্বরূপ একটু ঝোপ রাখিয়া দেওয়া হয়। সংস্কার এই যে, যদি এই ঝোপ নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বৃক্ষদেবতা

চটিয়া যাইবেন।

বাংলাদেশে কাঁচা-খেকো দেবতাকে লোকে বড় ভয় করে এবং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। গঙ্গায় ডুবিয়া কত লোক মরিয়া যায়, গঙ্গার হাঙ্গর কুম্ভীর কত লোককে উদরস্যাৎ করে, তাই গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পূর্বে ছাগল ভেড়া গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করা হইত। গঙ্গা পূজার জন্য গঙ্গাস্নান-যোগের সময় দেশ-বিদেশ হইতে যাত্রী আসে। বিবাহের সময় পুকুরে গঙ্গা পূজা হয়। জেলেরা মাছ ধরিবার পূর্বে এখনও ছাগ বলি কোথাও কোথাও দিয়া থাকে। লোকে গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপ করে, ভস্ম নিক্ষেপ করে, প্রথম পিণ্ড গঙ্গায় দেয়। প্রথম সন্তানও পূর্বে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হইত। বাংলার নানা স্থানে গঙ্গা পূজার নানারূপ বিধি আছে।

বাংলায় পৃথ্বী-পূজার রীতি আছে। বসুন্ধরাকে দুধ কলা দেওয়া, পাথরে সিন্দুর মাখাইয়া তাঁহার পূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। পাথরে সিন্দুর মাখানকে কেহ কেহ রক্তদান প্রথার নিদর্শন বলিয়া মনে করিয়া থাকে। দ্রবিড়দের মধ্যেও রক্তদান প্রথা আছে। ধরিত্রীর বিবাহ প্রথাও কোন কোন স্থানে আছে। গ্রাম্য-দেবতার সঙ্গেও ধরিত্রীর বিবাহ হয়। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেত্রপালের সঙ্গে ধরিত্রীর বিবাহ হয়।

শীতলা দেবী গর্দভ বাহিনী সম্মার্জনীহস্তা। সঙ্গে ঘণ্টাকর্ণ। ইঁহার পূজায় ছাগ ও পারাবত বলি হয়। যশোহর ও নোয়াখালিতে ইনি শ্বেতমূর্তি, বরিশালেও তাই। ওড়িষার যোগিনী, বর্ধমানের দিদিঠাকুরানী এই শ্রেণীর ঠাকুর।

ভুঁইয়াদের "ঠাকুরানী মাঈ" রক্ত পিপাসিনী দেবী। এই মূর্তি আমাদের কালী-মূর্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কালী পূজার প্রকারভেদে জীব-বলির নিয়ম সর্বত্রই আছে। ওড়িষার শূদ্র শ্রেণীর মধ্যে অনেকের দেবতা হিন্দু দেবতা নয়। তাহাদের ব্রাহ্মণ নাই, শ্রাদ্ধ নাই; কিন্তু ছাগল ও মোরগ বলি আছে।

বঙ্গদেশে অসভ্য জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ সুসভ্য জাতির মধ্যে বহুবিধ দেব-দেবীর নানা প্রকার পূজা পদ্ধতি আছে। সুসভ্য বাঙালীর অনেক পূজা-প্রণালীর সঙ্গে দ্রবিড়, মুণ্ডা, ভুঁইয়া, খন্দ, হো, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিদের পূজার রীতি আংশিক বা পূর্ণভাবে মিলিয়া যায়। শুধু মিলিলেই যে সেগুলি বাঙালী ইহাদের নিকট হইতে লইয়াছে তাহা সকল ক্ষেত্রে বলা যায় না। পৃথ্বী-পূজা, জল-দেবতা-পূজা, বৃক্ষ-পূজা প্রভৃতি বাঙালী কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করে নাই। এগুলি ইহাদের নিজস্ব। তবে কালভৈরব পূজা, হনুমৎ পূজা, কালী পূজা, লিঙ্গ পূজা, জগন্নাথ পূজা প্রভৃতি যে বাঙালী দ্রবিড় সংসর্গে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। প্রাচীন দ্রবিড়েরা না মানুষ না পশু এমন এক কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি পূজা করিত। তাহার কতকটা বানর, কতকটা মানুষ, সর্বাঙ্গে সিন্দুর লিপ্ত—কেবল একটি লাঙ্গুল তাহার পশুত্বের পরিচয় দিত। ফ্রেজার অনুমান করেন যে, হিন্দুরা এই অদ্ভুত জীবটিকে রামানুচর হনুমানে পরিণত করিয়াছিল। মারাঠীরা

এই হনুমানজীর অত্যন্ত ভক্ত। ভারতের উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামে এই হনুমদ্দেবের এক একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

সুপ্রাচীনকালে যখন দ্রাবিড়গণ শক্তি ও লিঙ্গ পূজা করিত, তখন বঙ্গদেশে ইহাদের পূজা অনুষ্ঠিত হইত না। তান্ত্রিক ক্রিয়া ও তন্ত্র মত বৌদ্ধযুগের পূর্ববর্তী বলিয়া গ্রহণ করিলেও (Journal of the Royal Asiatic Society, 1904, p. 557) স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্তমান প্রণালীর শাক্তধর্ম খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে পূর্ববঙ্গে ও আসামে সর্বপ্রথম প্রচারিত হইয়া সেইখানকার জনসাধারণের প্রবৃত্তি অনুসারে গ্রহণোপযোগী হয়। লোকে সেই শাক্তধর্ম গ্রহণ করে। সূচনাতেই কামাক্ষ্যায় শক্তি পূজা বেশ জাঁকিয়া বসে। এই স্থান হইতে শক্তি পূজা ক্রমশ তিব্বত, নেপাল ও গুজরাতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পঞ্চম শতকের পূর্বে শক্তি পূজা বঙ্গদেশে ছিল না। দ্রাবিড় সম্পর্কেই বাংলায় এই উপাসনার বিস্তৃতি হইয়াছিল। দ্রাবিড় দেশে পৃথ্বী-পূজা হইতেই শক্তি পূজার প্রথম উদ্ভব হয়। সেখানে গ্রাম দেবতা পৃথ্বী, ভূদেবী বা ভূমিদেবীরূপে পূজিত হইতে হইতে ক্রমশ শক্তি রূপে পরিণত হইয়াছেন। বাদামী-গুহা-মন্দিরের পৃথ্বীও এইরূপ ভূ-দেবী। পৃথিবীর বীজোৎপাদিকা শক্তি যাহাতে নষ্ট হইয়া না যায় তজ্জন্য দ্রাবিড়েরা পৃথিবীর সন্তোষ বিধানের জন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে পশু বলি দিত।

প্রাচীন কন্নড় সাহিত্য আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, লিঙ্গ পূজা দ্রাবিড়দিগের একটি সুপ্রাচীন রীতি। আমরা যাহাদিগকে আর্য অভিধান দিয়া থাকি তাহাদিগের ভারতাগমনের পূর্বে দক্ষিণ-ভারতে লিঙ্গোপাসকগণ বাস করিত। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ। কন্নড় ভাষায় তাহাদের প্রাচীন ভাষার উপকরণ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এই জাতি যখন লিঙ্গ পূজা করিত, তখন ভারতের কোথাও লিঙ্গ পূজার প্রচলন ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকের পূর্বে কোথাও লিঙ্গপ্রতীকের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকের কাছা-কাছি দুইটি প্রাচীনতম লিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। একটি ভিটা হইতে প্রাপ্ত—এক্ষণে তাহা লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে সংরক্ষিত। গোপীনাথ রাও লিখিয়াছেন যে, অপরটি উত্তর আরকটের অন্তর্বর্তী গুড়িমল্লমে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বে দ্রাবিড়েরা তাহাদের বীরগণকে সমাধিস্থ করিবার সময় তাহাদের সমাধির উপর লিঙ্গাকৃতি 'বীরকল' বসাইয়া দিত। এই 'বীরকল' স্থাপন রীতিই সম্ভবত লিঙ্গ পূজায় পর্যবসিত হইয়াছে।

পরযুগে এই দ্রাবিড়গণের ন্যায় বৌদ্ধেরাও স্তূপের পূজার প্রবর্তন করিয়াছিল। লিঙ্গ পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত হইলে পর প্রাচীন পল্লব, পাণ্ড্য ও চোড়দিগের মধ্যে লিঙ্গ-প্রতীকোপাসনার প্রবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রাবিড় দেশে খ্রীস্ট জন্মের বহু পূর্বে প্রথমে জৈন ও তারপর বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এ সময়েও দ্রাবিড়েরা লিঙ্গ পূজা করিয়া আসিয়াছে। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে উত্তর ভারত হইতে

শৈবধর্ম প্রথম দ্রাবিড় ভূমিতে প্রচারিত হয়। লকুলীশ ইহা প্রবর্তন করেন। দ্রাবিড়দের অনেকে শৈবধর্মে দীক্ষিত হয়। দক্ষিণ ভারত বৈদেশিক আক্রমণ হইতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ থাকিয়া শৈবধর্মের পুষ্টি সাধনে সমর্থ হইয়াছিল (Indian Antiquary, XXX, 17)। তারপর কিছুদিন বৌদ্ধধর্মের প্রচারে শৈবধর্ম কিঞ্চিৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ২৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে ২১৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম তেলেগু প্রদেশে বিশেষরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তারপর শৈবধর্মের স্রোত পুনরায় চলিতে থাকে। লিঙ্গ পূজায় ও শিব-পূজায় মেশামিশি হইয়া গেল। লিঙ্গোপাসক-দিগের সঙ্গে শৈবদিগের আর কোনও বিবাদ রহিল না।

দক্ষিণ ভারত হইতে দলে দলে শৈব সন্ন্যাসী আসিয়া বঙ্গদেশে ও অন্যত্র শৈবধর্ম প্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। ইহারই ফলে খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের প্রারম্ভে বৌদ্ধ প্রপীড়ক বঙ্গরাজ শশাঙ্ক শৈবধর্মে দীক্ষিত হন। এই সময় মহারাজ হর্ষও শৈবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্রাবিড় প্রভাবে ক্রমশ বাংলায় শৈবধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। বঙ্গদেশে লিঙ্গ পূজা ও শিবারাধনার ধূম চলিল। যাঁহারা লিঙ্গ পূজার নিন্দা করিতেন তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রাদি রচিত হইল। এই সময়ে নানাদিক হইতে লিঙ্গের নানারূপ ব্যাখ্যারও অভাব হইল না। কেহ বলিলেন—"শিবলিঙ্গং শিব এব এব ন তু শিবস্য শিশ্নঃ"। কেহ সুতসংহিতার ধ্যানযোগখণ্ডের দোহাই দিয়া,—

"আলয়ং লিঙ্গমিত্যাহুর্বেদান্তবিত্তমাঃ।
তত্রাপি শঙ্করঃ সাক্ষাল্লিঙ্গং নান্যং মুনীশ্বরাঃ॥
* * *
স্বয়মেব সদা লিঙ্গং ন লিঙ্গং তস্য বিদ্যতে॥"

শিব ও লিঙ্গের একত্ব-দ্যোতক এই বচনের দোহাই দিয়া অনেকে লিঙ্গ ও শিবের একত্ব প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। লিঙ্গ পূজার মন্ত্রের সঙ্গে লিঙ্গের সাধারণ অর্থের আর কোন ঐক্য রহিল না। এই পূজার মন্ত্রে যে ধ্যান হইল তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, উপাসক যে মূর্তি কল্পনা করেন তাহা শ্বেত, মূর্তির কপালে চন্দ্র, চারি হস্ত, পাঁচ মুখ, তিন চক্ষু, মূর্তি পদ্মাসনে স্থিত, ব্যাঘ্র চর্ম পরিহিত। তিনি বিশ্বের বীজ, বিশ্বের আদি। নানাস্থানে লিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকাদিও প্রণীত হইল। খ্রীস্টীয় নবম শতকে বৌদ্ধধর্ম বিতাড়িত হইয়া চোড় রাজ্যে শৈবধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। "বাতকুরর পুরাণম্" নামক দ্রাবিড় গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। অতঃপর বঙ্গ ও চোড় সম্পর্কে বঙ্গদেশে শৈবধর্মের ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

লোকবসতি

(গ্রাম-নাম ও বিবর্তনের ধারা)

(১)

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মানবগোষ্ঠী প্রয়োজনের তাগিদে আবাসস্থল নির্মাণের পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের সূচনা করে। প্রস্তর যুগের পরবর্তীকালে নব্য প্রস্তুর ও তাম্রাশ্মীয় যুগের মানুষেরা খাদ্য সংগ্রহ ও পশু শিকারের পরিবর্তে খাদ্য উৎপাদন ও পশু পালনকে জীবনধারণের প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করে খাদ্য উৎপাদন ও পশুপালনের কলাকৌশলকে আয়ত্তাধীনে রাখতে সচেষ্ট ছিল বা সক্ষম হয়েছিল ; সে সময়েই তারা স্থায়ী আবাসস্থল বা আশ্রয়স্থল নির্বাচন ও নির্মাণের পরিকল্পনা করে। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গোষ্ঠীর ব্যাপকতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গোষ্ঠী পরিচালনার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে একত্র বসবাসের প্রতিকুল অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় গোষ্ঠী নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও একাধিক ব্যক্তি প্রাধান্যের ফলে উপগোষ্ঠীগুলি স্থানান্তরে বসবাসের নিমিত্ত আবাসস্থল নির্মাণ করে। ফলে সৃষ্টি হল কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জনবসতি। 'স্থানভেদে গ্রাম ক্ষুদ্র, বৃহৎ বা মধ্যাকৃতির হতে পারে। ক্ষুদ্র গ্রাম বসতি ইতস্ততঃভাবে সর্বত্র গড়ে উঠা সম্ভব। কিন্তু মধ্যমাকৃতি বা বৃহৎ গ্রাম বসতি একমাত্র সমৃদ্ধ অঞ্চলে গড়ে উঠে।'[১]

প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষিজীবী মানুষ নদীতীর, পর্বতের সানুদেশ ও অরণ্যের পাশে বসতি স্থাপন করেছিল। কৃষিকার্যের জন্য জলসেচ ও পানীয় জলের জন্য নদীতীরে অধিকসংখ্যক প্রাচীন গ্রাম পত্তনের নিদর্শন মেলে। ক্রমশঃ মৎস্য শিকার ও মৎস্য আহার তাদের আয়ত্তাধীন হয়ে ছিল ; এর প্রমাণ মেলে পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে। আবার আত্মরক্ষার তাগিদে পর্বতের সানুদেশ ছিল অন্যতম নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কৃষিকার্যের বিরতির সময় শিকার ও অরণ্য সম্পদ আহরণের জন্য তারা নিকটবর্তী অরণ্যের প্রয়োজন অনুভব করেছিল। বর্ধমান জেলার তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শন মেলে পাণ্ডু রাজার ঢিবি, ভরতপুর, বনকাটি, সাঁওতালডাঙ্গা, এরুয়ার, বানেশ্বরডাঙ্গা, শ্রীপুর-দেপুর, রানিপোতার ডাঙ্গা, অনঙ্গপুর, মঙ্গলকোট, গ্রামরক্ষীতলা, বসন্তপুর, রাজারডাঙ্গা, গোস্বামীখণ্ড, গঙ্গাডাঙ্গা, পাঁচুন্দি, ধনাটিকর প্রভৃতি গ্রামে। অতীতে এই সকল গ্রাম ছিল নদীতীরে ও অরণ্য বেষ্টিত ভুভাগের মধ্যে। বস্তুতঃ একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, বর্ধমান তথা রাঢ়ের মাটির নীচে বাঙালীর আদি ইতিহাস চাপা পড়ে আছে। সমগ্র রাঢ়ের তাম্রাশ্মীয় যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানচিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বর্ধমানের তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল ধারাবাহিক ও সুপরিকল্পিতভাবে। তার প্রধান প্রমাণ হল তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা বিকাশের প্রত্নস্থল বা

গ্রামগুলির অবস্থান মানচিত্র হতে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন[২]—পাণ্ডু-রাজার ঢিবি উৎখননের ফলে আদি সমাজ জীবনের নূতন রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে এবং এই রূপ বাঙালীর আদি-ইতিহাসের রূপ। (আদিম পর্বের মানুষের জীবিকা ও বাসগৃহ নির্মাণের কলাকৌশলের কথা প্রথম খণ্ডের প্রাগৈতিহাসিক পর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে)। উৎখননের ফলে মঙ্গলকোট প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী হতে প্রমাণ মিলেছে যে, নব্যপ্রস্তর যুগ হতে শুরু করে তাম্রাশ্মীয় ও ঐতিহাসিক যুগের ধারাবাহিক জনবসতি সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে একমাত্র মঙ্গলকোটে রয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে উপজীবিকার বৈচিত্র্য ও জটিলতার ফলে কৃষিজীবী গোষ্ঠী ব্যতীত অন্যান্য সহায়ক শ্রমিক শ্রেণীর উপস্থিতিতে গ্রামগুলির আয়তন ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সম্ভবতঃ গুপ্ত যুগে রাষ্ট্রশক্তির আনুকূল্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম রাঢ়ে প্রবেশ লাভের পর বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচলিত হওয়ায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বহুধা পেশায় বিভক্ত হয়। মহারাজা গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসনে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত রাজকর্মচারীর উল্লেখ আছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম ও জীবিকায় নিযুক্ত বহুমুখী পেশা উদ্ভাবনের ফলে স্ব স্ব পেশায় নিযুক্ত উপগোষ্ঠীর মানুষেরা গ্রামের এক এক অংশে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে এবং বৃত্তির উপর নির্ভরশীল পরিবারবর্গের বসতিগুলিকে 'পাড়া' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এইভাবে কয়েকটি গোষ্ঠী বা পাড়া সৃষ্টির ফলে বৃহৎ গ্রাম পত্তন হয়। বর্ধমানের যে কোন বড় গ্রামে বামুনপাড়া, বাগদিপাড়া, বাউরীপাড়া, মুচিপাড়া, হাড়িপাড়া, বেনেপাড়া, তাঁতীপাড়া, কলুপাড়া ইত্যাদি নামে বৃত্তিধারী সম্প্রদায়ের পল্লী আছে। একালে কৃষি এলাকাভুক্ত গ্রামগুলিতে বহিরাগত ও ভ্রাম্যমাণ সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বসবাসের ফলে সাঁওতাল পাড়ার সৃষ্টি হয়েছে। আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের নামগুলি তাদের বৃত্তি নামকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বর্ধমানের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে গ্রামগুলির সম্পর্ক হল নিবিড় ও নিরবচ্ছিন্ন। জেলার লোকসংস্কৃতির পল্লবায়িত শাখাপ্রশাখাগুলি বিভিন্ন গ্রামের প্রচলিত রীতিনীতি ও লোকধর্মের মধ্যে নিহিত আছে। সেকারণে লোকসংস্কৃতির বাহ্যিক সূত্রগুলি আলোচনার পর লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক স্বরূপ বিভিন্ন গ্রামের পর্যালোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থের পরবর্তী পর্যায়ে। 'বাংলার সমাজ জীবনের বিবর্তন ধারা অনুসরণ করিতে হলে গ্রামগুলির সমীক্ষা ব্যতীত তাহা কদাচ সম্ভব হতে পারে না ; কারণ বাংলা দেশের বৃহত্তর সমাজ এখনও গ্রাম-কেন্দ্রিক'।[৩] বর্ধমান জেলার ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। বর্ধমানের গ্রামীণ অর্থনীতি ব্যবস্থা আজ আর প্রাচীনপন্থী নহে। জেলার পূর্বভাগ কৃষি অধ্যুষিত হলেও কৃষি আজ প্রাচীন পন্থার উপর নির্ভরশীল নয়। জেলার পশ্চিম অঞ্চল খনি ও শিল্পাঞ্চল এলাকারূপে চিহ্নিত। আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়ে ওঠার প্রধান অন্তরায় হল কৃষিপ্রধান অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল ধরে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণ প্রধান সমাজ উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনার সময়ে বর্ধমানের

১৫ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, কোড়া, ভূমিজ ও মাল উপগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১০ হাজার। পরবর্তীকালে এই জনগোষ্ঠীর সংখ্যা তিন লক্ষের কাছাকাছি পেঁছালেও অধিকাংশ জনসংখ্যা হল ভাসমান অর্থাৎ সস্তায় কৃষি শ্রমিক লাভের জন্য এই জনগোষ্ঠীকে বর্ধমানে স্থান দেওয়া হয়েছে। সেদিক হতে বিচার করলে বর্ধমানের তফশিলীভুক্ত জনসংখ্যা হল মোট লোকসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ। কিন্তু বর্ধমান জেলার সমাজ ব্যবস্থা ও লোকধর্মের পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, এই জনগোষ্ঠী অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও অ্যালপাইন গোষ্ঠীর মিলন মিশ্রণের ফলে গড়ে উঠেছে। এখনও গ্রামের লৌকিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাগদী, ডোম, সদগোপ প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোকেদের প্রাধান্য আছে ও তারাই পৌরোহিত্য করে থাকেন।

অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এক সময়ে মন্তব্য করেছিলেন,—'গ্রাম দেবতা, গ্রাম্য সমাজের সংহতি রক্ষার মূল সহায়। একটি গ্রামের কেন্দ্রীয় ঐক্যের রক্ষাকারী রূপেই গ্রাম দেবতার অধিষ্ঠান হয়ে থাকে। যে গ্রামে গ্রাম-দেবতার প্রভাব যত বেশী, সেই গ্রামে সামাজিক সংহতিও তত দৃঢ়। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার কতকগুলি গ্রামে 'গ্রামদেবতা বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও ইহারা এক একটি গ্রামের সমাজ জীবনের কেন্দ্রীয় ঐক্যের মূল স্বরূপ এখনও বর্তমান আছেন।' আবার অনেক সময় দেখা যায় বহিরাগতরা কোন গ্রামে বসতি স্থাপন করায় তাদের স্বীয় আরাধ্য দেবতাকে গ্রাম দেবতায় রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু গ্রামে আদি-দেবতার স্বরূপ পাল্টালেও অন্তঃসলিলারূপে প্রাচীন ধর্মীয়-আচার অনুষ্ঠানগুলি বলবৎ আছে। বোড় গ্রামের বলরাম হলেন বৈষ্ণব বা ভাগবত গোষ্ঠীর দেবতা এবং পূজার বহিরাঙ্গ বৈষ্ণবোচিত হলেও এই পূজায় এমন কিছু আচার আচরণ আছে, যদ্দ্বারা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বলরামকে কোন ধর্মপীঠ বা ধর্মরাজের পূজা বেদীতে স্থাপন করা হয়েছিল।

(২)

কৃষিপ্রধান বর্ধমান জেলার গ্রাম সৃষ্টি ও গ্রাম-নামে হতে অস্ট্রিক দ্রাবিড় ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। জেলার পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে এক সময়ে দক্ষিণ-বিহার ও ওড়িষার নিবিড় যোগাযোগ ছিল। পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীগণ যেসকল প্রাচীন গ্রাম পত্তন করেছিল তার মধ্যে বৃক্ষ-নাম, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় শব্দযুক্ত গ্রাম-নামই অধিক। ব্যক্তি, দেবতা, সম্প্রদায়, পারিবারিক উপাধি-যুক্ত গ্রাম-নামের সংখ্যাও নগণ্য নয়।

বর্ধমান জেলার বৃক্ষ-নাম যুক্ত গ্রাম-নামের আলোচনা যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গ্রাম-নাম অনুসন্ধানের ফলে অতীতে এ জেলার অরণ্যে কত অসংখ্য প্রকারের বৃক্ষ ছিল তার তালিকাও পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ বহু বৃক্ষ-নাম পাওয়া যায়, যার মধ্যে অনেকাংশের অস্তিত্ব একালে নাই।

অতি প্রাচীনকাল হতে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৃক্ষপূজা প্রচলিত ছিল।

বৃক্ষের সঙ্গে দেবদেবীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের জন্য একশ্রেণীর বৃক্ষকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসনে স্থান দেওয়া হয়েছিল ; আবার যেসকল বৃক্ষ মূল্যবান আসবাবপত্র তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হত ও ফলবান বৃক্ষ সকল মনুষ্য সমাজের নিকট অত্যন্ত আদরণীয় ছিল।[৪] তাই সভ্যতার উন্মেষ পর্ব হতে বৃক্ষ মানুষকে আশ্রয়, আহার ও আত্মরক্ষার কাজে সাহায্য করেছে। উপজাতীয় সংস্কৃতিতে বৃক্ষ হল টোটেম-এর প্রতীক এবং বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠীর কাছে বৃক্ষ বিশেষের উপর বিধি নিষেধ বা ট্যাবু আছে।[৫] বৃক্ষ যেমন ধর্মীয় ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে আমাদের সহায়ক, অনুরূপভাবে টোটেম বৃক্ষ-গুলি ছিল স্থান নির্দেশ জ্ঞাপক। একালেও গ্রামের মধ্যে স্থান নির্দেশের জন্য অশ্বত্থ-তলা, বটতলা, তেঁতুলতলার উল্লেখ করা হয় ; আবার লিচুবাগান, আমবাগান, ইত্যাদি উল্লেখের অর্থ হল, কোন পল্লীর বা পাড়ার অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত বা নির্দেশের সহায়করূপে গণ্য করা। দুটি গ্রামের সীমানা নির্দেশ জ্ঞাপনের জন্য বৃক্ষ-নাম ব্যবহারের প্রচুর নির্দেশ মেলে। আদিম মানুষ তাদের বাসস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমে টোটেম বৃক্ষকে অবলম্বন করে ; কারণ টোটেম বৃক্ষকে তারা দেবতা-জ্ঞানে পূজো করত এবং তাদের ধারণা ছিল যে, সর্বপ্রকার আপদ-বিপদ হতে বৃক্ষরূপী দেবতা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। পরবর্তীকালে বহুধা বিভক্ত গোষ্ঠীগুলি স্থানান্তরে চলে গেলেও স্বীয় গোষ্ঠীর মূল বাসস্থানের পরিচয় প্রসঙ্গে টোটেম বৃক্ষটির উল্লেখ করত এবং সেইভাবেই চিহ্নিত হত। রাঢ়ের অষ্ট্রিক ও প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ তাদের অতি পবিত্র ও প্রধান অবলম্বনকারী টোটেম বৃক্ষের নামে বসবাসের স্থানটিকে চিহ্নিত করণের কার্য সমাধান করেছিল বলে অনুমান করা যায়। বৃক্ষ-নাম ব্যতীত ফল ও ফুলের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু গ্রাম নামের পরিচয় জানা যায়। উদাহারণ-স্বরূপ বৃক্ষ-নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রাম-নামের (বন্ধনীর মধ্যে থানার নামের পরিবর্তে সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে) একটি তালিকা দেওয়া হল,—

থানা নির্দেশক সংখ্যা

১।	চিত্তরঞ্জন	২।	সালানপুর	৩।	কুলটি	৪।	হীরাপুর
৫।	আসানসোল	৬।	বরাবনী	৭।	জামুরিয়া	৮।	রাণীগঞ্জ
৯।	দুর্গাপুর	১০।	বুদবুদ	১১।	কাঁকসা	১২।	ফরিদপুর
১৩।	অণ্ডাল	১৪।	গলসী	১৫।	আউসগ্রাম	১৬।	ভাতাড়
১৭।	মেমারী	১৮।	বর্ধমান	১৯।	জামালপুর	২০।	রায়না
২১।	খণ্ডঘোষ	২২।	কাটোয়া	২৩।	কেতুগ্রাম	২৪।	মঙ্গলকোট
২৫।	কালনা	২৬।	পূর্বস্থলী	২৭।	মন্তেশ্বর		

বৃক্ষনামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রাম-নাম :

অর্জুন—অর্জুনডিহি (২২), অর্জুনপুকুর (২৬), অর্জুনপুর (১০),

অর্জুনা (২৫) ।

অশ্বত্থ—অশ্বত্থগাড়িয়া (১৮) ।

আকন্দ—আকন্দাড়া = আকন্দ + আড়া (১১) ।

আঁকড়া—অপভ্রংশে আখড়া (২২) ; বৈষ্ণব শ্রীপাট হতে পারে ।

আদাড়—আদড়া (১৪) ।

আম—আমডাঙ্গা (২২), আম্র (২১) আম্রল (২১), আমারুণ (১৬) আমবোনা (১৬), আমঝারিয়া (২), আমডিহি (৬), আম্রকুলা (৮), আমগাড়িয়া (২৩), আমডোব (২৪), আম্রসোটা (৮) ।

আমড়া—আমড়া (১৮), আমাড় (১৮) ।

আমলা—আমলাজোড়া (১১), আমলাদহি > আমলাডিহি (১), আমলৌকা (১২), আমুলিয়া (৬), আমিলিয়া (২১) আমুল (২২) ।

আস (*Shorea Rolusta*)—আসণ্ড > আসিণ্ড (১৫) ।

আসন (*Terminalia Tomentosa*)—আসানস্থলি > আসানসোল (৫) আসানবুনি (৩) আসানপুর (২৭) আসিণ্ড > আসনডা (১৫) ।

উচ (Cassia Fistula)—উচালন (২০), উচগ্রাম > উচ্চগ্রাম (১৪)

উলু—উলার (১৭) ।

উষ (ইক্ষু অথবা উর্বর অর্থে) —উষা > উষো (১৬, ২৬), উষাগ্রাম (৫) ।

এরণ্ড—বর্ধমান (১৮), রোণ্ডা (২২) ।

ওকড়া—ওকড়সা (২২), ওকড়া > উখরা (১৩) ।

কদম্ব—কদম্বা (২৫) ।

কণ্টকারী—কনাটি কুড়ি [কুড়া] (১৫) ।

করন্দা / করন্দি—করন্দা (১৭) ।

কসা—কুসা (১৮), কাঁসিগ্রাম (১৬, ২২), ক্ষসা (২৭) ।

কাঞ্চন—কাঞ্চনপুর (১১), কাঞ্চনডাঙ্গা (২৭, কাঞ্চননগর (১৮) ।

কাপাস—কাপাসটিকরী (১৭) ।

কাশ—কাশপুর (১৪), কাঁশকুলি (৬), কাশিয়াড়া (২৪), বেলকাশ (১৮), কেশিয়া (২২) ।

কুচ—কুচুট (১৭), কুচুটিয়া (২৩) ।

কুন্দ—কুন্দলিয়া (৭), কেন্দা (৭), কুন্দ (২৪) ।

কুরচি—কুরচি (২২), কুরচা (২৬), কুরচিগড়ে (২০) ।

কুল—কুলাড < কুলাডিহি (৩, ১৫), কুলটি (৩), কুলতাড়া (৩), কুলে (২১), কুলদহ (২৫), কুলজোড়া (২৭), কুলেপাড়া (২৫) ।

কুশ—কুশডাঙ্গা (২৫), কুশগাড়িয়া (২৬), আলকুশ (২) ।

কুসুম—কুসুমকানালি (২), রাজকুসুম (১১), কুসুমগ্রাম (২৭) ।

কেন্দ—কান্দুয়া (৩), কেন্দুলা (১২), কেন্দুর (২১), কেন্দুয়াটিকরী (১০)।
খয়ের—খয়েরবাদ ? (৬), খয়েরপুর (১৭), খয়েরগ্রাম (১৭)।
খেজুর—খেজুরহাটি (২১), খাজুরডিহি (২১)।
খেড়ো—খেড়ো<খেড়ুয়া (২৪)।
গড়ান—গড়াগাছা (২২)।
গামার—গামারকুড়ি (২)।
গোল—গোলগ্রাম (১৪), গোলগ্রাম (২০)।
গোলাপ—গোলাপবাগ (১৮) [আধুনিক]।
চাকুন্দি—চাকুন্দি (১৭)।
চাকুলা—চাকুলিয়া (২৪)।
চালিতা—সোনাচালিতা<সোনাচালিদা∠সোঁচালদে (১৬)।
জাড়—জাড়গ্রাম (১৯)।
জাম—জামডিহি (৪), জামগ্রাম (৬), জামসোল (৭), জামুরিয়া (৭), জামগড়া (১২) জামবন (১১), জামডোবা (১১), জামদহ (১৯), জামতাড়া (১৫), জামরা (২২), জামনা (২৭)।
জামাল—জামালডিহি (৩), জামালপুর (১৯, ২৬), মুসলমান ব্যক্তি নাম ?
জারুল—জারুল (২১), জরুর (১৮) [রূপান্তর]।
জিয়ল—জিয়লগড়িয়া (২৬)
ঝাউ—ঝাউডাংগা (২৬)।
ডুমুর—ডুমরা (১১), ডুমুর (১৪), ডুমো (১৯)।
তামাল—তমলা (১৩)।
তাল—তালকুনারি (৪), তালডাংগা (৬), তালচিনি (১৭), তালবেড়িয়া (২)।
তিল—তিলকুড়িয়া (২), তিলবনি (১২), তিলডাংগা (২১)।
তুলসী—তুলসীডাংগা (১৩)।
তেঁতুল—তেঁতুলমুড়ি (১৪), চক তেঁতুল (১০), তেঁতুলিয়া (১৮, ২৭)।
ধব (এক প্রকার রেশম)—ধবনী (১২)।
ধান—ধানগুড়ি (২), ধনডিহি (২), ধানতোড় (১৫), ধান্যরুখি (২৪)।
নল—হাতিনল (৩), নলসরা (১৯), নলডাঙ্গা (১৪), নাল (১৮) নলে (২০), নলাহাটি (২২), খাগড়াকুর [নলখাগড়া ?] (২৫)।
নারিকেল—নারিকেলডাঙ্গা (২৫)।
নারঙ্গ (নাগকেশর)—বর্ধমান (আভিধানিক অর্থে)।
নিম—নিমসা (৭), নিমদহ<নিমদে (২৬), নিমচা (৮), নিমো (১৪), নিমটিকরি (১১)।
পলাশ—পলাশডিহি (৫), পলাশবন (১৩), পলাশডাংগা (২১) পলাশন (২২),

পলাশী (১৮, ২৪), পলাশপর্লি (২৬), পলাশনী (২৯)।
পাটালী—পাটুলী (২৬)।
পানিফল—পানিফলা (৬)।
পারুল—পারুলবেড়িয়া (৬, ২৬) পারুলিয়া (৯, ২৬) পারুলডাঙ্গা (২৬)।
পিচ—পিচকুড়ি (১৫)।
পিপুল—পিপুলদহ (২০), পিপলন (২৭)।
বট (অপভ্রংশে 'বড়')—ইছাবটগ্রাম<ইচেবড়গাঁ (২৪), বটগ্রাম (১৫)।
বন বাইগুন—বাইগুন কোলা<বেগুনকোলা (২৩)।
বহড়া – বয়ড়া>বহড়া (২৬), বহড়া (১৭), বহড়ান (২৩)।
বহল—মালবহল (২), বহুলা [দেবীনাম ?] (১৩)।
বাকস্—বাকসা (২২)।
বাকুলি—বাকুলিয়া (২৪), বাকলসা (১৮, ২৩)।
বাবলা—বাবলা (১৪, ২০), বাবলাডিহি (২৪)।
বাবুই—বাবুইশোল (১৩)।
বাঁশ—বাঁশ কাটিয়া (২), বাঁশড়া (৮), বাঁশগড়া (১২), বাঁশকোপা (১১)।
বেগুন—বেগুনিয়া (৩), বীরবেগুন (২২), বেগুনকোলা (২৩)।
বেত—বেতপুকুর (১৬), বেত্রাগড় (১৯)।
বেনা—বেনাচিতি (৯), বেনাপুর (১৭), বেনাশোল (৭), বেনাগড়িয়া (২)।
বেল / বিল্ব—বেলরুই (৩), বিল্বেশ্বর (২৩), বেলগ্রাম (১৫, ২৪), বেলুই (১৭), বেলডাঙ্গা (২১), বেলুটি (১৫), বেলুন (১৬), বেলেণ্ডা (১৬), বেলগাছি (২৬), বেলতলি (২৬), বেলকাশ (১৮)
বেল / বকুল—বোলকুণ্ড (২), বোলডি>বেলেডিহি (৩)।
বৈঁচি—বৈঁচি (২২, ২৪)।
ভেরাণ্ডা—অপভ্রংশে বেরাণ্ডা>বেল্লেন্ডা ? (১৬, ২৭)।
ময়না—ময়না>মৈনা (১৯)।
মল্লিকা—মল্লিকপুর [মল্লিক পরিবারের বাসস্থান ?] (১৪, ১৫)।
মহিন্দি—মহিন্দর (১৯)।
মহুয়া / মহুল—মহুজুড়ি>মহুয়াজুড়ি (৫), মৌগ্রাম (১০, ২৬), মহুলা (২৩), মহুলাড়া (১৪), মৌডাঙ্গা (২৬), মহুলা>মৌলা (১৯)।
মান—মানবেড়িয়া (৩)।
মান্দার—মন্দারডিহি (১৬), মন্দারবনি (১২), মান্দারবাটি>মাদারবাটি (১৬)।
মালঞ্চ—মালঞ্চা (২২)
মালতী—মালতীপুর (২৬)।
মুগরা—মুগুরা>মগরা (১৭), ('দহ' অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে)।

মেহেদী—মেদগাছি (২৬), (বর্ধমানে রয়েছে 'মেহেদি বাগান')।
মৌরী—মৌরী (১৪)।
রসুন—রসুনপুর (৬)।
লাউ—লাউদহ>লাউডোহা>লাউডিহি (১২)।
শিউলী—পানশিউলী (১২) শিউলী (১৫), শিউলীডাঙ্গা (১৫)।
শাল—শালডাংগা (১০), শালগাছা (২০), শালঘরা (২৫)
শরগ্রাম— শরগ্রাম / সরগ্রাম (২২), শরডাংগা (২৬), শরকুড়ি (২), সারগাছি> শরগাছা (১৭) 'সর' (১৫), (সম্ভবতঃ সারংগ প্রভুর নামে গ্রাম-নাম হয়েছে)।
শিমুল—শাল্মলী (১৯), শিমুল গাছি (২২), হাট শিমুল (১৮) শিমুলিয়া (২৪), বীরশিমুল (১৭), কোট শিমুল (২০), সিমলা (২৫, ২৬)।
শিয়ালি—শিয়ালি (১৯), শিয়ালদহ (১৮)।
শিরিষ— শিরিষবেড়িয়া (২)।
শুশনী—শুশুনী (২৭), শুশুনা (২৭)।
সরিষা—সরিষা (২২), সরিষাতলি (২৬), সিউরি [সি+উরি=সরিষা উৎপন্ন হত এই গ্রামে] (২৪)।
সিজ—সিজনা (২৭)।
সিম—সিমডালি (১৮), সিমসিমি (১৪), সিমনাড়ী (১৪)।
সিয়াকুল—সিয়াকুলবেড়িয়া (২)।
সুন্দরী—সুন্দিয়ারা (১১), সুন্দরীপুর (২০)।
স্নুহি—আভিধানিক অর্থ হল মনসাগাছ ; অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-এর মতে সিংগ (২২) হল স্নুহি শব্দের অপভ্রংশ।
সেওড়া—পাটসেওড়া (১২), সেওড়াগাড়িয়া (২৬)।
হলদি—হলদিপাড়া (২৬), হলদি (২৩)।
হিঙ্গুল—হিঙ্গুলগড়িয়া (১৭)।
হিজল—হিজলগড়া (৭), হিজলী (২৫), হিজলনা (২০)।

(৩)

বৃক্ষ-নাম ব্যতীত গ্রাম-নামের মধ্যে আরও বহু সাংস্কৃতিক উপাদান লুকিয়ে আছে। বর্ধমান জেলার আদিম মানব সমাজের প্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি ছিল অষ্ট্রিক ও প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেরা। পুরাকালের বহু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু একালে লুপ্ত হলেও ভাষার সাক্ষ্যে বা ভাষার মধ্যে সেগুলির প্রাচীনতাকে ধরে রেখেছে। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার মানুষেরা যে, রাঢ় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল উভয় ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সংযোগ। বর্ধমান জেলার বহু গ্রাম-নামের মধ্যে আদি ও অন্তপদে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় শব্দের প্রচলন দেখা যায়। মানুষের নামের ক্ষেত্রে সকল সময় কোন অর্থ না হতে পারে—কিন্তু গ্রাম-নামের ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দ অর্থবহ এবং প্রত্যেকটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা বা পত্তনের সময় কোন অর্থবোধক শব্দের দ্বারা গ্রামটিকে

চিহ্নিত করা হয়েছিল—যা একালে হয়ত লুপ্ত। বাঙালী জাতির ন্যায় বাংলা ভাষা হল মিশ্রভাষা। এই মিশ্রণ কিছুটা ঘটেছে আদি ও অন্তপদে অপর ভাষা হতে আগত শব্দ সমূহের মিশ্রণের ফলে এবং গোটা শব্দটিকে বাংলা ভাষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করতে গিয়ে তা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু ব্যুৎপত্তি বা অর্থ নির্ণয়ের মাধ্যমে মিশ্র শব্দগুলির আদি রূপ নির্ণয় করা সম্ভব হলে দেখা যাবে যে, কোন শব্দই আর অর্থহীন নয়। বর্ধমান জেলার গ্রাম-নামের ক্ষেত্রে আদি ও অন্তপদে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক শব্দ যুক্ত হয়েছে তার প্রচুর প্রমাণ মেলে। রাঢ়ের বহু জায়গায় 'র', 'ড়' ও 'ঢ়'-এর উচ্চারণ বিভ্রাট অবশ্য অর্থবোধের ক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। আবার 'ষ', 'শ' ও 'স'-এর উচ্চারণ প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। গ্রাম-নামের ক্ষেত্রে ইংরাজী হতে ভাষান্তরিত করার সময় বিশেষ্য পদে *diacritical mark* দেওয়ার বিধি একালে অপ্রচলিত হওয়ায় বাংলা শব্দে রূপান্তরিত করার সময় বহুক্ষেত্রে অনুরূপ বিভ্রান্তি ঘটেছে। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত 'Consus Report' হতে ভাষান্তরিত করার সময় একালে প্রকাশিত কিছু গ্রন্থে বর্ধমান জেলার গ্রাম-নামের ক্ষেত্রে এরূপে বিভ্রান্তির প্রচুর নিদর্শন মেলে।

লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে গ্রাম-নামের উদ্ভব ও সে সম্পর্কে আলোচনার তাৎপর্য হল এই যে, ভাষার মাধ্যমে আদি বা মূল গোষ্ঠীর বসবাসের স্থান নিরূপণ বা কিছুটা অনুমানের কাছাকাছি হলেও আলোচনার ধারা আরও অতীতের দিকে প্রসারিত করা সম্ভবপর হতে পারে।

অষ্ট্রিক ভাষায় 'ওড়া / ওরা' শব্দের দ্বারা গ্রাম অথবা বাড়ীকে নির্দেশ করে। 'মুড়া বা মুড়ি' শব্দ হল মুণ্ডার অপভ্রংশ অর্থাৎ অন্ত পদে মুড়া বা মুড়ি শব্দ থাকলে মুণ্ডা জাতির বসবাসের কথা মনে আসে। 'ডিহি' বা 'ডি' অন্তপদে যুক্ত থাকলে কেবলমাত্র মোগল আমলের ডিহিদারের কার্যালয়কে বোঝায় না। সাঁওতালি ভাষায় ডিহি শব্দের অর্থ হল ছোট গ্রাম। ডাঙ্গা শব্দের সাঁওতালী ভাষার অর্থ হল বসবাসের স্থান। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষায় 'দা' শব্দের অর্থ হল জল; কাটারি নয়। 'সোল' বা সুলি বা শুলি শব্দকে অষ্ট্রিক ভাষাভাষীর লোকেরা জলাভূমি বা নিচু জমি অর্থে ব্যবহার করত। সাঁওতালী ও মুণ্ডা ভাষায় 'পাড়া' বা পাঢ়া শব্দ ব্যবহারের দ্বারা গ্রামকে বোঝায়। আবার নূতন অথচ ক্ষুদ্র গ্রাম-নামের অন্ত্যপদে 'পাড়া' শব্দের ব্যবহারও প্রচুর দেখা যায়। বাঁধ শব্দের অষ্ট্রিক ভাষার ব্যবহার জলাশয়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত—যার নিদর্শন বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার গ্রাম-নামে পাওয়া যায়। বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশে নুনিয়া জাতি ও নুনিয়া নদীর অস্তিত্ব রয়েছে। সাধারণভাবে নুনিয়া শব্দের অর্থে লবণ প্রস্তুতকারী গোষ্ঠীর মানুষদের বোঝায়। কিন্তু আসানসোল মহকুমায় লবণ অর্থে প্রযুক্ত নুনিয়া নদী-নাম ও উপগোষ্ঠীর নাম হল অবাস্তব চিন্তা। আবার শব্দটি আরবী বা সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত নয়। কিন্তু কোল ভাষায় 'নুনে' শব্দের অর্থ হল তৈল। একালের ন্যায় আদিম সমাজে তৈল প্রস্তুতকারকগণের সন্ধান পাওয়া যায় 'নুনে' শব্দ হতে এবং তাদের বসবাসের স্থানটি

নুনিয়া নদীর অববাহিকায় ছিল, একথা অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে। কোল ভাষায় 'তুরে' শব্দের অর্থ হল শুয়োর বা শূকর। বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশে শুয়োর পালন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে এরূপ তুরী নামক উপগোষ্ঠীর বসবাস আজও আছে। সাঁওতালী ভাষায় 'বীর' শব্দের অর্থ হল, জঙ্গল এবং বর্ধমানের গ্রাম-নামের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, বীরটিকুরি, বীর বেগুন, বীর শিমুল, বিরপুর, বীর-কুলটি বিরুডিহ, বির, বিরুডি ইত্যাদি গ্রাম।

কোল ভাষায় 'উর' গ্রামবাচক ও 'ইর' হল জলবাচক শব্দের সমার্থক। সেকারণে গ্রাম-নামের অন্তপদে 'উর' বা 'ইর' শব্দ যুক্ত থাকলে অষ্ট্রিক বা কোল ভাষাভাষী লোকের বসবাস ছিল বলে অনুমান করা যায়। আবার দ্রাবিড় ভাষায় 'উল' বা 'উলি' শব্দের অর্থ হল গ্রাম। জলের উৎসসন্ধানে আদিম জাতি কোন নূতন জলের দেশের খোঁজ পেলে সে অঞ্চলকে 'নওদা' নামে চিহ্নিত করত। হো ভাষায় 'লগরী' অর্থে বসবাসের স্থানকে বোঝায়, তাই বর্ধমানের গ্রাম-নামের অন্তপদে লগরীর অপভ্রংশে নগর শব্দের আধিক্য দেখা যায়। মুণ্ডা গোষ্ঠীর লোকেরা ধানক্ষেতকে 'গোড়া' বলে, সেকারণে অন্তপদে গোড়া শব্দ যুক্ত থাকলে ধানক্ষেতের পার্শ্বে অবস্থিত গ্রাম বলে ধরে নেওয়া যায়। দুটি উপজাতি গোষ্ঠী পাশাপাশি বসবাস করার ফলে পরবর্তীকালে বৃহত্তর গ্রামে পরিণত হলেও উভয় গোষ্ঠীর নামের অস্তিত্ব বিদ্যমান। যথা, নাকরা—কোন্দা > নাগরা কোন্দা = নাগরা + কন্দ ; নাগ ও কন্দ জাতির একত্রে বসবাসের ফলে যুগ্ম গ্রাম-নামের প্রচলন ছিল বলে অনুমান করা যায়। বর্ধমানের কথ্য ভাষায় বহুল প্রচলিত দুটি শব্দ হল—'ছোড়া' ও 'ছুঁড়ি' এবং 'ছেলে-পিলে'। এ শব্দগুলি সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষার অন্তর্ভুক্ত নয়। কোল ভাষায় 'কোড়া' শব্দের অর্থ উঠতি বয়সের বালক—তাই বালক-বালিকা বোঝাতে কোল ভাষায় প্রচলিত কোড়া-কুড়ি বর্ধমানের কথ্য ভাষায় ছোঁড়া-ছুঁড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। বাঙাল ভাষায় পোলা-পান রাঢ়ের চলতি ভাষায় হয়েছে ছেলে-পিলে। কিন্তু কোল ভাষায় 'পিল্লে' শব্দের অর্থ হল কন্যা। এরূপে বহু শব্দ আছে যেগুলির প্রচলিত বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হলেও তাদের আদি উৎপত্তি হয়েছে কোল বা অষ্ট্রিক ভাষা হতে।

প্রাচীন বাঙলার নদ-নদী ও স্থান-নাম প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যার সন্ধান করলে সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষা হতে কোন সাহায্য মিলবে না। আদি বাঙলা ভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার মন্তব্য করেছেন,—"অনেক নামের ব্যাখ্যা সংস্কৃত বা কোন আর্য ভাষা ধরে হয় না—কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত, কেউ এখানে সাহায্য করে না ; সেই সব নামের ব্যাখ্যার জন্য আর্য ভাষার গণ্ডীর বাইরে যেতে হয়,—অনার্য, দ্রাবিড় আর কোল ভাষার সাহায্য নিতে হয়। 'অঝডাচোবাল, দিজমকাজোলী, বাল্লহিট্টা, পিণ্ডারবীটি-জোটিকা, মোড়ালন্দী, আউহাগড্ডী প্রভৃতি নামের চেহারা কোনও আর্য ভাষার নয় ; আর পোল বা বোল, জোটা, জোডী বা জোলী, হিট্টা বা ভিট্টা, গড্ড বা গড্ডী প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ প্রাচীন অনুশাসনে প্রাপ্ত বাঙলা দেশের

স্থানীয় নামের মধ্যে মেলে। এইগুলি খুব সম্ভব দ্রাবিড় ভাষার শব্দ। জায়গার নামে এই সব অনার্য শব্দ দেখে, অনার্যদের বাস অনুমান করলে কেউ বলবে না এটা কেবল কল্পনা মাত্র।"[৬]

(৪)

'বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় শব্দ' ও 'বীরভুম জেলার গ্রাম-নাম প্রসঙ্গে' অধ্যাপক ডঃ সত্যনারায়ণ দাস[৭] প্রাচীন দ্রাবিড়, অর্বাচীন দ্রাবিড়, ব্রহুই ও ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষার শব্দ সংগ্রহ করে গ্রাম-নামের উৎস সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। ঐ সকল শব্দে বহু অর্থবোধক গ্রাম-নাম পাওয়া যায়— যাদের সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় কোন সদর্থ হয় না বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্দেশ করা কষ্টকর।

রাঢ়ের মিশ্র অধিবাসীগণের সঙ্গে দ্রাবিড় জাতির সম্পর্কের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। জাতি গঠনের বৈশিষ্ট্যের ন্যায় বহু দ্রাবিড় শব্দও বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। দ্রাবিড় ভাষায় অবস্থান, নৈকট্য ও অভ্যন্তরস্থ বোঝাতে অন্তপদে 'অন্দা' 'অন' বা 'আন' শব্দের সাক্ষাৎ মেলে। 'ণ' ও 'ন' এর ব্যবহার জনিত দোষও অনেক স্থানে দেখা যায়। বেলেন্ডা > বেলেন্দা, খাটুন্দি, কোন্দা, রায়ান, পোতনা, বেলেবাথান ইত্যাদি গ্রাম-নামের অন্তে দ্রাবিড় শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। 'আই' শব্দ যুক্ত গ্রাম-নাম দক্ষিণ ভারতের ন্যায় বর্ধমানেও রয়েছে, যথা,—দোনাই (পুর), বনসাই, চাঁচাই, কোন্দাই ইত্যাদি। অষ্ট্রিক ভাষার ন্যায় দ্রাবিড় ভাষার পদের অন্তে 'আড়া' বা 'আরা' শব্দের ব্যবহার আছে ; বর্ধমানে রয়েছে সুন্দিয়ারা, দৈয়ার, আড়া, বামুনাড়া, মালিয়ারা প্রভৃতি গ্রাম-নামে। সংস্কৃত ভাষায় 'পুর' অর্থে নগরকে বোঝায়। কিন্তু দ্রাবিড় ভাষায় 'ইর' বা 'ইরা' অর্থ হল গ্রামের সমার্থক। 'ইর' বা 'ইরা' কালক্রমে রাঢ়ের গ্রাম-নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'পুর'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। অধ্যাপক স্লিভ্যান লেভীর মতে[৮] প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষার 'কুর' শব্দের অর্থ হল গ্রাম বা নগর। সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে ওড়িষা ও রাঢ়ে কুর শব্দটি অন্তে যুক্ত হয়ে 'পুরে' রূপান্তরিত হয়েছে। তাই বর্ধমানের গ্রাম-নামের অন্তে 'পুর' শব্দে এত আধিক্য দেখা যায়। 'ওনা' শব্দটি হল দ্রাবিড় ভাষায় ব্যবহৃত স্থান-বাচক বিভক্তি ; তাই বর্ধমান জেলার গ্রাম-নামের অন্তে 'ওনা' শব্দ যুক্ত আছে, আমবোনা জামবোনা = জামবন, ইরকোনা, করকোনা, কিশোরকোনা, রাকোনা প্রভৃতি গ্রামের নামের সঙ্গে।

বাংলা ভাষায় 'কর' শব্দের অর্থ হল 'হাত'। অতএব মানকর, গুসকরা, পাইকরা, বরাকর প্রভৃতি গ্রাম-নামের শব্দার্থ জানতে হলে দ্রাবিড় শব্দের মধ্যে সন্ধান করতে হবে। 'বরাকর' স্থান নামটির বাংলা ভাষায় কোন অর্থ হয় না। কিন্তু দ্রাবিড় ভাষায় 'বর' অর্থে বন্ধ্যাভুমি বা প্রস্তরময় স্থান এবং কর, করা বা করই শব্দের অর্থ হল নদী-তীর। তাহলে বর ও কর যোগ করলে নদীতীরে অবস্থিত প্রস্তরময় বা বন্ধ্যা ভুখণ্ডকে বোঝায়। গলসী থানায় হিট্টা নামক একটি গ্রাম আছে। দ্রাবিড় ভাষায় 'হিট্টি' শব্দ হতে গ্রাম-নামটি উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যদি গ্রামটি অর্বাচীনকালের হয়, তাহলে

'হাটী' উপাধিকারী লোকের বসবাসের জন্য নামোৎপত্তি হতে পারে। বানানের তারতম্য ঘটায় বা অশুদ্ধ উচ্চারণের ফলে 'ড'-এর স্থলে 'দ' ব্যবহৃত হচ্ছে, যথা 'অম্লদহি'র প্রকৃত উচ্চারণ হল অম্লডিহি। আচার্য সুনীতিকুমার 'ড়া' অন্ত গ্রাম-নামকে দ্রাবিড় ভাষার শব্দ বলে অনুমান করেছেন। তাহলে বর্ধমান জেলার দামড়া, ছোড়া, আমড়া, বহড়া, সড়া, তিলাড়া ইত্যাদি গ্রাম-নামগুলি দ্রাবিড় ভাষার নিকট ঋণী। আবার উচ্চারণ দোষে 'ড়া' অনেক স্থলে 'রা'-এ রূপান্তরিত হয়েছে—এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অন্তে 'তা' শব্দ যুক্ত গ্রাম-নামগুলির সঙ্গে এককালে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগসূত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যথা,—জাকসতা, সুপ্লাতা, সানতা, মহতা, চাকতা, নাহাতা ইত্যাদি। বৈষ্ণব সাহিত্যে 'কুণ্ড' অর্থে জলাশয়। বর্ধমানে রয়েছে কোলকুণ্ডা, কাঁকরকুণ্ডা, উলকুণ্ডা, ভুরকুণ্ডা, নামক গ্রামসমূহ। কুণ্ডা শব্দের প্রাচীন ব্যবহার রয়েছে দ্রাবিড় ভাষায়। অর্বাচীন দ্রাবিড় ভাষায় 'কুড়ি' অর্থে ঘর—আর ঘরের সমষ্টি হল গ্রাম। বাংলার কুঁড়েঘর শব্দটি কি দ্রাবিড় ভাষা হতে এসেছে? বর্ধমান জেলায় 'কুড়ি' শব্দ অন্তে যুক্ত হয়ে সরকুড়ি, চিনাকুড়ি, বাথকুড়ি, কুড়াল প্রভৃতি গ্রামের নামকরণ করা হয়েছিল।

বর্ধমান শহরের নামোৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত প্রকাশিত হয়েছে (প্রথম খণ্ডের প্রাচীন পর্ব দ্রষ্টব্য)। তম্মধ্যে, 'বর্দ্ধতে ইতি বৃধ-বৃদ্ধৌ শানচ্' অর্থাৎ 'বাড়ছে এই অর্থে' জনপদটির অধিবাসীগণের শ্রীবৃদ্ধি বর্ধন করতে সক্ষম বলে স্থানটি 'বর্ধমান' নামে প্রসিদ্ধ। আবার অন্য মতে ২৪তম বা শেষ তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরের এখানে আগমনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় স্থানটি 'বর্ধমান' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। জৈন শাস্ত্রে বর্ধমানের প্রাচীন নাম ছিল 'অস্থিক গ্রাম', যেখানে বর্ধমান মহাবীর দ্বাদশতম বর্ষাকালটি অতিবাহিত করেছিলেন। কোষগ্রন্থে এরণ্ড (ভেরেণ্ডা বা রেড়ী) বা নারঙ্গ বৃক্ষকে 'বর্দ্ধমান' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে 'নারঙ্গ' বৃক্ষের উল্লেখ আছে। 'এরণ্ড' বৃক্ষ এখনও যত্রতত্র দেখা যায়। কিন্তু 'নারঙ্গ' শব্দের অর্থ হল কমলালেবু, যা সেকালে আবহাওয়াজনিত কারণে এই অঞ্চলে না থাকার সম্ভাবনাই অধিক ছিল। কিন্তু 'নাগরঙ্গ' (নাগ কেশর) শব্দ হতে 'নারঙ্গ' শব্দ জাত হলে 'বর্ধমান' স্থান নামটির ক্ষেত্রে এরণ্ড বা নারঙ্গ বৃক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের একটা ক্ষীণ সূত্র মিলতে পারে।

জাতিবাচক আদ্য পদে ব্যবহৃত বর্ধমান জেলার গ্রাম-নামে কোল বা দ্রাবিড় জাতি হতে সৃষ্ট উপজাতীয় গোষ্ঠীর বসবাসের প্রমাণ রয়েছে। এরূপ জাতি বা উপগোষ্ঠী বসবাসের গ্রামগুলি হল—দামিনবেড়িয়া, সড়কডিহি<সরকডিহি, কোটাডি< কোটালডিহি, ডোমরা, কোটালপুকুর, বাঘবাটি, ডোমবন্দী, কয়রাপুর, করাতিয়া, সাহাপুর, লোহাপুর, লোহার, হাড়িয়া, মালকিতা, কেওতসা<কেওটসা, কোটালঘোষ, দলুইপুর, কুমারপাড়া, কুমোরপাড়া, কুমডাঙ্গা<কুমীডাঙ্গা, মালডি, মালডাঙ্গা, কন্দ<কোন্দা ইত্যাদি। ভাতাড় থানার মাহাতা গ্রাম যদি মহত্তরণ অর্থে প্রযুক্ত না

হয়ে থাকে তাহলে মহতরী (লোহার উপগোষ্ঠীর সমপর্যায়ভুক্ত) নামক উপজাতীয় কামারদের বসবাসের স্থানকে নির্দেশ করছে বলে অনুমান করা যায়। আবার বনপাস-কামারপাড়ার কর্মকার পরিবারের আদি উপাধি ছিল মাহাত্মা (মাহাত?)। ধর্মস্থান বা দেবদেবীর নামের সঙ্গে যুক্ত গ্রাম-নামের নিদর্শন মেলে প্রচুর, যথা—কীর্তনখোলা, রাধাবল্লভপুর, শ্যামডিহি, বাসুদেবপুর, দেবীপুর, কল্যাণেশ্বরী, দামোদরপুর, শঙ্করপুর, চণ্ডীপুর, জগন্নাথপুর, ইন্দ্রাণী, ধর্মসিমলা, ধর্মপুর, রসুলপুর, শাঁকাই, বোড় বলরাম ইত্যাদি। এছাড়া শিব, রাধা ও কৃষ্ণের নামের সঙ্গে যুক্ত গ্রাম-নামের সংখ্যাও প্রচুর। ব্যক্তি-নাম, উপাধি, সংখ্যাবাচক, রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্পর্কিত নামের সংখ্যাও নেহাৎ স্বল্প নয়। তবে লোকসংস্কৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে এই সকল নামের তত গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় না। মধ্যযুগে মুসলমান জনবসতির প্রমাণ মিলছে গ্রাম-নামে, যথা,—মামুদপুর, জামালপুর, সেলিমাবাদ, শিলামপুর, নুরপুর, সিরাজপুর, আমিরপুর, ইছলাবাদ ইত্যাদি। মহব্বতপুরের পরিচিতি হল একালের মেমারী গ্রামের। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলে উল্লিখিত 'মামুড়ী' বৃক্ষ হতে মেমারী স্থান-নাম রূপে চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। প্রাচীন বাদশাহী রাস্তার ধারে সরাইখানা স্থাপনের নিদর্শন রয়েছে সরাইটিকরী নামের মধ্যে এবং ঐ একই রাস্তার উপর মোগল সৈন্যের ওড়িষা অভিযানের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মোগলমারী (মারী=পথ) আজও বিখ্যাত হয়ে আছে।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ২৬৭৯টি মৌজা / গ্রামের সামগ্রিক ব্যুৎপত্তি আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বা উদ্দেশ্যও নয়। এই জেলার লোকসংস্কৃতির প্রাচীন ধারাকে জানতে হলে বা আলোচনা করতে হলে গ্রামীণ বসতি ভূগোল সম্পর্কে একটা ধারণা সৃষ্টির জন্য গ্রাম-নাম আলোচনার অবতারণা করা হল। এ বিষয়ে আরও কয়েকটি অর্থবোধক শব্দের উল্লেখ করলে সাধারণভাবে আলোচনাটির সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। সংস্কৃত বা আর্য শব্দ ব্যবহারের দ্বারা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করা যায়, কিন্তু ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি আলোচনায় ক্ষেত্রে এটি হল সত্যকে চাপা দেওয়ার অপচেষ্টা মাত্র। গ্রাম-নামের ক্ষেত্র কিছু অর্থবহ শব্দ নিম্নে দেওয়া হল,—

কড্যা—কুই ভাষায় কড্ডাতি অর্থে নদী।

কাপিস্টা—কাপুস+হিস্টা অর্থে কাপুসদের বাসস্থান।

কুইটা—কুই জাতির গ্রাম।

কুরুম্বা—কুরুম জাতির বাসস্থান।

কোন্দা—কন্দ জাতির বাসভূমি।

গণপুর—দ্রাবিড় ভাষায় গণ অর্থে তৈল ব্যবসায়ী।

লগর—হোজাতির বাসভূমি (গ্রাম)।

করিধ্যা < করিধা=নদীতীরবর্তী স্থান।

পাই=শাখানদী (দ্রাবিড়)।

কর = নদীতীর (দ্রাবিড়)।
কাট = নদীতীর।
গড়গড়ে = জলবাচক 'গড়' শব্দের দ্বিত্ব-প্রয়োগ।
কামরা = বিস্তীর্ণ প্রান্তর বা চাষযোগ্য স্থান।
পলসা = কাঁকর অধ্যুষিত ক্ষেত্র।
কুল = পাথরের বাড়ী।
টিকর = উঁচু বসতি।
সেরান্দি = জলপ্রবাহের কাছে অবস্থিত গ্রাম।
সুরুল = জলের নিকটে অবস্থিত গ্রাম।
পাটুলি = পাট + উলি ঃ পাট = বন ; উলি = গ্রাম।
আর = জল ও পাথর দুই নির্দেশ করে (দ্রাবিড় ও বাস্ক ভাষা)।
ভুংরা = ছোট পাহাড় (অস্ট্রিক)।
পারু = জল (দ্রাবিড়)।
গর, গল = নদীতীরবর্তী স্যাতসেঁতে স্থান।
তাল = জলাশয়।
সি = সূর্য
সির = জল

'ডি' বা 'ডিহি' অন্ত পদে থাকলে সাধারণত সাঁওতালী ভাষায় ছোট গ্রামকে বোঝায়। আবার মুসলমান আমলে ডিহিদার শব্দ হতে উৎপন্ন 'ডিহি' অর্থে বিশেষ গ্রামের নামকে বোঝায়। অম্লদহি = আমলাদহি = আমলাডিহি (১) বনবিরডি (২) ধানুডি (২) মুচিডি (২) মাঝলাডি (২) মালডি<মালডিহি (২) জামালডি (৩) মাহাতাডি (৩) মাহুতডি (৩) ভালডি (৪) চাপরাডি (৪) জামডিহ (৪) সরকাডি<সরকাডিহি (৫) কোটালডি (৫) বিরুডিহা (১১) পাথরডিহি (১১) ইত্যাদি।

অস্ট্রিক ভাষার 'ডাঙ্গা' বা 'ডাঙ্গাল' শব্দ বসবাসের স্থানকে বোঝায় ঃ বরাডাঙ্গা (৬), মধুডাঙ্গা (৭), মাঝিডাঙ্গা (১১), মহিষডাঙ্গা (১৭), বালসিডাঙ্গা (১৬), ব্রহ্মডাঙ্গা (২৩), কাটান্দিডাঙ্গা (২৩), আমডাঙ্গা (২২), চরকডাঙ্গা (২৭), হুড়কোডাঙ্গা (২৭), শিমুল ডাঙ্গা (২৬), পারুলডাঙ্গা (২৬), বাঘডাঙ্গা (২৫), কোয়েলডাঙ্গা (২৫), কুলডাঙ্গা (২৫), মালডাঙ্গা (২৭) ইত্যাদি।

অস্ট্রিক ভাষায় 'বাঁধ' শব্দের অর্থ জলাশয়—বাঁধ শব্দযুক্ত গ্রাম নামগুলি হল,—রাজবাঁধ (১৩), বাবুর বাঁধ (১৫) বাঁধমুড়া (২২) বাঁদরা (২২) বাঁধগাছি (২৫) ইত্যাদি।

'দা' শব্দের অর্থ জল—জলের ধারে গ্রাম-নামের শেষে 'দা' বা 'দহ' থাকলে জলের ধারে অবস্থিত গ্রাম বোঝায়—বসুদা (১৬), নওদা (নূতন জলের স্থান ঃ ১৬), চকদা (২৪), চাকদহ (২৩) নাদাই (২৫), নওদা (২৫), নওদা (১৫) ; শিবদা (১৫) ইত্যাদি।

'মুড়া' শব্দটি মুণ্ডার অপভ্রংশ—গ্রাম নামের শেষ পদে মুড়া বা মুড়ি থাকলে

মুণ্ডা জাতির বসতি স্থান বলে অনুমান করা যায়,—বারমুড়ি (১) মহিষমুড়ি (২) নরসমুড়া (৫) চকমুড়ী (১৪) ছোটমুড়ী (১৪) বাঁধমুড়া (২২) জেমরী [যদি জাম+মুড়ী হয় তাহলে মুণ্ডা শব্দ জাত] (৮) ইত্যাদি।

ডঃ অমলেন্দু মিত্র সাঁওতালী ভাষায় দুবরাজ[৯] (দুরোজ) নামক এক রকম ধানের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর মতে এই বিশেষ শ্রেণীর ধানের উৎপাদনের জন্য দুবরাজপুর গ্রাম নাম হয়েছে। কাঁকসা থানার দুবরাজপুর গ্রামে (৯) হয়ত অতীতে সাঁওতালরা 'দুবরাজ'ধানের চাষ করত।

(৫)

বর্ধমান জেলায় গ্রামনামের সঙ্গে ব্রাহ্মণ বসতির সম্পর্ক বহুকাল ধরে চলে আসছে। তাই বামুন-গ্রাম, ব্রাহ্মণ-গ্রাম, ব্রাহ্মণ-ডিহি, বামুনাড়া, বামুনপুকুর, বামুনা, বামুনিয়া, বামুন-আড়ী, বামুন-ডিহ, বামুনডি, ব্রাহ্মণগড়িয়া, বামুনপাড়া, বামনে ইত্যাদি নামে চিহ্নিত গ্রামগুলি ব্রাহ্মণ বসতির প্রতি ইঙ্গিত করছে। সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের বসতির জন্য সাতসৈকা পরগণার নামকরণের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাঢ়ীর ব্রাহ্মণদের বসতি ইতিহাসের সঙ্গে বর্ধমানের গ্রাম নামের সম্পর্ক সুদীর্ঘকালের। বাচস্পতি মিশ্র ও হরি মিশ্রের কারিকায় উল্লেখ আছে যে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ ৫টি গোত্রে বিভক্ত ছিল (শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, সাবর্ণ ও বৎস গোত্র) এবং তাঁদের বসবাসের জন্য ৫৬টি গ্রাম নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। স্ব স্ব গ্রামের নামানুসারে গ্রামী বা 'গাঁঞী'র উৎপত্তি হয়েছে। বংশীবিদ্যারত্ন—সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা গ্রন্থে আছে,—

> "ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরস্য সুতেন চ।
> ক্রিয়ন্তে গাঁঞী সংজ্ঞানি তেষাং স্থান বিনির্ণয়াৎ॥'

কুলকারিকা অনুসারে বর্ধমান জেলায় গাঁঞীর সংখ্যা ২৪টি এবং যিনি যে গ্রামে বসবাস করেন তিনি সেই গ্রামী বা গাঁঞী আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কালক্রমে এটি তাঁদের বংশধরগণের উপাধিস্বরূপ গণ্য হয়েছে। বর্ধমানের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব গাঁঞী নাম যোগ করে পূর্বপুরুষগণের আদি বাসস্থানের পরিচয় বহন করছেন। এ বিষয়ে আংশিকভাবে অনুসন্ধান ও অনুমানের ভিত্তিতে গ্রাম-নামের পরিচয় নিম্নে আলোচিত হল,[১০]—

বর্ধমান জেলায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের বসবাসের (গাঁঞীর) বিবরণ

গাঁঞী	গ্রাম	অবস্থান
বন্দ্য	বন্দ্যঘাটি	বর্ধমান হতে ২২ কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্বে
কুলভি	কুলভ	কুলে—খণ্ডঘোষ থানা
কুসুমকুলি	কুসুমকুল	সম্ভবতঃ মন্তেশ্বর থানার কুলে ও কুসুমগ্রাম

কুশারী	কুশ	বর্ধমান থানার কুশ গ্রাম
বোকট্টাল	বোকড়া	রায়নার নিকট
ডিংসাই	ডিংসা	আউসগ্রাম থানার দিয়াসা
রায়ী	রায়	মন্তেশ্বর থানার রাইগ্রাম
পালধি	পালিতিয়া	কেতুগ্রাম থানার পালিটা
পালিয়াল	পালি	মঙ্গলকোট থানার পালি গ্রাম
চট্ট / চাটুতি	চাটতি	সম্ভবতঃ বর্ধমান থানার চাণ্ডুতিয়া
পোষলী	পোষেলা	মঙ্গলকোট থানার পোষলা
হড়	হড়গ্রাম	ভাতাড় থানার হাঁড়গ্রাম
আম্বলী	আমরুলী	ভাতাড় থানার আমারুণ
মুলী	মুলগ্রাম	মন্তেশ্বর থানার মুলগ্রাম
বাপুলি	বাপুলা	মঙ্গলকোট থানার বাকুলিয়া / বাকলসা
হিজুলী	হিজল	সম্ভবতঃ রায়না থানার হিজলনা
চতুর্থী	চোৎ	মেমারী থানার চোৎখণ্ড
কাঞ্জিলাল	কাঞ্জি	কেতুগ্রাম থানার খাঁজি
শিম্বুলি	সিমুল	বর্ধমান শহরের নিকট হাটসিমুল
গাঙ্গোলী	গাঙ্গুল	মেমারী থানার গাঙ্গুয়া
কুন্দলাল	কুন্দ	মঙ্গলথানার কুঁদো গ্রাম
নন্দীয়াল	নন্দি	কাটোয়া থানার নন্দীগ্রাম
সিহাড়ী	সিহড়া	রায়না থানার সেহাড়া
নাঞাড়ী	নায় / নব	কেতুগ্রাম থানার নবহট্ট / নৈহাটী

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উল্লিখিত না হলেও আরও কয়েকটি গ্রাম-নামে প্রাচীন ব্রাহ্মণ বসতি সম্পর্কের কথা অনুমান করা যায় যথা,—

পতিতুণ্ডী গাঁঞী হতে পুতুণ্ডা, কিশোরকোণী গাঁঞী হতে কিশোরকোনা, সিন্ধল গাঞী হতে সিন্ধল গ্রাম (অপভ্রংশে শীতলগ্রাম) পলসা গাঁঞী হতে পলাশী, মহন্তী গাঁঞী হতে মহতা, শিম্বুল গাঁঞী হতে শিমুলিয়া ইত্যাদি। বর্ধমান জেলায় বৈদ্য জাতির বসবাসের সঙ্গে একটি বিশেষ গ্রামের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে। বৈদ্য জাতির বসবাসের জন্য শ্রীখণ্ডের প্রাচীন নাম ছিল বৈদ্যখণ্ড। শ্রীখণ্ড গ্রামের বৈদ্যবংশীয় একটি গোষ্ঠী অণ্ডালের নিকট দক্ষিণখণ্ড গ্রামে বসবাসের ফলে বৈদ্যপ্রধান গ্রামে পরিণত হয়েছে। আবার বৈদ্যবংশীয় রাজা কিঙ্করমাধব সেনের বাসস্থান বলে কথিত বৈদ্যপুর গ্রামে একালে একঘর বৈদ্যও বসবাস করেন না।

বর্ধমান জেলার গ্রাম-নামের ব্যুৎপত্তি ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করলে 'অতীতের অন্ধকারময় জগতে আলোকপাত করতে সমর্থ হয়'। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষায়

ব্যবহৃত শব্দসঙ্কলন ও তার প্রয়োগে কেবলমাত্র ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়ে ভাষা দু'টির তাৎপর্য শেষ হয় নাই। গ্রাম-নামগুলিকে অযথা সংস্কৃত-রূপ না দিয়ে আদিরূপের ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা থাকলে নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ও সংস্কৃতির আলোচনার ক্ষেত্র হবে অত্যন্ত অর্থবহ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গ্রাম-নামের ব্যুৎপত্তি জানা যাবে ব্যবহৃত ভাষা থেকে—আবার ব্যবহৃত ভাষার মাধ্যমে অধিবাসীগণের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় জানা যাবে। জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় ভাষাও মিশ্র হয়েছে। তাই উপসংহারে আচার্য স্নুনীতিকুমারের মন্তব্য উল্লেখ করে বলা যায়,[১১]—'বাঙলাদেশে দ্রাবিড়-কোল-আর মোঙ্গোলভাষীদের সমাবেশ কি রকমভাবে ছিল, তার এক রকম মোটামুটি ধারণা ক'রতে পারি বটে—কোলেরা প্রায় সমস্ত দেশটি জুড়ে ছিল, দ্রাবিড়েরা বেশীর ভাগ পশ্চিমবঙ্গে, আর মোঙ্গোলেরা ছিল পূর্ববঙ্গে আর উত্তরবঙ্গে এইরূপই অনুমান হয়'। গ্রামীণ সংস্কৃতির আশ্রয়স্থল হল গ্রামে আর প্রাচীন গ্রামের আদি জনবসতির স্মৃতিচিহ্ন তথা পরিচয় বহন করছে 'গ্রাম-নাম'-এর মধ্যে।

(৬)

গ্রাম ও গ্রামীণ জনবসতি হল রাঢ়ীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিস্থল। কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জনবসতি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম পত্তনের ইতিহাস জড়িত। কিন্তু গ্রামের বসতি ইতিহাসের ধারা হতে গ্রাম পত্তনের প্রাচীনতা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। অধিকাংশ স্থলে প্রমাণাভাব দেখা যায়। সেকারণে বর্ধমান জেলার ২৬৭৯টি মৌজার পত্তনের কালনির্ণয় করা সম্ভবপর নয় এবং বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্যও তা নয়। কেবলমাত্র তাম্রশাসন, প্রত্নতত্ত্ব, পুরাকীর্তি, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, তন্ত্রশাস্ত্র, পুরাণ ও মধ্যযুগের সাহিত্যে বর্ণিত জনবসতির তালিকা নির্ণয় করা সম্ভবপর হলে প্রাচীন গ্রামের উল্লেখ বা নিদর্শন জানা যাবে। অবশ্য এর জন্য কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভরশীল হওয়ারও প্রয়োজন আছে। আবার বহু গ্রাম হয়ত ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ঐ স্থানে প্রাচীন গ্রাম-নামকে পাথেয় করে নূতনভাবে গ্রাম পত্তন করা হয়েছে। গ্রাম-নামটি প্রাচীন হলেও প্রাচীনত্বের কোন নিদর্শন নাই। যেমন কাটোয়া, পাটুলি ও পূর্বস্থলী গ্রামের প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া গেলেও প্রাচীনত্বের কোন নিদর্শন দেখা যায় না। ভাগীরথীর বন্যায় এই সকল স্থান বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রাচীনত্বের সকল নিদর্শন ধ্বংস হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে বর্ধমান শহর ও দামোদরের তীরবর্তী গ্রামসমূহের একই পরিণতি ঘটেছিল। একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন গ্রামের প্রাচীনত্বের উল্লেখ জানা গেলেও গ্রামটি উল্লেখপঞ্জী বা মুখ্য প্রমাণের বহু পূর্বে তৈরী হয়েছিল। কোন গ্রাম পরবর্তীকালের সাহিত্যে বর্ণিত হলেও গ্রাম পত্তন তার বহু পূর্বে হয়েছিল; এরূপ অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পঞ্চদশ শতকে রচিত সাহিত্যে 'ইন্দ্রাণী' নামক স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু এই স্থানে ইন্দ্রেশ্বর শিবের মন্দির নির্মিত হয়েছিল একাদশ-দ্বাদশ শতকে। একালের

বাঘনাপাড়ার ইতিহাস ষোড়শ শতকে শুরু হলেও এই স্থানে একমুখলিঙ্গ সদাশিব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেন রাজাদের আমলে। অবশ্য আদি স্থান-নামের পরিচিতি আজ অজ্ঞাত।

খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে বর্ধমান জেলায় গ্রামীণ সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল এবং এর প্রাচীনতম প্রমাণ মেলে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে বা পাণ্ডুক গ্রামে। তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার ধারক ও বাহকরূপে মঙ্গলকোট, বড় বেলুন, ভরতপুর, সাঁওতালডাঙ্গা, বসন্তপুর, এরুয়ার, পাচুন্দি, শ্রীপুর-দেপুর, সিলুট, বেরেণ্ডা কাঁটাটিকুরী, অঙ্গদপুর, রানীপোতার ডাঙ্গায় গ্রামীণ সভ্যতার পত্তন হয়েছিল।[১২] প্রাচীন নাম অজ্ঞাত হলেও, স্থানটি নিঃসন্দেহে প্রাচীন। জৈন কল্পসূত্রে বর্ণিত আছে যে, বর্ধমান মহাবীর চতুর্মাস্য পালনের সময় অস্থিক গ্রামে এসেছিলেন এবং জম্ভক গ্রামে মহাবীরের কৈবল্য লাভ হয়েছিল। অনেকের মতে জম্ভক গ্রাম ও অস্থিক গ্রাম হল একালের জামগ্রাম ও বর্ধমান শহর। অগ্রদ্বীপে এমন কোন প্রাচীন নিদর্শন মেলে না যে, গ্রামটিকে পুরাতন গ্রামরূপে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে (৬।৩।৯৮) অগ্রদ্বীপের উল্লেখ আছে। তেলপত্ত জাতকে বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধদেব সুহ্ম জনপদের অন্তর্গত 'দেশক' নামক স্থানে এসেছিলেন। অরিয়ণের বিবরণে 'অন্দেমাটিস', 'কটদুপা' 'অম্যাস্টিস' ও টলেমী বর্ণিত 'অগনগর'কে উইলফোর্ড ও সেণ্টমার্টিন দামোদর, কাটোয়া, অজয় ও অগ্রদ্বীপ নামে সনাক্ত করেছেন। প্লিনি বর্ণিত পার্থেলিস হল, সেণ্টমার্টিনের মতে একালের বর্ধমান শহর। আবার ৬ষ্ঠ শতকে রচিত 'কুব্জিকাতন্ত্রে' (৭ম পটল) বর্ধমান, অম্বিকা ও ক্ষীরগ্রাম নামক সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে। 'মহাপীঠ নিরূপনম্' গ্রন্থে বহুলাপীঠ (কেতুগ্রাম) ও বৃহদ্ধর্মপুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র মঙ্গলকোষ্ঠ বা মঙ্গলকোটের উল্লেখ আছে।

গলসী থানার অন্তর্গত মল্লসারুল গ্রামে মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছিল। মল্লেশ্বর শিবের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র মল্লসারুল গ্রামের প্রাচীনত্ব জানা না গেলেও গোহগ্রাম, বাকতা, কড়ড়ে, আদড়া, কইতারা, খাঁড়জুলি, মওড়া, সিমলাড়া ও বিজুর গ্রামের অস্তিত্ব ছিল অন্ততঃপক্ষে ষষ্ঠ শতকে, এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।[১৩] হরিকেলরাজ কান্তিদেবের চট্টগ্রাম লিপি ও হর্ষবর্ধনের বাঁশখেড়া লিপিতে উল্লিখিত বর্ধমানপুরকে পণ্ডিতেরা 'বর্ধমান' শহররূপে চিহ্নিত করেছেন।[১৪] তা'হলে বর্ধমান শহরের প্রসিদ্ধি ছিল খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক হতে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্ত। মনে হয় সেসময়ে শহরের অবস্থিতি ছিল বাঁকা নদী ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে—যা একালে কাঞ্চননগর পল্লীরূপে চিহ্নিত হয়েছে। দ্বাদশ শতকে সম্পাদিত বল্লালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে কেতুগ্রাম থানার নৈহাটী-সীতাহাটী গ্রামে। এই গ্রামদ্বয়ের প্রাচীনতা জানা না গেলেও শাসনোক্ত বালুটিয়া, খাড়ুলিয়া, অম্বলগ্রাম, মুরুন্দী ও মুর্শিদাবাদ জেলার জলসোথী গ্রামের অস্তিত্ব অন্ততঃ পক্ষে দশম-একাদশ শতকের পূর্বে ছিল বলে মনে করা যায়।[১৫] নৈহাটী বা নবহট্ট ও

শিখরভূমের উল্লেখ আছে শ্রীজীব গোস্বামীর 'লঘু বৈষ্ণবতোষণী' নামক গ্রন্থে। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' উল্লিখিত ঢেক্করী ও উচ্ছাল হ'ল একালের ঢেকুর ও উচালন গ্রাম। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের—"প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্" নাটকে বর্ণিত রাঢ়াপুরীর অবস্থিতি ছিল সম্ভবতঃ দুর্গাপুরের নিকট একালের আড়াগ্রামে। ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসনে বর্ণিত গাল্লিটিপ্যাক দিগঘা, সোদিকাকে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গতিষ্ঠা, দিঘা ও সোয়ারা নামে সনাক্ত করেছেন।[১৬] ভোজ বর্ম্মণের বেলাভ তাম্রশাসনে ও ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিলিপিতে সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ আছে,[১৭]; অনেকের মতে সিদ্ধল গ্রামের অবস্থিতি হ'ল বীরভুম জেলায়, আবার অনেকে গ্রামটি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত শীতলগ্রাম বলে দাবী করেন।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে কুলীন গ্রাম, বেড়ো ও গরুটির উল্লেখ আছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, গ্রামগুলির অস্তিত্ব পঞ্চদশ শতকের পূর্বেই ছিল। ষোড়শ শতক ও পরবর্তীকালে রচিত বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থ হ'তে বহু প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম জানা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, আমাইপুর (রামাইপুর), আকাইহাট, আউড়িয়া, ওকড়সা, উজানি—কোগ্রাম, কুলাই, কাঞ্চননগর, করন্দা, কানাইডাঙ্গা, কুড়ুম্বা, কড়ুই, কাজলিগ্রাম, কাঁদড়া, কেশবপুর, কৈয়র, জাহ্নগর, জাজিগ্রাম, ঝামটপুর, চাঁপাহাটী, নিত্যানন্দপুর, নান্নাপুর, নবগ্রাম, বেলগ্রাম, বড় বেলুন, বিদ্যানগর, ব্রাহ্মণীতলা, বাঘনাপাড়া, বড়ডাংগা, গলিগ্রাম, বিশ্রামতলি, পূর্বস্থলী, পারুলিয়া, পাড়ালগ্রাম, পাতুন, পাতাইহাট, পালিগ্রাম, পুটস্যুরি, প্যারী-গঞ্জ, পাঁচড়া, পলিসিট-ভৈটা, মামগাছি, মহৎপুর, মতিসর, মোস্থলি, রুদ্রডাঙ্গা, শীতলগ্রাম, সমুদ্রগড়, সর, শিংগার,-কোন, শেরগড়, দধিয়া, দেনুড়, তাঁকপুর, দক্ষিণখণ্ড, ইছাপুর, উদ্ধারণপুর, ধাত্রী-গ্রাম ইত্যাদি গ্রামের নাম উল্লেখ আছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের উল্লেখ হতে জানা যায় যে, অন্ততঃপক্ষে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতকে বা তার পূর্বেও গ্রামগুলির অস্তিত্ব ছিল। কারণ অতীতের কোন খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি না থাকলে ষোড়শ শতকের রচিত গ্রন্থে এগুলি স্থান লাভ করত না।

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান" গ্রন্থের রচয়িতা কবি কাশীরাম দাস ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রথম চারি পর্বের রচনা সমাপ্ত করেন। কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর বর্ণিত স্বীয় বংশ পরিচয় প্রসংগে জানা যায় যে, তাঁর ঊর্ধ্বতন দশম পুরুষ দৈত্যারিদেব সিংগি গ্রামে বসবাস শুরু করেন—তাহলে সিংগি গ্রামের অস্তিত্ব চতুর্দশ শতকে ছিল বলে ধরা যায়। ১৫৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ হ'তে জানা যায় যে, ইন্দ্রাণী, সাতসৈকা, ছুটিপুর, রায়না, বর্ধমান, ভুরকুণ্ডা ভাতছালা, ধেঞা, বাঘা, আজমৎশাহী, খাড়গ্রাম, খণ্ডঘোষ, মনোহরশাহী, চম্পানগরী, শেরগড়, সমরশাহী, নামক পরগণা ও পরগণার সদর কার্যালয় ছিল। গোপভূম, শিখরভূম ও সেনপাহাড়ীর ইতিহাস বহুকালের। এতদঞ্চলে গোপভূম রাজবংশের ইতিহাসের সংগে অমরারগড়, ঢেকুরগড়, শ্যামারূপার

গড়, সুয়াতা, ভাল্কি, দিগনগর, কাঁকসা, পানাগড়, ও ভরতপুরের সম্পর্ক জড়িত আছে। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে রচিত বিপ্রদাস পিপল্লাইয়ের 'মনসাবিজয়' কাব্যে চম্পকনগর, হাসননগর (হাসানহাটি), উজানি, শাঁখাই, কাটোয়া, ইন্দ্রাণী, অম্বুয়া ইত্যাদি স্থান-নামের সঙ্গে অজয় ও শিবা নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-এ মৃতপতি সহ কলার মান্দাসে বেহুলার যাত্রাপথে দুবরাজপুর (থানা কাঁকসা), নবখণ্ড, বাঁকা—দামোদর জুজুটী, গোবিন্দপুর, বর্ধমান, গাঙপুর, দৌলিবাজায়, কেজা, আমাদপুর, শিয়ালা, দেপুর, ওসমানপুর, কোদালিয়া, হাসানহাটি, গেগরঘাটা, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর অতিক্রম করার পর ত্রিবেণীর ঘাটের উল্লেখ আছে। ষোড়শ শতকের কবি ক্ষেমানন্দের জন্মস্থান কাঁথড়া বা কাঁকসা হল একটি প্রাচীন গ্রাম। রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে জাড়গ্রাম, গাবপুর, শালেপুর, শ্রীরামপুর, গোতান, কামালপুর, দিগনগর, এড়াল, বাহাদুরপুর, মোগলমারি, আমিলা, উচালন, রাজঘাট, বর্ধমান, কর্জনা, ঢেকুরের উল্লেখ আছে। শাহ সুজার সমসাময়িক কবি রূপরাম চক্রবর্তী আরও উল্লেখ করেছেন,—

"নহে জৌগ্রাম চল, কনাদের ঠাঁই।
তার সম ভট্টাচার্য শান্তিপুরে নাঞি॥"

কাইতি সম্পর্কে কবি বলেছেন,—

"কাইতি চাপিয়া বন্দ বাণরাজার পাট।"

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে বর্ণিত গৌড়যাত্রার পথটি তিনি রূপরামকে অনুসরণ করে বর্ণনা করেছেন। কবি মুকুন্দ মিশ্র রচিত বাসুলীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত গ্রামগুলির অবস্থিতি ছিল দামোদর বা কানা দামোদরের তীরে। জলপথে এই গ্রামগুলির যোগাযোগ ছিল এবং গ্রামগুলিতে গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল বলে জানা যায়। ধুসদত্তের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে কাঞ্চননগর বড়শুল জামদহ, বেড়ুগ্রাম, রুক্মিণী মহুলা ও মাধবপুরের উল্লেখ আছে। ষোড়শ শতকে রচিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য হ'ল বর্ধমান তথা রাঢ়ের সামাজিক ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থ। ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা উপলক্ষে অজয় ও ভাগীরথীর কুলে অবস্থিত গ্রামগুলির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোন সংশয়ের কারণ নেই। মুকুন্দরাম বর্ণিত স্থান-নামগুলি কবিকল্পিত নয়; এগুলি অতীতেও ছিল—বর্তমানেও আছে।

ধনপতি উজানি-মঙ্গলকোট হ'তে বাণিজ্যযাত্রায় বহির্গত হ'য়ে থানাঘাট, মৌনা, গড়পাড়া, দৌলতপুর, কাঁকড়া, কেওড়সা, কোঁয়ারপুর, বাকুলিয়া, বিল্বেশ্বর, চরকি, অঙ্গারপুর, সোনালিয়া, নবগ্রাম, বেগুনকোলা, শাঁখাই, শিবানদী, উদ্ধারণপুর, নৈহাটী, কাটোয়া, ললিতপুর, মণ্ডলহাট ইন্দ্রাণী, ভাউসিং, বেলনপুর, চণ্ডিগাছা, পূর্বস্থলী, পাড়পুর, অম্বুয়া, অতিক্রম করে ভাগীরথীর প্রবাহপথ ধ'রে আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়েছিলেন। বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণ বসতির ন্যায় গন্ধবণিকগণের

বসবাস বহুকালের। তাই ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে বিভিন্ন স্থান হ'তে আগত বণিকদের সাক্ষাৎ পাওয়ায় যায় উজানিতে—সেকথা কবির ভাষায় উল্লেখ করা গেল ঃ

"বর্দ্ধমান হৈতে বেনে আইসে ধুসদত্ত।
সর্ব্বজনে গায় যার ফুলের মহত্ত্ব॥
চম্পাইনগরে আইসে চাঁদ সদাগর।
সঙ্গে লক্ষ্মী সহোদর চাপিয়া কুঞ্জর॥
কজ্জনার বেণে আইসে নামে নীলাম্বর।
নয় ঘোড়া নয় ভাই অনেক নস্কর॥
গণেশপুরের বেণে সনাতন চন্দ।
তারা দুই সহোদর গোপাল গোবিন্দ॥
আইসে বাসু লা যার বাড়ী দশঘরা।
সেয়াথালার বেণে আইসে শ্রীধর হাজরা॥
সাঁকো হইতে বেণে আইসে নামে শঙ্খদত্ত।
রাত্রি দিন বহে যার আট ঘোড়ার রথ॥
বিষ্ণুদত্ত আইসে গায়ে পামরী আঁচলা।
সাত ভাই আসে তার সাতখানা দোলা॥
কাইতি হইতে আসে যাদবেন্দ্র দাস।
রঘুদত্ত আইসে যার জাড়গ্রামে বাস॥
ফতেপুর বড়শুল গ্রাম মহাস্থান।
তার বেণে আইল হরিদত্ত মতিমান॥
আইসে গোপাল দত্ত তেঘরার বেণে।
রাত্রি দিন চলে বার্ত্তনের কথা শুনে॥
সিতলপুরের দশ ভাই আইল রাম রায়।
কেহ আসে তটেবাঁকে কেহ আইসে নায়॥
রাম দত্ত আইসে যার বাড়ী নাড়ুগাঁ।
পাঁচড়ার বেণে আইল চণ্ডীদাস খাঁ॥
সাতগাঁ হইতে আসে বেণে রাম দাঁ।
বিষ্ণুপুরের বেণে আসে ভাগ্যবন্ত খাঁ॥
বাসু দত্ত আইল যার বাড়ী খণ্ডঘোষ।
কুলে শীলে ব্যবহারে যার নাহি দোষ॥
হালি সহরের বেণে আইল পঞ্চজন।
রাম রঘু রাঘব কেশব জনার্দন॥
গোতনের মধুদত্ত আইসে ছয় ভাই।
মাধব যাবব হরি শ্রীধর বলাই॥

সাধুর শ্বশুর আইল নামে লক্ষপতি।
নানা ধন লয়ে আইসে সাধুর বসতি ॥
একে একে বণিকের কত কব নাম।
সাত শত বেণে আইসে ধনপতি-ধাম ॥"

উক্ত বর্ণনার মধ্যে তেঘরা, সাতগাঁ, সিন্নাথালা ও হালিশহরের অবস্থিতি ছিল বর্ধমান জেলার বাইরে এবং লক্ষপতির নিবাস ছিল উজানিতে। দামিন্যা চণ্ডীবাটি, রত্নানদী, ও চক্রাদিত্য শিবের প্রাচীনতা সম্পর্কে কোন সংশয় নাই। বণিক সমাজের বসবাসের স্থানরূপে সাতগাছিয়া ও শ্রীবাটীর প্রসিদ্ধি বহুকালের।

অষ্টদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত কবি গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'এ-বর্ধমান জেলার বহু প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রামের সন্ধান জানা যায়। স্বাভাবিক কারণে অনুমান করা যায় যে, ঐ সকল গ্রামে ধনী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ বসবাস করত এবং সেকারণে বর্গীরা ঐ সকল গ্রাম লুণ্ঠনের পরে অগ্নিসংযোগ করেছিল। 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'-এ বর্ণিত গ্রামগুলি হল,—বর্ধমান, নিমগাছি, নিগণ, সেড়গাঁ, সিমাইল, চণ্ডিপুর, শ্যামপুর, আনাইল, সাতসৈকা, চাঁদপুর, কাথরা, জামদহ, যদুপুর, ভাটছাল মীর্জাপুর, চান্দড়া, কুড়মন, পলাশি, বেড়া, সমুদ্রগড়, জাহ্নুনগর, মাহাতাপুর, সুলুন্ট, পূর্বস্থলী, পরানপুর, ভাটরা, মন্দারবাটী, সরভাঙ্গা, ধিতপুর, চাঁদড়া, জাহাঙ্গীরাবাদ, কুমিরা, বেলতলি, নিমদহ, কড়ুই, কৈথন, চাণ্ডুল, সিঙ্গি, বাক্সা, ঘোড়ানাশ, মুস্থুল, গোটপাড়া, চাঁদপাড়া, অগ্রদ্বীপ, পাটুলি, আতাইহাট, পাতাইহাট, বেড়া, ভাউসিংহ, বিকিহাট, কাগ্রাম, নৈহাটী, উদ্ধারণপুর, কাটোয়া, মাঙ্গনপাড়া, কামনগর, মহুলা, চৌরিগাছা, কাঁঠালিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

বর্ধমান রাজবংশের আদিপুরুষ সঙ্গম রায় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বল্লুকা বা ভল্লুকা নদীর তীরে বৈকুণ্ঠপুরে বসবাস শুরু করলেও গ্রাম / গঞ্জটির অস্তিত্ব তৎপূর্বেই ছিল। বঙ্গাধিকারী হরিনারায়ণ রায়ের পূর্বপুরুষগণ খাজুরডিহি গ্রামে বসবাস করতেন এবং অমরারগড়ের রাজা মহেন্দ্রনাথ এই গ্রাম হতে শিবাক্ষা মূর্তি জোরপূর্বক অধিকার করে অমরারগড়ে প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁশবেড়িয়ার জমিদার বংশের আদি নিবাস ছিল পাটুলিতে এবং কেশব দত্তের পৌত্র সহস্রাক্ষ দত্ত হিজরা ৯৮০ অব্দে (১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ) সম্রাট আকবরের নিকট ফরজলপুরের জমিদারী লাভ করেন। বৈদ্যপুরের কিঙ্কর মাধব সেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। কোটাসিমুল-এর শাসক বঙ্গবারা খাঁ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে এতদঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কুকুড়া-কৃষ্ণপুর গ্রামটি শ্রীধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর জন্মস্থানরূপে প্রসিদ্ধ। শাক্তসঙ্গীত রচয়িতা দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের সাতপুরুষের নিবাস ছিল চুপী গ্রামে। প্রবাদ যে, আদিশূরের নামের সঙ্গে ভাতুরিয়া ও সুউরা গ্রামের সম্পর্ক জড়িত আছে। মাধবসঙ্গীতের রচয়িতা পরশুরাম রায় সাতপুরুষ ধরে গলসী থানার বাহিরঘণ্য গ্রামে বসবাস করে থাকলে এই গ্রামে অস্তিত্ব অন্ততঃপক্ষে চতুর্দশ

শতকে ছিল বলে অনুমান করা যায়। পুরাকীর্তির প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের স্থানরূপে চিহ্নিত বরাকর ও সাতদেউলিয়ার প্রাচীনতা বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তাছাড়া গড়ুই, এথোরা, রাইগ্রাম, কল্যাণেশ্বরী, উখরা, দোগাছিয়া, বোড়, পুচরা, বোহার, মৌডাঙ্গা, মেড়তলা, কুলুট, চুরুলিয়া, তালিতগড়, খুদিকা, নন্দী, ছোটদিখরী, শীতলপুর, আমাদপুর কামারকিতা, মণ্ডলগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মন্দির, মসজিদ ও গড় নির্মাণের জন্য পরোক্ষভাবে গ্রামগুলির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। চানক, মাজিগ্রাম, মন্তেশ্বর, সিজনা, রায়ান, কালিগ্রাম, গলসী, সারুল ও মসাগ্রামের নিদর্শনবলী হতে অনুমান করা যায় যে, এই সকল গ্রাম বেশ পুরাতন। ভন. ডেন. ব্রুকের মানচিত্রে উদ্ধারণপুর, বিকিহাট, গাজীপুর, অম্বুয়া, নিমদহ, মীর্জাপুর ও সেলিমাবাদের উল্লেখ আছে। রেনেলের সার্ভে মানচিত্রে (১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) কিছু অতিরিক্ত প্রাচীন গ্রাম নাম পাওয়া যায়, যথা,—বাক্সা, বৈঁচি, পলসোনা, ভাতাড়, মন্তেশ্বর, কড়ুই, নিগণ, সাতগাছিয়া, রসুলপুর, ওড়গ্রাম, এরুয়ার, সাদিপুর, চারবাকপুর, কুমিরকোলা, লক্ষ্মীপুর, আলমপুর, বেলকাশ, জামালপুর, রাধানগর, জুনট, বেলেরহাট, নয়াহাট (নূতনহাট বা থানা ঘাট), চোৎখণ্ড, মহম্মদপুর, সেহাড়া, মোগলমারি, উচালন, খুষ্টেনন্দপুর, দাদপুর, গোহগ্রাম, ছোড়ার ইত্যাদি। এই মানচিত্রে প্রদর্শিত অন্যান্য স্থানের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বহু প্রাচীন গ্রাম কোন এক সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লব, মন্বন্তর, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ধ্বংস হয়েছে এবং যার প্রমাণস্বরূপ জনবসতিবিহীন কিছু পুরাতন মৌজার নাম অতীতের গ্রামসমূহের স্মারক চিহ্নরূপে একালে রয়ে গেছে। জনবসতিবিহীন মৌজার সংখ্যা ভাগীরথী, অজয় ও দামোদর নদের তীরেই অধিক দেখা যায়।

বর্ধমান জেলার অজস্র প্রাচীন গ্রামসমূহের মধ্যে সামান্য অংশ মাত্র চিহ্নিত হল। উপরোক্ত আলোচনার বাইরে বহু প্রাচীন গ্রাম আছে, যেগুলির প্রাচীনতা নির্দেশ করতে হলে লোকবসতি, লোকসংস্কৃতি ও লোকধর্মের সাহায্য ব্যতীত গত্যন্তর নাই এবং এ কাজের জন্যে ব্যাপকভাবে গ্রাম-সমীক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যৌথ উদ্যোগ ব্যতীত ২৬৭৯টি গ্রাম / মৌজার সমীক্ষা অত্যন্ত দুরূহ কার্য।

পাদটীকা ঃ

১। সমাজ বিজ্ঞানীয় ভূগোল—অনিমা ভট্টাচার্য ও বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৪১৮।

২। বাঙালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়, পৃষ্ঠা ৯১৯।

৩। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা (শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৯৫ সংখ্যা) প্রবন্ধ ঃ গ্রাম সমীক্ষা—ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ১।

৪। *The Golden Bough* (Abridged Ed.—Sir James J. Frazer (Ch. IX, *The worship of Trees*) p. 154.

৫। *Ibid*, p. 156

৬। বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (কলিঃ বিশ্বঃ) স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২১।

৭। বীরভূম জেলার গ্রাম নাম—ডঃ সত্যনারায়ণ দাস ও বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় শব্দ—ডঃ সত্যনারায়ণ দাস (কয়েকটি বিশেষ অধ্যায় ও শব্দার্থ দ্রষ্টব্য)।

৮। *Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India* (*Eng.* Tr.)—Sylvain Levi & others (Introduction & Ch. III).

৯। রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর—ডঃ অমলেন্দু মিত্র, পৃষ্ঠা ৩।

১০। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (১ম খণ্ড, প্রথম ভাগ) নগেন্দ্রনাথ বসু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ্য কাণ্ড ও গৌড় কাহিনী (আদি যুগ) শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ, পৃষ্ঠা ১৯৮-২০৩।

১১। বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (কলিঃ বিশ্বঃ), পৃষ্ঠা ৩৩।

১২। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড)—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী (প্রাগৈতিহাসিক অধ্যায়ে বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া আছে)।

১৩। বর্ধমান সম্মিলনী, হীরক জয়ন্তী স্মরণিকা, ১৯৭৪ পৃষ্ঠা ১৭-৮।
(প্রবন্ধ : বর্ধমানের ইতিহাস—যৎকিঞ্চিৎ : ডঃ সুকুমার সেন)

১৪। *Decline of the kingdom of Magadha*—Dr. B. P. Sinha, p. 270-72
Howrah In Perspective—Dr Kalyan kr. Ganguli, p. 18, (বিষদ বিবরণের জন্য প্রথম খণ্ডের প্রাচীনপর্ব অধ্যায়ে ১১৫ পৃষ্ঠায় ৭০নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

১৫। *Inscriptions of Bengal*, Vol. III—N. G. Majumder, p. 71.
Epigraphia Indica, Vol. VIX, p. 156-63 ; সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৭ সাল, পৃষ্ঠা ২৩৩।

১৬। গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫২।

১৭। *Eprigraphia Indica*, Vol. XXVI, p. 317.
বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নবর্ণিত গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য : শ্রীকৃষ্ণবিজয় (মালাধর বসু), চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দরাম), মনসবিজয় (বিপ্রদাস পিপলাই), মনসামঙ্গল (কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ), ধর্মমঙ্গল (রূপরাম চক্রবর্তী), শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘনরাম চক্রবর্তী), ভক্তিরত্নাকর (নরহরি চক্রবর্তী), চৈতন্যচরিতামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ), চৈতন্যমঙ্গল (জয়ানন্দ), শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, বাংলা স্থাননাম (সুকুমার সেন), Rennell, is Atlas, Sheet No. VII, IX.

চতুর্থ অধ্যায়

একটি গ্রাম সমীক্ষা

(লোকসংস্কৃতি ও লোকধর্মের প্রেক্ষাপটে ক্ষীরগ্রাম)

লোকসংস্কৃতির সঙ্গে লোকধর্মের সম্পর্ক এবং লোকধর্মের সঙ্গে লৌকিক দেবদেবী, লৌকিক আচার-আচরণ', সমাজব্যবস্থা ও অধিবাসীগণের পারস্পারিক যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টাকে উপস্থাপনা করতে পারলে লোকধর্মের প্রসার ও তার গঠন-প্রকৃতিকে জানা যায়। একটি লৌকিক দেবীকে কেন্দ্র ক'রে গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরাও সংস্কৃতির নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। গ্রামের নাম ক্ষীরগ্রাম। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত শাক্তপীঠ ক্ষীরগ্রাম একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের উত্তরভাগ দিয়ে ব্রাহ্মণী নদী প্রবাহিত। বর্ধমান শহর হতে ৪০ কিলোমিটার উত্তরে ও কাটোয়া শহর হতে ১৮ কিলোমিটার দক্ষিণে বাসযোগে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের উৎপত্তি বিষয়ে কোন লোককথা বা কিম্বদন্তী নেই। ক্ষীরগ্রাম একটি দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক ভাষায় উৎপন্ন কোন শব্দও নয়। গ্রাম-নামটি সংস্কৃত ভাষা হতে জাত। ক্ষীর শব্দ এসেছে —দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যের জন্য অর্থাৎ গোপ জাতির বসতির ফলে 'ক্ষীর'-এর প্রাচুর্য ছিল, এই ইঙ্গিতই করছে। এখনও গ্রামে বহু গোপ জাতির বসবাস আছে। তরু দত্তের 'Jogoddya Uma' নামক বিখ্যাত ইংরাজী কবিতার বঙ্গানুবাদে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে,—

'ক্ষীরের জন্য বিখ্যাত ক্ষীর গাঁয়ে
দুই পাশে তার গোচর ভূমির কোলে।'

বৃহন্নীল তন্ত্রে পীঠের পরিচিতি 'ক্ষীরপীঠ' হলেও রুদ্রযামল তন্ত্রে ক্ষীরিকা নামের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার কোন কোন গ্রন্থে ক্ষীরপুরের উল্লেখ আছে।

ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেনের মতে 'ক্ষীর' অর্থে শশা অর্থাৎ যে স্থানে প্রচুর শশা উৎপাদিত হয় সেই স্থান-নামটি সম্ভবতঃ ক্ষীরগ্রামে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কুব্জিকাতন্ত্রে ক্ষীরগ্রাম' নামক সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে। এখন বিচার্য বিষয় হ'ল। প্রাচীনকালে এতদঞ্চলে শশার চাষ হ'ত কিনা? মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' শশার উল্লেখ নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজও শ্রীচৈতন্যদেবের আহারের সময় অথবা জগন্নাথদেবের ভোগে অন্যান্য উপাদানের উল্লেখ করলেও এক্ষেত্রে শশা অনুপস্থিত। বর্তমানকালেও এই গ্রামে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শশার উৎপাদন হয় না। অতীতে গ্রামটি তিন অংশে বিভক্ত ছিল, তাই ৩টি মৌজা নিয়ে গ্রামটি গঠিত হয়েছে, যথা—চক ক্ষীরগ্রাম, খারিজা ক্ষীরগ্রাম ও ক্ষীরগ্রাম। খারিজা শব্দের অর্থ হল বাতিল—অর্থাৎ কোন কারণে মৌজাটি জনশূন্য হ'লে জমিদারি সেরেস্তায় তা খারিজ পর্যায়ভুক্ত গ্রাম ছিল। গ্রামের

দক্ষিণভাগে সুবিশাল ধামাচিয়া নামক হ্রদতুল্য দীঘিটির জল ও পাড়ের আয়তন প্রায় ৪০০ বিঘা। শোনা যায়, বর্গী হাঙ্গামার সময়ে গ্রামটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং গ্রাম-দেবী যোগাদ্যাকে কেন্দ্র করে পুনরায় নূতন গ্রামপত্তন হয়েছিল। গ্রামের জনবসতির ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে গ্রাম-পত্তন শুরু হয়েছিল।

ক্ষীরগ্রামে কোন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন না মিললেও ধর্মগ্রন্থ ও প্রাচীন সাহিত্যে এই গ্রামের প্রাচীনতার সাক্ষরতা বহন করছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে রচিত কুব্জিকাতন্ত্রের একখানি পুঁথি নেপাল থেকে উদ্ধার করেন এবং তা এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। উক্ত পুঁথিতে ক্ষীরগ্রাম সহ ৪২টি সিদ্ধপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়,—

"ক্ষীরগ্রামং বৈদ্যনাথং জানিয়াদ বামলোচনে
কামরূপং মহাপীঠং সর্ব্বকাম ফলপ্রদম্ ॥"

ষোড়শ শতকে রচিত বৃহৎ—নীলতন্ত্রে উল্লেখ আছে,—

"ক্ষীরপীঠে যুগাদ্যা চ ক্ষীরাখ্যা নিয়মপ্রভা।
রাজেশ্বরী মহালক্ষ্মী হস্তিনাপুরবাসিনী ॥"

দশম শতকে রচিত রুদ্রযামলতন্ত্রে আছে, ক্ষীরিকা—'বামপদাঙ্গুলীমূলে'।

বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ভারতবর্ষের ৫১টি স্থানে পতিত হয় এবং উক্ত স্থানসমূহ শাক্তপীঠরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ক্ষীরগ্রামে দক্ষিণ-পদাঙ্গুলী-মূল পতিত হয়। কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির ৩৪০০নং পুঁথিতে (মহাপীঠ-নীরূপণম্) পাওয়া যায়,—

"ভুতধাত্রী মহামায়া বামপদাঙ্গুলী মম।
নকুলীশ কালীপীঠে দক্ষপদাঙ্গুলী মম ॥"

আবার এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৬নং পুঁথিতে আছে,—

"যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠ পদো।"

ষোড়শ শতকে রচিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে আছে,—

"ওনং ধং ক্ষীরিকাপীঠায় নমো বামপদাঙ্গুলীমূল।" (তন্ত্রসারঃ)

ক্ষীরগ্রামে কোন লিপিমালা পাওয়া না গেলেও সমসাময়িককালে রচিত তন্ত্রশাস্ত্র ও আখ্যানমূলক কাব্যসমূহে এই পীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ প্রসিদ্ধি না থাকলে সুদূর পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) কবিগণের রচনাতে ক্ষীরগ্রামের নাম উল্লেখ থাকত না। কুব্জিকাতন্ত্রের কাল থেকে মধ্যযুগের শেষ পর্ব পর্যন্ত (ভারতচন্দ্র) এই সুদীর্ঘ কাল ধরে যোগাদ্যাতন্ত্রের (Jogadya Cult) খ্যাতি বিদ্যমান ছিল। মঙ্গলকাব্যের কবিদের দিগ্‌বন্দনায় দেবী ও দেবীপীঠগুলির উল্লেখ রয়েছে। অতি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন না হলে শাক্তপীঠ ক্ষীরগ্রামের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত না। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'শিবচরিতে' দেবী ও গ্রামের নাম সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ রয়েছে—এখানে দেবীর নাম 'যোগাদ্যা' এবং গ্রামের নাম 'ক্ষীরগ্রাম'।

ঈশ্বর উবাচ।

"মাতঃ পরাৎপরে দেবী সর্বজ্ঞান ময়ীশ্বরি।
কথ্যতাং মে সর্বপীঠ শক্তি ভৈরব দেবতা॥
শৃণু বৎস প্রবক্ষামি দয়াল ভক্ত বৎসল।
যানি বিনা ন সিদ্ধন্তি জপসাধন সত্‌ক্রিয়া॥
... ...
ক্ষীরগ্রামে মহাদেব ভৈরবঃ ক্ষীরকণ্টকঃ।
যুগাদ্যাসা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠাং পদোমম্॥"

কিন্তু ভারতীয় যাদুঘরের ১০৮৬৩নং পুঁথিতে (শিব রচিত) আছে,—

'ভুতধাত্রী মহাদেবী ভৈরব ক্ষীরকণ্টভাক্।
যুগাদ্যা সা মহাবিদ্যা বিখ্যাতা ভুবনেশ্বরী॥'

ষোড়শ শতাব্দীতেই বাচস্পতি রচিত 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনীতে' গান্ধর্ব তন্ত্রে উক্ত ৪৭টি শাক্তপীঠের উল্লেখ রয়েছে। এখানে ক্ষীরগ্রামের পরিবর্তে 'ক্ষীরিকা' পাওয়া যায়। যথা,—

"পীঠমাহে গান্ধর্বে।
পীঠমুজ্জয়নী চৈব ক্ষীরিকা পীঠমেবচ।
হস্তিনাপুরকং পীঠ পীঠমুড্ডীসমেবচ।"

উপরোক্ত রচনার পাঠান্তরে (তন্ত্রচূড়ামণি) দেখা যায়,—

"পীঠমুজ্জয়িনীবৈচব বিচিত্রা ক্ষিরিকাভিধম্।
হস্তিনাপুরক পীঠঞ্চ (পুরকং পীঠম্) উড্ডীনঞ্চ প্রায়াগকম্॥"

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত 'মহাপীঠনীরূপণম্' গ্রন্থের কোন কোন পুঁথিতে গ্রামের নাম রয়েছে 'যোগাদ্যা' এবং পীঠের দেবী মহামায়া নামে খ্যাত।

"ভূতধাত্রী মহাদেব ভৈরবঃ ক্ষীরকণ্টক।
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষানুঙ্গুষ্ঠ পদোমম॥"

কিন্তু ডঃ দিনেশচন্দ্র সরকার এর পাঠান্তরের নির্দেশ করেছেন (Sakta Pithas —Dr. D. C. Sircar),—

'ভূতধাত্রী (ক্ষীরগ্রাম) মহামায়া (দেব) ভৈরবঃ ক্ষীরখণ্ডকঃ
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষানুঙ্গুষ্ঠ পদোমম॥'

সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া বাংলা ও ইংরাজীতে (কেবলমাত্র তরু দত্ত) স্পষ্টরূপে ক্ষীরগ্রাম, যোগাদ্যা ও ক্ষীরকণ্টক ভৈরবের নামোল্লেখ আছে। বাংলা ভাষায় কৃত্তিবাস রচিত "যোগাদ্যা বন্দনা" এর প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে হয় এবং মহাকবি সংস্কৃতে একটি স্তব রচনা করেন এবং পাতালবাসিনী দেবী বলে উল্লেখ করেন "ওঁ আদ্যাং সর্বতেজময়ীং শ্যামাং করাল বদনাং মুক্তকেশী চতুর্ভুজং বিশাল ত্রিনেত্রাং স্মেরানন— সরোরহেং খড়্গদক্ষিণোর্দ্ধপাণিকাম্"......এবং স্তব শেষ করেছেন—"কৃত্তিবাস ওঝা

বিরচিতম্ শ্রীপাতালবাসিনী যোগাদ্যাস্তোত্রাং সমাপ্তম্।" কৃত্তিবাস রচিত "যোগাদ্যা বন্দনায়" মহাপীঠ ক্ষীরগ্রামের নাম স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

"মাথায় প্রতিমা করি আন্যা হনুমান
অবনি মণ্ডল মধ্যে ক্ষীরগ্রাম নাম।"

মঙ্গলকাব্যে ক্ষীরগ্রামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে। 'সতী স্কন্ধে শিবের ভ্রমণ' প্রসঙ্গে কবি বর্ণনা করেছেন,—

'তবে সদাশিব রায় মহা পরিশ্রম পায়
ক্ষীরগ্রামে করিলা বিশ্রাম।
তাহে পৃষ্ঠদেশ পড়ে দেবের আনন্দ বাড়ে
যোগাদ্যা হইল তার নাম।'

মুকুন্দরামের পর রামানন্দ যতির 'চণ্ডীমঙ্গলে', ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্মমঙ্গলে', রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গলে', বলরাম চক্রবর্তীর 'কালিকামঙ্গলে', রামদাস আদকের 'অভয়ামঙ্গলে', কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গলে', মানিক গাঙ্গুলির 'ধর্মমঙ্গলে', ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গলে' ও রামকিশোর শিরোমণির 'কালিকা সঙ্গীতামৃত' গ্রন্থে ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যার উল্লেখ আছে। রাঢ়ের লৌকিক দেবীদের কেন্দ্র করে দেবীর শঙ্খ পরিধানের কাহিনীও গড়ে উঠেছে। দেবীর বন্দনা রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে শঙ্খ পরিধানের কাহিনী সহ দেবী পূজার প্রাক্-কথা জড়িত। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর লোককাহিনীকে অবলম্বন করে কৃত্তিবাস, দয়ারাম, দ্বিজ পরমানন্দ, দ্বিজ বাঞ্ছারাম, তরু দত্ত (ইংরাজী কবিতা) ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বন্দনাগান বা উপাখ্যান মূলক কবিতা রচনা করেছেন। বিভিন্ন কবির রচনার পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়. এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বর্ধমান সাহিত্য সভা, শ্রীরামপুর কেরী লাইব্রেরী প্রভৃতি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ক্ষীরগ্রামবাসী দ্বিজ বাঞ্ছারাম ও দ্বিজ দয়ারামের পুঁথি হল সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও প্রামাণ্য। এছাড়া বহু অজ্ঞাতনামা লেখকের যোগাদ্যা বন্দনার পুঁথি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। যোগাদ্যা সম্পর্কিত এত অধিক সংখ্যক রচনা দেখে, মনে করা যায় যে, এক সময়ে রাঢ়ের জনমানসে বা লোকধর্মে দেবীর একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল।

গ্রামের মধ্যস্থলে এক বিশাল চত্বরের মধ্যে যোগাদ্যা দেবীর মন্দিরটি অবস্থিত। সমগ্র চত্বরটি তিন ভাগে বিভক্ত। মূল অংশে দেবীর মন্দির এবং উত্তরভাগে ফুলবাগিচা এবং ফুলবাগিচার পশ্চিমে মালি ও রাজবাড়ীর দারোগার (ইনি বর্ধমান রাজবাড়ীর হয়ে যোগাদ্যা দেবীর সেবাপূজার দায়িত্বে ছিলেন) আবাসস্থল আছে। সমগ্র চত্বরটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মূল মন্দির প্রাঙ্গণে দু'টি প্রবেশদ্বার আছে। পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারটি জোড়বাংলা রীতি ও পশ্চিম ভাগের প্রবেশদ্বারটি দোচালা রীতিতে নির্মিত। নবাব সুজাউদ্দীনের রাজত্বের প্রথম ভাগে বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদ রায় খেঞা পরগণার জমিদারীর অধিকার প্রাপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ শাক্তপীঠ

ক্ষীরগ্রাম তাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তিনি প্রাচীন মন্দির চত্বরের উপর নূতন মন্দির, বেদী, অর্ধমণ্ডপ, নাটমন্দির, পাকশালা ইত্যাদি নির্মাণ করেন। প্রাচীন মন্দিরের শিলালিপিটি মন্দিরের গর্ভগৃহের পশ্চাতে গাঁথা আছে ; কিন্তু অক্ষর এতই অস্পষ্ট যে, তাহা পড়া যায় না। মূল মন্দিরের দরজার বাজু পুরাতন মন্দিরের উপাদানে নির্মিত হয়েছে। এই প্রস্তর খোদিত বাজুগুলি দেখে অধ্যাপক নীরদবন্ধু সান্যাল মন্তব্য করেছিলেন,—"As I looked round and round I found a gargoyle and pieces of door-james of stone built into the walls of the existing temple, Their workmanship painted into a date which was the eleventh or the twelfth century A. D. বন্ধুবর প্রয়াত ডঃ হিতেশ সান্যালের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি উক্ত মতটি সমর্থন করেছিলেন।

মূল মন্দিরের গর্ভগৃহটি ত্রিরথাকৃতি পদ্ধতিতে নির্মিত এবং প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ। মন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন আছে অর্ধমণ্ডপ যেখানে দাঁড়িয়ে মহিলা ও গ্রামস্থ ব্যক্তিরা নিত্য পূজা দর্শন করেন। অর্ধমণ্ডপটির ছাদ হল গম্বুজাকৃতির এবং এর স্থাপত্য রীতিটি ইসলামিক স্থাপত্য রীতিকে অনুসরণ করেছে। ত্রিরথাকৃতি গর্ভগৃহ সহ গম্বুজাকৃতি অর্ধমণ্ডপের অপর কোন উদাহরণ সমগ্র বর্ধমান জেলায় আর দ্বিতীয় নাই। মন্দিরের বাইরে রয়েছে সাধারণ দর্শনার্থীদের স্থান। ৮টি সুদৃঢ় থামের উপর দালান রীতিতে নির্মিত এই উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে দেবী দর্শন করা যায়। মন্দিরের পশ্চাৎভাগের এককোণে নিত্যভোগের জন্য পাকশালা ও অপর প্রান্তে শ্যামরায়ের মন্দির, যথায় শ্যামরায়ের শিলামূর্তি ও অষ্ট ধাতুর শ্রীরাধিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে ও নিত্যপূজা হয়।

যোগাদ্যা মন্দিরের অনতিদূরে দেবীর ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠক মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরটি ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটি প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ এবং ত্রি-স্তরে বিভক্ত। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে তৃতীয় স্তরে উঠলে ক্ষীরকণ্ঠক ভৈরব লিঙ্গের দর্শন মিলবে। শিবলিঙ্গের পার্শ্বে কাশী হতে আগত এক সন্ন্যাসীর সমাধি রয়েছে। এই সাধক ক্ষীরগ্রামে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন এবং তাঁর দেহত্যাগের পর মন্দিরের মধ্যে সমাধিস্থ করা হয়। গ্রামে পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে সুউচ্চ যজ্ঞবেদী। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে যজ্ঞকুণ্ডের বেদীতে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা দেবীর উদ্দেশ্যে হোম করেন। যজ্ঞকুণ্ডের পাশে আছে 'উত্থান মন্দির'। ৩১শে বৈশাখ অর্থাৎ মহাপূজার দিন দেবীকে জল হতে তুলে সারাদিনের জন্য এই মন্দিরে রাখা হয় এবং হাজার হাজার মানুষ পর্যায়ক্রমে শ্রীমূর্তি দর্শন করে নয়ন সার্থক করেন। ক্ষীরদীঘির পাড়ে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। অতীতে প্রবাদ ছিল যে, গ্রামে কোন দালান নির্মাণ করতে নেই। সেকারণে গৃহস্থ বাড়ীর বিগ্রহগুলি মাটির তৈরী বাংলা চালাঘরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

গ্রামের মধ্যস্থলে সুবিস্তৃত চত্বরের মধ্যে গ্রাম-দেবী যোগাদ্যার সুউচ্চ মন্দির।

মন্দির প্রাঙ্গণটি ঘিরে ব্রাহ্মণগণের বসবাস, দেবী পূজার সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। ব্রাহ্মণ বসতির চারিদিকে উগ্রক্ষত্রিয় ও গোপ জাতির বাসস্থান। সর্বশেষে গ্রাম সংলগ্ন অথচ গ্রামের বহির্ভাগটি ঘিরে নিম্নবর্ণের লোকেদের বসবাস আছে। গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রসারিত ২টি প্রধান রাস্তা—পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে চলে গিয়েছে। ধর্ম্মীয় কারণে—এই গ্রামে ধোপা, কলু, কুম্ভকার, মুসলমান প্রভৃতি কয়েকটি গোষ্ঠির মানুষের বসবাস নিষিদ্ধ হয়ে আছে। সদগোপ ও বৈদ্য জাতির বসবাস নেই। গ্রামস্থ মানুষের প্রধান উপজীবিকা হ'ল চাষবাস, মজুর ও ভিন্ন অঞ্চলে চাকুরী।

যে কোন সাধারণ গ্রামেই এরূপ অবস্থা দেখা যাবে। কিন্তু ক্ষীরগ্রামের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে দেবী যোগাদ্যাকে কেন্দ্র করে এবং গ্রামের যে কোন প্রাচীন বংশের সঙ্গে যোগাদ্যা দেবীর নিত্য নৈমিত্তিক পূজা আচার জড়িত আছে। দেবীর সঙ্গে গ্রামের মানুষের তিনভাবে সম্পর্কটি গড়ে উঠেছে, যথা,—ভূমিদান, বৃত্তিদান ও সম্মানজনক মালা-চন্দন বিতরণের মধ্য দিয়ে। যোগাদ্যা দেবীর সেবাইত ও পূজার সঙ্গে জড়িত নিম্নবর্ণের লোকেরা ঢাকী, কামার প্রভৃতি গোষ্ঠির ব্যক্তিরা বর্ধমানের মহারাজার নিকট হ'তে ভূমিদান পেয়েছিল। সেবাপূজার সঙ্গে জড়িত গ্রামের অন্যান্য ব্যক্তিগণ কোন নির্দিষ্ট কর্মের জন্য বর্ধমানের রাজাদের নিকট বৃত্তি পেত। ব্রাহ্মণ ব্যতীত গ্রামস্থ উচ্চবর্ণের লোকেরা দেবীর পূজা সুষ্ঠুভাবে সারা বছর ধরে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্মগুলি পালন করতেন। এই সকল সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণ ভূমিদান বা বৃত্তির পরিবর্তে বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় সম্মান-জনক মালা ও চন্দনে লোকসমক্ষে ভূষিত হতেন। গ্রাম প্রতিষ্ঠার কোন জনশ্রুতি বা প্রবাদ না থাকলেও এই গ্রামে দেবী যোগাদ্যার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বরূপ কীর্ত্তি-বাসের রামায়ণে পাওয়া যায়। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে মহীরাবণবধ পালায় বর্ণিত আছে যে, মহীরাবণের পূজিতা দেবী ভদ্রকালী বা যোগাদ্যাকে মহীরাবণ বধের পর রামচন্দ্রের আদেশে মর্ত্তদেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কীর্ত্তিবাসের 'যোগাদ্যা বন্দনা' হতে জানা যায় যে, দেবীর আদেশে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে ক্ষীরগ্রামে দেবীকে প্রতিষ্ঠার জন্য আজ্ঞা করেন। এখানে হরিদত্ত নামক এক স্থানীয় ভুস্বামীর কথা যোগাদ্যা বন্দনায় পাওয়া যায়। এই হ'ল দেবী যোগাদ্যার প্রতিষ্ঠার প্রাক-কাহিনী। কিন্তু সপ্তদশ শতকের পূর্বে দেবী কোন রাজানুগৃহীত ছিলেন বলে কোন কথা জানা যায় না। সম্রাট আওরংগজেবের সময়ে খাজুরডিহি নিবাসী বঙ্গাধিকারী হরিনারায়ণ রায় প্রসিদ্ধ পীঠস্থান ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর সেবা বন্দোবস্তের জন্য ১৬০০ টাকার ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। বর্ধমানের জমিদার কীর্ত্তিচাঁদ রায়ের আমলে যোগাদ্যা দেবীর সেবা পূজার ভার বর্ধমান রাজবংশ গ্রহণ করে এবং সেই সময়েই প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের উপর বর্ত্তমান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যোগাদ্যা দেবীর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হ'য়ে নদীয়ার রাজা, পাটুলির জমিদার ও স্থানীয় সম্ভ্রান্তশালী ভুস্বামীগণ

বৈশাখী সংক্রান্তিতে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা ও বলিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ৩১শে বৈশাখ জল হ'তে দেবীকে তোলার সময় মশালের দ্বারা আলোক দানের ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপ মশালের আলো 'নদের মশাল' নামে খ্যাত। একালের নদীয়ার রাজারা মশাল পাঠান না; কিন্তু আলো দানের ব্যবস্থাকে আজও 'নদের মশাল' বলা হয়। মহাপূজার দিন দ্বিপ্রহরে পার্শ্ববর্তী ইটাগ্রামের রায়চৌধুরীদের ও কাঁটারিয়া গ্রামের ভট্টাচার্যদের দেবী দর্শনের অগ্রাধিকার আজও বলবৎ আছে। গ্রামে প্রচুর ব্রাহ্মণের বসবাস থাকা সত্ত্বেও দেবীর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে যজ্ঞকারক হ'লেন বৈদিক ব্রাহ্মণরা। তাঁরা পার্শ্ববর্তী নিগন গ্রামের বাসিন্দা। এই যজ্ঞের সময় ছাগ বলিদান-কর্মে সাধারণ শাস্ত্রীয় রীতি মানা হয় না। বলিকৃত ছাগের মুণ্ডটি পশ্চিমদিকে এবং হন্তারক দক্ষিণমুখে দাঁড়িয়ে বলিদান করে। মহাপূজার ২ দিন পূর্বে অর্থাৎ ২৯শে বৈশাখের গভীর রাত্রে দেবীকে জল হ'তে তোলা হয়। এই সময়ে দেবী মূর্তিকে ঘৃত সহকারে মার্জন করা হয়। রায়রায়াণ বংশীয়গণ একটি বলি ও একগাছি নূতন কাছি দিয়ে থাকেন; যা দিয়ে দেবীকে জল থেকে তোলা হয়, কিন্তু তাঁরা উপস্থিত থাকেন না। নরসোনা গ্রাম হ'তে চক্রবর্তীরা ২৯শে তারিখে অর্থাৎ পাট-নড়ানর-দিন প্রাতঃকালেই চাল, মাছ, তরিতরকারী, বিল্বপত্র ও জবার মালা নিয়ে এসে দেবীর ভাণ্ডারীর হস্তে অর্পণ করেন। এই দিন রাত্রে দেবীকে জলে রাখার সময়ে ডোমের মশাল জ্বালান হয়। গোহগ্রাম হ'তে আসে মাসীপিসীর ঝাঁপি আর একজোড়া শাঁখা। সম্ভবতঃ গোহগ্রামের শাঁখারির নিকটই দেবী ধামাচিয়ার ঘাটে শাঁখা পরেছিলেন। দেবীর শাঁখা পরার কাহিনীটি গোহগ্রামে শাঁখারিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। ১৫ই বৈশাখ হ'ল দেবীর লগ্ন উৎসব। লগ্ন উৎসবের দিন হ'তে ২৯শে বৈশাখ পর্যন্ত ঢাকের পরিবর্তে মাদল বাদ্য হয়। পালাক্রমে বৈঁচি ও গোবর্ধনপুরের চর্মকারেরা এই মাদল তৈরী করেন। রাজবাড়ীর প্রধান হন্তারক আসেন পার্শ্ববর্তী গ্রাম হতে। কিন্তু এই মাদল পরের বছরের জন্য রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। গ্রামের পূর্বভাগে মাদল ভাঙ্গার মাঠে 'মাদলভাঙ্গা' অনুষ্ঠান হয়। একালে লুপ্ত হলেও অতীতে মৃদঙ্গের ব্যবস্থা ছিল, যা সরগ্রামের কোন এক ব্যক্তি তৈরী করত।

পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে দেবী পূজার যেরূপ নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অনুরূপভাবে সমগ্র গ্রামের জনগোষ্ঠির সঙ্গে দেবী-পূজার অনুষ্ঠানগুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সারা বছরের পূজার আচার অনুষ্ঠান ও বাৎসরিক পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলি দেখে অনুমান করা যায় যে, অতীতে দেবী কোন আদিম জনগোষ্ঠির উপাস্য ছিলেন এবং পূজার সঙ্গে কৃষিভিত্তিক লোকধর্ম অনুষ্ঠানের সূত্রগুলি এখনও বর্তমান আছে। যদি দেবী আদিতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রভাবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিতা হতেন তাহলে তিনি কোন গোষ্ঠিবিশেষের উপাস্যা দেবীরূপে পূজিতা হ'তেন। জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে গ্রামের সমস্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠত না।

প্রথমেই বলা যায় ডোম উপগোষ্ঠির কথা। ক্ষীরগ্রামে ডোম পরিবারগুলি দৈনন্দিন পুজো অর্চনার ক্ষেত্রে ও বাৎসরিক পুজায় একটি অপরিহার্য গোষ্ঠি বলে বিবেচিত হয়। যোগাদ্যা দেবীর পুজো পদ্ধতি ও পশুবলির বাহুল্য দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায় আদিতে তিনি পুরোপুরি তান্ত্রিক শাক্তদেবী। কবি কৃত্তিবাস ওঝা ও পরবর্তীকালের কবিদের রচিত "যোগাদ্যাবন্দনা" হতে এই পরিচয় মেলে যে, অতীতে দেবীর নিকট নরবলি দেওয়ার রীতি ছিল। কালিকাপুরাণে আছে,—নরবলি হল দেবী পুজার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। ৩১শে বৈশাখ অর্থাৎ বাৎসরিক পুজার দিন ভোর রাত্রে জল থেকে দেবীকে তোলার পর ডোমগোষ্ঠির কোন ব্যক্তি বেলের কাঁটা দিয়ে তার বুক হতে রক্ত বার করে ঐ রক্ত নিবেদন করার সময় বলেন—"নে মা নররক্ত খা।" আজও মহাপুজার দিন ও আশ্বিন মাসে মহানবমীর দিন মহিষ বলিদান হয়। বাৎসরিক পুজার দিন গ্রামস্থ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা ক্ষীরদিঘীর পাড়ে ঘট-স্থাপনা করে পুজো করে ও অসংখ্য ছাগ বলিদান হয়।

বৈশাখী সংক্রান্তির দিন দেবীর মূলমন্দির প্রাঙ্গণে ভোর রাত্রে অনুষ্ঠিত "ডোম-চুয়াড়ী" অনুষ্ঠানটি দেখে স্বাভাবিকভাবে সন্দেহ জাগে যে, অতীতে ডোম সম্প্রদায় ছিল দেবীর আদি উপাসক। তরোয়াল হাতে ব্রাহ্মণ ও লাঠি হাতে ডোমের যুদ্ধের মহড়ার অর্থ হল দেবী পুজার অধিকার নিয়ে উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের সংঘর্ষ অর্থাৎ প্রাচীন গোষ্ঠির উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা লোকেদের হল নকল যুদ্ধের মহড়ার প্রতীক। ঐ দিন ভোর রাত্রে যে ছাগ বলিদান হয় সেটি নরবলির অনুকল্প বলে কোন উচ্চবর্ণের মানুষ তার মাংস আহার করে না।

বৎসরের অন্যান্য সময়ে দেবীকে জল থেকে তোলার সময় ডোমের উপস্থিতি অত্যন্ত আবশ্যক। মাঘ মাসে "উগলের" সময় ডোমই হল আমন্ত্রক বলির প্রধান হন্তারক। ২৭শে বৈশাখ বৈকালে ক্ষীরগ্রামে "মোরনাচ" যা অপভ্রংশে—"ময়ূর নাচে" পরিণত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটির অন্তর্নিহিত অর্থ হ'ল আদিম আদিবাসীদের নরবলি প্রথার একটি স্মরণযোগ্য দিন। হান্টার সাহেব তাঁর "History of Orissa" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ওড়িষার খন্দ জাতি বলিকৃত নরকে "মেড়য়া" বলে। তারা মেড়য়াটিকে কিছুকাল আহারাদি দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করার পরে বলির উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়। প্রতিটি উপজাতীয় পুজা আচারের সময় গ্রাম প্রদক্ষিণের ব্যবস্থা আছে। বলিকৃত "মেড়য়াটিকেও" তাই একটি নূতন বস্ত্র পরিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণের বিধি ছিল।

প্রথাটির অনুকল্পরূপে দত্তবংশীয় কোন ব্যক্তি ক্ষীর কলস মাথায় নিয়ে নাচের যে দৃশ্যটি দেখিয়ে থাকেন, তা আদিতে ছিল প্রাণ ভয়ে ভীত কোন মানুষের পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বার করা। এইভাবে 'মেড়য়া' নাচ বা 'ময়ূর নাচ' অনুষ্ঠানের পর মানুষটিকে আরও তিন দিন আবদ্ধ করে রেখে মহাপুজার দিন ভোর রাত্রে দেবীর সম্মুখে বলিদান করা হত। একালে নরবলির পরিবর্তে মহিষ বলি হয়।

আদিম অধিবাসীদের বিশ্বাস ছিল যে, নররক্তের সঙ্গে কৃষির সুসম্পর্ক আছে।

ভারতবর্ষের কয়েকটি আদিম উপজাতি ও প্রাচীন জার্মানীর উপজাতীয় ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে Sir James Frazer ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—'নররক্ত হল উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক।'

হাড়ি পরিবারের লোকেরা দেবীকে জল হ'তে তোলার সময় ১০টি মশাল জেলে ক্ষীরদীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গ্রামের বাগদী পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা দেবীর প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের সময় পতাকাবাহীর কাজ করেন। বিশেষতঃ ১৫ই বৈশাখ ও ৩০শে বৈশাখ গ্রাম প্রদক্ষিণের সময় ৭টি পতাকা সহ তাদের উপস্থিতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার ভঙ্গি বলে অনুমান করা যায়।

দেবীবাক্য অনুসারে সারা বৈশাখ মাস ধরে ক্ষীরগ্রামে 'হলকর্ষণ নিষেধ। আনুষ্ঠানিকভাবে ৩০শে বৈশাখ বৈকালে হলকর্ষণ অনুষ্ঠানের পর হ'তে গ্রামের কৃষিকার্য শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানটিকে "হাল-লাঙ্গল" বলে। "হল-লাঙ্গল" অনুষ্ঠানে প্রধান অংশগ্রহণকারীর মধ্যে বাগদী সম্প্রদায়ের অপর একটি গোষ্ঠি নেতৃত্ব প্রদান করে। অতীতে 'এরাই' ছিল দেবীর রক্ষী এবং একালেও রক্ষী বা পাইক নিযুক্ত হ'ত বাগদীদের মধ্য হ'তে। অন্যান্য কাজের মধ্যে এদের আরেকটি প্রধান কাজ হল, "উগলের" সময় গ্রামের প্রত্যেকটি গোষ্ঠিকে চিৎকার করে জানিয়ে দেওয়া হ'ত পূজাস্থানে উপস্থিত থাকার জন্য।

দেবীপূজার অঙ্গ হিসাবে অপর একটি অনুষ্ঠান অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং এই বিষয়ে গবেষণার অপেক্ষা রাখে। দেবীর বৃত্তিধারী ঢাকী সমস্ত মাঘ মাসের গভীর রাত্রে চোখের উপর সাত ভাঁজ কাপড় বেঁধে এক পা মন্দিরের মধ্যে ও আর এক পা বাইরে রেখে সপ্ততালে বিশেষ ধরনের বাদ্য বাজায়। বৎসরের অন্য কোন সময়ে ঢাকীর পক্ষে এই তাল ব্যবহার করা নিষেধ। এই অনুষ্ঠানটিকে "নিশিধেম্বল" বলা হয় যা পুরাকালে আদিম গোষ্ঠিতে প্রচলিত ছিল। ১৫ই বৈশাখ হ'তে ৩০শে বৈশাখ পর্যন্ত ঢাকের পরিবর্তে মাদলের ব্যবহার দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, দেবী ছিলেন কোন আদিম গোষ্ঠির উপাস্য। আদিম গোষ্ঠির উৎসবের সময় আজও মাদলের ব্যবহার করা হয়। কিন্তু দেবীবাক্য অনুসারে গ্রামে চর্মকার ও কুম্ভকারের বসবাস নেই। প্রতি বৎসর পার্শ্ববর্তী গ্রামের চর্মকারেরা মাদলের নূতন চর্ম আচ্ছাদন করেন একথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

যোগাদ্যা দেবীর সঙ্গে শাঁখারি ও তার শঙ্খ পরার কাহিনী কৃত্তিবাস, দয়ারাম বাগারাম, তরু দত্ত ও সত্যেন দত্তের রচনায় অমর হয়ে আছে। কাহিনীটি হ'ল,—ভিন্ন গ্রামের কোন একজন শাঁখারি ক্ষীরগ্রামে শাঁখা বিক্রয় করতে আসার সময় ধামাচিয়ার ঘাটে যোগাদ্যা দেবীকে শাঁখা পরিয়েছিলেন। গ্রামস্থ প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণ পরিবার পালাক্রমে দেবীর সেবাপূজার সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সম্পর্কযুক্ত হ'য়ে আছেন। প্রত্যহ চন্ডীপাঠের জন্য ৪টি ব্রাহ্মণ পরিবার পালাক্রমে নিযুক্ত আছেন। এ ছাড়া নরশোনা গ্রামের চক্রবর্তী পরিবার, ইটাগ্রামের রায়চৌধুরী পরিবার,

মেড়তলার ভট্টাচার্য পরিবার ও দোনাগ্রামের ভট্টাচার্য পরিবার দেবীপূজার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। দোনাগ্রামের ভট্টাচার্যগণ পঞ্চমুণ্ডীর আসনে তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন। ক্ষীরগ্রামেও ৪টি পঞ্চমুণ্ডীর আসন ছিল। জনশ্রুতি যে, মহাপূজার দিন জল হ'তে দেবীকে তোলার পর বলিকৃত মানুষের নরমুণ্ডটি দোনার ভট্টাচার্যদের প্রাপ্য ছিল। উচ্চবর্ণের মধ্যে দেবী পূজায় দত্ত বংশের প্রাধান্য আছে। তাঁরা হরিদত্তের বংশধর বলে দাবী করেন। সম্ভবতঃ অতীতে দেবী ব্রাহ্মণ্যধর্মে রূপান্তরিত হওয়ার সময় স্থানীয় ভূস্বামীর সহায়তা লাভের প্রয়োজন হয়েছিল। মহীরাবণের উপাসিতা দেবী ভদ্রকালী রূপকের অন্তরালে অনার্যদের আরাধিতা দেবী ছিলেন এবং তাঁর ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অন্তর্ভুক্তির সময় হনুমান কর্তৃক দেবীর ক্ষীরগ্রামে আনীত হওয়ার পর সেবাপূজার জন্য তিনি হরিদত্তকে স্বপ্নাদেশ দেন। এই অনার্য দেবীকে হরিদত্ত সাত পুত্র বলি দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। প্রচলিত লোককথা ও কীর্তিবাসের রামায়ণ হ'তে এই সব তথ্য জানা যায়। দত্ত পরিবারের লোকেরা পালাক্রমে বৈশাখ মাসে যাবতীয় যজ্ঞ সম্পর্কিত কাজ, মেড়য়া নাচ, হলুদমাখা বস্ত্র পরিধান, উষ্ণীষ ধারণ, উপাচার সহ ঝাঁপি ধারণ, ক্ষীর কলস ধারণ ও বহন, ক্ষীর কলস বিতরণ সহ গ্রাম প্রদক্ষিণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি এরূপ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন তাঁকে ব্রহ্মচর্য, ভূমিতে শয়ন, হবিষ্যান্ন ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। কোন কারণে এঁরা পূর্বোক্ত আচার অনুষ্ঠানগুলি সমাধান করতে অক্ষম হ'লে তাঁদের পরিবর্তে সামন্ত গোষ্ঠির কোন ব্যক্তি প্রতিনিধিত্ব করেন। সামন্তদের পরিবর্তে যে কোন পূজারী ব্রাহ্মণ ঐরূপ অনুষ্ঠান করে থাকেন।

এছাড়া দেবী পূজার সর্বাঙ্গীন আচার-অনুষ্ঠান বজায় রেখে নিত্যপূজাও মহাপূজায় সামন্ত গোষ্ঠি, চৌধুরী গোষ্ঠি, মল্ল ও সাঁইয়েরা সহায়তা করে থাকেন। মহাপূজার প্রাক্কালে রাজপুরোহিত গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেন—"মায়ের পূজা উপস্থিত, আমূল, মামূল, বজায় রেখে মায়ের পূজা সার্থক করে তুলতে হবে।" উক্ত বাক্যের পর গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সায় দেন। দেবীকে সারা বৎসর জল হ'তে তোলার জন্য যে মোটা কাছি প্রয়োজন হয় সেটি 'পাটনাড়ান'-এর দিন অর্থাৎ ২৯শে বৈশাখ রায়রায়াণ বংশীয়রা ঘি, বলিকৃত ছাগ ও কাছিটি পাঠিয়ে দেন। গ্রামস্থ প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত বংশের প্রতিনিধিকে মালা চন্দন ও হোমের ফোঁটা দেওয়ার বিধি আছে।

যোগাদ্যা পূজার ব্যাপকতা সম্পর্কে অপর একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বোঝা যায়। এই অনুষ্ঠানটিকে "গুয়াডাকা" বলে। মূল মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে একটি বেদী আছে, যা গুয়াডাকার বেদী নামে খ্যাত। অতীতে প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যার পর দেবীর মালাকার পান ও সুপারি নিয়ে গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ও কতক-গুলি নির্দিষ্ট স্থানের ব্যক্তিদের আহ্বান করেন। যাঁদের আহ্বান করা হয় তাঁদের

মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন "ফোপল" মশায় অর্থাৎ তিনি কোন ডোম সম্প্রদায়ের লোক। এরপর "গুয়া" দেওয়া হয় ভরত দত্ত শাসমল্লকে-উদ্দেশ্য করে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে এড়ুয়ার, নাসিগ্রাম, কুসুমগ্রাম, কুড়মুন ও কলিগ্রামের উগ্র ক্ষত্রিয় বা আগুরীদের উদ্দেশ্যে ডাক দিয়ে "গুয়া" দেওয়া হয়। উগ্র ক্ষত্রিয়দের ডাকার অর্থ হ'ল এতদঞ্চলে এঁরাই হ'লেন বিত্তশালী তথা সম্ভ্রান্তশালী ব্যক্তি, যাঁরা দেবীকে রক্ষা করে থাকেন; কিন্তু সর্বশেষে মাজগ্রামের নামে "গুয়া' দেওয়ার সময় 'মাজ' শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্রই সজোরে ঢাক বাজিয়ে দেওয়া হয়, যাতে অবশিষ্ট কথাগুলি কেউ শুনতে না পায়।

২৭শে বৈশাখ হ'তে ৩০শে বৈশাখ পর্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিতে মন্দিরের সম্মুখে রামায়ণ গান হয়। শেষ দিনে "মহীরাবণ বধ" পালা অনুষ্ঠিত য়য়। বৈশাখ মাসের এই ৪ দিন দেবীর কোন ভোগ হয় না। প্রবাদ যে, এই সময়ে মহীরাবণ বধ হয়েছিল। প্রয়াত অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় যোগাদ্যা দেবীর পুজা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কয়েকটি কৃষি ভিত্তিক অনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মাঘ মাসের মকর সপ্তমী তিথিতে মন্দিরের একপাশে ছাই দিয়ে তৈরী চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের উপর লাঙ্গলের ফলায় ক্ষেত্রটিকে চাষ দেওয়া হয়। অতঃপর উক্ত ক্ষেত্রের উপর ব্যাং ও মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান—অন্তে গ্রামবাসীরা উর্বরা বৃদ্ধির সহায়ক বলে এক মুঠো করে ছাই নিয়ে নিজ নিজ কৃষিক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেয়। ঐ দিন আর একটি কৌতুকপ্রদ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মালী ও তাঁর স্ত্রী ছাইয়ের উপর খই ছড়িয়ে দেয় এবং যোগাদ্যা বাড়ীর পুর্বভাগে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রতি বৎসর তাঁরা নবদম্পতির ন্যায় গাঁটছড়ায় আবদ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। এই অনুষ্ঠানটিকে অনেকে কৃষি-কার্যের প্রাক্‌-উৎসব বলে অনুমান করেন। ২৭শে বৈশাখ 'মেড়ুয়া' নাচের সময় 'মেড়ুয়ার' মাথায় হলুদ মাখান বস্ত্রখণ্ড দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। হরিদ্রাকে শুভ চিহ্ন ও কৃষির উর্বরাশক্তির সহায়ক বলে মনে করা হত।

বৈশাখ মাস হ'ল ক্ষীরগ্রামবাসীর কাছে পবিত্র মাস এবং গ্রামবাসীরা মহাপুজার দিনটিকে উপলক্ষ্য করে সারা মাস ধরে কর্মচঞ্চল থাকেন। পুজার দিন কোন মহোৎসবের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু যে কোন যাত্রী যে কোন গৃহস্থের বাটীতে গেলে তিনি আতিথেয়তা, আহার ও বিশ্রাম লাভের সুযোগ পাবেন।

সমস্ত বৈশাখ মাস ধরে ক্ষীরগ্রামবাসীকে দেবী-বাক্য মনে করে কয়েকটি বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়, যথা—(১) বৈশাখ মাসে হরিদ্রা বাটা নিষেধ, (২) বৈশাখ মাসে অন্ন রন্ধনের হাঁড়িতে কাঠি দেওয়া নিষেধ, (৩) বৈশাখ মাসে প্রদীপের জন্য সলিতা পাকান নিষেধ, (৪) পুর্ণগর্ভা নারীর গ্রামে অবস্থান নিষেধ, (৫) ধান হ'তে চাউল প্রস্তুত করা নিষেধ, (৬) সমস্ত মাস ধরে হলকর্ষণ নিষেধ, (৭) প্রথম ৫ দিন, ১৫ই বৈশাখ ও শেষ ৫ দিন, লেখনী ধারণ নিষেধ ও অন্যান্য দিন লাল কালিতে লেখার বিধি আছে। এ ছাড়া গ্রামের কুম্ভকারের বাস ও কোন পরিবারের লোকেদের

উত্তরদুয়ারী ঘরে বসবাস নিষেধ। যোগাদ্যা দেবীকে উপলক্ষ করে এক বিস্তৃত অঞ্চলের মানুষ নানাভাবে পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছিল। এই গ্রামের দেবীকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলি সুপ্রাচীন কালের জনগোষ্ঠির সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রূপে আছে। নানা গ্রামের নানা জাতির সমাবেশে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল একদা গড়ে উঠেছিল সেই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ব্যাপকভাবে গবেষণার অপেক্ষা রাখে। গ্রাম সমীক্ষায় বিশেষ সাহায্য লাভ করেছি আমার অনুজতুল্য ক্ষীরগ্রামবাসী সনৎকুমার চক্রবর্তীর।

পাদটীকা ঃ

১। ক্ষীরগ্রাম শ্রীযোগাদ্যা বাণীপীঠ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা (প্রয়াত অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ।)
২। ক্ষীরগ্রাম শ্রীযোগাদ্যা বাণীপীঠ পত্রিকা, প্লাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা।
৩। কুব্জিকাতন্ত্র, শাক্তনন্দা তরঙ্গিণী, তন্ত্রসার, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
৪। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাবলী।
৫। Legends and Ballads of Hindusthan—Toru Dutta.
৬। গ্রাম সমীক্ষার বিশেষ সাহায্য লাভ করেছি আমার অনুজতুল্য ক্ষীরগ্রামবাসী সনৎকুমার চক্রবর্তীর।

নমামি বর্দ্ধমান

রাঢ়ের মধ্যমণি বর্ধমান জেলার 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' রচনার সময়ে নদীতীরে, পথে-প্রান্তরে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি তথ্যানুসন্ধানের নিমিত্ত। নানা বৈচিত্র্যে ভরা বর্ধমানের প্রাচীন 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' জেলার গ্রামগুলিকে আশ্রয় করে আজও টিঁকে আছে। গ্রামপরিক্রমাকালে বর্ধমানের পল্লীকবি প্রয়াত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের অমর বাণী ছিল এ কাজের পাথেয়স্বরূপ। তাই সময়ে সময়ে স্মৃতিপথে উদিত হয় তাঁর সুললিত ভাষা ও ছন্দের মাধুর্যে ভরা কবিতা 'বর্দ্ধমান'কে।

নমামি বর্দ্ধমান,
দামোদর গায় দশকোশী তালে
তব বন্দনা গান।
তব কবিদল যারা কালজয়ী—
ভাষাকে করেছে চির শোভাময়ী,
যুগ যুগ ধরি বঙ্গবাসীরে
করায়েছে সুধাপান।
জ্ঞান কর্ম্মের বিবিধ ক্ষেত্রে
সন্তানগণ তব,
নিজ প্রতিভায় কীর্ত্তির মঠ
স্থাপিয়াছে নব নব।
মমতায় গড়া তব ইতিহাস,
দেবতা মানুষে পাশাপাশি বাস
দিকে দিকে তব তনয়গণের
জয়রথে অভিযান।
লাখো ভক্তের চরণের ধূলি—
দিয়াছ আমার শিরে,
অভিষেক মোরে তুমিই করেছ
লাখো নয়নের নীরে।
তোমার বটের টোপরই যে পরি
ধন্য যে মানি, গৌরব করি
তোমার স্নেহেতে বর্দ্ধিত আমি—
এই মোর সম্মান।
নমামি বর্দ্ধমান।

পঞ্চম অধ্যায়

লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্য

রাঢ়াপুরী

(রাঢ়ের প্রাচীন রাজধানী)

রাঢ় জনপদের ইতিহাস পর্যালোচনার সঙ্গে রাঢ়ের প্রাচীন রাজধানীর অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। এই জনপদের রাজধানী কোথায় অবস্থিত ছিল সে-সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্যান্য জনপদের ন্যায় রাঢ়ে একটি প্রাচীন নগরী ছিল, যেখান হতে জনপদের শাসনকার্য পরিচালিত হত। একাদশ শতকে কৃষ্ণমিশ্র রচিত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়ম্' নামক সংস্কৃত নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বর্ণিত আছে,—'গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী'—অর্থাৎ গৌড় নামক একটি অনুপম দেশে রাঢ়াপুরী নগরী বিদ্যমান। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, রাঢ়াপুরীর অস্তিত্ব ছিল ; কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থিতি বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

কৃষ্ণ মিশ্র বর্ণিত, ভাগীরথী তীরে চক্রতীর্থ, ভুরিশ্রেষ্ঠী ও রাঢ়াপুরী কোন কল্পিত নাম নয়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে—"জয়দেব-কেন্দুলী হতে প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণস্থিত 'আড়া' গ্রামই প্রাচীন রাঢ়াপুরীর স্মৃতি বহন করছে।" রাঢ়ের অধিশ্বর ও নৃপতি-বনিতার উল্লেখ রয়েছে খাজুরাহো মন্দিরলিপিতে। অনুরূপভাবে রাঢ়াপুরীর অধিশ্বর কর্তৃক রাঢ়েশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বর্তমান আড়া গ্রামে। দুর্গাপুর হতে ৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে কাঁকসা থানার অধীনস্থ আড়াগ্রামের (জে. এল. নং ৯১) পূর্বপ্রান্তে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে একটি ধ্বংসস্তূপ আছে এবং আড়া হতে শিবপুর যাওয়ার পথে প্রসিদ্ধ রাঢ়েশ্বর শিব-মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরটি রেখদেউল স্থাপত্য রীতিতে মাকড়া পাথরে নির্মিত হয়েছিল ; কিন্তু বারবার সংস্কারের ফলে মন্দিরের বহিরঙ্গ বেশ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আরও মন্তব্য করেছেন যে, গ্রামের চারিদিকের ধ্বংসস্তূপকে কোন প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে অনুমান করা যায়। রাঢ়ের উচ্চারণে 'র' স্থানে 'অ' প্রচলিত আছে তাই 'রাঢ়েশ্বর' হয়েছেন 'আড়েশ্বর' এবং রাঢ়াপুরী 'আড়া'তে পরিণত হয়েছে।

রামগঞ্জ তাম্রশাসনে বর্ণিত ঈশ্বর ঘোষের ঢেক্করী ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে উল্লিখিত ঢেক্করী রাজ্য ছিল এই অঞ্চলেই। মন্দিরের উত্তরভাগে অবস্থিত নিবিড় অরণ্যটি গড়ের জঙ্গল নামে পরিচিত। এই বনভূমির মধ্যেই গৌরাঙ্গপুর মৌজায় ইছাই ঘোষের দেউল (নং ২৮) এবং বিষ্ণুপুর গ্রামের (জে. এল. নং ৪৪) নিকট শ্যামারূপার গড় অবস্থিত। মনে হয় আড়া, বামুনাড়া, গোপালপুর রূপগঞ্জ, কালিগঞ্জ ও গড়ের জঙ্গল স্থান নিয়ে অতীতের রাঢ়াপুরীর পত্তন হয়েছিল এবং গড় ও পরিখার দ্বারা

নগরটি বেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছিল।

আড়া গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি স্থান গড়দুয়ার নামে পরিচিত এবং পূর্ব প্রান্তকে স্থানীয় লোকে বাজীগড় বলে। বাজীগড় অঞ্চলে খোদিত প্রাচীন প্রস্তরখণ্ড ও প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। গ্রামের মধ্যে ও চারপাশে কয়েকটি বড় দীঘি আছে, যেগুলিকে ঘিরে স্থানীয় প্রবাদ বা লোককথা প্রচলিত আছে। মন্দিরের স্বল্প পরিসর গর্ভগৃহের মধ্যে গ্রানাইট পাথরে তৈরী শিবলিঙ্গটি একটি কূপের উপর স্থাপিত। মন্দিরের নিকটস্থ মহাকাল দীঘি ও রমণার দীঘি নাম দুটি তাদের প্রাচীনত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আড়া গ্রামে প্রাচীনত্বের অপর নিদর্শন হল গ্রামদেবী 'অখিলেশ্বরী', যিনি গ্রামের দক্ষিণভাগে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মূর্তিটি ভগ্ন এবং সম্মুখ ভাগ চাঁচিয়া তুলে দেওয়া হয়েছে। 'মূর্তির দুই পার্শ্বে দু'টি কদলীবৃক্ষ, মাথার উপর সর্পের সাতটি ফণা ছত্রাকারে সজ্জিত। দেবী দ্বিভুজা, ভগ্ন পাদপীঠে একটি হস্তী মূর্তি খোদিত রয়েছে। বেদীর উপর বৃক্ষমূলে আরও কয়েকটি ভগ্ন মূর্তি, একটি বাসুদেবের মূর্তি, একটি তার মূর্তি এবং অপর দু-একটি অজ্ঞাত মূর্তির ভগ্নাবশেষ আছে। তারামূর্তির দু'পাশে দু'ছত্র লিপি ছিল, এক ছত্র একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, অপর ছত্রের দু-একটি অক্ষর পড়া যায় মাত্র। তার দু'পাশে পঞ্চমহাভয়ের মূর্তিটি প্রায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। মূর্তির ভাস্কর্য-ধারায় পাল রাজত্বের প্রথম ভাগের শিল্পরীতির প্রভাব লক্ষিত হয়।' গ্রামের মধ্যে ধর্মরাজতলায় পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের ভগ্ন মূর্তিটি ধর্মরাজরূপে পূজিত হচ্ছেন। গ্রামস্থ পোড়েলপুকুর নামক পুষ্করিণী সংস্কারকালে বহু মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ২১ সেঃ মিঃ × ১৩ সেঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট খণ্ডপ্রস্তরে খোদিত দ্বিস্তর বিশিষ্ট পদ্মের উপর একজোড়া নূপুরের চিহ্ন এবং নিচের পদ্মটির নিম্নভাগে একটি সিংহমূর্তি খোদিত আছে। তাঁর মতে এটি কোন জৈন দেবী। বেলে পাথরে নির্মিত ৩১ সেণ্টিমিটার উচ্চ গর্দভ লাঞ্ছনের উপর ললিতাসনে উপবিষ্ট ও দু'হাত বক্ষে নিবদ্ধ অবস্থায় শীতলাদেবীর প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গেছে, যাঁর বাম হস্তে সম্মার্জনী।

পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি সম্পর্কে দু-এক কথা বলা যায়। আড়া গ্রামে ধর্মরাজ তলায় পঞ্চধ্যানী বুদ্ধমূর্তির একটি প্রস্তর নির্মিত চালচিত্রটির আয়তন ৫৮ সেঃ মিঃ × ৬৫ সেঃ মিঃ। 'শিলাখণ্ডটি ক্রমশঃ উপরের দিকে সরু হয়ে গিয়েছে এবং সর্ব উপরে মুকুট সহ বুদ্ধদেবের কীর্তিমুখ আছে। চালচিত্রে ১৩ সেঃ মিঃ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পাঁচটি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি খোদিত আছে। এই পাঁচটি মূর্তি পঞ্চস্কন্ধের দ্যোতক এবং পঞ্চস্কন্ধকে বৌদ্ধরা বুদ্ধদেবের পাঁচটি ধ্যানী মূর্তি যথা অমিতাভ, পদ্মপাণি বৈরোচন, সামন্তভদ্র ও অমোঘ সিদ্ধিরূপে কল্পনা করেছেন। এই মূর্তিটি পাল যুগের শেষ পর্বে বলে অনুমান করা যায়।

আড়া গ্রামের পশ্চিমভাগ গড়দুয়ার এবং পূর্বভাগ বাজীগড়ের কথা পূর্বেই বলা

হয়েছে। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে বাজীগড়ে খনন করে ১৬৫ সেঃ মিঃ × ৬৫ সেঃ মিঃ একটি প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কৃত হয়। একটি বেলে পাথরের উপর মোট ১১টি চিত্র খোদিত আছে। দুই পাশের মূর্তি দুটি জটাযুক্ত শিবের আবক্ষমূর্তি এবং মধ্যে ৯টি মূর্তি পৃথক পৃথক সমচতুষ্কোণ কুলুঙ্গীর মধ্যে খোদিত এবং মূর্তিগুলি হর-পার্বতীর বিভিন্ন লীলামূর্তি। মধ্যের হর-পার্বতীর যুগল মূর্তি ছাড়া বাকীগুলি অস্পষ্ট। সম্ভবতঃ প্রস্তরখণ্ডটি কোন মন্দিরের লিণ্টেল রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল।

রাঢ়ীপুরীর ইতিহাসের সঙ্গে আড়া গ্রামের ন্যায় পার্শ্ববর্তী বামুনাড়া গ্রামের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে বলা যায় যে, আড়া বা আরা শব্দটি অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষায় ব্যবহৃত হয় এবং ভাষাতত্ত্বের বিচারে গ্রামটি প্রাচীন। আড়া গ্রামের যে অংশে ব্রাহ্মণ বসতি ছিল তা ব্রাহ্মণ + আড়া = বামুন + আড়া = 'বামুনাড়া'তে রূপান্তরিত হয়েছে। গ্রামের মধ্যস্থলে ভুবনেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত এবং মন্দির সংলগ্ন একটি পুকুরের পাড়ে শিবতলায় কয়েকটি ভগ্ন মূর্তি পড়ে আছে। জনশ্রুতি এই যে, প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে রামপাল নামক জনৈক ব্যক্তি পোড়েল পুকুর সংস্কারকালে কয়েকটি মূর্তি উদ্ধার করেন। তন্মধ্যে আকর্ষণীয় হল নৃত্যরত অষ্ট-ভুজ শিবমূর্তি। একটি আয়তাকার ল্যাটেরাইট পাথরে খোদিত অপূর্ব এই শিবমূর্তি, যার আয়তন ৭৫ সেঃ মিঃ × ৪২ সেঃ মিঃ। পাদপীঠ বা বেদীতে বৃষ লাঞ্ছন, যার পৃষ্ঠদেশের কুঁজটি অত্যন্ত স্পষ্ট, নৃত্যরত মূর্তির উপরের হাত দু'টি যোগমুদ্রায় মুষ্টিবদ্ধ; আর নিচের হাতে রয়েছে ডমরু ও অক্ষমালা। ডান ভাগের একটি হাত কনুই থেকে ভাঙ্গা—মনে হয় এই হাতে ছিল শিবের ত্রিশূল। বাম ভাগের সর্বনিম্ন হাতে রয়েছে কমণ্ডুল এবং তার উপরের হাত দু'টি ভাঙ্গা। বৃষের দু'পাশে শিবের অনুচরদ্বয় দণ্ডায়মান। শিবমূর্তির মাথায় জটাজুট ও গায়ে বিচিত্র অলঙ্কার শোভিত। ফলকের উপরিভাগের দু'পাশে দু'টি উড়ন্ত গন্ধর্বমূর্তি খোদিত। শিল্পরীতির বিচারে অনেকে ভাস্কর্যটিকে গুপ্তোত্তর যুগের বলে মনে করেন। হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন জৈন মূর্তি হল উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তু।

আড়া গ্রামে চট্টরাজ পরিবারের দুর্গা-দালানের কাছে প্রস্তর খোদিত দু'টি বৃষ-মূর্তি আছে। গ্রামের অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে রায় পরিবারের বৈকুণ্ঠেশ্বর ও সৌদামিনেশ্বর শিব মন্দির, চট্টরাজ পরিবারের দু'টি আটচালা শিব মন্দির ও দুর্গা-দালান আছে। মুখার্জি পরিবারের শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা কাল জানা যায় মন্দির-লিপি হতে,—

ওঁ

শ্রীশ্রীঅঙ্গনেশ্বর শিব

স্থাপয়িত্রী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন লায়েকের পত্নি

শ্রীমতি অঙ্গনা সুন্দরি দেবী

১৬ আশ্বিন, সন ১৩২১।

গ্রামটি ক্ষুদ্র হলেও নানা বৈচিত্র্যে ভরা। পারিবারিক দুর্গা পূজাগুলির রীতিও বিচিত্র। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভগিনী সুশীলা দেবীর কন্যা উমারাণী দেবীর শ্বশুরালয়ের পূজাটি।

কালিগঞ্জের কালিতলায় ব্যাসাল্ট পাথরের উপর খোদিত ভগ্ন দেবীমূর্তিটিকে পালযুগের নির্মিত বলে অনুমান করা হয়। মূর্তিটির বক্ষদেশ ও কণ্ঠহার ভিন্ন অপর কোন অংশ পাওয়া যায় নাই। এই ভগ্ন দেবীমূর্তিটিকে কালিকার ধ্যানে পূজা করা হয় এবং দেবীর নামানুসারে গ্রামের নাম হয়েছে কালিগঞ্জ।

রাঢ়েশ্বর মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে পোড়েল পুকুর, আকুলেশ্বরী, রমনা দীঘি, মহাকাল দীঘি—যা আড়া গ্রামের প্রাচীনত্বের নিদর্শন। অনেকে অখিলেশ্বরী শব্দের অপভ্রংশ রূপে আকুলেশ্বরী বলে মনে করেন। কিন্তু এই অঞ্চলে বসবাসকারী ডোম সম্প্রদায়কে 'আঁকুড়ে ডোম' বলা হয়। মনে হয়, আকুড়ে ডোমদের আদি ধর্মস্থান আঁকুড়েশ্বরীতলা পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে আকুলেশ্বরীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। উপবিতের পরিবর্তে তাম্রবলয়ধারী ডোম সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ ছিলেন পোড়েল উপাধিধারী, যাঁরা বামুনাড়া গ্রামে পোড়েল উপাধি নিয়ে আজও বসবাস করেছেন। কালিগঞ্জে খাড়াৎ উপাধিধারী ডোম সম্প্রদায়ের বসবাস আছে। মনে হয়, খঙ্গধারী শব্দের অপভ্রংশ রূপ হল খাড়াৎ—এরা রাজকীয় সৈন্যদলের অংশস্বরূপ ছিল। কালিগঞ্জ গ্রামের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত মাঠটি টোঁঠি খেলার মাঠ নামে পরিচিত। টোঁঠি =টেঁটা=টেঁঠা অর্থাৎ লৌহনির্মিত ত্রিফলাযুক্ত ধারাল অস্ত্র। স্বাভাবিক কারণে অনুমান করা যায় যে, এই মাঠে যুদ্ধের উপযোগী নানাপ্রকার অস্ত্র চালনা অনুশীলন করা হত ; যা আধুনিক পরিভাষায় যুদ্ধের মহড়ার স্থান।

পোড়েল পুকুর হতে উদ্ধারপ্রাপ্ত একটি দেবীমূর্তির ভগ্ন পাদপীঠে একটি হস্তীর মূর্তি খোদিত আছে। মহাভয়ে ভীত হস্তীটি সম্মুখের পা দু'টি মুড়ে অবনত মস্তকে রয়েছে এবং তার পিঠের উপর প্রবল বিক্রমে একটি অশ্ব সম্মুখের ডান পা তুলে দিয়ে বিজয়দর্প ঘোষণা করছে। অশ্বের বাঁ পা'টি করিরাজের মস্তকের উপর স্থাপিত আর পিছনের পা দুটি যথাক্রমে হস্তীর পিঠ ও লেজের উপর ন্যস্ত আছে। অশ্বের মুখ ঈষৎ ডাইনে বেঁকে আছে ; কিন্তু শাদুলের ন্যায় বীভৎসাকৃতি সেই মুখভঙ্গীমা যা বীরত্ব ও দর্পের প্রতীক চিহ্ন। অনেকের মতে অশ্বটি হল ওড়িষার গঙ্গো রাজবংশের প্রতীক চিহ্ন আর অবনত মস্তকে অবস্থানরত হস্তী হল পাল রাজবংশের প্রতীক চিহ্ন। সম্ভবতঃ উৎকলরাজ অনন্তভীমদেব রাঢ় বিজয়ের পর দেবী মূর্তির পাদপীঠে গজভয়াল মূর্তি খোদাই করিয়ে স্বীয় বিজয়-দর্প ঘোষণা করার ব্যবস্থা করেন এবং দেবী মূর্তিটি এইস্থানের কোন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরূপ গজভয়াল মূর্তির সাদৃশ্য মূর্তি কোনারকের সূর্য মন্দিরে খোদিত আছে।

আড়া গ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে দু'জন সাধকের কাহিনী জড়িত আছে। প্রবাদ এই যে, ভুবনরায় নামক কোন ব্যক্তি দেবীর কৃপায় তন্ত্রশাস্ত্র মতে সাধনা করে নায়িকা-সিদ্ধ

হয়েছিলেন এবং প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হয়ে স্থানীয় অঞ্চলের জমিদারী লাভ করেন। জমিদার হয়ে তিনি সাহজাদ রায় নামে পরিচিত হন। সাহজাদ রায়ের প্রত্যহ ইষ্টদেবী দর্শনের কাহিনী শুনে কেন্দুলা নিবাসী বিরূপাক্ষ গোস্বামী আড়ায় উপস্থিত হয়ে দেবী দর্শনের উপায় জিজ্ঞাসা করায় দেবীর আদেশ হয়—'বিরূপাক্ষের গুরুমন্ত্র অশুদ্ধ। শুদ্ধমন্ত্রে উপাসনা করলে আমার দর্শন পাবে।' একথা শুনে বিরূপাক্ষ উত্তর দেন—'আমার গুরুদত্ত মন্ত্রই শুদ্ধ, আমি দেবীদর্শন চাই না'। বিরূপাক্ষের গুরুভক্তি দর্শনে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একখানি শিলাসন দান করেন এবং এই শিলাসনে বসেই বিরূপাক্ষ ইষ্টমন্ত্র জপ করতেন। কিছুকাল পরে দেবীর নির্দেশে সাহজাদ বিরূপাক্ষের নিকট কৌশলে শিলাসনখানি প্রার্থনা করেন এবং ঐ শিলাসনের দ্বারাই রাঢ়েশ্বর শিবলিঙ্গ নির্মাণ করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। এরূপ অন্যায় কার্যের জন্য বিরূপাক্ষের পুত্র কবীন্দ্রের শাপে সাহজাদ শ্রীহীন হন। জনশ্রুতি যা হউক না কেন, উপরোক্ত কাহিনীর সঙ্গে রাঢ়েশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কোন সম্পর্ক মানা যায় না।

সমগ্র কাঁকসা থানা অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস তার পুরাকৃতির নিদর্শন হতেই প্রমাণিত হয়। কিন্তু শিল্পনগরী দুর্গাপুরের বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল নিদর্শনগুলি ধ্বংস ও লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যদি এগুলিকে সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে আড়া-বামুনাড়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি পরবর্তী প্রজন্মের নিকট কেবল প্রবাদ বা জনশ্রুতি রূপে গণ্য হবে—বাস্তবতার প্রমাণসমূহ লুপ্ত হয়ে যাবে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। *Epigraphia Indica*, Vol. I.
২। Inscriptions of Bengal, Vol. III—N. G. Majumdar.
৩। দুর্গাপুরের ইতিহাস—প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।
৪। গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
৫। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (৬ষ্ঠ খণ্ড)।

ইন্দ্রাণী

(একটি বিলুপ্ত জনপদ)

অজয়-ভাগীরথী সঙ্গমস্থল হ'তে ভাগীরথীর প্রবাহ-পথ দক্ষিণ-পূর্ব গামিনী হয়ে চলেছে। কাটোয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঐ প্রবাহপথ ধরে দাঁইহাট শহরের ভাউসিংহ মৌজা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে যে মহানগরী একসময়ে গড়ে উঠেছিল —তার নামটি ছাড়া অতীত ঐতিহ্যের আর সকলই বিলুপ্ত। এই অঞ্চলের মধ্যে কাটোয়া ও দাঁইহাট ব্যতীত আতুহাট চক, কেশিয়া, ঘোষহাট, পানুহাট, মণ্ডলহাট, একাইহাট, বিকিহাট, বেড়া, বাগটিকরী, পাতাইহাট, চর পাতাইহাট, ভাউসিংহ প্রভৃতি মৌজার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত জনবসতিগুলি হ'ল অতীতের 'ইন্দ্রাণী' নগরের অংশবিশেষ। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে, সরকার সুলেমানাবাদের অন্তর্গত 'ইন্দ্রায়ীন' পরগণার উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই পরগণার রাজস্ব ছিল ৫, ৯২, ১২০ দাম। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে পাটুলীনিবাসী রাঘব দত্ত (যিনি মোগল সম্রাটের নিকট রায়চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন) ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে এতদঞ্চলের জমিদারী লাভ করেন। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে ইন্দ্রায়ন বা ইন্দ্রায়ীন পরগণা চাকলা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই স্থানের সামরিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে নবাবী আমলে একটি দুর্গ, একটি গড় ও একটি নূতন শহরের পত্তন হয়। হিজরা ১১২৪ অব্দে মোগল সম্রাট জাহান্দার শাহের মৃত্যুর পর তাঁর উজির জুলফিকার খানের ভ্রাতা সৈয়দ শাহু আলম খান দিল্লী হ'তে পলায়ন করে ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত কাটোয়া শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুর্শিদকুলি খাঁ ও সুজাউদ্দীনের সময়ে ইন্দ্রাণী পরগণার জমিদার ছিলেন রামভদ্র চৌধুরী; কিন্তু নিজামতে উক্ত পরগণার খাজনা দাখিল না হওয়ায় সুজাউদ্দীনের পুত্র দেওয়ান সরফরাজ খাঁয়ের এক ফরমানবলে ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদ রায়ের পুত্র চিত্রসেন রায়কে উক্ত জমিদারির রাজস্ব ভার প্রদত্ত হয়েছিল। কীর্তিচাঁদের অধিকারভুক্ত জমিদারির মধ্যে ইন্দ্রাণী ছিল গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলের মধ্যে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, সেকারণে তাঁরা এই অঞ্চলের উন্নতি বিধানের জন্য অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। বর্গী হাঙ্গামার পর ইন্দ্রাণীর অতীত গৌরব একেবারেই লুপ্ত হয়।

ইন্দ্রাণীর ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ বাদ দিলেও মধ্যযুগের সাহিত্যে ইন্দ্রাণী জনপদ, ইন্দ্রাণী নগর ও অধিষ্ঠিত দেবতা ইন্দ্রেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশস্তিসূচক উল্লেখ পাওয়া যায়। কীর্তিবাসের রামায়ণে (আদিকাণ্ড) আছে,—

'ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে যেবা নর স্নান করে।
সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে।'

মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপলাই কাটোয়া ও ইন্দ্রাণী উভয় স্থানের উল্লেখ করেছেন,—

'উজবনি ক্রমে বাই শিবা নদী শাথাই
ওধনপুর বাই ইন্দ্রেশ্বর,

বাহিনু নদীয়া দিয়া আঁবুয়া ফুলিয়া বায়্যা
ত্রিবেণী প্রবেশে মধুকর ।'

দ্বিজ মাধব রচিত 'মঙ্গলচণ্ডীগীত' কাব্যে ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—

'ইন্দ্রাণীস্বরূপা বাহে সাধু দিয়া স্বরা ।
তাহার মেলানে ডিঙ্গা যায়ে কুমুদপুরা ॥'

লোচনানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ইন্দ্রাণীর উল্লেখ না থাকলেও কণ্টকনগর বা কাঞ্চন-নগরের উল্লেখ পাওয়া যায় । শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে নবদ্বীপ থেকে কাটোয়ার পথে ইন্দ্রেশ্বরঘাট ও বিকিহাটে এসেছিলেন, তার প্রমাণ রেখে গিয়েছেন বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দ,—

'গোধূলি সমএ ইন্দ্রেশ্বরঘাট গিয়া ।
বিকীহাট প্রবেশিলা নিত্যানন্দ গিয়া ॥'

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে ইন্দ্রাণী ও কাটোয়ার উল্লেখ করেছেন,—

'ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম ।
তথায় আছেন কেশব ভারতী শুদ্ধনাম ॥'

ইন্দ্রাণী নামটিকে বিখ্যাত করে রেখেছেন বর্ধমানের দুই কবি—কাশীরাম দাস ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী । কাশীরাম দাসের জন্মভূমি ছিল ইন্দ্রাণী পরগণাতে, তাঁর রচিত মহাভারতে (স্বর্গারোহণ পর্ব) উল্লেখ আছে,—

'ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি ।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগিরথী ॥'

কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গলে' ধনপতি সওদাগরের পুত্র সপ্তডিঙ্গা মধুকরে উজানী থেকে অজয় বেয়ে,—

'ডাহিনে ললিতপুর পাইল ইন্দ্রাণী ।
ইন্দ্রেশ্বরে পূজা করে দিয়া পুষ্প পাণী ।'

শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে পুনরায় বর্ণিত আছে,—

'মণ্ডলঘাট ডাহিনে আছে থাকিব ঘাটের কাছে
আনন্দিত সাধুর নন্দন ।
সম্মুখেতে ইন্দ্রাণী ভুবনে দুর্লভ জানি
দৈব নাশে যাহার স্মরণ ॥'

মুকুন্দরামের বর্ণনায় পাওয়া যায়—ষোড়শ শতকের শেষ পর্বে ইন্দ্রাণী নামক স্থানের অধিষ্ঠিত দেবতা ইন্দ্রেশ্বরের খ্যাতি ছিল । মহাভারতে বাচস্পতি মিশ্র-ধৃত বচন থেকেও পাওয়া যায়,—

'ইন্দ্রাণী নাম তীর্থং স্যাৎ ইন্দ্রাণী যত্র বাসবম্।
তপস্তুত্বা পতিংলেভে সৈব শাক্ত্যা প্রয়াগবৎ।।'

অনুবাদ—যেস্থানে ইন্দ্রাণী তপস্যা করিয়া দেবরাজ বাসবকে (ইন্দ্র) পতিরূপে পেয়েছিলেন, সেই ইন্দ্রাণী তীর্থ প্রয়াগের ন্যায় পবিত্র।

এছাড়া, এতদঞ্চলে একটা প্রবাদও আছে,—

'বার ঘাট তেরো হাট তিন চণ্ডী তিনেশ্বর।
ইহা যে মানে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর।।'
অথবা,
এই কথা যে জানে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর।"

প্রবাদবাক্যটির মধ্যে গূঢ় অর্থ আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। অতীতের সমৃদ্ধিশালী ইন্দ্রাণী নগরীতে এত অধিক সংখ্যক দেবালয়, গঞ্জ ও স্নানার্থীগণের স্নানের ঘাট ছিল, তা স্থানীয় ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করতে অক্ষম ছিল। প্রবাদবাক্যের মধ্যে ইন্দ্রাণী নগরীর বিস্তৃতির কথাও জানা যায়। এখানে তিনটি চণ্ডীর দেউল ছিল, যথা,—পাতাইহাটে 'পাতাইচণ্ডী', আকাইহাটে 'আকাইচণ্ডী' ও কুলাইহাটে 'কুলাইচণ্ডী'। দেবী চণ্ডীকার সঙ্গে মহাদেবও পূজিত হতেন 'চন্দ্রেশ্বর', 'শঙ্খেশ্বর' ও 'ইন্দ্রেশ্বর' রূপে। আবার যে নগরীতে তেরটি গঞ্জ বা বাজার ছিল তার সমৃদ্ধি ও জনবসতি সহজেই অনুমান করা যায়। এই স্থানের লোকেদের জন্য তৈরী হয়েছিল গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বারটি ঘাট। এগুলি হল—মনোহারী ঘাট, শঙ্খেশ্বরী ঘাট, ইন্দ্রেশ্বর ঘাট, বারদুয়ারী ঘাট, কালুর ঘাট, স্বরূপ-পানের ঘাট, কদমতলার ঘাট, বক্সীর ঘাট, গণেশ মাতার ঘাট, শিবের ঘাট, দেওয়ানের ঘাট ও কান্তবাবুর ঘাট। ঘাটের নামগুলি হতে অনুমান করা যায় যে, প্রথম তিনটি ব্যতীত অন্যান্য ঘাটগুলি অষ্টাদশ শতকের পূর্বে নির্মিত হয় নাই।

কাশীরাম দাসের নামে যে 'তের হাটের' প্রবাদ প্রচলিত হ'য়ে আছে সেই হাটগুলিও প্রাচীন ইন্দ্রাণী শহরের মধ্যে রয়েছে, যথা,—দেওয়ানের হাট বা দাঁইহাট, পাতাইহাট, বিকিহাট, মণ্ডলহাট, আকাইহাট, পানুহাট, গুড়েহাট বা খাঁরহাট, ঘোষহাট, আতুহাট, বীরহাট বা বেড়া, গঞ্জমুর্শিদপুর বা কাটোয়া। এছাড়া ব্যক্তি-নামে দুটি হাট আছে —নসরতপুর ও কৃষ্ণচন্দ্রপুরে। মনে হয় প্রাচীন নাম দুটি হারিয়ে গেছে।

ইন্দ্রাণী শহরে কোন এক সময়ে কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত বিশাল মন্দির ছিল। একালের এই মন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না; কিন্তু দাঁইহাট থেকে যতই কাটোয়ার পথে যাওয়া যায় ততই গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষোদিত প্রস্তর চোখে পড়বে। দাঁইহাট শহরের বহু বড়ীতে এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়; এমনকি এতদঞ্চলের মসজিদ ও মাজারেও ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে।

দাঁইহাটে গঙ্গার ঘাটের পাশে বদরশাহ আউলিয়ার মাজারে এই মন্দিরের প্রস্তর

ব্যবহৃত হয়েছে। উক্ত মাজারে চুণ, সুরকির পলেস্তারা থাকলেও যেস্থানে পলেস্তারা খসে পড়েছে যেখানে হিন্দু দেবদেবীর ক্ষোদিত মূর্তি দেখা যায়। আলম খানের মসজিদের প্রবেশদ্বারে এইরূপ হিন্দু দেবদেবীর ক্ষোদিত মূর্তি দেখা যায়।

কবি কাশীরাম দাসের জন্মভূমি হ'ল ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে যার অবস্থিতি কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস তাঁর 'জগৎমঙ্গল' কাব্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৪-১০)।

দাঁইহাট শহরের বদরশাহ মসজিদের ১·৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ইন্দ্রেশ্বর ঘাট অর্থাৎ বর্তমান বেড়া এবং বিকিহাটের মধ্যবর্তী স্থানে ইন্দ্রেশ্বর মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তাহলে অনুমান করা যেতে পারে যে, ইন্দ্রাণী নগরী এখানেই অবস্থিত ছিল এবং এই স্থানের অদূরে রাজারপোতা নামে এক উঁচু ডাঙ্গায় স্থানীয় শাসকের আবাসস্থল ছিল। আজ থেকে প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বসু ঐ স্থানে একখানি সুচিক্কণ সুমসৃণ ও কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর (৭' ৮'' × ১½') দেখেছিলেন। এরূপ দুটি প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে একটি কাটোয়া "কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের" প্রবেশদ্বারের উপর গাঁথা আছে ও অপরটি অনাদি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আছে। প্রস্তরস্তম্ভ দুটির উপর একটিতে গণেশমূর্তি ও অপরটিতে ইন্দ্রাণী মূর্তি ক্ষোদিত আছে। এছাড়া 'সখীর আখড়া', শাহ আলমের মসজিদের ও দাঁইহাটে জঙ্গলের নানাস্থানে বহু ক্ষোদিত প্রস্তরখণ্ড এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বদরশাহ মাজারে সন্নিহিত তেঁতুলতলায় এবং সংলগ্ন গঙ্গার খাতে সমশ্রেণীর আরও কিছু প্রস্তরখণ্ড এখনও দেখা যায়।

এই বিশাল শিবমন্দির যিনি নির্মাণ করেছিলেন তাঁর ধনসম্পদ নিশ্চয়ই প্রভূত ছিল এবং ঐ রাজা প্রবল প্রতাপান্বিত শৈব নরপতি ছিলেন। 'রাজারপোতা' নামক স্থানে কোন শাসকের বাসস্থান ছিল বলেই অনুমান। তারাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে "বিকিহাটের খড়িবনের মধ্যে একটি ভগ্ন মন্দির দৃষ্টিগোচর হইয়ে থাকে এবং বীরহাট বা বেড়া গ্রামের প্রবেশপথে রাস্তার দক্ষিণে একটি সুন্দর কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ প্রোথিত আছে ; এটি হনুমানের লাঠি নামে পরিচিত। মাটির উপরের অংশটি প্রায় ৫ ফুট। স্থানীয় লোক মাটি খুঁড়ে ঐ স্তম্ভটি তুলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ৭।৮ ফুট খুঁড়বার পরও তার তলদেশ না পাওয়ায় ঐ কার্য পরিত্যক্ত হয়। মনে হয় উক্ত প্রস্তরখণ্ড প্রায় ২৫ ফুট লম্বা এবং উক্ত প্রস্তরখণ্ডটির দৈর্ঘ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, ঐটি ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরে ব্যবহৃত কোন স্তম্ভ। রাজা ইন্দ্রেশ্বর এই স্থানেই ইন্দ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করে উক্ত দেবতার নামানুসারে ইন্দ্রাণী নগরীর পত্তন করেন। অথবা ইন্দ্রাণী নগরের প্রতিষ্ঠিত দেবতার নামে শিবলিঙ্গের নাম হয় ইন্দ্রেশ্বর। কৃত্তিবাস থেকে মুকুন্দরামের সময় পর্যন্ত ইন্দ্রেশ্বরের ও ইন্দ্রাণীর খ্যাতি ছিল।

ইন্দ্রাণী অঞ্চলে প্রাপ্ত পুরাবস্তুসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে শ্রীবাটী নিবাসী রামরাম চন্দ্র দাঁইহাটের পশ্চিমস্থ বেড়া নামক স্থানে মাটি কাটার সময় একখানি পিতলের তৈরী তাম্রফলক

পেয়েছিলেন এবং পরে সেটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে প্রেরণ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, উক্ত তাম্রফলকটি জৈনদের নৌপজ্জী অর্থাৎ নবপদ প্রতিমা। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জৈনরা মনে করেন যে, ঋষভদেব থেকে মহাবীর বর্ধমান পর্যন্ত সকল তীর্থঙ্করকে পূজা করলে যে ফল হয়, আশ্বিন মাসে নৌপজ্জী বা নবপদজীর পূজা করলে সেই ফল পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় বর্ণিত নৌপজ্জী প্রতিমার বিবরণটি নিম্নরূপ ঃ

"নবপদের প্রথমপদ অরিহণ্ড অর্থাৎ অর্হৎ। এই প্রতিমার ঠিক মধ্যস্থলে পাঁচটি (৫) অর্হতের মূর্তি আছে। ইহারা শ্বেতাম্বরীদিগের ঠাকুর ; এইজন্য ইহাদের পরিধানে কৌপীন আছে। ইহাদের সর্বমধ্যস্থলের ঠাকুরটির মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় হার। ইনি ধরাসনে উপবিষ্ট, পদদ্বয় উত্তানভাবে ক্রোড়দেশে স্থাপিত, ইনি সম্পূর্ণরূপে ধ্যানমগ্ন। ইহার বামে ও দক্ষিণে দুইটি থাম ; থামের উপর সেকালের মুসলমানী খিলান, খিলানের উপর দুই পার্শ্বে দুইটি হাতী। হাতী দুইটি আপন আপন শুঁড় উঁচা করিয়া আছে। শুঁড় দুইটি প্রায় পরস্পর ঠেকিয়াছে, শুঁড় দুইটির নীচে খিলানোর উপরিভাগে ঠিক মধ্যস্থলে উঁচা খুরা দেওয়া বাটীর মত কি পদার্থ আছে। খিলানের নীচে অরিহতের মস্তকের উপর এবং তাহার দুই পার্শ্বে লতার মত তিনটি পদার্থ আছে। অরিহতের বামপার্শ্বে একটি ছোট খিলান, তাহাতে দুইটি মূর্তি ; একটি অরিহতের ঠিক প্রতিরূপ, আর একটি দণ্ডায়মান অরিহতের মূর্তি। অরিহতের দণ্ডায়মান মূর্তি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। দিগম্বর জৈনদিগের দণ্ডায়মান মূর্তি উলঙ্গ। শ্বেতাম্বরদিগের দণ্ডায়মান মূর্তি বিরল হইলেও যথায় আছে, তথায় কৌপীনধারী। আমাদের এ মূর্তি কৌপীনধারী—ধ্যানস্থ বাহুদ্বয় দেহপার্শ্বে লম্বমান, মস্তক মুকুটহীন, পাদুকা জোড়া।

মূল অরিহতের দক্ষিণ পার্শ্বেও দুইটি মূর্তি। একটি উপবিষ্ট, অপরটি দণ্ডায়মান। অরিহতের এই পাঁচ মূর্তি প্রতিমার ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত। জৈনগণ একস্থানে পঞ্চমূর্তি রাখিতে পারিলে, তাহাকে পঞ্চতীর্থ কহেন এবং বিশেষ আদর করেন। কলিকাতায় কোথাও পঞ্চতীর্থ নাই। এই জায়গায় ৩টি জৈন মন্দির আছে, আর দুইটি হইলেই পঞ্চতীর্থ হয়, কিন্তু আমাদের নবপদজীর মধ্যস্থলে একটি পঞ্চতীর্থ আছে ; উহা জৈনদিগের বড়ই আদরের। এই পঞ্চতীর্থের দুই পার্শ্বে দুইটি থাম এবং উপরে একটি প্রকাণ্ড খিলান, নীচে একটি রেখা। অবশিষ্ট আটটি পদ ইহার চতুর্দিকে স্থাপিত।

দ্বিতীয় পদ ঃ—নাম সিদ্ধ। অরিহতের মস্তকোপরি স্থাপিত। ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত, কর্ণে কুণ্ডল, উত্তান মুদ্রায় হস্তদ্বয় অঙ্কোপরি স্থাপিত। উনি বীরাসনে উপবিষ্ট।

তৃতীয় পদ ঃ—নাম আচার্য। ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত, কর্ণে কুণ্ডল, যোগাসনে উপবিষ্ট, হস্তদ্বয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ পদ ঃ—নাম উপাধ্যায়। অরিহতের নিম্নদেশে অবস্থিত, মুণ্ডিত মস্তক যোগাসনে উপবিষ্ট ; হস্তদ্বয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম পদ ঃ—নাম সর্ব্বসিদ্ধ। কর্ণে কুণ্ডল, মুণ্ডিত মস্তক যোগাসনে উপবিষ্ট, এবং হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; এবং অন্য হাত ক্রোড়দেশে স্থাপিত।

ষষ্ঠ পদ ঃ—নাম সম্যক্ত। সিদ্ধ ও আচার্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত ইহার আকৃতি নাই। ইহার পরে লেখা আছে, "নমো শংম্যনশ" অর্থাৎ নমঃ সম্যক্তায়।

সপ্তম পদ ঃ—নাম জ্ঞানপদ। আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের মধ্যস্থলে স্থাপিত। পরে লেখা আছে "নমো নানশ" অর্থাৎ নমো জ্ঞানায়।

অষ্টম পদ ঃ—নাম চারিত্র। উপাধ্যায় ও সর্ব্বসিদ্ধের মধ্যস্থলে অবস্থিত। পরে লেখা আছে "নমো চালিততয়" অর্থাৎ "নমশ্চারিত্রায়"।

নবম পদ ঃ—নাম তপঃ। সিদ্ধ ও মহাসিদ্ধের মধ্যস্থলে, খালিঘরে লেখা আছে, "নমো তপর্ণ" অর্থাৎ নমস্তান।

নবপদের নাম—(১) অরিহত (২) সিদ্ধ (৩) আচার্য্য (৪) উপাধ্যায় (৫) সর্ব্বসিদ্ধ (৬) সম্যক্ত (৭) জ্ঞান (৮) চারিত্র (৯) তপঃ।

প্রতিমার নীচে দুই কোণে দুই গণধরের মূর্তি। গণধর অর্থাৎ গুরু। অনেক শিষ্যের গুরু হইলে তাঁহাকে গণধর বলিত। গণধরের মুণ্ডিত মস্তক কুণ্ডলধারী, ইঁহারা জোড়হাতে বসিয়া আছেন। পরিধানে কৌপীন। একটি হাঁটু ভূমির উপর পদদেশ পশ্চাৎভাগে স্থাপিত। অপর পদের পদতল ভূমির উপর। হাঁটুধি উচ্চভাবে অবস্থিত।

প্রতিমার নিম্নভাগে অতি অস্পষ্টভাবে কয়েকটি অক্ষর লেখা, 'সংবৎ ১৯২৩...শ্রী... পজ্জী—'

প্রতিমার পৃষ্ঠদেশে প্রথম সূক্ষ্মাক্ষরে বিন্দু লেখা আছে, তাহার পর স্থূলাক্ষরেও বিন্দু লেখা আছে। সূক্ষ্মাক্ষরে যথা—৯000 সংবৎ ১৯২৩ মাঘসুদি ১৩ মকরাশি সংস্থিতে মন্ত্রাধিপতৌ শুক্রবারে ইদং চন্দ্রমণ্ডলং পূজা শান্তি...শ্রীইন্দ্রেশ্বরে জৈনক্ষেত্রে স্বর্গস্থানে—স্থূলাক্ষরে যথা—৯000 নবসহস্র বিম্বজ—সর্ব্বসুরিণঃ সংবৎ ১৯২৩ মাঘ শুভদি ১১ বুধে দেশ শাসিন প্রতাপ সিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র ভৃগু মহা তপন সিংহ জৈনেনসহ সঙ্গত সহিতেন ভট্টাতীর্থিন—ওঁ নবপদ ॥"

লিপিটিতে দুই জায়গায় ১৯২৩ সম্বৎ এর উল্লেখ আছে। এটি বিক্রমাব্দ হতে পারে না। মনে হয় বৌদ্ধদের ন্যায় জৈনগণ মহাবীর বর্ধমানের পরিনির্বাণের তারিখ থেকে একটি অব্দ গণনা শুরু করেছিলেন। জৈন ধর্মশাস্ত্র ত্রিলোকসারে পাওয়া যায় ৫২৭ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে (শক রাজের ৬০৫ বৎসর পূর্বে) মহাবীর বর্ধমান পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। তাহলে ২৫১৪ জৈনাব্দ বৎসর পূর্বে তাঁর পরিনির্বাণ হয়েছিল এবং ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দ=১৯২৩ জৈনাব্দ, যা প্রতিমাতে সম্বৎ রূপে উল্লেখিত আছে।

তারাদাস চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণে পাওয়া যায়,—'ইন্দ্রাণীর ভগ্নবক্ষের উপর দাইহাট

প্রান্তে গঙ্গাগর্ভের উপর প্রাচীন কারুকার্য শোভিত শিবমন্দিরের একাংশ এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কাপ্তেন লঙ্গ তাহা হইতে প্রস্তর ফলক উন্মোচন করিয়া লইয়া কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষা করিয়াছেন।'

এই ফলকের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শ্লোক পাঠে জানা যায়,—ভগবান শ্রীশংকরের সময়ে কোন ভাগ্যবান নরপতি উক্ত মন্দির স্থাপন করেছিলেন। প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায়, শঙ্করাচার্যের সময়ে (৭৮৮-৮১৫) অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় নবম শতকের প্রথম ভাগে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

এই বিশাল মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার কোন পরিচয় জানা যায় না। অনেকে মনে করেন যে, উড়িষ্যার কিংবদন্তী রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু এর কোন ঐতিহাসিকতা নাই বা ইন্দ্রদ্যুম্ন কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিও ছিলেন না।

ইন্দ্রাণীর ইন্দ্রেশ্বর মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এই অঞ্চলে অবশিষ্ট মন্দির, মসজিদ, সমাজগৃহ, মাজার ইত্যাদি পুরাকীর্তির নিদর্শনগুলি ধ্বংসের অপেক্ষায় আছে। সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে এই প্রাচীন জনপদের অতীত নিদর্শনগুলি হয়ত মহাকালের আঘাত হতে রক্ষা পেতে পারে। মন্দির সহ ইন্দ্রাণীর ইন্দ্রেশ্বর লুপ্ত হয়ে গেছে ; কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানটি বিলুপ্ত নগরী রূপে আরও কয়েক শতাব্দী ধরে অতীত স্মৃতিকে ধরে রেখে বিস্মৃতির অতলতলে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। *Ain-I-Akbari*, Vol-2 (tr.)
২। *The History of Bengal*—C. Stewart.
৩। *Calcutta Review*, 1846. Vol. 6.
৪। *Indian Archaelogy*—A Review, 1966-67.
৫। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৪ সাল, ১৩১৯ সাল ও ১৩২২ সাল
৬। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত—রাখালদাস মুখোপাধ্যায়।
৭। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন (বর্ধমান সভা), ১৩২১ সাল।
৮। জন্মভূমি—১৩০১ সাল।
৯। মাসিক বসুমতী, ১৩৩৩ সাল (চৈত্র সংখ্যা)।
১০। গৌড়ের ইতিহাস (২ খণ্ড)—রজনীকান্ত চক্রবর্তী।
১১। কাটোয়াদর্শন—ডঃ কালিচরণ দাস।

মঙ্গলকোট

রাঢ়-বাংলার প্রত্ন-ইতিহাসে মঙ্গলকোট হল একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। পার্শ্ববর্তী কুনুর ও নিকটবর্তী অজয় নদ অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় প্রাচীনকালে এখানে একটি নদী বাণিজ্যকেন্দ্র ও শাসনকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। একালেও থানা ও ব্লকের সদর কার্যালয় হল মঙ্গলকোট গ্রামে। মঙ্গলকোটে সমৃদ্ধশালী প্রত্ন-ইতিহাসের যে সন্ধান পাওয়া গেছে তা খ্রীস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক জনবসতির চিহ্ন বিরাজমান। পশ্চিমবঙ্গে অপর কোন প্রত্ন ক্ষেত্রে এরূপ নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে এই স্থানটি কোট বা দুর্গ নামে উল্লিখিত এবং ঐ পুরাণ গ্রন্থ রচনার সময়ে সমগ্র গ্রামটি অজয়ের তীরবর্তী উজানী-কোগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বর্ণিত আছে,—

'উজ্জয়িন্যাম্ তথা পূর্বাম্ পীঠম্ মঙ্গলকোষ্ঠকম্।'

মঙ্গলকোটের ইতিহাস ও কিংবদন্তীর সঙ্গে স্থানীয় শাসক রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম জড়িত আছে। টলেমীর মানচিত্রে সিব্রিয়াম বা শিবিপুরী নামক স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ঐ স্থান বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট অঞ্চল ও বীরভুম জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল। ডাঃ অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর মতে বেসান্তর জাতকে উল্লিখিত শিবি-রাজ্যের রাজধানী ছিল প্রাচীন জেতুত্তর নগরীতে; ডাঃ চৌধুরীর মতে স্থানটি হল বর্তমান মঙ্গলকোট। এ বিষয়ে ডঃ অতুল সুর মন্তব্য করেছেন যে, জাতক বর্ণিত শিবিরাজ্য ছিল বর্ধমান জেলার অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে এবং শিবিরাজ্যের রাজধানী ছিল মঙ্গলকোটের নিকটে। গুপ্ত, গুপ্তোত্তর, পাল ও সেন আমলে মঙ্গলকোট একটি সমৃদ্ধশালী স্থান ছিল। মঙ্গলকোটের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হতে একথার প্রমাণ মেলে। সম্ভবতঃ বক্তিয়ার খলজী রাজনগর অধিকার করে অজয় অতিক্রম পূর্বক মঙ্গলকোটের হিন্দু রাজাকে দমন করে নদীয়া অভিযান করেছিলেন।

কিম্বদন্তী আছে যে, রাজা বিক্রমজিতের সময়ে মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। এই সময়ে আঠারজন আউলিয়া এখানে এসেছিলেন বলে স্থানটি অষ্টাদশ আউলিয়ার দেশ নামে প্রসিদ্ধ। তম্মধ্যে গোলাম পাঞ্জাতন পীর সহ পাঁচ-জনের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল এবং এখানে তাঁদের সমাধি আছে। মঙ্গলকোটের প্রত্নকীর্তির মধ্যে হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহের মসজিদ দু'টি উল্লেখযোগ্য। মসজিদ লিপিতে উল্লেখিত হোসেন সাহের আমলের দীঘিটির অস্তিত্ব একালেও রয়েছে। মঙ্গলকোটে মোগল-পাঠানের যুদ্ধ ও একটি দুর্গের উল্লেখ আছে, আবুল ফজল আলামির রচিত 'আকবরনামা' গ্রন্থে। ১৬২৪ খ্রীস্টাব্দে শাহজাহান এখানে এসেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর গুরু দানেশমন্দ কর্তৃক হিজরা ১০৬৫ অব্দে নির্মিত মসজিদে সম্রাটের নাম ক্ষোদিত আছে। ঐ মসজিদের একাংশ ও শিলালিপির নিদর্শন আজও দেখা যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলকোট পরিদর্শনকালে হোসেনশাহী

মসজিদে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রস্তরখণ্ডের উপর প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে ক্ষোদিত 'শ্রীচন্দ্রসেন' নামক নৃপতির নাম দেখেছিলেন। সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন দেবালয়ের উপাদান এই মসজিদে ব্যবহৃত হয়েছিল।

মঙ্গলকোটের অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে হামামখানা, নাকারাখানা, কোয়ার সাহেবের মসজিদ, ফুলবাগ, বিক্রমাদিত্যের ভিটে (সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত), অন্যান্য মসজিদ, তেল ঢালা পুকুর, গজনভী গাজির সমাধি রাজদীঘি, বাঁধা পুকুর, মজলিস দীঘি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তেল ঢালা পুকুর নিয়ে বহু কিম্বদন্তী জড়িত আছে। জনশ্রুতি যে, ফুলবাগের পুকুর, বাঁধা পুকুর ও মাইনে পুকুরের তলদেশ মাটির নল দ্বারা যুক্ত ছিল এবং মাটির নল দ্বারা ঐ জল হামামখানায় সরবরাহ করা হত। মাইনে পুকুরে স্নান করে দানেশমন্দের সমাধি-প্রাঙ্গণের ধূলায় গড়াগড়ি দিলে চর্মরোগ হতে আরোগ্য লাভ হয়। মাইনে পুকুরের পশ্চিমপাড়ে কাজি খোদা নওয়াজ সাহেবের বাসভবন আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলকোটের তিনটি মসজিদের মধ্যে হোসেন শাহ ও দানেশমন্দ বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ দুটির কথা ২য় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে (পৃঃ ৩১৬)। কিন্তু হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও প্রতিষ্ঠালিপি হতে এই মসজিদ নির্মাণের কথা জানা যায় এবং এই মসজিদটি হিজরা ৯৩০ অব্দে বা ১৫২৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। শিলালিপিটি হল,—

'ক্বালান নাবীয়ো সল্লাল্লাহো আলাইহে অয়া সাল্লাম মান বানা মাসজেদা ল্লাহে বোনেয়া ল্লাহো লাহু বায়তান মেছলাহু ফিল জান্নাতে। বোনেয়া হাজাল মাসজেদুল জামে আ ফি আহদেস সুলতানোল মোয়াজ্জেম আস্ সুলতান এবনে সুলতান নাসীরুদ্দুনয়া ওয়াদ্দীন আবুল মোজাফ্ফর নুসরৎ শাহ আস্সুলতান এবনে হুশেন শাহ আস্সুলতানো খাল্লাদা ল্লাহো সুলকাহু ওয়া সুলতানাহো ওয়া বানীহে খান মিঞা মোয়াজ্জেম এবনে মুরাদ হয়দার খাঁন দামা আজ্জাহু ফি সানাতেন ছালাছুনা ...ওয়াতেস্আ' মেয়াতেন ॥" [হিজরা ৯৩০]

"ঈশ্বরের প্রেরিত (তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন হউন) বলিয়াছেন,—যে কেহ ঈশ্বরের নিমিত্ত কোনও মস্জিদ (উপাসনাস্থান) নির্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার নিমিত্ত সেই প্রকারের একটি গৃহ স্বর্গে নির্মাণ করিবেন। এই জামে মস্জিদ্ হুসেনসাহের পুত্র প্রশংসিত সুলতান, সুলতানের পুত্র সুলতান্ নাসের উদ্দুনিয়া ওআদ্দিন আবুল মজফ্ফর নসরৎ শাহের রাজত্বকালে নির্মিত হয়। ঈশ্বর তাঁহার রাজত্ব ও প্রাধান্য চিরস্থায়ী করুন। ইহার নির্মাণকারী খান্ মিয়া মুয়জ্জম মোরাদ হায়দর খানের পুত্র, তাঁহার সম্ভ্রম বৃদ্ধি হউক, নয় শত ত্রিশ সালে নির্মিত।" (ক্ষোদিত আরবী লিপিটি মঙ্গলকোটবাসী স্বর্গীয় মৌলবী আবুল মজফ্ফর জমালুদ্দিন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত হয়েছিল।)

প্রাচীন মঙ্গলকোটের ব্যাপ্তি ছিল উজানী-কোগ্রাম, নূতনহাট, মঙ্গলকোট,

বক্সীনগর, বড়বাজার, পদিমপুর প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে। গৌড় হতে কটক পর্যন্ত বাদশাহী সড়ক নামে খ্যাত রাস্তাটি এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে উত্তর হতে দক্ষিণে প্রসারিত ছিল। কয়েক বৎসর ধরে মঙ্গলকোটে সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে উৎখনন কার্য চলেছিল। মঙ্গলকোট গ্রামে কয়েকটি ঢিবির নীচে প্রাচীন প্রত্ন-সম্পদ লুকিয়ে আছে; আবার অনেক সময় মাটির উপরিভাগেও বহু নিদর্শনের সন্ধান মিলেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে শুরু করে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্ত আমলের মুদ্রা ও সমসাময়িককালে মানুষের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি হতে এই অঞ্চলে প্রাচীন জনবসতির অন্যতম প্রমাণ মিলছে। কিংবদন্তী, জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধিশালী মঙ্গলকোটের সভ্যতাকে ছ'টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা,—(১) তাম্রাশ্মীয় যুগ (খ্রীস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ হতে শুরু), (২) হস্তিনাপুরের সমগোত্রীয় মৃৎপাত্রের যুগ, (৩) কুষাণ যুগের মুদ্রা, মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির মূর্তি, প্রকার ইত্যাদি, (৪) গুপ্তযুগের শীল-মোহর, মৃৎপাত্র ও প্রকার, (৫) মুসলমান আমলের প্রথমপর্ব, (৬) স্বাধীন সুলতানী ও মোগল আমলের সৌধাবলীর ভগ্নাংশ, এছাড়া বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর অস্তিত্বের নিদর্শন রয়েছে হিন্দু দেবালয়গুলিতে।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। অষ্টম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ১৩২১ সাল।
২। *Sibi king Vessantara his Country and Cultural Heritage*—Dr. A. K. Chaudhuri.
৩। *Indian Archaeology—A Review*, 1962-63.
৪। *An Encyclopadia of Indian Archaeology*, 2 Vols.
৫। *Inscriptions of Bengal*, Vol IV—S. Ahmed.
৬। *Journal of Bihar and Orissa Research Society*, Vol-III, pt. III.
৭। *Akbar Nama* (Eng Tr.), Vol-III

বরাকর ও কল্যাণেশ্বরী

(১)

বর্ধমান জেলার পশ্চিম প্রান্তে বয়ে চলেছে দামোদরের উপনদী বরাকর এবং নদীর বাম তীরে বেগুনিয়া ও বরাকর পল্লীর অবস্থিতি। রাঢ়ের রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চল ও অরণ্যের মধ্যে একদা প্রস্তর নির্মিত শিখর-দেউলগুলি একটি মন্দির-চত্বরের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। এই স্থানের কোন প্রাচীন ইতিহাস জানা না গেলেও মন্দিরগুলি হতে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, এতদঞ্চলে কোন ক্ষমতাশালী রাজার রাজপাট অথবা ধর্মকেন্দ্র ছিল। হাওড়া হতে ২১৪ কিলোমিটার রেলপথে ভ্রমণ করলে বরাকর ষ্টেশনে পেঁছান যাবে এবং ষ্টেশন হতে ১½ কিলোমিটার পথ এগিয়ে গেলে বেগুনিয়া বাজারের ডান দিকে ৪টি সুউচ্চ শিখর-দেউল চোখে পড়বে। স্থানীয়ভাবে মন্দিরগুলি বেগুনিয়ার মন্দির নামে প্রসিদ্ধ।

মন্দির চত্বরে প্রবেশ করলেই পাশাপাশি একজোড়া প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ শিখর-দেউল দেখা যায়। ২টি মন্দিরের গর্ভগৃহে বা মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। বাম দিকের মন্দিরটির দেওয়ালের গাত্রে একটি বিশাল গণেশ মূর্তি সিঁদুর লিপ্ত অবস্থায় রয়েছে; কিন্তু ডান দিকের মন্দিরের দেওয়ালের গাত্রে মহিষমর্দিনী মূর্তি ক্ষোদিত আছে। জোড়া শিখর-দেউলের স্থাপত্যরীতি এক ধরনের এবং ২টি মন্দিরই এক সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে করার সংগত কারণ আছে। বাম ভাগের মন্দিরের দরজায় পাথরের বাজুতে মন্দির প্রতিষ্ঠার লিপি ক্ষোদিত আছে। লিপিটি হল নিম্নরূপ:

"ওঁ ।। শাকে নেত্র বসুত্রিচন্দ্র গণিতে
পুণ্যে বুধাহেতিথাবষ্টম্যাং
রুচিরং প্রতিষ্ঠীতাবতী পক্ষোসিতে ফাল্গুনে।
ঐশম্ দেবকুলম্ যথাবিধি
হরিশচন্দ্রস্য ভূরিশ্রিয়ো ভূশক্রস্য
হরিপ্রিয়া প্রিয়তমা উচ্চৈঃ ফল প্রাপ্তয়ে।"

প্রতিষ্ঠা লিপি হতে জানা যায় যে, রাজা হরিশচন্দ্রের স্ত্রী হরিপ্রিয়া দেবীর নামে ১৪৬১ খ্রীস্টাব্দে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডান দিকের মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠা লিপি না থাকলেও অনুমান করা যায় যে, রাজা হরিশচন্দ্রই উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রতিষ্ঠা লিপির নিম্নে অপর একটি ক্ষোদিত লিপি হতে জানা যায় যে, ১৪৬৮ শকাব্দে বা ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে মন্দির দুটির সংস্কার করা হয়েছিল বঙ্গাক্ষরে লিখিত সংস্কার লিপিটি হল,—

শাকে বসু রস সমুদ্র চন্দ্র গণিতে পক্ষে সিতে
মার্গকে সপ্তম্যাঞ্চ গুরুদিনে প্রতিষ্ঠিতঃ
হর পুণ্যে বুধাহে ভুবি। তেষাম বিপ্রকুলে

কুলবতাম্ শিবপদে নন্দনামধ্যেয়ম্ তস্য
ভার্য্যেতি পক্ষঃ হরপদ বিদিতা বিশ্বেশ্বরী তৎপ্রিয়া ॥
প্রণম্য মাধবম্ দেবম্ নন্দ জন্মনা।
হরিশ্চন্দ্রস্য নৃপতেঃ কির্ত্তির লুপ্তা ভবিষ্যতি ॥
তৎকীর্ত্তিম্ রক্ষণার্থায় পুণঃ কীর্ত্তিম্ করোম্যহম্।

এই মন্দির দুটির শীর্ষদেশে আমলক শিলার উপর কলস স্থাপিত আছে। বজ্রপাতের ফলে ডান দিকের মন্দিরের কলস কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মন্দিরের স্থাপত্য পুরোপুরি শিখর-দেউল রীতিকে অনুসরণ করেছে, কিন্তু ২।১ টি অংশ ব্যতীত কোন ভাস্কর্য নেই। এর কিছুটা পশ্চিমে তৃতীয় শিখর-দেউলটি অবস্থিত। এই মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা উচ্চ। তৃতীয় মন্দিরের স্থাপত্যরীতি দেখে অনুমান করা যায় যে, এটি প্রথম দুটি মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন। তৃতীয় মন্দিরের মধ্যে একটি বিস্ময়কর বস্তু দেখা যায়। প্রথমতঃ এই মন্দিরটি পশ্চিম মুখে অবস্থিত এবং মন্দিরের অভ্যন্তরভাগে যোনীপট্ট বা গৌরীপট্টের পরিবর্তে ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি পাথরের উপর মৎস্যের আকৃতি ক্ষোদাই করা রয়েছে এবং এই মৎস্যের উপর ৫টি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। সম্ভবতঃ কোন এক সময়ে মৎস্য ছিল প্রজননের প্রতীকচিহ্ন, আবার মৎস্যকে শুভ বা মাঙ্গলিক কার্যে ব্যবহার করা হয়। ৫টি শিবলিঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয়টি খর্বাকৃতি এবং অপর ৪টি একই আকৃতি বিশিষ্ট। এই শিখর-দেউলের আমলক শিলার উপর স্থাপিত কলসটি ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দে বজ্রপাতের ফলে স্থানচ্যুত হয়ে নীচে পড়ে আছে।

বরাকরের মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মন্দির হল চতুর্থ মন্দিরটি যেটি স্থানীয় লোকের নিকট সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির নামে পরিচিত। মন্দির তত্ত্ববিদগণের মতে সিদ্ধেশ্বর মন্দিরটি খ্রীস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে নির্মিত হয়েছিল। অনেকের মতে ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বরে মন্দিরের সংগে সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পূর্বমুখী এই মন্দিরটির উর্ধ্বভাগে একটি চৈত্য গবাক্ষ রয়েছে—ঐ চৈত্যগবাক্ষের মধ্যে—ধ্যানমগ্ন নিমীলিত লোচনে উপবিষ্ট কৃশতনু জটাজুটধারী মুনি প্রবরের একটি মূর্তি ক্ষোদিত আছে। তাঁর ডান হাতে রয়েছে একটি লকুট বা লগুড়। অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে একসময়ে পূর্ব ভারতে লকুলীশ পাশুপত ধর্মের প্রচলন ছিল। মন্দিরে উৎকীর্ণ লকুলীশ মূর্তিটি তার প্রধান প্রমাণ। নিকটবর্তী সিংভূম জেলার বেনুসাগরে একটি ভগ্ন লকুলীশ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। চতুর্থ মন্দিরটি রাহাপগে এবং এর উর্ধ্বদেশ ভাস্কর্য ক্ষোদিত বহু দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের রূপ সহ একটি বিশাল বরাহমূর্তি ক্ষোদিত রয়েছে। সমগ্র মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এবং ক্ষোদিত মূর্তিগুলি দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বরাকরের পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চলে গুপ্ত পরবর্তী যুগে পাশুপত ধর্মের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। একালের বহু উর্বর মস্তিষ্কের পণ্ডিত ব্যক্তি এটিকে জৈন মন্দির বলে নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এই

মন্দিরের অপর এক বৈশিষ্ট্য হল বিশাল আমলক শিলা—যদিও অন্যান্য মন্দিরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির আমলক শিলা স্থাপিত আছে। মন্দিরের প্রবেশ পথের দুই পাশে ২টি নন্দী বৃষ মূর্তি রয়েছে, তন্মধ্যে একটি ভগ্ন। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগে অমসৃণ পাথরে নির্মিত শিবলিঙ্গটি কোন গৌরীপট্ট বা যোনিপট্টের উপর স্থাপিত নয়। এই মন্দিরের গর্ভগৃহের অনেকটা বসে গেছে।

সমগ্র মন্দির চত্বর দেখে অনুমান করা যায় যে, এখানে আরও ৫টি মন্দির ছিল। ১৮৭২-৭৩ খ্রীস্টাব্দে জে. ডি. বেগলারের রিপোর্টে পূর্বতম মন্দিরগুলির উল্লেখ আছে। অপর একটি মন্দিরের ভিত্তিবেদী দেখে বেগলার সাহেব এটিকে বিষ্ণু মন্দির বলে সনাক্ত করেছিলেন যা ষষ্ঠ শতকে নির্মিত হয়েছিল বলে তিনি অনুমান করেছিলেন।

শিবক্ষেত্রের পশ্চিম ভাগে সীতারাম দাস বাবার আশ্রম রয়েছে। এই আশ্রমটিকে শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির বাড়ী বলা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়পুর নিবাসী সাধক সীতারাম বাবা ১৩৩১ সালে একটি দালান মন্দির নির্মাণ ক'রে নিতাই গৌর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গৌরাঙ্গ মন্দিরের পাশে স্থাপিত রয়েছে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। উক্ত চত্বরের মধ্যে সীতারাম বাবার সমাজের উপর একটি সমাধি মন্দির নির্মিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথিতে নবরাত্র কীর্তন ও উৎসবে এতদঞ্চলের বহু ব্যক্তি আশ্রমে অনুষ্ঠিত নাম-সঙ্কীর্তনে যোগদান করেন। এছাড়া রাস ও রথযাত্রা উৎসবও মহাসমারোহে পালিত হয়। মন্দির চত্বরের দক্ষিণ ভাগে একটি ক্ষুদ্র কক্ষকে মাসির বাড়ী নামে চিহ্নিত করা আছে। রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথদেব কয়েকদিনের জন্য ঐ কক্ষে অবস্থান করেন। এখানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বস্তুগুলির মধ্যে রয়েছে একটি কক্ষের মধ্যে কয়েকটি দেববিগ্রহ। এই দুর্লভ সংগ্রহটি সীতারাম বাবার উদ্যোগেই রক্ষা পেয়েছে। তিনি বরাকরের নদী-খাত হ'তে ১২ / ১৩টি কষ্টিপাথরে নির্মিত বিগ্রহ উদ্ধার করে একটি ঘরের মধ্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। বিগ্রহগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যক্ষবাহনে কুবের, মকর বাহনে বরুণ, শশকবাহনে চন্দ্রদেব, ছাগ-বাহনে অগ্নি, মহিষবাহনে যমরাজ, গরুড়বাহনে বিষ্ণু, সপ্তাশ্চবাহিত রথে সূর্যদেব, রাজছত্রধারী হস্তীবাহনে দেবরাজ ইন্দ্রের মূর্তি রয়েছে। এছাড়া হরগৌরীর কামরাজ মূর্তি যার নিম্নভাগে বৃষ ও সিংহ লাঞ্ছন, শিবের নটরাজ মূর্তি যার নিম্নভাগে বৃষ ও একটি গণেশ মূর্তি রয়েছে। সমস্ত মূর্তিগুলি ভাস্কর্য শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যায়। সম্ভবতঃ মূর্তিগুলি পাল যুগে নির্মিত হয়েছিল। মন্দির চত্বরের বহির্ভাগে একটি কাঁটাঝোপের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে ১৫/১৬টি দেব-দেবীর মূর্তি অবহেলা ও অনাদরে পড়ে রয়েছে। মনে হয় কোন সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হ'লে এগুলি একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। বেগলার সাহেবও এই মূর্তিগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। মন্দির বাড়ীর সংলগ্ন ব্রাহ্মণী পুকুরের পাড়ে একটি ইষ্টক নির্মিত বেদীর উপর বেলে পাথরে তৈরী একটি নারীমূর্তি শায়িত অবস্থায় রয়েছে। এই মূর্তিটি

পূর্ব-পশ্চিমে শায়িত এবং পীনোন্নতা, পয়োধরা ও স্ফীতোদরা। স্থানীয় লোকেরা ব্রাহ্মণী দেবীজ্ঞানে এঁর পূজা করেন। এতদঞ্চলে হিন্দু ও আদিবাসীরা বিবাহ অনুষ্ঠানের পর অষ্টমঙ্গলার দিন দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা ও পশুবলি দিয়ে ঐ রক্ত মূর্তির গায়ে ছড়িয়ে দেয়। মনে হয় আদিম সমাজে এই দেবী ছিলেন প্রজনন ও উর্বরা শক্তির প্রতীক। বিগ্রহটির আরও একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, এর পদদ্বয় প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে।

(২)

বরাকর হ'তে ৮ কিলোমিটার দূরে হালদা পাহাড় ও চালনাদহকে ঘিরে যে লৌকিক দেবী বিরাজিতা আছেন তিনি দেবী কল্যাণেশ্বরী নামে খ্যাত। অনুচ্চ পার্বত্য অঞ্চলটি একসময়ে গভীর জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল এবং সমগ্র অঞ্চলটি পঞ্চক্রোশীর মাঠ বা কল্যাণেশ্বরী গড় নামে খ্যাত।

আবার অনেকের মতে হালদা পাহাড়কে ঘিরে শিখরভুমের রাজারা কল্যাণপুরের পত্তন করেছিলেন, তাই দেবী হয়েছেন কল্যাণেশ্ববী। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, শিখরভূমের রাজা কল্যাণেশ্বর সিং মন্দির নির্মাণ পূর্বক দেবীকে প্রতিষ্ঠা করায় দেবীর নামানুসারে স্থান-নাম হয়েছিল কল্যাণেশ্বরী।

দেবীকে প্রতিষ্ঠার প্রাচীন কথা জানা না গেলেও এতদঞ্চলে জনশ্রুতি আছে যে, শিখরভুম রাজ্যের রাজগুরু দেবনাথ দেওঘরিয়া চালনাদহের তীরে বিগ্রহের সেবা পূজা শুরু করেন এবং দেবী কল্যাণেশ্বরী নামে রাজবংশের কুলদেবীরূপে অধিষ্ঠিতা হ'ন। কল্যাণেশ্বরী দেবীর কোন বিগ্রহ মূর্তি নেই। গর্ভমন্দিরের ভিতর একটি সুড়ঙ্গের নীচে বিগ্রহটি বিমুখ হয়ে বিরাজিতা। কল্যাণেশ্বর সিং-এর প্রতিষ্ঠিত মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় দেবী বিগ্রহ কিছুকাল বিস্মৃতির গহ্বরে চলে যান। কিন্তু কাশী-ধাম হ'তে আগত শিবচৈতন্য নামক দক্ষিণ ভারতীয় জনৈক সিদ্ধ সাধক স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে শিখরভুমের (পঞ্চকোট) রাজানুকুল্যে মন্দির নির্মাণ করান। বাংলা ১২৩০ সালে কাশীপুরের রাজা বিক্রম সিংহ ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের উপর একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করে দেবী কল্যাণেশ্বরীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কল্যাণেশ্বরী দেবীর পূজার স্থানটি 'মাই কি স্থান'-অপভ্রংশে 'মাইথন' নামে খ্যাতি লাভ করেছে।

মধ্যযুগের অন্যান্য লৌকিক দেবীর ন্যায় দেবী কল্যাণেশ্বরীর শঙ্খ পরিধানের কাহিনীটির মধ্যে মঙ্গলকাব্যের আদর্শগত ছোঁয়ার পরশ পাওয়া যায়। শাঁখারি দামোদর এবং পূজারি ব্রাহ্মণ দেবব্রত দেওঘরিয়ার নাম চালনাদহের দেবীর শঙ্খ পরিধানের আখ্যানের সঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

শঙ্খ পরিধানের স্থানটি সিদ্ধাসন নামে খ্যাত এবং এখানে একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। অতীতে এই তান্ত্রিক দেবীর নিকট নরবলি দেওয়া হ'ত—এখনও পশু বলির যথেষ্ট সমারোহ আছে। জনশ্রুতি এই যে, দেবীর পূজারি ব্রাহ্মণ ভক্তদাসের নাবালিকা কন্যা ভবানীকে ভুলবশতঃ মন্দিরে রেখে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, দেবী ব্রাহ্মণ কন্যাকে গলধঃকরণ করেছেন এবং ভবানীর মাথার চুল দেবীর মুখে আটকিয়ে যায়—সেকারণে বিগ্রহের সম্মুখ ভাগে একটি আবরণ দেওয়া আছে। কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের পশ্চাৎভাগে একটি চত্বরের মধ্যে পোড়া মাটির ঘোড়া, হাতী ও শশক রক্ষিত আছে। আবার এতদঞ্চলে একটি প্রাচীন লোক-গাথা হল,—'ধলেতে রঙ্কিণী মাগো শিখরে কল্যাণী' অর্থাৎ ধলভূমের রঙ্কিণী দেবী শিখরভূমে কল্যাণেশ্বরীতে পরিণত হয়েছেন। ধলভূমের রঙ্কিণী দেবীর উর্ধ্ববাহুতে একজোড়া হস্তী ধরা আছে। মনে হয়, বনদেবী রঙ্কিণী শিখরভূমে কল্যাণেশ্বরীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

বর্তমান মন্দিরটি পীড়াদেউল রীতিতে নির্মিত। প্রাচীন মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ঐ মন্দিরের উপাদান নিয়ে নূতন মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। মন্দিরের ক্ষয়-প্রাপ্ত শিলালিপিতে একজন রাজার নাম ও কল্যাণকোট-এর উল্লেখ থাকায় বেগলার সাহেব মন্তব্য করেছিলেন যে, পূর্বে এই স্থানে একটি গড় বা ছোট দুর্গ ছিল। মন্দিরের অপর একটি শিলালিপিতে "শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বরী পরায়ণ শ্রীযুক্ত দেবনাথ দেবশর্ম্মা"—খোদিত আছে। দেবীর মূল মন্দিরের পাশে শিখর-দেউল রীতিতে নির্মিত কামেশ্বর শিবমন্দির রয়েছে। এছাড়া ছোট বড় আরও ১১টি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে একটি শৈব পরিমণ্ডল গড়ে তোলা হয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণে যূপকাষ্ঠ, আম্রবৃক্ষ ও একটি প্রাচীন নিমগাছ আছে। নিমগাছের তলায় বহু পাথর জড়ো হয়ে আছে; যেগুলিকে কামনা পাথর বলা হয়। শোনা যায় মানুষের হাড়ে তৈরী একটি মহাশঙ্খের মালা গোপনে মন্দিরের মধ্যে সংগোপনে সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল। শ্রীপঞ্চমী, রবিবার ও মঙ্গলবারে দেবীর বিশেষ পূজা হয়। মাঘ মাসের প্রথমে বিশেষ পূজা ও উৎসব উপলক্ষে একটি বিরাট মেলা বসে। এই সময়ে প্রায় সহস্রাধিক ছাগ বলিদান করা হয়।

কল্যাণেশ্বরীতে হিন্দু ও আদিবাসী গোষ্ঠীর বিবাহ অনুষ্ঠানটি বড়ই বিচিত্র। পাত্র ও পাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে তাদের অভিভাবকবৃন্দ মন্দির প্রাঙ্গণের চারপাশে বিবাহের আসর জমায়। এই সকল বিবাহের অনুষ্ঠান অত্যন্ত সহজ ও সরল। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের বিবাহ অনুষ্ঠান স্বগৃহে সমাপন করা হ'লেও কয়েকটি বিশেষ অনুষ্ঠান মন্দির প্রাঙ্গণে করার বিধি আছে। বিবাহ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হ'লে বর ও কন্যাপক্ষ নিজেদের সাধ্যানুযায়ী আত্মীয়স্বজন নিয়ে এইখানেই আহার কার্য সমাধা করেন। ১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মার্চ তারিখে এখানে প্রায় ৭০টি গণবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে রয়েছে ১৩৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমা সারদামণি মাতৃ আশ্রম এবং একটু দূরে ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত কল্যাণেশ্বরী সর্বজনীন দুর্গামন্দির।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। *Unique Temples of West Bengal* (Hindusthan Standard, dated 14th January, 1973)—Adris Banerjee.

২। পূর্ব ভারতে লকুলীশ—অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবাসী ; ১৩৭৭)।

৩। J. A. S. B. 1936.

৪। *A Report of a Tour through the Bengal Province* in 1872-73, Vol. VIII—J.D. Beglar.

কাটোয়া

অজয়-ভাগীরথী সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কাটোয়া একটি সমৃদ্ধশালী ও ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন নগর। বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থান রূপে কাটোয়া বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। অরিয়নের বিবরণে অ্যামেষ্টি নদীর তীরে অবস্থিত 'কট্টদ্বীপ' নামক স্থানের উল্লেখ আছে, যা সেণ্ট মার্টিনের মতে একালের কাটোয়া। ভবিষ্যৎ ব্রহ্মখণ্ড নামক অর্বাচীনকালে রচিত পৌরাণিক বিবরণে গৌড় জনপদের অন্তর্গত কণ্টকপত্তনের নাম জানা যায়। কাটোয়া নামে পরিচিতি লাভের পূর্বে কণ্টকপত্তন, কণ্টকনগর, কট্টদ্বীপ, কাটাদ্বীপ ইত্যাদি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অরিয়ন অজয় নদের তীরে কাটোয়ার অবস্থিতির কথা বর্ণনা করলেও গঙ্গা বা ভাগীরথীর নাম এখানে অনুপস্থিত। তবে কি দু'হাজার বছর পূর্বে ভাগীরথীর প্রবাহ পথ কাটোয়া শহরের নিকটবর্তী ছিল না? অন্যথায় গঙ্গার ন্যায় প্রসিদ্ধ নদীর উল্লেখ না করে তিনি একটি অতি সাধারণ নদীর তীরে কাটোয়ার অবস্থিতির কথা বর্ণনা করেছিলেন।

ইতিহাসের বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী হলেও ষোড়শ শতকের পূর্বে কাটোয়ার কোন পরিচয় জানা যায় না। ১৫১১ খ্রীস্টাব্দে কেশবভারতীর নিকট শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করায় কাটোয়া পঞ্চ-বৈষ্ণবতীর্থের মধ্যে অন্যতম তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, তাঁর অগ্রজ বিশ্বরূপও কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। উক্ত ঘটনার পর হতে বহু বৈষ্ণব মহান্ত, সাধক ও সাহিত্যিকের বসবাসের জন্য কাটোয়ার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শোনা যায় যে, নিমাই-এর সন্ন্যাস গ্রহণের স্থান বলে শচীমাতা আক্ষেপ করে কাটোয়াকে 'কণ্টকনগর' বলেছিলেন।

নবাবী আমলে কাটোয়া শহরের 'বাগানেপাড়া' অঞ্চলটি 'গঞ্জমুরশিদপুর' নামে খ্যাত ছিল। সপ্তদশ শতকে এখানে একটি গড় নির্মাণের কথা শোনা যায় এবং ঐ গড়খাই-এর

কিছু অস্তিত্ব আজও রয়েছে। শাসনকার্যের সুবন্দোবস্ত ও অপরাধ নিবারণার্থে মুর্শিদ-কুলী খাঁর আমলে এখানে একটি থানা বা চৌকি স্থাপিত হয়েছিল। সমসাময়িককালে রচিত গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, এখানে নবাবী আমলে একটি শয্যাগার ছিল। রেভাঃ লঙ ও 'তীর্থমঙ্গল'-এর বিবরণে উল্লেখ আছে যে, ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে কাটোয়ার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। ১৭৭০-৭১ খ্রীস্টাব্দে রচিত কবি বিজয়রামের তীর্থমঙ্গল কাব্যে কাটোয়ার ব্যবসাবাণিজ্যের খ্যাতি বর্ণিত হয়েছে,—

'অপূর্ব শহর খান কতেক বাজারে।
ইহার সমান স্থান নাহি এথাকারে ॥'

কাটোয়া বাগানেপাড়া পল্লীতে অবস্থিত একটি পুরাতন মসজিদ ও মাজার নির্মাণ কাহিনীর সঙ্গে মোগল আমলের অন্তিম পর্বের ইতিহাস জড়িত আছ। সম্রাট ফারুক শাহ কর্তৃক পূর্বতম সম্রাট জাহান্দার শাহ ও তাঁর উজির জুলফিকার খান নৃশংসভাবে নিহত হওয়ায় উজিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহ আলম খান প্রাণভয়ে আত্মীয়স্বজন সহ দিল্লী হতে পলায়ন করে কাটোয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় তিনি ১৭০০০ টাকার আয়ের ১১খানি মৌজার রাজস্ব লাভ করেন এবং ঐ অর্থের দ্বারা শাহ আলম খান ছ'টি গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ, পাথরের বাঁধ ও গড় নির্মাণ করান (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১১৫)। বাঁধ ও গড়ের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু ৪টি মিনার সহ ছ'গম্বুজের মসজিদের মধ্যে ৩টি শিলালিপিতে সম্রাট ফারুক শাহ ও আলম খানের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। মসজিদে প্রবেশ করার সময় পাথরের তৈরী একটি সুদৃশ্য তোরণ দেখা যায়। এই তোরণে ব্যবহৃত প্রস্তরখণ্ডে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ক্ষোদিত আছে। মনে হয় ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের উপাদান এই তোরণ নির্মাণের সময় ব্যবহৃত হয়েছিল। জনশ্রুতি এই যে, আলম খান একজন বীরপুরুষ ছিলেন; তাঁর লৌহনির্মিত বর্মটির ওজন ছিল প্রায় সাড়ে তিন মন। বর্গী হাঙ্গামার ফলে কাটোয়া সহ সমগ্র ইন্দ্রাণী পরগণা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল; সমসাময়িককালে রচিত গ্রন্থ হতে বিস্তারিত ঘটনা জানা যাবে।

কাটোয়ার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতি বিজড়িত গৌরাঙ্গ বাড়ী। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর কুলাই হতে তিনটি গৌরবিগ্রহ নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং তন্মধ্যে বড় বিগ্রহটি কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে যদুনন্দনের বংশধরগণ গৌর বিগ্রহের পাশে নিত্যানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন গৌরাঙ্গ বাড়ী ও কেশবভারতীর আশ্রম গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বিগত শতকের শেষ ভাগে গৌরাঙ্গ বাড়ীতে দু'টি দালান মন্দির নির্মিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠালিপি হতে জানা যায় যে, বাম ভাগে অবস্থিত দালান মন্দিরটি ১২৮৮ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মূল প্রবেশ পথের বামে শ্রীচৈতন্যদেবের মস্তক মুণ্ডনের স্থান এবং তার পাশে রয়েছে কেশবভারতী ও গদাধর দাসের সমাধিস্থল। গৌরাঙ্গ বাড়ীর সুউচ্চ তোরণটি প্রায় ৭০

বছর পূর্বে কাটোয়া নিবাসী নিরঞ্জন মল্লিকের জামাতা কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। গৌরাঙ্গ বাড়ীর সন্নিকটে একটি দালান মন্দিরে কাষ্ঠ নির্মিত একটি প্রাচীন রাধাকান্ত বিগ্রহ সেবাপূজা পাচ্ছেন। এই অপূর্ব কৃষ্ণ বিগ্রহটি উপবিষ্ট অবস্থায় রয়েছেন। শোনা যায় যে, ঠাকুরপুকুরের পঙ্কোদ্ধারের সময় এই বিগ্রহটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। আর একটু এগিয়ে গেলে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সাক্ষাৎ লাভ হবে এবং এই বিগ্রহটি একটি দালান মন্দিরের মধ্যে সেবাপূজা পাচ্ছেন। শহরের পূর্বভাগে থানা রোডের উপর অপর একটি দালান মন্দিরে নিতাই-গৌর ও রাধাবল্লভের অপূর্ব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বিগ্রহগুলি বীরভূম জেলায় রাণী ভবাণীর দেবোত্তরভুক্ত ছিল এবং প্রায় ১০০ বছর পূর্বে বর্তমান সেবাইত-বংশ বিগ্রহগুলিসহ বসবাসের নিমিত্ত কাটোয়ায় চলে আসেন। রাধামাধব বিগ্রহ কাটোয়া শহরে প্রতিষ্ঠিত হলেও বৎসরের কয়েকটি বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট কিছু গ্রামে অবস্থান করেন।

মাধাই তলায় রয়েছে মাধাই-এর সমাধি। সপ্তদশ শতকে মথুরাবাসী গোপীচরণ দাস বাবাজী নিতাই-গৌর বিগ্রহ সহ ১০৮টি শালগ্রাম শিলা সঙ্গে এনে মাধাই-এর সমাধি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। শহরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে রয়েছে সখীর আখড়া। শ্রীচৈতন্যদেবের ক্ষৌরকার মধু নাপিতের স্মৃতি বিজড়িত এই আখড়ায় একটি পাথরের উপর ক্ষোদিত মহাপ্রভুর পদচিহ্ন আছে। এখানে একটি শ্বেত পাথরের ক্ষুদ্র বুদ্ধ মূর্তির পাদপীঠে 'বিম্বিদাস' নামটি ক্ষোদিত রয়েছে।

শহরের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরী তলায় সিদ্ধেশ্বরী কালিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। জনশ্রুতি এই যে, প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে তিনি বিশু ডাকাতের আরাধ্যা দেবী ছিলেন এবং বিশু ডাকাতের মৃত্যুর পর দেবীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে আলমখান কাটোয়ায় বসবাস করার সময় মূর্তিটির সন্ধান পেয়ে হিন্দুদের দান করেন। প্রাচীন মূর্তি বিনষ্ট হওয়ায় ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে কাটোয়া নিবাসী মুচিরাম দত্ত দেবীর নূতন মন্দির ও পাষাণ মূর্তি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, যা আজও নিত্যসেবাপূজা পাচ্ছেন।

কাটোয়া শহরে মুসলমান বাসিন্দার সংখ্যা নেহাত কম নয় এবং তাঁদের উপাসনার জন্য কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, যেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য না থাকলেও পুরাতন মসজিদ স্থাপত্যের নিদর্শন বলা যায়। কাছারী রোডের উপর নির্মিত মসজিদটি ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। সাহেববাগান পল্লীতে উইলিয়ম কেরীর পুত্র জুনিয়ার কেরীর সমাধি রয়েছে একটি প্রাচীর বেষ্টিত চত্বরের মধ্যে। এছাড়া এখানে আরও কয়েকটি অজ্ঞাতনামা খ্রীস্টানের সমাধিস্তম্ভ রয়েছে। আট ফুট উচ্চ সমাধিস্তম্ভগুলি পাতলা ইঁটের তৈরী ছিল। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য জুনিয়ার কেরী কাটোয়ায় আগমন করেন এবং তাঁর পূর্বে চেম্বারলিন ও ট্রাইফেনথ্যলা নামক আরও দু'জন খ্রীস্টান ধর্মযাজক এখানে এসেছিলেন। সাহেববাগানে একটি গীর্জা নির্মাণের কথা শোনা গেলেও গীর্জার

কোন নিদর্শন দেখা যায় না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ইন্দ্রাণী পরগণার অধীনস্থ কাটোয়া শহরের নিকটে প্রাচীন ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের অবস্থিতি ছিল এবং ঐ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের বহু চিহ্ন কাটোয়া শহরের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। তম্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল সমবায় ব্যাঙ্কের প্রবেশ পথের উপরিভাগ যে প্রস্তরখণ্ড দিয়ে সাজান আছে, সেটি বিকিহাট হতে আনীত হয়েছিল। উক্ত প্রস্তর খণ্ডের উপর গণেশের মূর্তি ক্ষোদিত আছে। অনুরূপ একটি প্রস্তরখণ্ড কাটোয়া নিবাসী অনাদি মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আনীত হয়েছিল, যার উপর সম্ভবতঃ ইন্দ্রাণী মূর্তি ক্ষোদিত রয়েছে। এতদঞ্চলে পুরাকীর্তি প্রেমী ও তথ্যানুসন্ধানী ব্যক্তি হিসাবে আয়ুব হোসেন ও অধ্যাপক ডঃ কালিচরণ দাসের নাম সর্বজনবিদিত। তাঁরা আজও তথ্যানুসন্ধানের কাজে আত্মনিয়োগ করে আছেন। আয়ুব হোসেনের চেষ্টায় কাটোয়া মহকুমা গ্রন্থাগারে বহু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগৃহীত ও সংরক্ষিত করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মহকুমার সদর শহর কাটোয়ার খ্যাতির মূলে ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা। অতীতে স্থলপথ ও জলপথে কাটোয়ার সঙ্গে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কাটোয়ার প্রসিদ্ধি বহুকাল ধরে চলে আসছে। ইন্দ্রাণীর অন্তর্গত কয়েকটি হাটের অবস্থিতি একালের কাটোয়ার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। শাসনকার্য ও ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য কাটোয়ার প্রসিদ্ধি থাকায় ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে এখানে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে মহকুমা সদর কার্যালয় স্থাপিত হয় এবং পরের বৎসর মুন্সেফের কার্যালয়, জেলখানা, সাবট্রেজারী অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান হাসপাতালের পূর্বভাগে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে এখানে প্রথম সরকারী হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল। বঙ্গদেশের অন্যান্য (দ্বিতীয় পর্যায়ের) পৌরসভাগুলির ন্যায় ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল কাটোয়া পৌরসভার সৃষ্টি হয়। স্থলপথ পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কাটোয়ার সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা নবাবী আমল হতে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ব্যাণ্ডেল-কালনা-নবদ্বীপ ও কাটোয়া হয়ে বারহাওড়া পর্যন্ত রেলপথ প্রসারিত হওয়ায় কাটোয়ার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান-কাটোয়া ও ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে আহমদপুর-কাটোয়া লাইট রেলওয়ে স্থাপনের ফলে এক বিস্তৃত কৃষি অঞ্চলের সঙ্গে কাটোয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠে এবং এই শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, অষ্টাদশ শতকে ফোর্ট উইলিয়ম হতে হুগলী, কালনা, পাটুলি হয়ে স্থল-পথে কাটোয়া যাতায়াত করা হত এবং এই পথ ধরে পলাশির যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে ক্লাইভ সসৈন্যে কাটোয়া ও শাঁকাই অধিকার করেন। আজও সাধারণে বসতপুর ও বল্লভপাড়ার বিস্তৃত ময়দানকে ছাউনীডাঙ্গা বলে।

মহকুমা শহররূপে কাটোয়ার পরিচিতি হলেও গ্রামবাংলার কৃষিপ্রধান অঞ্চলের

মধ্যে শহরটি অবস্থিত হওয়ায় গ্রামীণ সংস্কৃতি ও কৃষিভিত্তিক উৎসবগুলির সঙ্গে এখানকার অধিবাসীগণের নিবিড় যোগাযোগ আছে। রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্য পূজা ব্যতীত ঝুলন, দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি ও ১লা মাঘ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের দিনটিকে স্মরণ করে মহোৎসব পালিত হয়। ১লা মাঘ শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহকে কৌপিন, ডোর গেরুয়া বস্ত্র, কমণ্ডুল ও দণ্ড হাতে দিয়ে সাজান হয় এবং পুনরায় পরদিবসে যথারীতি পরিচিত পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে সারা বৎসর ধরে শ্রীমন্দিরে অবস্থান করেন। প্রতি তিন বৎসর অন্তর শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগ অনুষ্ঠান হয় এবং এই সময়ে মন্দির-দ্বার রুদ্ধ করে সেবা পূজা হয়ে থাকে। গৌরাঙ্গ বাড়ীতে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে গদাধরদাসের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে ভক্ত বৈষ্ণব ও কীর্তনীয়ার দল নাম-গান ও কীর্তনের জন্য এখানে উপস্থিত হন।

কাটোয়ায় সর্বজনীন উৎসব হল কার্তিক পূজা ও কার্তিক লড়াই। কেবলমাত্র কাটোয়া শহরই নয়, যেন সারা মহকুমার মানুষ কার্তিক লড়াই দেখার ঔৎসুক্যে সারা-বছর অধীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে থাকেন। আনন্দ ও উন্মাদনায় সমগ্র অঞ্চলটি মেতে উঠে। কার্তিক মাসের শেষ দিনে কার্তিক পূজা হয় এবং প্রধানতঃ বারোয়ারী পূজা সংগঠকগণের দ্বারা বড় বড় পূজাগুলি পরিচালিত হয়। ১লা অগ্রহায়ণ হল বিসর্জনের দিন, যাকে স্থানীয় মানুষেরা 'কার্তিক লড়াই' বলে আখ্যা দিয়েছেন। বাঁশের তৈরী পৈঠা বা সিঁড়ির মত দেখতে সুউচ্চ থাকাগুলি সাজান হয়। প্রতিটি থাকায় সামাজিক, পৌরাণিক ও ধর্মীয় কাহিনী অবলম্বনে ৪০।৪৫টি মাটির পুতুল ঘটনাবিন্যাস ক্রমে সাজান হয়। স্থানীয় শিল্পীদের তৈরী মূর্তিগুলি যেন সজীব ও সুবিন্যস্ত। বিসর্জনের দিন বিভিন্ন পূজামণ্ডপ হতে শোভাযাত্রা সহকারে শহর পরিক্রমার পর গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। মূর্তি নির্মাণ, আলোক-সজ্জা, থাকা সাজান, বাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যেকটি পূজাপণ্ডপের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলে দু'দিন ধরে ; সেকারণে স্থানীয় লোকে পূজা-অনুষ্ঠানটিকে 'কার্তিক লড়াই' আখ্যা দিয়েছে।

কার্তিক পূজার উদ্ভব সম্পর্কে অধ্যাপক ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কয়েকটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন 'ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে। তাঁর মতে কার্তিক একজন লৌকিক দেবতা যিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তবে ইনি আদিতে ছিলেন কৃষি ও প্রজননের দেবতা—যাঁর পূজা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রচলিত ছিল এবং কার্তিকের প্রণয়িনী লৌকিক ধর্মে সন্তানোৎপাদনের অধিষ্ঠাত্রী ষষ্ঠী দেবী নামে পূজিতা। 'কার্তিকের পূজা হয় প্রতীকে—একটি মাটির পাত্র বা সরায় কিছু বীজ বপন করে সেই বীজ থেকে উদ্ভূত চারাগাছগুলিই হল দেবতার প্রতীক। কার্তিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন ; আবার ঐ দিন ইতুপূজা ও সাঁজ পূজনী ব্রত আরম্ভ হয়। বর্ধমান জেলায় কৃষকেরা জমি হতে আড়াই আটি ধান কেটে এনে লৌকিক ও ব্রাহ্মণ্য মতে পূজা করে—এই প্রথাটিকে স্থানীয়

ভাষায় 'মুঠ' আনা বলে। এই প্রথার সঙ্গে নবান্ন উৎসবের যোগসূত্র ছিল, কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলি তাৎপর্যহীন হয়ে গেছে। তবে কার্তিক পুজো অনুষ্ঠানের প্রচলিত লোক-বিশ্বাস হল এই যে, কার্তিক পুজো করলে কার্তিকের মত পুত্র লাভ হয়। আবার কাটোয়া ও চুঁচুড়া শহরের গণিকাপল্লীতে কার্তিক পুজোর সমারোহ ছিল। কিন্তু উভয় শহরেই বারোয়ারী পুজো সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও গণিকাপল্লীর পুজোগুলি একেবারেই কমে গেছে। তবে কাটোয়ার চুনুরি পাড়ায় বিরাট ন্যাংটো কার্তিকের পুজো আজও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কার্তিক পুজোর বহিরঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ছাপ থাকলেও তিনি লৌকিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কৃষি ও প্রজননের দেবতারূপে কাটোয়া, চুঁচুড়া, কৃষ্ণনগর এবং গ্রামবাংলায় সন্তানেচ্ছুগণের দ্বারা পূজিত হয়ে আছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। রায়শেখরের পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
২। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
৩। কাটোয়া দর্শন—ডঃ কালিচরণ দাস।
৪। দেশ (১৪ই নভেম্বর, ১৯৮৭) ঃ কার্তিকপূজা ঃ ঐতিহ্য ও লোকায়ন, সুধীর চক্রবর্তী।
৫। *J.A S.B*, 1917.
৬। *The Maathir-ul-umara* (Eng. Tr.)—H. Beveridge.

শ্রীপাট অম্বিকা-কালনা

(ধর্ম-সাধনা ও পুরাতত্ত্বের আলোকে)

পুণ্যসলিলা ভাগীরথী নদীর পশ্চিমকূলে বাংলার ইতিহাস ও ধর্মীয় আন্দোলনের বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী হল 'শ্রীপাটঅম্বিকা-কালনা'। বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে অবস্থিত কালনা মহকুমার সদর শহর অম্বিকা-কালনা বা শ্রীপাট অম্বিকা-কালনা একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু স্থানরূপে পরিচিত। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে এই স্থানটি আম্বুয়া বা অম্বুয়া-মুলুক নামে উল্লিখিত হয়েছে। 'মুলুক' শব্দ অন্তপদে থাকায় এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এখানে সুলতানী আমলে কোন শাসন কার্যালয় ছিল। শ্রীপাট অম্বিকা-কালনা নামকরণের সার্থকতা সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থরূপে চিহ্নিত হওয়ায় অন্যান্য স্থানের ন্যায় 'শ্রীপাট' শব্দটি স্থান-নামের

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 'অম্বিকা' নামটি এসেছে দুর্গার নামের পরিবর্তে; নগরদেবী মহিষমর্দিনী প্রতিষ্ঠিত আছেন এই শহরে। ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুকুমার সেনের মতে 'কালনা' শব্দটি কল্যাণ শব্দ হতে জাত। কালনা নামে আরও কয়েকটি স্থানের সন্ধান পাওয়া যায় এবং আলোচ্য স্থানের সঙ্গে সে সকল নামের পার্থক্য বোঝাতে বা নাম বিভ্রাট এড়াবার জন্য শহরটি 'শ্রীপাট অম্বিকা-কালনা' বা 'অম্বিকা-কালনা' নামে চিহ্নিত হয়েছে।

কালনার অতীত ইতিহাসের সন্ধান না পাওয়া গেলেও সুলতান রুকুন-উদ্দিন কৈকায়ুসের (১২৯১-১৩০১ খ্রীষ্টাব্দ) আমলে জাফর খাঁ কর্তৃক সপ্তগ্রাম অধিকারের পর হতে সামরিক ঘাঁটি বা প্রতিরক্ষার দিকে অম্বুয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় একথা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। এই অনুমানের প্রধান ভিত্তি হল এই যে, মুসলমান আমলে রাজপুরুষেরা এখানে বসবাসের সময়ে দু'টি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদগুলি ধ্বংস হলেও প্রতিষ্ঠালিপি হতে পরোক্ষভাবে একথা প্রমাণিত হয়।

অম্বিকা স্থাননাম প্রসঙ্গে গবেষকগণ ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পোষণ করেছেন। এদেশে স্থান নামের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নামের সঙ্গে একটা কল্পিত যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, অম্বুঋষির আশ্রম-স্থল হিসাবে স্থানটি অম্বিকা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। স্বর্গীয় বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন,—"অম্বিকা-কালনার অম্বিকা জৈনদেবী ছিলেন। পরে তিনি হিন্দু শক্তি পুজায় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়েছেন। বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবের যুগেই বাংলা দেশে অম্বিকা-পুজার প্রচলন ছিল মনে হয়। অর্থাৎ পাল যুগে। অম্বিকা-কালনার ইতিহাস হিন্দু পাল যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত না হলে 'অম্বিকা' কথার ব্যাখ্যা করা যায় না।" বিনয় ঘোষ U.P. Saha রচিত 'Iconography of the Jain Goddess Ambika' নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে (Journal of the University of Bombay, 1940-এ প্রকাশিত) উক্ত মন্তব্য করেছেন। তিনি হিন্দু পাল যুগ অর্থে কি বলতে চেয়েছেন তা বোঝা গেল না। U. P. Saha প্রবন্ধটি মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও রাজস্থানের জৈনধর্ম প্রসারের প্রেক্ষাপটে রচিত এবং যেসকল অম্বিকামূর্তি পলিতানা, দিলওয়াড়া ও দেওগড়ে পাওয়া গেছে লেখকের আলোচ্য বিষয়বস্তু ঐ সকল অঞ্চলের মধ্যে প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। উপরোক্ত স্থানসমূহে পুজিত মূর্তির সঙ্গে বঙ্গদেশের অম্বিকা পুজার কোন সম্পর্ক নাই। প্রকারান্তরে বলা যায়,—'...she is by name and appearance a borrowed form of Durga. Amba, Ambica and Ambalika are names of Durga. She has further the name, as in this case, of Kusmandini. Kusmandini is the name of Durga. Kusmandas were a hilly clan attached to Lord Siva'. জৈন শাস্ত্রে বর্ণিত মূর্তিতত্ত্ব আলোচনা হতে জানা যায় যে, তীর্থঙ্করগণ ও তাঁদের বাহনগণের মূর্তি প্রথমে নির্মিত ও পুজিত হয়। দেবীমূর্তিগুলি পরবর্তী-

কালে জৈনধর্মে স্থান লাভ করেছিল।

হিন্দু দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি, ধ্যান, মন্ত্র ও মূর্তি নির্মাণ শাস্ত্র হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জৈনদেবী অম্বিকা অপেক্ষা অম্বিকা বা দুর্গা বা মহিষমর্দিনীর পূজা প্রাচীন। বেদ, আরণ্যক, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র বর্ণিত অম্বিকার পরিচয় বহু পূর্বকালের। সর্বপ্রথম শুক্ল যজুর্বেদে অম্বিকার উল্লেখ আছে। বাজসেনেয়ি সংহিতায় আছে,—'এষতে রুদ্রভাগ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষাস্ব স্বাহা' (৩।৫৭)। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে রুদ্রকে নমস্কার প্রসঙ্গে পাওয়া যায়,—'অম্বিকাপতয়ে, উমাপতয়ে পশুপতয়ে নমো নমঃ (১০/১৮/১)। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে যে, শুম্ভ ও নিশুম্ভাসুরের চণ্ড ও মুণ্ড নামক অনুচরদ্বয় অম্বিকার সেই মনোহররূপ দর্শন করিল (৮৫/৪২)। কুব্জিকাতন্ত্রে পাওয়া যায়, গোবর্ধন পীঠের (নাসিকের নিকট) অধিষ্ঠাত্রী দেবী অম্বিকা। কুব্জিকাতন্ত্রে সিদ্ধপীঠ নির্ণয় প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে,—'বদরী চ মহাপীঠ অম্বিকা বর্ধমানকম্'। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে 'অম্বিকা' নামক সিদ্ধপীঠের অবস্থান হল বর্তমান অম্বিকা কালনায় (Sakta Pithas, p. 81)। মহাকবি কালিদাস 'কুমারসম্ভব' কাব্যে (৬।৯০) পার্বতীকে অম্বিকা নামে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া বহু উদাহরণ দেওয়া যায়, তবে বাহুল্য ভয়ে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। বিনয় ঘোষ সম্ভবতঃ বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, দুর্গা বা অম্বিকার অপর নাম হল মহিষমর্দিনী। কৃত্তিবাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়,—

'আশ্বিনে অম্বিকামূর্তি যদি দেখিতে পাই।
তবে সে প্রত্যয় হয় ঘরে ফিরে যাই ॥'

অম্বিকা-কালনায় মহিষমর্দিনীর পূজা বহুকালের এবং আজও সাড়ম্বরে সেই পূজা চলে আসছে। জৈন দেবী অম্বিকার নামানুসারে 'অম্বিকা' স্থাননামটি গ্রহণ করা হয় নাই। আবার প্রমানাভাবে অম্বুঋষির উপাসনার স্থানরূপে 'অম্বিকা' নামটি গ্রহণ করার অসুবিধা আছে। এতদঞ্চলে জৈনধর্মের প্রচার ও প্রসারের কোন প্রাচীন প্রমাণ বা এ যুগেও কোন যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

খানসাহেব মৌলবী ওয়ালির মতে হিন্দু ও মুসলমান যুগে কালনা একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে সরকার সাতগাঁও-এর অন্তর্ভুক্ত 'অম্বোয়া' নামের একটি পরগণার ; কিন্তু রাইপুর পরগণা অম্বোয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় পরবর্তীকালে অম্বিকা-রাইপুর নামক পরগণার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে জাফর খাঁর আমলে অম্বোয়া পরগণাকে চাকলা বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং উক্ত সময়কাল হতে আরম্ভ করে আজও অম্বিকা-কালনা বর্ধমান জেলার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে আছে। ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে ভন. ডেন. ব্রুকের মানচিত্রে প্রদর্শিত 'Ambowa' হল একালের অম্বিকা-কালনা।

মঙ্গলকাব্যে সর্বপ্রথম বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসাবিজয়' কাব্যে অম্বুয়ার উল্লেখ আছে অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে অম্বুয়া ছিল একটি প্রসিদ্ধ স্থান। 'মনসাবিজয়'

হতে জানা যায়,—

'ইন্দ্রানি বাহিয়া নদিয়ায় উপনীত
আঁবুয়া বাহিয়া গিয়া চাপাত্র বুহিত।
রন্ধন ভোজন করি গোঁয়ায় রজনী
বাহ বাহ বলি ডাকে চাঁদো নৃপমণি।
বুহিত্র বাহিয়া সুখে চলিল প্রভাতে
ফুলিয়া বাহিয়া হাতিকান্দা উপনীতে।'

বর্ধমানের কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে উল্লেখ আছে,—

'নায়ের পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক
ডাহিনে রহিল পুরী অম্বয়া মুলুক।

অথবা,

ডাহিনে রহিল সহর আম্বুয়া মুলুক।'

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে রচিত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত আছে সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যদেব কাটোয়া হতে শান্তিপুরে উপনীত হন। শান্তিপুরে তিনদিন অবস্থানের পর তিনি শ্রীক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে আছে, শান্তিপুর হতে বহির্গত হয়ে সপারিষদ শ্রীচৈতন্যদেব,—

'হেন মতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসিয়া আটিসরা নগরেতে॥"

কিন্তু জয়ানন্দের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেব অন্য পথে প্রথমবার শ্রীক্ষেত্র পেঁছোছিলেন। 'চৈতন্যমঙ্গলে' বর্ণিত আছে,—

'রজনী প্রভাতে শান্তিপুর ছাড়িয়া
আম্বুয়াএ দিল দরশন।
আচার্য জগন্নাথ সভাই মেলিয়া
করিল শরণ॥
নানা মহোৎসবে রজনী বঞিয়া
সুরনদী করিয়া বামে
কাঁচমণি বেড়া ডাহিনে থুয়্যা
উত্তরিলা কুলীনগ্রামে॥'

এরপর দামাদর বা দেবনদ পার হয়ে তাম্রলিপ্তে গমন করেন। বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দ উভয়েই সমসাময়িক ব্যক্তি, কিন্তু যাত্রাপথ বর্ণনা প্রসঙ্গে উভয়ের অভিমত হল ভিন্ন। শ্রীপাট অম্বিকা-কালনা গৌর-গৌরীদাসের মিলনস্থল রূপে প্রসিদ্ধ। কালনা শহরের দক্ষিণ ভাগে একটি প্রাচীন তেঁতুল বৃক্ষতলে একটি ফলকে লিখিত আছে,— 'শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান আমলিতলা ঃ শ্রীগৌর ও গৌরীদাসের সম্মিলন স্থান।' সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে গৌর-গৌরীদাসের মিলন হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত বৈষ্ণব বন্দনায় পাওয়া যায়,—

প্রভু বিদ্যমানে মূর্ত্তি করিল প্রকাশ।
যে মূর্তি দেখিলে কর্ম্মবন্ধের বিনাশ ॥'

শ্রীচৈতন্যদেবের পুরী গমনের পর নিত্যানন্দ প্রভু বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও নামসংকীর্তনে সমগ্র বঙ্গদেশ মাতিয়ে তুললেন এবং এই সময়ে তিনি যে অম্বুয়া মুলুকে এসেছিলেন তার উল্লেখ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে আছে,—

'জয় জয় অবধূত চন্দ্র মহাশয়।
যাহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয় ॥
এই মতে সপ্তগ্রামে অম্বয়া মুল্লুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে ॥'

অম্বুয়া মুলুকে গৌরীদাস পণ্ডিত বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে নেতৃত্বপদ গ্রহণ করেন। ভাগীরথীর এক তীরে শান্তিপুর ও অপর তীরে কালনা অবস্থিত। সেকালের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহান্তগণ শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরপারে গিয়ে গৌরীদাসের সঙ্গে মিলিত হতেন। নদীয়া জেলার শালিগ্রাম নিবাসী সূর্যদাস সরখেল ও গৌরীদাস সরখেল পরিণত বয়সে স্বগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক অম্বুয়ায় বসবাসের নিমিত্ত আগমন করেন। গৌরভক্ত গৌরীদাসের আগমনের ফলে অম্বুয়া শ্রীপাটরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে (শ্লোক নং ১২৮),—

'সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাস পণ্ডিতঃ ॥

ঐ গ্রন্থের অন্যত্র আছে,—

'পুরা সুবলচন্দ্রং শ্রীগৌরীদাসং গুণান্বিতম্।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রিয়মহং ভজে ॥'

অর্থাৎ পূর্বে কৃষ্ণলীলার সুবলচন্দ্র, অধুনা গৌরলীলায় মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় গুণবান শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতকে ভজনা করি।

বিবাহসূত্রে গৌরীদাস ছিলেন নিত্যানন্দের খুড়া-শ্বশুর। গৌরীদাসের দুই ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহ হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের দেহত্যাগের পর নিত্যানন্দ সূর্যদাসের বসুধা ও জাহ্নবা নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ও গৌরীদাসের মিলনের বিস্তারিত বিবরণ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হতে জানা যায়। শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুর প্রত্যাবর্তনের পথে হরিনদী গ্রাম হতে অম্বিকায় গৌরীদাস পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হন এবং গৌরীদাসকে নৌকার বৈঠা ও গীতা প্রদান করেন। মহাপ্রভুর আদেশে নবদ্বীপ হতে নিম্ববৃক্ষ আনাইয়া গৌরীদাস নিতাই-গৌর মূর্তি নির্মাণ করে শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। বৈঠা ও গীতাখানি আজও শ্রীমন্দিরে আছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় তাঁর আদেশে বিগ্রহ নির্মাণের ব্যাপারটি একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এ বিষয়ে মুরারি গুপ্ত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বা বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে কোন উল্লেখ মাত্র নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথমবার শান্তিপুর

আগমনের অন্ততঃপক্ষে দু'শ বছর পরে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেব কোন অবস্থায় তাঁর বিগ্রহ নির্মাণ করে সেবাপূজা করার কথা কারও কাছে ইঙ্গিতেও প্রকাশ করেন নাই। নরহরি চক্রবর্তী গৌরীদাসের মাহাত্ম্য বাড়াতে শ্রীচৈতন্যদেব কথিত বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গৌরীদাস গৌর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

গৌরীদাস পণ্ডিত ছিলেন নিত্যানন্দ শাখার দ্বাদশ গোপালের অন্যতম মহান্ত এবং একজন বিশিষ্ট চৈতন্য-উপাসকরূপে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। গৌরীদাসের নেতৃত্বে কালনায় বৈষ্ণব সমাজ গড়ে উঠেছিল। তিনি যে একটি চৈতন্য জীবনী রচনা করেছিলেন সে কথা জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' হতে জানা যায়,—

'গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি ॥' (আদি-১/৬৭)

নবদ্বীপবাসী বাণীনাথের পুত্র ও গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয়চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ দেখে গৌরীদাস তাঁকে গৌর-নিতাই বিগ্রহের সেবায় নিয়োজিত করেন। গৌরীদাসের পর হৃদয়চৈতন্য এখানে শ্রীপাট স্থাপন করেন। মেদিনীপুর জেলার ধরেন্দা-বাহাদুরপুর নিবাসী কৃষ্ণদাস মণ্ডল কালনায় নিতাই-গৌর বিগ্রহ দর্শনে মোহিত হন এবং এই ব্যক্তির বিশুদ্ধ ভাব দর্শনে প্রীত হয়ে হৃদয়-চৈতন্য তাঁকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেন এবং পরবর্তীকালে তিনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহান্ত শ্যামানন্দ নামে খ্যাতি লাভ করেন। প্যারিগঞ্জ পল্লীতে নকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট আছে। গৌড়বাসীগণকে উদ্ধারের জন্য নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে শ্রীচৈতন্যদেবের আবেশ ঘটায় তাঁর ভাবাবেশে হাস্য-নৃত্য-গীত-ক্রন্দনে মহাপ্রভুকে দর্শন করে ভক্তেরা পরিতৃপ্তি লাভ করত। নকুল ব্রহ্মচারীর ভাবাবেশ দেখে মোহিত হয়ে শিবানন্দ সেন সর্বসমক্ষে একথা প্রচার করেছিলেন (চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত ২।১৬-১৮)। গৌরীদাসের সমসাময়িক পরমানন্দ গুপ্ত অম্বিকাবাসী ছিলেন। পরমানন্দ কৃষ্ণস্তবাবলী গ্রন্থের রচয়িতা এবং এঁর গৃহে নিত্যানন্দ প্রভু মধ্যে মধ্যে অবস্থান করতেন (চৈ· চ· আদি ১১ / ৪৫)। নকুল ব্রহ্মচারীর শিষ্য পরম্পরারূপে খ্যাত সন্তোষদাস বাবাজী ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে কালনায় আবির্ভূত হন এবং তাঁর আশ্রমে গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে আবির্ভূত ভগবান দাস বাবাজী নামক একজন সিদ্ধ বৈষ্ণব সাধকের আশ্রমে নামব্রহ্ম সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে। ভগবান দাসের রাগানুগ সাধন-ভজন ও নামব্রহ্ম জপে আকৃষ্ট হয়ে বহু বৈষ্ণব ভক্ত ও গৃহী তাঁর আশ্রমে আসতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বৈষ্ণব তত্ত্বকথা ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে জ্ঞান লাভের নিমিত্ত ভগবান দাসের আখড়ায় এসেছিলেন। সাধন-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপও দেখা যেত (ভারতের সাধক, ২য় খণ্ড, নূতন সংস্করণ)।

ভক্তপ্রবর, সাধক, সুকবি ও শ্যামাসংগীত রচয়িতা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন অম্বিকা-কালনার বিদ্যাবাগীশ পল্লীনিবাসী মহেশ্বর ভট্টচার্যের পুত্র। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে চান্নাগ্রামে মাতুলালয়ে লালিতপালিত হন। কমলাকান্তের শ্যামা সাধনা ও শ্যামাসংগীতে আকৃষ্ট হয়ে বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র তাঁকে বোরহাটে বসবাসের জন্য অনুরোধ করেন। বোরহাটে তিনি পঞ্চমুণ্ডীর আসন ও কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানেই তাঁর সাধন মার্গের চরম বিকাশ ঘটেছিল।

অম্বিকা-কালনা কেবলমাত্র শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের তীর্থস্থান রূপে খ্যাতি লাভ করে নাই। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে মুসলমানদের নিকট শহরটি একটি পবিত্র স্থান রূপে গণ্য হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকে বিহার হতে আগত বদ-রুদ্-দীন বদরে আলম নামক একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান সাধক ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কালনায় এসে একটি খানকা নির্মাণ করেন। ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করার পর তাঁর সহযোগী শাহ মজলিস কালনায় বসবাস করেন। খাসপুর পল্লীতে একজন আফগান সর্দার মজলিস সাহেবের নামে একটি বিরাট দীঘি খনন করে দিয়েছিলেন। মসলিস দীঘির তীরে একটি মসজিদ আস্তানা ও মাজার ছিল। কিন্তু সমুদয় কীর্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ক্ষোদিত প্রস্তরখণ্ড সকল দেখে অনুমান করা যায় যে, কোন হিন্দু মন্দিরের উপাদান নিয়ে এগুলি তৈরী হয়েছিল।

কালনার প্রাচীনতম মসজিদটি সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে (১৪৮৭-৯০ খ্রীস্টাব্দ) উলুঘ আলি জাফর খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু ডঃ টি· ব্লক কর্তৃক ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত শিলালিপিটি ব্যতীত উক্ত মসজিদের কোন নিদর্শন নাই। সৈফুদ্দিনের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের আমলে হোসেন খানের পুত্র দৌলতখান কর্তৃক হিজরা ৮৯৫ অব্দে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এই মসজিদের শিলালিপি ব্যতীত অপর কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই।

(১) আল্লাহ লা এলাহা ইল্লা হুয়াল কাইয়ুম। লা তা'খুজু ওলা নাওম, লাহু মা ফিস সামাওয়াতে ওয়া ফিল আরদে। মান জাল্লাজি ইয়াসফাও এনদাহু ইল্লা বে এজনেহী ইয়ালামো।

(২) মা বাইশা আইদিহিম ওয়ামাখালফাহুম। ওয়ালা ইয়াহ ইয়াতুনা বে সাইয়িম মিন এলমে হি ইল্লা বেমাশাআ। ওয়াশেয়া কুরশিয়াহুস সামাওয়াতে ওয়াল ওয়াল আরদা ওয়ালা ইয়াওদুহু হেফজুহুমা। ওয়া হুয়াল আলিউল আজিম।

(৩) লা একরাহা ফিলুনিয়া কাদ তাবাইয়ানার রাশিদো মিনাল গাইয়ে। ফামাই ইয়া কাফার বিত্তাগুতে ওয়া ইয়ুমেনু বিল্লাহে ফাকাদ এসতামসেকা বিল উরুতেল উসাক। লা আনফুসামে লাহা ওয়াল্লাহো।

(৪) সামীউল আলীম, বানি হাজাল মাসজিদে দৌলতখান। কী আহাদেস সুলতানো এবনে সুলতানুন নাসিরুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দিনে আবু (মুজাহাদ) মাহমুদা সাহু বে আদসাহা গাজী। খালেদুল্লাহে মালেকাহু ওয়া সুলতানাহু। ফিত্তারিখো

সানাতো খামিসো ওয়া তেসইনা ওয়া নামানিয়াতা ।

সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহের মসজিদটি হিজরা ৮৯৫ অব্দে (১৪৮৯ খ্রীস্টাব্দে) নির্মিত হয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে নিম্নে উল্লিখিত শিলালিপিতে,—

ক্বালান নাবিয়ে আলায়হেস সাল্লামো মান বানি মাসজিদান ফিদ্দুনিয়া বানিল্লাহা লাহু সাবইনা কাসিরান ফিল জান্নাতে, ওয়াকাদ বানি হাজাল মাসজিদুস সুলতানেল আদলে সাইফুদ্দিন ওয়াদ্দিনে আবুল মুজাফর ফিরোজ শাহু সুলতানে খালেদিল্লাহে মালাকেহী ওয়া বানি হাজাল মাসজিদে মজালিস……ওয়া হুয়া সাঈদ……মাওরেখান সানাতুন……সামানিয়াত ।

(১) বানি হাজাল মাসজিদেল জামি ফি জামানুল মালেকুল আদলে আলাউদ্দুনিয়া ওয়াদ্দিন আবুল মুজাফর ফিরোজ শাহ ।

(২) সুলতান বিন নুসরাত্ শাহাস সুলতান খালেদুল্লাহে মালেকুহু ও সুলতানুহু বানা কারেদুহু মালিকুল মুয়াজ্জাম ওয়াল মুকরিম উলুগ মসনদ খান মালিক সেরলস্কর ওয়া উজিয়ো মালামাল্লাহু ফিদুনিয়া। মওরে খান ফিল গুররাতে মিন শাহরেল মুরারকে রামাজান সানাতো তেসআ ওয়া সালাসিনা ওয়া তেসএমাইয়াতে । কালান্নাবিয়ে আলায়হেুস্ সালামো সান বানি মাসজিদান ফিদ্দুনিয়া বানিল্লাহা সাবয়িনা কাসিরান ফিল জান্নাতে । বানি ফি আহাদেস সুলতানে ফিরোজ (শাহ্) এস্সুলতানে খালেদিল্লাহে মালেকুহু ওয়া সুলতানুহু……উলুগ আলি জাফর খান……খান……উলুগ……খামসে ওয়া তেসইনা ওয়া সামানিয়াতা ।

হোসেন শাহী বংশের রাজত্বকালে কালনার গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় । হোসেন শাহের পৌত্র ও নসরৎ শাহের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে দশ গম্বুজ বিশিষ্ট জামিয়া মসজিদ খাসপুর পল্লীতে নির্মিত হয় । মসজিদের গম্বুজগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও টেরাকোটা অলঙ্করণ ও স্থাপত্যের নিদর্শন ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের । শিলালিপি হতে জানা যায় যে, ফিরোজ শাহের উজির মালিক উলুঘ মসনদ খান হিজরা ৯৩৯ অব্দে (১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দ) এই জামিয়া মসজিদ নির্মাণ করেন । সুরবংশের রাজত্ব-কালে গিয়াসউদ্দিন আবুল মুজাফর বাহাদুর শাহের আমলে সরওয়ার খান কর্তৃক হিজরা ৯৬৭ অব্দে (১৫৫৯ খ্রীস্টাব্দ) একটি মসজিদ নির্মাণের কথা জানা যায় । এই মসজিদটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে । ঊনবিংশ শতকে কালনার জেলেপাড়া পল্লীতে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল । মসজিদের প্রতিষ্ঠালিপি হতে জানা যায় যে, পরম করুণা-ময় আল্লাহ ও তাঁর দূত মহাম্মদকে স্মরণ করে সেখ খয়েরউল্লা এই মসজিদ নির্মাণের সঙ্কল্প করেছিলেন । উক্ত মসজিদের নির্মাণকার্য হিজরা ১২৬১ অব্দের (১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দ) ৬ই ফাল্গুন শুরু হয় ও ১৪ই শ্রাবণ সমাপ্ত হয়েছিল ।

শ্রীপাট অম্বিকা-কালনায় ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে মন্দির নির্মাণের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না । অতীতে বর্ধমান রাজবংশের গঙ্গাবাসের স্থান ছিল কাটোয়ার সন্নিকটে দাঁইহাট শহরে । ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে বর্গী হাঙ্গামার সময়ে দাঁইহাটের রাজ-

প্রাসাদ মারাঠারা অধিকার করে এবং প্রাসাদটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেকারণে পরবর্তী বর্ধমানের জমিদারগণ দাঁইহাটের পরিবর্তে অম্বিকা-কালনায় গঙ্গাবাস, প্রাসাদ, সমাজবাড়ী ও প্রচুর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বর্ধমানের রাজাদের আনুকূল্যেই কালনায় এত অধিক সংখ্যক মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এমন কি এত অধিক সংখ্যক মন্দির বর্ধমান শহরেও নাই। কালনার রাজবাড়ীকে মন্দিরময় প্রাসাদ চত্বর বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। কালনা শহরে বর্ধমানের রাজাদের তৈরী মন্দিরগুলির মধ্যে রাজবাড়ী চত্বরে অবস্থিত লালজী মন্দির হল সর্বপ্রাচীন। শোনা যায়, কীর্তিচাঁদের জননী ব্রজকিশোরী দেবী এক বৈষ্ণব সাধকের নিকট হতে লালজী অর্থাৎ একটি কৃষ্ণ-মূর্তি পেয়েছিলেন। পরে শ্রীবিগ্রহের পাশে রাধিকার বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। কীর্তিচাঁদ স্বীয় প্রতিষ্ঠা জননীর অনুরোধে ১৬৬১ শকাব্দে (১৭৩৯-৪০ খ্রীস্টাব্দ) লালজী মন্দির করেন। মন্দিরলিপি হতে একথা জানা যায়,

'ষৎ-পুত্রাঃ পৃথিবীতলে সুবিদিতাঃ সৎকীর্ত্তিচন্দ্রঃ কৃতী
সা শ্রীরাজকুমারিকাঃ ব্রজকিশোরী কৃষ্ণভক্তয়র্থিনী
শাকে বৈকষড়র্ত্তুচন্দ্র গণিতে প্রাসাদমেতমূ দদৌ
রাধাকৃষ্ণ যুগায় সৎ-কবিসভামধ্যেস্থ তৎপ্রতয়ে। শকাব্দা ঃ ১৬৬১।'

লালজী মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী দেখে চমকে উঠতে হয়। পঁচিশরত্ন বা চুড়া বিশিষ্ট মন্দিরের স্থাপত্য ও অনুপম পোড়ামাটির ভাস্কর্য শোভিত বাংলার মন্দিরশিল্পের একটি অপূর্ব সংযোজন। সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে লালজী মন্দিরের ন্যায় বিরল গোষ্ঠীর মন্দির স্থাপত্য চোখে পড়ে না। কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের টেরাকোটা অলঙ্করণ লালজী অপেক্ষা উন্নতমানের হলেও স্থাপত্যশৈলীতে লালজি মন্দির হল বাংলাদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পঁচিশরত্ন মন্দির।

রাজবাড়ীর মধ্যে এবং লালজি মন্দিরের সন্নিকটে রয়েছে কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির। এই মন্দিরটিও পঁচিশরত্ন বিশিষ্ট। স্থাপত্যরীতিতে মিল থাকলেও কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের টেরাকোটা অলঙ্করণ লালজি মন্দির অপেক্ষা উন্নতমানের এবং সর্বেধভাবে সুন্দর, সাবলীল ও বলিষ্ঠ শিল্পকলার নিদর্শন। বর্ধমানের জমিদার রাজা ত্রিলোকচন্দ্র রায় স্বীয় জননী লক্ষ্মীকুমারী দেবীর নামে কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরে ক্ষোদিত শিলালিপি হতে মন্দির প্রতিষ্ঠার কাল জানা যায়,—

'শ্রীহরিচরণ সরোজ গুণমুনি
ষোড়শ সংখ্যকে শকে-অব্দে।
মন্দিরমূ অর্পিতমেতদ্রাজা
শ্রী ত্রিলোকচন্দ্র মাত্রা ।। ১৬৭৩ সন ১১৫৯ সাল।'

কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির প্রাঙ্গণের পর্বেভাগে সুবিশাল 'বিজয়বৈদ্যনাথ' শিবমন্দিরটি কুমার মিত্রসেন রায় ও তাঁর ধর্মপত্নী লক্ষ্মীদেবীর প্রীতর্থে তাঁদের পুত্র রাজা ত্রিলোকচন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন। শহরের মধ্যে গোপালজীর পঁচিশচুড়া মন্দিরটি কৃষ্ণচন্দ্র বর্ণ

নামক রাজা ত্রিলোকচাঁদের একজন অনুগত ব্যক্তি কর্তৃক ১৬৮৮ শকাব্দে (১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দ) নির্মিত হয়েছিল এবং কৃষ্ণচন্দ্র এই মন্দিরে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কালনার মন্দিরগুলির মধ্যে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের স্থাপত্যরীতি পৃথক ধরনের। জোড়-বাংলা রীতিতে নির্মিত এই মন্দিরে সিদ্ধেশ্বরী কালিকাদেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি হতে জানা যায় যে, রাজা চিত্রসেন রায় ১৬৬৩ শকাব্দের (১৭৪১ খ্রীস্টাব্দ) ২৬শে জ্যৈষ্ঠ সিদ্ধেশ্বরী দেবীর জন্য এই শ্রীমন্দির নির্মাণ করেন। প্রতিষ্ঠালিপিতে শিল্পী রামচন্দ্রের নাম ক্ষোদিত আছে,—

"শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৬৬৩।২।
২৬।৬ শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী দেবী
শ্রীযুত মহারাজা চিত্রসেন রায়স্য।
মিস্ত্রী শ্রী রামচন্দ্র।"

সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা চিত্রসেন রায় হলেও দেবী সিদ্ধেশ্বরী বহুকাল ধরে অম্বিকা-কালনায় অধিষ্ঠিতা আছেন। চিত্রসেনের একশত বৎসর পূর্বে রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল'-এ দেবীর প্রসিদ্ধির কথা উল্লেখ আছে,—

'তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে পারি।
অম্বুয়ার ঘাটে বন্দো কালিকা ঈশ্বরী ॥'

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির বাড়ীর মধ্যে রাজা ত্রিলোকচাঁদের জননীর শিবমন্দির (১৬৮৫ শকাব্দ), রাজঅমাত্য রামচন্দ্র নাগের শিবমন্দির (১৬৬৮ শকাব্দ) ও আরও একটি আটচালা শিবমন্দির আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, রামচন্দ্র নাগের সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরকে মূলাজোড় ত্যাগ করতে হয়েছিল এবং কবি 'নাগাষ্টক' রচনা করে মনের জ্বালা মিটিয়েছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী মন্দির চত্বর পার হয়ে একটু পূর্বমুখে এগিয়ে গেলে অপূর্ব টেকাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত অনন্তবাসুদেবের আটচালা মন্দিরে প্রস্তর নির্মিত বদ্রিনারায়ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৬৭৬ শকাব্দে (১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দ) রাজা ত্রিলোকচাঁদ তাঁর পিতামহী ব্রজকিশোরী দেবীর নামে 'অনন্তবাসুদেব' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অতীতে গঙ্গার তীরে আর একটি মন্দির চত্বর ছিল। বর্তমানে তিনটি পরিত্যক্ত সুউচ্চ আটচালা শিবমন্দির ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট নাই। জগন্নাথ বাড়ীর মন্দিরগুলিও বর্ধমানের রাজাদের তৈরী।

রাজবাড়ীর পশ্চিমে এক বিশাল শিবক্ষেত্রের মধ্যে বৃত্তাকারে ১০৯টি শিবমন্দির আছে। সাধারণের কাছে ১০৮ শিবমন্দির নামে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে মন্দিরের সংখ্যা হল ১০৯টি। 'জপমালায় যেরূপ ১০৮টি বীজ গ্রথিত থাকে এবং মধ্যস্থলে ঈষৎ বড় আকারের একটি বীজ মেরুস্বরূপ থাকে'—এই শিবক্ষেত্র নির্মাণের সময় উক্ত বিধান মানা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের দুটি ১০৯টি মন্দির সমন্বিত শিবক্ষেত্রের মধ্যে প্রথমটি বর্ধমানের নবাবহাটে ও দ্বিতীয়টি কালনায় অবস্থিত। ১৭৩১ শকাব্দে

(১৮০৯ খ্রীস্টাব্দ) মহারাজা তেজচন্দ্র ১০৯টি শিব মন্দির নির্মাণ করেন—ক্ষোদিত শিলালিপি হতে এ তথ্য জানা যায়,—

'শকে চন্দ্র শিবাব্ধি সপ্ত কুমিতে শ্রীতেজচন্দ্রাভিধো
রাজা সূর্য ইব স্থিরার্পিত চলচ্চিণ্ড প্রতাপানলঃ।
শম্ভোর্ধাম পরম নবাধিকশত শ্রীমন্দিরৈর্মণ্ডলম্
প্রাকাষীশ্মহদম্বিকাখ্য নগরে কৈলাসমেতং নবম্ ॥'

কালনার অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান হল রাজবাড়ী। বর্গী হাঙ্গামার ফলে দাঁইহাটের রাজবাড়ী ধ্বংস হওয়ায় রাজারা গঙ্গাবাসের জন্য এখানে সুবৃহৎ অট্টালিকা ও বহু মন্দির নির্মাণ করেন। মহারাজা তেজচন্দ্রের আমলে নির্মিত সুবিশাল চত্বরের মধ্যে মহারাজা ও রাজকর্মচারীদের আবাসস্থল ব্যতীত বহুমন্দির ও রাজাদের সমাজ রক্ষার স্থান রয়েছে। রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকের প্রবেশ পথের উপর স্থাপিত শিলালিপি হতে জানা যায় যে, ১৭৩১ শকাব্দে মহারাজা তেজচন্দ্রের সময়ে রাজবাড়ীটি নির্মিত হয়েছিল। শিলালিপির পাঠ নিম্নরূপ,—

'মুক্তা হেম প্রবালৈ রজত দরবরৈ স্ফটিকে রত্নসংঘৈঃ
পুষ্পৈঃ সিন্দূর চন্দ্রৈরগুরু ঘট পটৈশ্চাময়াদ্যৈঃ প্রপূর্ণা।
শাকে শুভ্রাংশুবহ্নি ক্ষিতিধর কুমিতে তেজচন্দ্রস্যরাজ্ঞঃ—
পূর্ভুর্তা সাম্বিকাখ্যা সুর নগর সরিত্তীর পূর্ব্যাংচ কাস্তি ॥ শকাব্দা ১৩৭১।'

রাজবাড়ীর মধ্যে আরও বহু মন্দির রয়েছে। কিন্তু সর্বাগ্রে চোখে পড়বে প্রতাপেশ্বর শিবমন্দির। স্থাপত্য ও টেরাকোটা অলঙ্করণে শোভিত এই শিখর দেউলটি সত্যই অনুপম। ১৭৭১ শকাব্দে (সন ১২৫৬ সাল) রাজা প্রতাপচাঁদের প্রথমা মহিষী প্যারিকুমারীদেবী এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, কালনা শহরে রাজকুমার প্রতাপচাঁদের অন্তর্ধান হয়েছিল এবং জাল প্রতাপচাঁদের নামে ফৌজদারী মামলা ঘটনার সূত্রপাত এই শহরেই হয়েছিল।

কালনা শহরে মহিষমর্দিনীর প্রতিষ্ঠা বহুকালের জনৈক ব্যবসায়ী মহিষমর্দিনীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া মীরের বাগানে প্রস্তরময়ী জয়চণ্ডী, জ্ঞানানন্দ মঠ, হিন্দু মিলন মন্দির, নির্গমানন্দ সারস্বত আশ্রম, রাজবাড়ীর দোলমঞ্চ ইত্যাদি স্থানগুলিও দেখে নেওয়া যায়।

বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে কালনার প্রসিদ্ধি বহু কালের। মধ্যযুগে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান কালনায় বসবাস করতেন এবং এখানে আরবী ও ফারসী ভাষার চর্চা ছিল। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, কালনা অঞ্চলে ৬টি মক্তব ছিল। ষোড়শ শতকে গৌরীদাস পণ্ডিতের আকর্ষণে এখানে বহু পণ্ডিত ও ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণবের আগমন ঘটেছিল। গৌরীদাস ও পরমানন্দ গুপ্ত চৈতন্যজীবনী অবলম্বনে বহু গীত ও পদ রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। অম্বিকা কালনার হাঁসপুকুর নিবাসী কবি কৃষ্ণদাস পৈত্রিক বাসস্থান ত্যাগ করে কলিকাতার বহুবাজারে বসবাস করতেন। ১০৯৯

সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রচিত কবি তাঁর 'নারদ পুরাণ' গ্রন্থে পৈত্রিক বাসস্থানের উল্লেখ করেছেন,—

'পৈত্রিক বসতি পূর্বে অম্বিকানগর।
হাঁসপুকুর নাম যথা তাহার উত্তর।।'

সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে কালনা ছিল আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র। বর্ধমানের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কালনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত টোলগুলিতে বহু শীর্ষস্থানীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপনা করতেন। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে কালনা থানায় মোট ৩৭টি টোল ছিল। কালনার বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মধ্যে তারানাথ তর্কবাচস্পতি, দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন, অযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশ, শ্রীরাম ন্যায়রত্ন, তারিণীপ্রসাদ ন্যায়রত্ন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তারানাথের পাণ্ডিত্য ও সেই সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের দূরদৃষ্টির ফলে তাঁর টোলের ছাত্রদের কখন পরমুখাপেক্ষী হতে হয় নাই। তাঁর পূর্বপুরুষ রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত বরিশাল জেলার বৈচণ্ডী হতে এসে কালনায় বসবাস করেন এবং তিনি রাজা ত্রিলোকচাঁদের আনুকুল্য লাভ করেছিলেন। বিদ্যালাভের পর তারানাথ স্বগৃহে কিছুকাল চতুষ্পাঠী পরিচালনা করার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুরোধে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ছয় খণ্ডে সমাপ্ত 'বাচস্পত্য অভিধান' তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের নিকট ভুয়সী প্রশংসা পেয়েছিলেন। তারানাথের রচিত সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রকাশের সময় তাঁর একান্ত গুণমুগ্ধ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ই. বি. কাওয়েল সরকারকে লিখিত এক পত্রে ব্যক্ত করেছিলেন,—'I question if any one in Bengal is equal to him'. কাওয়েলের মতে জয়নারায়ণ ও তারানাথ ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজ হতে অবসর গ্রহণ করে কাশীধামে বসবাস করতে থাকেন। ১২৯২ সালের ৭ই আষাঢ় কাশীধামে এই 'জীবন্ত সংস্কৃত বিশ্বকোষ' ইহলোক ত্যাগ করেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতির (১৮১২-৮৫) মৃত্যুতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অশ্রুপাত করতে করতে আক্ষেপ করেছিলেন, 'ভারত পণ্ডিতশূন্য হইল'।

কালনায় ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয় ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে। খ্রীস্টান মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের জন্য এখানে চার্চ মিশনারী সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে পাদ্রী কুরি ও প্রাদ্রী ডিয়ারের প্রচেষ্টায় প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০০ জন। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ধর্মপ্রচারের জন্য কালনায় আগমন করেন। তিনি জাল প্রতাপচাঁদ মামলায় প্রতাপচাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ায় তাঁকে কালনা ত্যাগ করতে হয়। কালনায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল মিশনারীদের দ্বারা। কিন্তু ধর্মান্তরকরণের নিমিত্ত পাদ্রীদের বিদ্যালয়গুলি জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয় নাই। অপরপক্ষে ১৮১৭

খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের মহারাজার প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয়টির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে এটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিণত হয়। এই শহরের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাজাদের দানে।

অতীতকালের অম্বিকা-কালনার পুরাকীর্তি ও ইতিহাসের উপর আধুনিক কালনা শহরের পত্তন হয়েছে। অষ্টাদশ শতক হতে আধুনিক কালনার শ্রীবৃদ্ধি শুরু হয়। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কালনা শহরটি মহকুমা সদরে পরিণত হয়। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে কালনা পৌরসভা গঠিত হয়। রেভারেণ্ড লঙের বিবরণে জানা যায় যে, নৌবাণিজ্যের উপযোগী স্থানরূপে শহরটি অন্তর্দেশীয় বন্দর হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। লঙ সাহেবের বিবরণে জানা যায়,—[Kalna] 'is noted for its great trade, being the port of the Burdwan District, the bazar has 1000 shops ; the houses are chiefly of bricks. Great quantities of rice brought from merchants of Rangpur, Dewanganj. Jaffirganj, are here stored up, grain, silk and cotton also from a large staple'. ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে তিন দিনের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের দ্রব্যসমূহ ও বিরাট বাজারটি ভস্মীভূত হয়েছিল।

কালনার অতীত গৌরবের ইতিহাস ও ঐশ্বর্যময় পুরাকীর্তি—সম্পদ প্রচারের অভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় নাই। তাছাড়া রাত্রিবাসের কোন জায়গা বা হোটেল না থাকায় এখানে দূরের মানুষকে কাছে টানতে পারে নাই। সম্প্রতিকালে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কালনায় পর্যটন কেন্দ্র গড়া হলে কেবলমাত্র অম্বিকা-কালনা নয়, দূরের মানুষেরা এক সঙ্গে নবদ্বীপ, সমুদ্রগড়, ধাত্রীগাম, গুপ্তিপাড়া, দেরিয়াটন (স্বামী বিবেকানন্দের পৈত্রিক বাসস্থান), বৈদ্যপুর, আনুখাল, সুখাড়িয়া প্রভৃতি স্থানের মন্দির-মসজিদ দর্শনের সময়ে ঐ সকল জায়গার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে বঙ্গ সংস্কৃতির সমন্বয় সূত্রের সন্ধান লাভে সক্ষম হবে। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ৮ই মার্চ কালনা সম্পর্কে খান সাহেব মৌলবী ওয়ালির একটি মন্তব্যে জানা যায়,—

"This place, like many others, has not been noticed by chroniclers. Kalna, in the District of Burdwan, is situated on the Ganges or Bhagirathi. It appears that it was a celebrated place during the Muhammedan rule, and earlier during the Hindu period. Being situated on the river, it was no doubt considered to be a healthy and suitable place for strategical purposes. Nothing of the period of the Hindues can now be traced, except that some of the Later Archaeological remains reveal the fact that the Muhammedans built out of the material of the older and Hindu ruins. The inscrip-

tions noticed here show that Kalna was the seat of military Governors, who were generally, if not invariably of the Afgan or Turkoman race. The ruins of a large fort constructed to command the river are still visible. The Bhagirathi which formerly flowed behind the old Kalna has considerably receded."

প্রায় আশি বছর পূর্বে যে অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ওয়ালী সাহেব অম্বিকা-কালনার অতীত ইতিহাসকে দেখেছিলেন, তার উত্তরসূরী হিসাবে কালনার ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি, ধর্ম, মনীষী জীবনী, সাহিত্য, দেবায়তন ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্মৃত পুরাকথাকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হল আঞ্চলিক ইতিহাস আলোচনার সার্থকতা।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, ভক্তিরত্নাকর ইত্যাদি বৈষ্ণব গ্রন্থ
২। *Inscriptions of Bengal* (Vol : V)—Shamsuddin Ahmed.
৩। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত—রাখালদাস মুখোপাধ্যায়।
৪। *Calcutta Review*, 1846.
৫। *Bengal past and present*, 1917.
৬। *The History of Bengal* (Vol. 2)—Sir Jadunath Sarkar.
৭। *Ain-I-Akbari* (Vol. 2).
৮। *Journal, University of Bombay*. 1940.

শ্রীপাট শ্রীখণ্ড

(বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের সমন্বয়ক্ষেত্র)

শ্রীচৈতন্য 'কল্পবৃক্ষের পঞ্চশাখা ও কিছু সংখ্যক উপশাখার লীলাভূমি হল মধ্য রাঢ়ের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রাম। গৌর-কল্পবৃক্ষের পঞ্চশাখার মধ্যে একটি শাখা পল্লবিত ও মুকুলিত হয়ে উঠেছিল নরহরি সরকার ঠাকুর ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরকে কেন্দ্র করে। তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় লোচনানন্দ দাসের রচনায়,—

'কল্পতরু বিশ্বম্ভর তার শাখা সুবিস্তর
তাহে শ্রীমুকুন্দ প্রেমময়।
ঠাকুর শ্রীসরকার শ্রীরঘুনন্দন আর
চিরঞ্জীব সুলোচন হয়॥'

সুপণ্ডিত ও ভক্তিরস শাস্ত্রজ্ঞ নরহরি সরকার ভক্তির সঙ্গে গৌরনাগরবাদের আলোচনার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন এবং নরহরি প্রবর্তিত ভক্তিরস তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর মনেপ্রাণে গ্রহণ করে অষ্টরসসিদ্ধি হয়েছিলেন। শ্রীরঘুনন্দনের ভক্তিতত্ত্বের বীজ তাঁর বাল্যাবস্থায় অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং ঠাকুর পরিবারের গৃহদেবতা গোপীনাথ শিশু রঘুনন্দের কাছে নাড়ু খেয়েছিলেন। শ্রীরঘুনন্দন ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক শক্তি-সংন্যস্ত সিদ্ধপুরুষ ; গোপীনাথের অঙ্গ মাধুর্য দর্শন করতে করতে যিনি আত্মহারা হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। শ্রীরঘুনন্দনের ভক্তিময় চরিত্রের কথা জানা যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের একটি উক্তি (২।১৫) হতে,—

'মুকুন্দদাসেরে পুছে শচীর নন্দন।
তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন ।।
কিবা রঘু পিতা তুমি তাহার তনয়।
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয় ।।'

শ্রীচৈতন্যদেবের গূঢ় প্রশ্নের উত্তরে রাজবৈদ্য মুকুন্দ সরকার সহাস্যে জানালেন,—

'আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে ।।'

অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি প্রসঙ্গে রঘুনন্দনই মুকুন্দদাসের পিতা। ভক্তিরস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উক্ত বাক্য অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় আর কি হতে পারে !

বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীখণ্ড বৈষ্ণবভক্তদের কাছে 'শ্রীপাট শ্রীখণ্ড' নামে খ্যাত। শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধির কথা জানা যায় ১৫৯৭ শকাব্দে রচিত ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' নাটকের একটি উক্তি হতে,—

'শ্রীখণ্ড নাম নগরী রাঢ়ে বঙ্গেষু বিশ্রুতা।
সর্বেষামেব বৈদ্যানামাশ্রয়ো যত্র বিদ্যতে ।।'

আবার বৈষ্ণব কবি রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী'র রচনা প্রসঙ্গে জানা যায়,—

'কেতুগ্রামে আরম্ভ সম্পূর্ণ বৈদ্যখণ্ডে।'

নৈবেদ্যের উপর স্থাপিত মিষ্টান্নটিকে 'খণ্ড' বলা হয়। অনুরূপভাবে এতদঞ্চলের খণ্ডগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ (শ্রী) হওয়ায় গ্রামনাম হয়েছে 'শ্রীখণ্ড'। আবার এই গ্রামে খণ্ডেশ্বরী নামে শাক্তদেবী অধিষ্ঠিতা আছেন এবং গ্রামদেবীর নামে গ্রামনাম খণ্ড বা শ্রীখণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। শ্রীখণ্ড নামটি প্রাচীন। বৈষ্ণবেরা শাক্তদেবীর নামানুসারে খণ্ড গ্রামবাসীরূপে পরিচয় না দিয়ে নিজেদের বৈদ্যখণ্ডের অধিবাসী বলে পরিচয় দিতেন। বৈদ্যবংশের দুই কৃতি পুরুষ শ্রীখণ্ডে এসেছিলেন ; তাঁরা হলেন পদ্মদাস ও রাঘবসেন। কুলপঞ্জিকা মতে তাঁরা দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের লোক। পদ্মদাস নিজে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়ধর্মে অনুরাগী ছিলেন। পদ্মদাসের ধারায় বুধদাস ছিলেন বৈষ্ণব এবং এই

গোষ্ঠীর উত্তরপুরুষ হলেন নারায়ণ সরকার ও তাঁর গৌরগতপ্রাণ মুকুন্দ ও নরহরি নামক পুত্রদ্বয়। রাঘব সেনের বংশধরগণের মধ্যে দামোদর সেন ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর উপাস্য দেবী দশভুজা ছিলেন সেন বংশের কুলদেবী এবং মাতামহের ধর্মসাধনার প্রভাবে বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রথম জীবনে শাক্ত ধর্মাবলম্বী ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রভাবে পরবর্তীকালে তিনি পরম বৈষ্ণব ভক্তরূপে প্রসিদ্ধ হন।

শ্রীখণ্ড গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস হতে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে যশোরাজ খান, মহাকবি দামোদর সেন, নারায়ণ সরকার ও মুকুন্দ সরকার রাজ-অনুগৃহীত ব্যক্তিরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পদকর্তা যশোরাজ খান-এর একটি পদ হতে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন সুলতান হোসেন শাহের সভাসদ। দামোদর সেন একাধারে রাজবৈদ্য ও অন্যদিকে পদকর্তারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কীর্তিবাস ওঝার আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, তিনি যে সময়ে গৌড়েশ্বর রুকুনুদ্দিন বারবক শাহের সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন তখন অন্যান্যদের সঙ্গে নারায়ণ সরকারকে সভাসদরূপে গৌড়েশ্বরের দরবারে দেখেছিলেন। তাঁর নিজস্ব উক্তি হল,—

'রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তার পাছে বস্যা আছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্বরায় বস্যা আছে গন্ধর্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিঁহো গৌরব অপার॥'

কবির আত্মপরিচয় হতে প্রমাণিত হয় যে, ত্রিহুতের দেওয়ান কদর খাঁ, জগদানন্দ রায় (দাঁইহাটের সন্নিকটে তাঁর নামে গ্রাম-নাম আছে), শ্রীখণ্ডবাসী নারায়ণ সরকার (মুকুন্দ ও নরহরির পিতৃদেব) ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ গন্ধর্বরায় (মালাধর বসুর আত্মীয়) গৌড়ের রাজদরবারে উপস্থিত ছিলেন। নারায়ণের পুত্র মুকুন্দ দাস ও নরহরির সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গতার কথা বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত ব্যতীত যে কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। পিতা ও পিতৃব্যের সাহচর্যে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের নেতৃত্বে উত্তর রাঢ় অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল। রঘুনন্দনের ঐশিক শক্তি এত প্রবল ছিল যে, অভিরাম গোস্বামী পর্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন। এঁদের তিন জনের প্রভাবে শ্রীখণ্ড গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল। অতঃপর যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য শ্রীপাট স্থাপন করার ফলে শ্রীখণ্ডের গৌরব আরও বৃদ্ধি পায়।

নিত্যানন্দ প্রভু নরহরি সরকারের আহ্বানে শ্রীখণ্ডে এসেছিলেন এবং তিনি সরকার ঠাকুরের 'মধুমতী তত্ত্ব' ও ভক্তি মহিমার প্রকাশ ঘটাতে মধুপানের ইচ্ছা করায় তাঁকে সরকার ঠাকুরের গৃহের নিকটস্থ পুষ্করিণী হতে পানের নিমিত্ত জল দান করা হয়।

নরহরির মহিমায় ঐ জল নিত্যানন্দ মধুরূপে পান করায় পুষ্করিণীটি আজও মধু পুষ্করিণী নামে খ্যাত। রায়শেখরের একটি পদে আছে,—

'ভুবন মণ্ডল মাঝে তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে
মধুমতী যাহে পরকাশ
ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে বিলসই রাত্রি দিনে
নাম ধরে নরহরি দাস।'

অথবা, নরহরি প্রসঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্যকৃতাষ্টক হতে জানা যায়,—

'গৌড়দেশে রাঢ় ভুমে শ্রীখণ্ড নামেতে গ্রামে
মধুমতী প্রকাশ যাহায়।
শ্রীমুকুন্দদাস সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন রঙ্গে
ভক্তিতত্ত্ব জগতে লওয়ায় ।।'

সরকার ঠাকুর ছিলেন ব্রজের মধুমতী সখী এবং তিনি প্রচলিত সাধন ভজনের পথ অনুসরণ না করে গৌর-নাগরী ভাবে সাধনা করতেন। গৌর-নাগরী ভাবের প্রেম-বন্যায় অন্যের তো কথাই নাই, এমন কি নিত্যানন্দ পর্যন্ত মোহিত ও পুলকিত হয়েছিলেন। রায়শেখরের পদের শেষাংশে আছে,—

'মধুমতী মধুদানে ভাসাইল ত্রিভুবনে
মত্ত কৈলা গৌরাঙ্গ নাগরে।
মাতিল সে নিত্যানন্দ আর সব ভক্তবৃন্দ
বেদবিধি পড়িল ফাঁপরে ।।'

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ সরকার শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে পুরীতে অবস্থান করতেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে নরহরি ও শ্রীরঘুনন্দন শ্রীখণ্ডে বসবাস করে তাঁদের আরব্ধ কর্মের সঙ্গে গোপীনাথ সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। ভক্তিধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নামকীর্তন বা লীলাকীর্তনের প্রচলন শুরু হয়েছিল চৈতন্যদেবের আমলে। সরকার পরিবারের তিনজনই নৃত্যগীতবাদ্য কুশল ছিলেন এবং এখানে উচ্চ সঙ্গীত চর্চার প্রচলন থাকায় শ্রীখণ্ডের নিজস্ব ঘরানায় কীর্তন গানের প্রচলন শুরু হয়। 'বিলম্বিত লয়ের ধীর, গম্ভীর ও মাধুর্যময় শ্রীখণ্ড ঘরানার গান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঐতিহ্যবাহী।' কথিত আছে, অভিরাম গোস্বামী ও শ্রীরঘুনন্দন নাম-সংকীর্তন ও নৃত্যে এতই মত্ত হয়েছিলেন যে, রঘুনন্দনের পায়ের নূপুর দাঁইহাটের সন্নিকটে কালা কৃষ্ণদাসের গৃহে পতিত হয়েছিল। আকাইহাটের যেখানে নূপুর পতিত হয়েছিল সেই স্থান 'নূপুরকুণ্ড' নামে অভিহিত। শ্রীপাট নির্ণয়ে আছে,—

'আকাইহাটে আছিলা ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
রঘুনন্দনের নূপুর পায়্যা যাহার উল্লাস ।।'

শ্রীখণ্ডের কীর্তনের খ্যাতির কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। মহাপ্রভুর পুরীতে অবস্থানরত কালে জগন্নাথদেবের রথযাত্রায় শ্রীখণ্ডের

কীর্তনীয়া সম্প্রদায় স্বতন্ত্রভাবে কীর্তনে অংশগ্রহণ করতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে,—

'খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন।'

শ্রীখণ্ড ঘরাণার কীর্তন সকলের পক্ষে রসোপলব্ধি না হওয়ায় সরলীকৃতরূপে ও বৈচিত্র্যপূর্ণ তালের সমাবেশে গরানহাটি, মনোহরশাহী, রেনেটী, মান্দারণী প্রভৃতি ঘরাণার সৃষ্টি হয়। শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া হিসাবে শ্রীরঘুনন্দনের খ্যাতি ছিল, তাই তিনি খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তমদাস ও তার চারজন সঙ্গীকে কীর্তন শুরু করার আগে মালা-চন্দনে ভূষিত করেন। খেতুরী উৎসবের পর জাহ্নবা দেবীর শ্রীখণ্ডে আগমন উপলক্ষে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ভুবনমঙ্গল কীর্তন গান করে সমস্ত বৈষ্ণবদের মুগ্ধ করেছিলেন। শ্রীরঘুনন্দনের পর তাঁর পুত্র কানাই ঠাকুর ও পৌত্র মদন ঠাকুর ছিলেন শ্রীখণ্ড ঘরানার উত্তরাধিকারী। একালে শ্রীখণ্ড ঘরানার শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন গৌরগুণানন্দ ঠাকুর।

আনুমানিক ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দের কয়েক বৎসর পরে নরহরি সরকার ঠাকুর ইহলোক ত্যাগ করেন। সরকার ঠাকুরের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে বহু বৈষ্ণব মহান্ত শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হয়েছিলেন। আজও তাঁর তিরোধান তিথি উপলক্ষে শ্রীখণ্ড গ্রামের দক্ষিণে 'বড়ডাঙ্গা' নামক প্রান্তরে কার্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে তিন দিন ধরে মহোৎ-সবের সময় মেলা বসে। এই মহোৎসবের বিশেষ আকর্ষণ হল বিভিন্ন স্থান হতে আগত কীর্তনীয়া দল কর্তৃক কীর্তনে অংশগ্রহণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা লোচনদাসের পৈত্রিক বাসস্থান কোগ্রামে হলেও তিনি নরহরির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে জীবনের অধিকাংশ সময় শ্রীখণ্ডে কালযাপন করেছিলেন।

নরহরির তিরোধানের পর শ্রীরঘুনন্দন শ্রীখণ্ডকে কেন্দ্র করে এতদঞ্চলের অবিসংবাদী বৈষ্ণব মহান্তরূপে নেতৃত্ব প্রদান করেন। শ্রীরঘুনন্দনের নামমাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীনিবাস আচার্য, অভিরাম গোস্বামী, বীরভদ্র গোস্বামী, নরোত্তম ঠাকুর ও জাহ্নবা দেবী পর্যন্ত শ্রীখণ্ডে এসেছিলেন। দ্বিতীয়বার খেতুড়ী উৎসবের পর অর্থাৎ ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের কিছু পরে অসংখ্য ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করেন। তাঁর পুত্র কানাই ঠাকুর ও শ্রীনিবাস আচার্য মহাসমারোহে তিরোধান উৎসব পালন করেন। কানাই ঠাকুরের পরবর্তী বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীখণ্ড পরিত্যাগ পূর্বক বীরভূম জেলায় ও অণ্ডাল থানার দক্ষিণখণ্ড নামক গ্রামে বসবাস শুরু করেন।

শ্রীখণ্ড কেবলমাত্র ধর্মপ্রচার কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ ছিল না। পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ হতে শুরু করে শ্রীখণ্ড ছিল বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থান। শ্রীখণ্ডের সাহিত্যচর্চার প্রসঙ্গ দু'এক কথায় বলা যায় না (বিশদ বিবরণের জন্য দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'সাহিত্যে বর্ধমানের অবদান' দ্রষ্টব্য)। চৈতন্য চরিতকার লোচনদাসের

কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। শ্রীখণ্ডবাসী দামোদর সেন মহাকবি ছিলেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ 'সঙ্গীতমাধব' নাটকে তাঁর মাতামহের কবিত্ব শক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন,—

'পাতালে বাসুকিবর্ক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥'

পদকর্তা ও বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণেতাদের মধ্যে যশোরাজ খান, মুকুন্দ সরকার, নরহরি সরকার, শ্রীরঘুনন্দন, চিরঞ্জীব সেন, সুলোচন সেন, ভগবানদাস, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, রতিকান্ত ঠাকুর, রামগোপাল দাস, পীতাম্বর দাস, শচীনন্দন ঠাকুর, জগদানন্দ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তি এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। জনশ্রুতি এই যে, দ্বিতীয় বিদ্যাপতি নামে খ্যাত কবি রায়শেখরের সঙ্গে এই গ্রামের মধুর সম্পর্ক ছিল। একথা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বঙ্গদেশের যে কোন একটি গ্রামে এত অধিক সংখ্যক ধর্মপ্রচারক, পদকর্তা ও কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। নরহরির সম্প্রদায়ের মধ্যে চক্রপাণি চৌধুরী, নয়নানন্দ কবিরাজ ও মহানন্দ চৌধুরীও শ্রীখণ্ডের প্রাচীন গৌরবের অংশীদার ছিলেন। মহানন্দ চৌধুরী নরহরির প্রদত্ত শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ গৌড়দেশে প্রতিষ্ঠা করেন।

বৈষ্ণবধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধির কথা সর্বজনবিজিত, আর সেই সঙ্গে দর্শনীয় স্থান ও বিগ্রহগুলি গ্রামের প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ। সরকার ঠাকুরের পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহ ছিল গ্রামের সর্বপ্রাচীন বিগ্রহ। কিন্তু তিন বৎসর পূর্বে বিগ্রহ চুরি হয়ে যায়। রসকল্পবল্লী হতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে গৌরবিগ্রহগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন বিগ্রহ হল, কুলাই নিবাসী দৈত্যারি ঘোষ ও কংসারি ঘোষ কর্তৃক নরহরিকে প্রদত্ত তিনটি নিম কাঠের গৌর বিগ্রহ। নরহরি বড় বিগ্রহটি কাটোয়ায় গদাধরের নিকট ও ছোটটি বগুড়া জেলার গঙ্গানগরে (ভাগকোলা) সেবা পুজার নিমিত্ত পাঠিয়ে দেন এবং মধ্যমটিকে শ্রীখণ্ডে প্রতিষ্ঠা করেন। কাটোয়া ও শ্রীখণ্ডে গৌরাঙ্গ বিগ্রহ নিত্য পূজিত হলেও ভাগকোলার বিগ্রহটি বর্তমানে শ্রীখণ্ডে অধিষ্ঠিত আছেন এবং শ্রীরঘুনন্দনের সূতিকাগৃহে উক্ত গৌরাঙ্গ বিগ্রহকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

নিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক মধুরূপে জলপান করার জন্য খ্যাত মধু-পুষ্করিণী দেখতে বহু লোক উৎসুক হয়ে আজও শ্রীখণ্ডে আগমন করেন। এছাড়া অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তু ও স্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সরকার ঠাকুরের গৃহ ও সাধনস্থান, বড়ডাঙ্গায় ভজনস্থান, শ্যামরায় বিগ্রহ, মদনগোপাল, গোবিন্দজী, মদনমোহন ইত্যাদি। শ্রীরঘুনন্দনের পুত্র কানাই ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের বামে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ঠাকুর বংশের তিন প্রধান শরিকের মধ্যে উত্তরবাড়ী শাখায় মদনগোপাল, মাঝের বাড়ীতে মদনমোহন ও দক্ষিণ বাড়ীর গোবিন্দজীউ বিগ্রহের বামে রাধিকা বিগ্রহ আছেন। কিন্তু গোপীনাথ বিগ্রহের বামে কোন দিন শ্রীরাধা অধিষ্ঠিত ছিলেন না। বঙ্গদেশে রাধিকা মূর্তির প্রতিষ্ঠা শুরু হয় ষোড়শ শতকে। গোপীনাথের

মন্দিরে গৌর ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অধিষ্ঠিত আছেন। তবে গৌর বিগ্রহের সেবাপূজা তিন শরিকে পালাক্রমে করে থাকেন। ঠাকুর বংশের দক্ষিণ বাড়ী শাখার (দৌহিত্র সূত্রে মল্লিক বংশের অধিকারে) মন্দির নরহরি প্রতিষ্ঠিত গৌর মন্দির প্রাঙ্গণে নির্মিত হয়েছে। এই গৌর প্রাঙ্গণে জাহ্নবা দেবী, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর, বীরচন্দ্র, অভিরাম গোস্বামী প্রমুখের আগমন ঘটেছিল। কিন্তু বাসুদেব ঘোষের নামে একটা পদ প্রচলিত আছে, যদ্দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল যে, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীখণ্ডে এসেছিলেন। পদটি হল,—

'কি আনন্দ খণ্ডপুরে ঠাকুর নরহরির ঘরে
মহোৎসব কে করে আনন্দে।
সকল মহান্ত আসি প্রেমানন্দ রসে ভাসি
নিরখয়ে গৌর-মুখচন্দে ॥'

এই পদটি জাল। নরহরির মাহাত্ম্য বাড়াবার জন্য বাসুদেব ঘোষের নামে পদটি প্রক্ষেপ করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব কোন সময়েই এখানে আসেন নাই।

এত গেল বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা। শৈব ও শাক্ত ধর্মের প্রভাবও যে শ্রীখণ্ড গ্রামে যথেষ্ট ছিল তার নিদর্শনও নেহাৎ কম নাই। গ্রামদেবী খণ্ডেশ্বরী গ্রামস্থ সকল সম্প্রদায়ের নিকট পূজিতা এবং খণ্ডেশ্বরীর পূজা আচার তান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। জনশ্রুতি এই যে, খণ্ডেশ্বরীতলার আশে-পাশে অতীতে তন্ত্রসাধনার স্থান নির্দিষ্ট ছিল। খণ্ডেশ্বরীর মূর্তি হল, পীঠোপরি বদ্ধ পদ্মাসনে উপবিষ্টা এবং মাত্র সাড়ে তিন ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট। চতুর্ভুজা দেবী মূর্তির ডান ভাগের নিম্নের হাতটি ভাঙ্গা এবং বাম হাতে অভয়মুদ্রা। উপরের দুটি হাতে তরবারি ও দণ্ড ধরা আছে। প্রসিদ্ধ শাক্তপীঠ কেতুগ্রামের বহুলা দেবীর ভৈরব ভূতনাথের অধিষ্ঠানক্ষেত্র হল শ্রীখণ্ডে। প্রাণতোষণী তন্ত্রে ইনি হলেন ভীরুক ভৈরব। ভীরুক হল বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবতার নাম। ভূতনাথের গাজন অনুষ্ঠানে বিচিত্র ধরনের প্রথা চালু আছে। চড়কের পূর্বদিন ভূতনাথ মন্দিরে তান্ত্রিক হোমের অনুষ্ঠান হয়। ২১শে চৈত্র থেকে ২৭শে চৈত্র পর্যন্ত সাত দিন ধরে মন্দিরে রাতের পূজার পর ময়রা পরিবারের কয়েকজন ব্যক্তি মন্দির প্রাঙ্গণে চিৎ হয়ে, উপুড় হয়ে ও গড়াগড়ি দিয়ে দশ-বার রকমে ভূতনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়। এরপর বিজোড় সংখ্যক ব্রাহ্মণেরা নানাভাবে ১০৮ মুদ্রায় ভূতনাথের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানায়, যা বামুনখাটা নামে পরিচিত।

প্রাচীন শিব মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও নূতন মন্দিরের ক্ষোদিত লিপি হতে জানা যায় যে, ১৬৭৬ শকাব্দের মাঘ মাসে (১৭৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) রাজা রাজবল্লভ প্রাচীন মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রবাদ এই যে, বৈদ্যবংশের আদিপুরুষ রাঘব সেন কাশী হতে 'দুধকুমার' শিবলিঙ্গ এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ঐ শিবমন্দির বিনষ্ট হওয়ায় গোবিন্দচন্দ্র হালদার নামক এক ব্যক্তি নূতন মন্দির নির্মাণ করেন।

গাজনের সময় ভূতনাথের প্রতিভূস্বরূপ দগ্ধকুমার শিবলিঙ্গ নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ সহ পূজা ও অনুষ্ঠানাদি হয়। ভূতনাথের পাশে রয়েছে ভৈরবনাথ নামে শিবলিঙ্গ। এই শিবলিঙ্গের উর্ধ্বভাগ বৈদ্যনাথ ধামের শিবলিঙ্গের ন্যায় অমসৃণ, চ্যাপ্টা ও মাথায় কাটা দাগের চিহ্ন।

গ্রামের পূর্বভাগে একটি মন্দিরে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাছাড়া পশ্চিম প্রান্তে স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র মল্লিকের গৃহ সংলগ্ন মাঠে রয়েছে ধর্মরাজের থান। রাঢ়ের লোকদেবতা ধর্মরাজ এখানেও হাড়ি, বাগদি, ডোম প্রভৃতি নিম্ন সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত হন এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজা অনুষ্ঠানের পর ছাগ ও শূকর বলির বিধান আছে। বৈদ্যবংশীয় পদ্মদাস গোপীনাথের সেবক হলেও পরবর্তী বংশধর দুর্জয় দাস শক্তির উপাসক ও একজন সিদ্ধ সাধক ছিলেন। দুর্গাদাসের প্রপৌত্র কাশীনাথ মাটির প্রাচীরের মধ্যে অষ্টধাতুর দেবী বিগ্রহ লাভ করেন, তাই দেবীমূর্তি 'কাঁথেশ্বরী' নামে খ্যাত। কল্যাণেশ্বরীর দেবীর ন্যায় কাঁথেশ্বরী দেবী সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে, তিনি কাশীনাথের কন্যাকে গ্রাস করার সময়ে কেবলমাত্র লালপাড়ের কাপড়ের অংশ তাঁর মুখের বাইরে দেখা যায়। কাঁথেশ্বরীর প্রাচীন মন্দির ধ্বংস হলে গ্রামস্থ চন্দ্রকুমার রায় নামক এক ব্যক্তি মন্দিরটির সংস্কার করেন। তবে দেবীর নিত্যপূজা হয় গুপ্ত পরিবারের বাসগৃহ সংলগ্ন মন্দিরে; কেবলমাত্র শারদীয়া পূজার সময় দেবীকে প্রাচীন মন্দিরে আনয়ন করা হয়। বৈদ্যবংশীয় রায় গোষ্ঠীর পাঁচু দাস কুলদেবী 'সিংহবাহিনী'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে। বর্তমানে কবিরাজ পরিবারের গৃহসংলগ্ন একটি মন্দিরে দেবীর নিত্যপূজা হয়। রায় বংশের কুলদেবতা বৃন্দাবনচন্দ্রের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ষোড়শ শতকে। নরহরি সরকার ঠাকুর এই বিগ্রহের সেবাপূজার ভার চক্রপাণি চৌধুরী ও মহানন্দ চৌধুরীকে প্রদান করেন।

বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য থাকলেও শ্রীখণ্ডের উৎসবগুলি বৈষ্ণব ও শাক্ত দেবদেবীকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণবেরা সরকার ঠাকুরের মহোৎসব, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব, রাসযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, হোলী ও দোলযাত্রায় নাম-সংকীর্তন, অষ্টপ্রহর ইত্যাদিতে সারা গ্রাম মাতিয়ে তোলেন। অনুরূপভাবে শাক্ত ধর্মাবলম্বীরা শিবের গাজন, শিবরাত্রি, খণ্ডেশ্বরীর পূজা, মনসা পূজা, দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ও কালীপূজার প্রাচীন ঐতিহ্যকে বংশানুক্রমে ধরে রেখেছে।

শ্রীখণ্ড গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ধর্ম সাধনার ধারায় শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের সহ-অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায় যে, অতীতে এখানে শাক্ত সাধনা বা তন্ত্র-সাধনা প্রবল ছিল। শাক্তধর্মের বনিয়াদের উপর পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবের ফলে এখানকার বৈষ্ণবধর্মে শাক্ত সাধনার প্রলেপ রয়েছে। কিন্তু নবদ্বীপের ন্যায় শ্রীখণ্ডের শাক্ত মতাবলম্বীরা বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারকে সুনজরে দেখেন নাই। বৈষ্ণব দেবতাদের প্রাধান্য ও গৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই শাক্ত-বৈষ্ণবদের রেষারেষি

শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়। 'এর পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে ঠাকুর বংশের মন্দিরে সমারোহ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা ও গৌরাঙ্গদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই তিথিতেই খণ্ডেশ্বরীতলায় খণ্ডেশ্বরী দেবীর বাৎসরিক পূজা হয়।' শ্রীখণ্ড ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষেরা বাৎসরিক পূজার দিন মানতের পূজা নিবেদন করে এবং এই দিন ছাগ, শুয়োর, হাঁস প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। একই গ্রামে পূর্ণিমার দিন এক স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবতিথি ও দোলযাত্রা উপলক্ষে পূজা, ভোগ, কীর্তন ও আবীর খেলা হচ্ছে এবং সেই গ্রামের অন্যত্র সাড়ম্বরে পশু বলি দিয়ে তন্ত্রাচারে শাক্তদেবীর বাৎসরিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মনে হয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য দেখে বিদ্বেষ প্রসূত হয়ে বিরুদ্ধতা জ্ঞাপনের জন্য অতীতে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে দেবীপূজার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

নরহরি সরকার গৌরনাগরবাদের প্রবক্তা ছিলেন এবং শ্রীখণ্ড গৌরনাগরবাদের অন্যতম কেন্দ্র পরিগণিত হয়েছিল। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবেরা গদাধরকে শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তি মনে করে গৌরগদাধরের ভজনা করত। রূপ গোস্বামীও এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। যথা,—

'কলৌ গৌরাঙ্গঃ শ্রীকৃষ্ণো রাধা চ শ্রীগদাধরঃ।
উভৌ তৌ রাধিকাকৃষ্ণৌ শ্রীচৈতন্য গদাধরৌ ॥'

প্রয়াত হিতেশ সান্যাল (বাঙলা কীর্তনের ইতিহাস, পৃঃ ১৩২) মন্তব্য করেছেন যে, বড়ডাঙ্গায় নরহরির ভজনস্থানের কাছে একটি পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে এবং এই আসনটি শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবদের নিকট বিশেষ মাননীয়। নরহরির তিরোধান উৎসবের সময় যাওয়া-আসার পথে গোপীনাথ বিগ্রহকে প্রথানুযায়ী পঞ্চমুণ্ডীর আসনের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রীচৈতন্যদেব ও গদাধরকে যুগলাবতার কল্পনা এবং বৈষ্ণব ধর্মানুরাগীদের পঞ্চমুণ্ডী আসনকে মান্য করার অর্থ হল রাঢ়ের লৌকিক ও তান্ত্রিক ধর্মের ঐতিহ্য ও প্রাধান্যকে স্বীকার করে নেওয়ার প্রবণতা। এই ভাবাদর্শের ফলেই কানাই ঠাকুর কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বামে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। শাক্তদেবী খণ্ডেশ্বরীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের সন্নিকটে একটি পঞ্চমুণ্ডীর আসনে পূর্বাচার্য তান্ত্রিক আচার্যগণ তন্ত্রসাধনা করতেন। আর শাক্তদেবীর বহুলার ভৈরব ভূতনাথের পূজা-পীঠের স্থান হল এই গ্রামে। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব সাধনার ধারা সম্পর্কে বিনয় ঘোষের মত হল,—'নরহরি সরকার ঠাকুর ও লোচনদাসের রাগাত্মিকা বা রাগানুগা ভজনপদ্ধতি, রাধাভাব ও নাগরভাব পদের মধ্যে বাউল-বাউলিনীর কথা ইত্যাদির মধ্যে কোন রকম তান্ত্রিক সহজ সাধনধারার প্রভাব যে একেবারেই নেই, এমন কথা বলা যায় না। নরহরি-রঘুনন্দনের অনুবর্তীদের সাধনায় তান্ত্রিক রীতির প্রভাব আরও অনেক বেশী স্পষ্ট। রাঢ়বাসী দ্বিজ চণ্ডীদাস বা বড়ু চণ্ডীদাসের সহজ সাধনার ধারা উত্তরাধিকারসূত্রে শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব সমাজকে প্রভাবিত করেছিল সেকথা

অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে।'

নরহরির প্রবর্তিত গৌরনাগরবাদ গৌরপারম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্য-দেবের নবদ্বীপ-লীলা ও নীলাচল-লীলার ভাব-মাধুরী ভাষায় প্রকাশ করতে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়। নরহরি সরকার উত্তরাধিকারী-সূত্রে গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা পূজার ভার পেয়েছিলেন এবং ব্রজলীলা রসাস্বাদনের অধিকার তিনি শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্বেই লাভ করেছিলেন সেকথা রায়শেখরের একটি পদে পাওয়া যায়,—

'গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে
ব্রজরস করিলেন গান।
হেন নরহরি সঙ্গ পাঞা পহুঁ শ্রীগৌরাঙ্গ
বড় সুখে জুড়াইল প্রাণ ॥
পহুঁর দক্ষিণে থাকি চামর ঢুলায় সখী
মধুমতী রূপে নরহরি।
পাপিয়া শেখর কয় তার পদে মতি হয়
এই ভিক্ষা দেও গৌরহরি ॥'

সরকার ঠাকুর কয়েকটি অসাধারণ পদ রচনা করে গৌর-নাগরী ভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত নবদ্বীপলীলার পদগুলি ভাব ও ভাষার সম্পদে অতুলনীয় শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণীতে ধৃত ধানশী রাগের এরূপ একটি পদের সন্ধান জানা যায়,—

'কি লাগি আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর বসিয়া গৃহের মাঝে।
বসন আসন রতন ভূষণ সাজায়ে অঙ্গের সাজে ॥
আপন বপুর ছাহ নেহারিয়া চমকি উঠয়ে মনে।
কি লাগি অবহুঁ না মিলল পহুঁ এত না বিলম্ব কেনে ॥
কহে নরহরি মোর গৌরহরি ভাবিয়া রাইয়ের দশা।
সজল-নয়নে চাহে পথ পানে কহে গদ গদ ভাষা ॥'

শ্রীখণ্ডে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব আলোচনান্তে একটা কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা যায় যে, মুকুন্দ, নরহরি ও শ্রীরঘুনন্দনের আবির্ভাবে এই গ্রামের প্রসিদ্ধি এবং সেকারণে এই গ্রামও ধন্য। তাই মহাজন নির্দেশিত পথে তাঁরা শ্রদ্ধা লাভের উপযুক্ত পাত্র, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়,—

'শ্রীখণ্ড গ্রামেতে বাস নাম শ্রীমুকুন্দ দাস
ভক্তি চর্চা বিনা নাহি আন।
ধন্য গোয়ীদেবী মাতা ধন্য নারায়ণ পিতা
গোপীনাথের সেবাগত প্রাণ ॥
ভাই নরহরি ধন্য প্রেমে বাঁধা শ্রীচৈতন্য
ধন্য পুত্র শ্রীরঘুনন্দন।

গোর প্রেম রত্নখানি বিলায়ে সে চিন্তামণি
ধন্য কৈল এ তিন ভুবন ॥'

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব—গৌরগুণানন্দ ঠাকুর।
২। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড)—বিনয় ঘোষ।
৩। বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস—হিতেশরঞ্জন সান্যাল।
৪। সাহিত্য সঞ্চয়ন পত্রিকা—২৫শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৯৭। প্রবন্ধ ঃ বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীখণ্ড—অধ্যাপক ডঃ জয়গুরু গোস্বামী।
৫। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (২ খণ্ড)—হরিদাস দাস।
৬। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত।
৭। রামগোপাল দাসের পদকল্পবল্লী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।
৮। রায়শেখরের পদাবলী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।
৯। কৌশিকী, শারদীয়া ১৩৯৫ (প্রবন্ধ ঃ শ্রীখণ্ডের ঠাকুর দেবতা—ডঃ হিতেশ-রঞ্জন সান্যাল)।
১০। শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার।

কুলিনগ্রাম

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ রামানন্দ বসুর শ্রীপাটরূপে পরিচিত দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত কুলিনগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থস্থান হিসাবে খ্যাত। কুলিন অর্থাৎ শীলযুক্ত বর্ধিষ্ণু লোকের বসবাসের জন্য গ্রামটি 'কুলিনগ্রাম' নামে পরিচিতি লাভ করে-ছিল। হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইন রেলপথে হাওড়া হতে ৬৫ কিলোমিটার দূরে জৌগ্রাম রেল স্টেশন এবং তথা হতে পাকা রাস্তা ধরে বাস অথবা রিক্সায় ৫ কিলোমিটার এগিয়ে গেলে কুলিনগ্রামে পেঁছান যায়।

কুলিনগ্রামের অতীত খ্যাতির সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ পরিবারের অন্যতম কৃতি পুরুষ ও সুপণ্ডিত মালাধর বসুর নাম। মালাধর ছিলেন গৌড়েশ্বরের সভাসদ এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করে তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট হতে গুণরাজখান উপাধি লাভ করেছিলেন, একথা কবির উক্তি হতে জানা যায়। ১৪৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহের (১৪৫৯-৭৫ খ্রীঃ) আমলে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা আরম্ভ হয় এবং ১৪৮০-৮১ খ্রীস্টাব্দে

সুলতান শামসুউদ্দিন ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। মালাধরও ঐ সময়ে গৌড়ে বসবাস করতেন বলে অনুমান করা যায়।

বসু বংশীয়গণের বংশতালিকানুসারে মালাধরের কাশীনাথ ও লক্ষ্মীকান্ত বা সত্যরাজ খান নামে দুই পুত্র জন্মে। সত্যরাজের পুত্র পরম বৈষ্ণব আকুমার ব্রহ্মচারী রামানন্দ বসু অর্থাৎ পরবর্তী বসু বংশীয়গণ ছিলেন কাশীনাথের বংশধর। মালাধরের পর তাঁর পুত্র সত্যরাজখানও সম্ভবতঃ গৌড়েশ্বরের অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন। কারণ 'সত্যরাজখান' এটি কোন ব্যক্তি নাম নয়—এটি রাজা বা সুলতান প্রদত্ত উপাধি। সত্যরাজের পুত্র রামানন্দ বসু ঐ সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন, সেকথা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হতে জানা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, সত্যরাজ ও রামানন্দ এক ব্যক্তি। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের একটি উক্তি হতে এই ভ্রমের নিরসন হতে পারে,—

'তবে রামানন্দ আর সত্যরাজখান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥'

বসু পরিবারের আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্যদেব কুলিনগ্রামে এসেছিলেন। বৃন্দাবন দাসের মতে প্রথম পুরী যাত্রার সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব ছত্রভোগের পথে গিয়েছিলেন। কিন্তু জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' বর্ণিত আছে—শান্তিপুর হতে অম্বুয়া-কুলিনগ্রাম-দাঁতন-রেমুন্যা অতিক্রম করে তিনি শ্রীক্ষেত্র গিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে তিন দিন কুলিন-গ্রামে ছিলেন তাঁর সমর্থন 'চৈতন্যমঙ্গলে' পাওয়া যায়।

কুলিনগ্রামের বসু পরিবারের কৃষ্ণভক্তির জন্য শ্রীচৈতন্যদেব প্রতি বৎসর স্নানযাত্রার সময়ে তাঁদের উপর পট্টডোরি প্রেরণের দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থানকালীন সময়ে 'পাণ্ডুবিজয়' উৎসবকালে জগন্নাথদেবের পট্টডোরি ছিন্ন হওয়ায় মহাপ্রভুর আদেশে,—

'কুলিনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান। তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান ॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান। প্রতিবর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ ॥
এতবলি দিলা তারে ছিঁড়া পট্টডোরী। ইহা দেখি করিবে ডোরী অতিদৃঢ় করি ॥
এই পট্টডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান। দশমূর্ত্তি ধরি যেঁহ সেবে ভগবান ॥
ভাগ্যবান সত্যরাজ বসু রামানন্দ। সেবা-আজ্ঞা পাইয়া হইল পরম আনন্দ ॥'

(চৈ· চ· মধ্যলীলা, ১৪শ অধ্যায়)

রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর জগন্নাথ দর্শন ও শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গ লাভের জন্য বঙ্গদেশের অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সাথে কুলিনগ্রামের বসু পরিবারের লোকজনও শ্রীক্ষেত্রে গমন করতেন এবং ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক হতে তাঁরা পট্টডোরী সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বিজয়রামস্বামীর মতে—রেশম বস্ত্রকে 'পট্টদাই' বলা হ'ত। দক্ষিণ ভারতীয় পট্টদাই' বাংলা ভাষায় 'পট্টডোরী' রূপে উল্লিখিত হয়েছে। এটি সাধারণ কোন কাছি নয়। ভিতরে তুলো ভরে উপরে নানা রঙের রেশম সুতো দিয়ে

অতি সুন্দরভাবে পাকানো এক বন্ধনী। ডোর বা রশির সাহায্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে রথে তোলার সময় এবং রথ হতে বিগ্রহ পড়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় রথের মধ্যে খুঁটির সঙ্গে বিগ্রহত্রয়কে শক্ত করে বেঁধে রাখা হত। আবার দেবতারা শ্রীমন্দিরে রত্নবেদীতে অধিষ্ঠিত হলে ঐ ডোর দিয়ে বিগ্রহগুলির গলায় মালার ন্যায় সাজিয়ে রাখা হত। পরবর্তীকালে বসুবংশীয়দের পক্ষে পট্টডোরি সরবরাহে ছেদ পড়ে এবং মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তদীয় শিষ্য কুলিনগ্রামের হরিদাস বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। হরিদাস বসু বাঁকুড়ার এক শিল্পীকে দিয়ে পট্টডোরী প্রস্তুত করে পুরীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। হরিদাস বসু ও তাঁর পুত্রদের আমলে পট্টডোরী প্রেরণের ব্যবস্থা বজায় দিল। পরবর্তীকালে কাশীর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকিরণচন্দ্র দরবেজ মহারাজের আদেশে পট্টডোরী প্রেরণের ভার বিজয়কৃষ্ণ মঠের উপর বর্তায়।

বসু পরিবারের তিন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ব্যতীত কুলিনগ্রামে আরও অনেক ভক্ত বৈষ্ণব ও সুসাহিত্যিক জন্মেছিলেন এবং এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর বিদ্যানন্দ, বাণীনাথ বসু প্রমুখ ব্যক্তি। পদকর্তা গোপাল বসু ছিলেন কুলিনগ্রামবাসী। 'বঙ্গভাষার লেখক' হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতে শিবানন্দ সেনের পৈত্রিক বাসস্থান ছিল কুলিনগ্রামে। শিবানন্দের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে, যথা,—চৈতন্য দাস, রাম দাস ও পরমানন্দ বা কবিকর্ণপুর (জন্ম ১৪৪০ শকাব্দ)। শিবানন্দ সেন তাঁর শ্বশুরালয় কাঁচড়াপাড়াতে বসবাসের নিমিত্ত কুলিনগ্রাম ত্যাগ করেন। কিন্তু পূর্বাপর বিচার না করে শিবানন্দকে কাঁচড়াপাড়াবাসী বলা হয়েছে। কুলিনগ্রামের কীর্তনীয়া সমাজের নেতৃস্থানীয় সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসুর বিশিষ্ট স্থান ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় চৈতন্যচরিতামৃতে,—

> "কুলীন গ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া সমাজ।
> তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ।।" (মধ্যলীলা, ১৩শ অধ্যায়)

শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বংশের কীর্তনের ধারা আজও প্রচলিত থাকলেও রামানন্দ বসুর পর কুলিন গ্রামে কীর্তন চর্চার বিশেষ খ্যাতির কথা জানা যায় না। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে কুলিনগ্রামের অনতিদূরে বিখ্যাত পদকর্তা বিপ্রদাস ঘোষ রেনেটি কীর্তনের প্রবর্তন করেন। রেনেটি ঘরানা অপেক্ষা সহজ ও সুলভ সুরের কীর্তন গানের প্রচলন দেখা যায় কিছুটা দক্ষিণে মান্দারণ পরগণায়, যা মান্দারণী ঘরানা নামে প্রসিদ্ধ।

কুলিনগ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে কৌতূহল মেটার পর দর্শনীয় স্থানগুলির সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হলে সর্বপ্রথমে গোপেশ্বর শিবমন্দিরের কথা মনে আসে। অবিভক্ত বাংলাদেশের মধ্যে ইঁটের তৈরী এবং প্রতিষ্ঠালিপি সহ মহাকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে যে সকল হিন্দু দেবায়তন আজও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই তন্মধ্যে আটচালা গোপেশ্বর শিবমন্দির প্রাচীনতম। গোপেশ্বর শিবমন্দিরের বহির্ভাগে ২½ ফুট দীর্ঘ

ও ১½ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কষ্টিপাথরে নির্মিত সুন্দর বৃষমূর্তির গলদেশে উৎকীর্ণ আছে যে, ১৪২০ শকাব্দ বা ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে সত্যরাজ খান কর্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিবমন্দিরের অভ্যন্তরভাগে আর একটি অভিনব বস্তু দেখা যায়। সত্যরাজ খান প্রতিষ্ঠালিপি সহ প্রস্তর নির্মিত স্বীয় প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন।

কুলিনগ্রামের উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্যবস্তু হল মদনগোপাল মন্দির। জগমোহন ও নাটমন্দির সহ ইষ্টক নির্মিত বৃহৎ মন্দির এবং এই মন্দিরে মদনগোপাল বিগ্রহ সহ শ্রীরাধিকা ও শ্রীললিতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর বিশেষ তিথি উপলক্ষে শ্রাবণ, কার্তিক ও ফাল্গুন মাসে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের পূর্বভাগে গোপাল দীঘি নামক বৃহৎ পুষ্করিণীর পাড়ে ১লা মাঘ উত্তরায়ণ উপলক্ষে মেলা বসে। গোপাল মন্দিরের মূল প্রবেশ পথের উপর লিপি ঃ

'পুনঃ সংস্কার কারক
শ্রীরামানন্দ বসু
দাস পুত্র সত্যখান
শ্রীরাম বসু'

গোপাল মন্দিরের দক্ষিণে প্রবেশ পথে উপর লিপি ঃ

'সম্বাথি'···শ্রীল সানা জানকঃ
সত্যরাজ খান পুত্র শ্রীনাথ বসুঃ'

গ্রামের হাটতলায় একটি মাটির ঘরে প্রস্তর নির্মিত শিবামূর্তিকে শিবাণী দেবী নামে পূজা করা হয়। শোনা যায় যে, প্রাচীন মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে দেবীকে মাটির ঘরে রাখা হয়েছে। মন্দিরের নিদর্শন না থাকলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মূর্তিটি প্রাচীন। ভট্টাচার্য পাড়ায় একটি দালান মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় সাড়ম্বরে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ও মেলা বসে। জীর্ণদশাগ্রস্ত রঘুনাথ মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও হনুমান মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং নিত্যপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঐ একই মন্দিরে দশভুজা ভুবনেশ্বরী দেবীর প্রস্তর মূর্তির নিত্যপূজা হয়। কৃষ্ণরায় মন্দিরের কথা শোনা গেলেও ঐ মন্দিরের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। মিত্রপাড়ায় কালুরায় নামক ধর্মশিলার নিত্যপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কুলিনগ্রামস্থ চৈতন্যপাড়ায় একটি ইষ্টকস্তূপ আছে। পূর্বে এর দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর ভাগে গড়খাত ছিল এবং এই জায়গাটি রামানন্দের ভিটা রূপে সনাক্ত করা হয়। কুলিনগ্রামের দক্ষিণ ভাগের শেষ প্রান্তে হরিদাস ঠাকুরের ভজন স্থানে দারুনির্মিত গৌরাঙ্গ মূর্তি পূজিত হয় এবং একই মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগে রাধাকৃষ্ণ ও নাড়ুগোপালের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ীতে প্রতি বছর আশ্বিন মাসে তাঁর তিরোভাব উৎসব এবং অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় মঠের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন কীর্তনীয়া সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। শোনা যায়

যে, এই জায়গাটি জগদানন্দ পাঠকের গৃহ ও ভজনাশ্রম ছিল। মন্দিরের সম্মুখ ভাগে ইষ্টকলিপি হতে জানা যায় যে, ১৮৩৩ শকাব্দে বৈদ্যপুরনিবাসী দীননাথ নন্দী, হরিদাস ঠাকুরের জপস্থলে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তবে আশ্বিন মাসে তিরোধান উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ায় যবন হরিদাসের ভজনক্ষেত্র রূপে কথিত স্থানে বিপরীত সাক্ষ্য বহন করছে ; কারণ যবন হরিদাস ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে ৯ই মার্চ পুরীতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

কবিতীর্থ দামুন্যা

বর্ধমান জেলার গ্রাম পরিক্রমাকালে আমার স্বগ্রামবাসী অগ্রজপ্রতীম সঞ্জীবকুমার বন্ধুর নিকট শ্রীকবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জন্মভূমি দর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি সানন্দে এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। সম্মতি লাভের পর দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল এবং ১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মে তারিখে দু'জনে বর্ধমান হতে বেরিয়ে পড়লাম। বর্ধমান-দামুন্যার বাস ধরে প্রথমে রায়না গ্রামের তথ্যানুসন্ধানের পর পুনরায় বাসে দামুন্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। দামুন্যা যাবার পথেই প্রয়াত ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুকুমার সেনের জন্মভূমি গোতান গ্রামের অবস্থিতি।

দামুন্যায় পৌঁছে কবিকঙ্কণের বাসস্থান দেখতে গেলাম। ভট্টাচার্য উপাধিধারী কবিকঙ্কণের বংশধরগণ এখনও দামুন্যায় বসবাস করছেন। তবে এই বংশের একটি গোষ্ঠী ছোট বৈনান গ্রামে আছেন। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই মুকুন্দরামের বংশধরগণের বাসগৃহ এবং বাসগৃহের সংলগ্ন স্থানে 'কবিকঙ্কণ স্মৃতি মন্দির' স্থাপিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদানে স্মৃতি মন্দিরের জন্য ইষ্টক নির্মিত পাকা গৃহের নির্মাণের কার্য শুরু হয়েছে। অবশ্য গৃহনির্মাণের আর্থিক দায়দায়িত্বের সিংহভাগ স্মৃতি মন্দিরের পরিচালকবর্গ ও মুকুন্দপ্রেমীদের বহন করতে হচ্ছে। আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে কবির দৌহিত্র বংশীয় দামুন্যাবাসী নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় উপস্থিত হলেন। তাঁর কাছে কবির দামুন্যায় প্রত্যাবর্তন, বংশধরদের কথা ও গ্রাম সম্পর্কিত বিবরণ শোনার পর গ্রাম প্রদক্ষিণ শুরু হল।

দামুন্যা গ্রামে মাটির দেওয়াল ও খড়ের ঘরে অধিষ্ঠিতা কবির বংশের আরাধ্যাদেবী সিংহবাহিনী চণ্ডীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং তাঁর সেবাকার্য পালাক্রমে পরিচালিত হয়। ধাতুনির্মিত চতুর্ভুজা চণ্ডীমূর্তির বৈশিষ্ট্য হল—উপরের দু'হাতে পদ্ম ও চক্র এবং নিচের হাতে ত্রিশূল শোভিত। পদতলে সিংহ ও মহিষাসুর ; দেবীর ডান পা মহিষের উপর এবং বাম পা দিয়ে মহিষের ছিন্নমুণ্ড দলন করছেন। মূর্তিটি ক্ষুদ্র, কিন্তু অপূর্ব সুন্দর। ১৪/১৫ বৎসর পূর্বে প্রাচীন মূর্তি চুরি হওয়ায় নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ভট্টাচার্য বংশের একাংশ টীকারামের সময় হতে ছোটবৈনান

গ্রামে বসবাস করছেন এবং পারিবারিক বিশেষ উৎসব উপলক্ষে চণ্ডীমূর্তিটিকে ছোটবৈনান গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেকারণে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের কল্পনায় ধরা পড়েছে যে, মুকুন্দরাম আড়া (ব্রাহ্মণভুম পরগণা) হতে প্রত্যাবর্তনের পর ছোটবৈনানে বসবাস শুরু করেন। ডঃ মণ্ডলের এই অনুমানের কোন ভিত্তি নাই। কারণ সিংহবাহিনী চণ্ডীমূর্তি, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথি ও কবিপুত্র শিবরামের আনুকুল্যে বারা খাঁ কর্তৃক প্রদত্ত ২০ বিঘা ভুমিদান (বসতবাড়ী সহ) কার্যের সম্পর্ক রয়েছে দামুন্যার সঙ্গে এবং অধিকাংশ বংশধর দামুন্যায় বসবাস করছেন। ডঃ মণ্ডল নিজ গ্রামের খ্যাতি বৃদ্ধির মানসে ছোটবৈনানে মুকুন্দরামের প্রত্যাবর্তনের কথা কল্পনা করেছেন। এখানে চণ্ডীমঙ্গলের যে পুঁথিটি সংরক্ষিত আছে সেটি মুকুন্দরামের স্বহস্ত লিখিত কিনা সে বিষয়ে উভয়েই সংশয় মুক্ত হতে পারি নাই।

দামুন্যায় চক্রাদিত্য শিবের মন্দিরের অস্তিত্ব নাই। তবে রত্না নদীর তীরে একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষে মেলায় প্রচুর জনসমাগম হয়। রত্না নদীর একাংশে জাহাজপোতা নামে একটি স্থান আছে। প্রয়াত প্রত্নতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত জাহাজপোতা উৎখনন করে কাঠের পাটাতন, প্রাচীন মূর্তি ও মন্দিরের দরজার পাথরের বাজু আবিষ্কার করেছিলেন। প্রস্তর নির্মিত বাজুগুলি ভাস্কর্য ক্ষোদিত ছিল। চক্রাদিত্য শিবের গাজনের সময় শিব ও শীতলার বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কুরকুজা নামক দীঘির পাড়ে একটি মাটির ঘরে শীতলাদেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। পিতলের তৈরী রুদ্রদেব ও চণ্ডীর পিতল নির্মিত মূর্তির নিত্য-পূজা হয়। গ্রামের মধ্যে একটি পঞ্চমুণ্ডীর আসনের উপর প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবারে রক্ষাকালী দেবীর পূজা হয়। গ্রামের উত্তরভাগে মাণিকপীরের উরস উপলক্ষে ১২ই ফাল্গুন হতে ৩দিন ধরে কল্পতরুর মেলায় প্রচুর জনসমাগম হয়। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন ধর্মরাজের বাৎসরিক পূজা হয়। বর্তমানে ধর্মরাজের গাজন বন্ধ হয়ে গেছে। অতীতে দামুন্যায় রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হত; কিন্তু কিছুকাল পূর্বে রথ ভেঙ্গে যাওয়ায় এই উৎসবটি বন্ধ হয়ে গেছে। সম্প্রতিকালে কবিকঙ্কণ স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে ৪ঠা মাঘ হতে ৬ই মাঘ পর্যন্ত তিন দিন ধরে সাংস্কৃতিক মেলা হয়।

'চণ্ডীমঙ্গল'-এর কবি মুকুন্দরামের জন্মস্থান রূপে দামুন্যার প্রসিদ্ধি। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কবি সরকার সেলিমাবাদের অন্তর্গত হাবেলী পরগণার অন্তর্ভুক্ত দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং কবির আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে জানা যায় যে, তাঁর সাতপুরুষের বাসস্থান হল এই গ্রামে। স্থানীয় শাসকের অত্যাচারে গ্রাম ত্যাগ করার কিছুকাল পরে কবি অথবা তাঁর পুত্র শিবরাম পুনরায় দামুন্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই প্রমাণ মিলছে শিবরামের আনুকুল্যে বারা খাঁর অধীনস্থ কুতুব খাঁ কর্তৃক সম্পাদিত ২০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর দলিল হতে (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৩-০৪)। অম্বিকাচরণ গুপ্তের মতে, মুকুন্দরাম দামুন্যা হতে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ভাণ্ডামোড়া গ্রামে

বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করেন। ষোড়শ শতকে ভাণ্ডামোড়া গ্রামে বহু পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী ছিল, যাঁরা বিদ্যার্থীদের বিদ্যা, অন্ন ও আশ্রয় দান করতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, অম্বিকাচরণ গুপ্ত দামুন্যায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে বসবাসের নিমিত্ত ভাণ্ডামোড়ায় গমন করেন। নিকটবর্তী পাইটা গ্রামে ছিল কবির শ্বশুরালয়। মুকুন্দরামের শুভানুধ্যায়ী দামুন্যাবাসী দামালনন্দী (মতান্তরে গোপীনাথ নন্দী) ও তাঁর অপর এক শুভানুধ্যায়ী গরীব খাঁর বংশধরগণ এখনও এই গ্রামের অধিবাসী এবং একথা তাঁরা সগৌরবে ব্যক্ত করে থাকেন।

আত্মপরিচয়

পরিশেষে কবির বাসভূমি দামুন্যা ও কবির বংশ পরিচিতি সম্পর্কে কবির নিজস্ব ভাষায় তুলে ধরা হল ঃ—

'ধন্য ধন্য কলিকালে রত্না নদীর কুলে
অবতার করিলা শঙ্কর
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামুন্যা করিলা ধাম
তীর্থ কৈলা সেই ত নগর।
বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব দেউল দিলা ধুসদত্ত
কতোদিন তথায় বিহার
কে জানে তোমার মায়া দেবকুল ছাড়িয়া
চল দলে করিলা সঞ্চার
হরি নন্দী ভাগ্যবান শিবে দিল ভূমিদান
মাধব ওঝা ধামতি করনি
দামুন্যার লোক যত শিবের চরণে রত
সেই পুরী হরের ধরণী।
গঙ্গা সম নিরমল তোমার চরণ জল
পান কৈলা শিশুকাল হৈতে
সেই পুণ্যের ফলে কবি হৈয়া শিশুকালে
রচিলাম তোমার সংগীতে।
নামদা বিখ্যাত স্থান দত্তবংশে সত্যবান
কল্পতরু নাম উমাপতি
অশেষ পুণ্যের কন্দ নাগ ঋষি সর্বানন্দ
সেই পুরী সজ্জন বসতি।
কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘাটি বেদান্ত নিগম পাটি
কুশাল পণ্ডিত মহাশয়

দামুন্যা নগরবাসী বন্দ্যঘাটি বাগালপাসি
কুলত্তমা তিন মহাশয়।
নিজ বৃত্তি অনুপদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য
দামুন্যাতে বৈসে কবিরাজ
কুলে শীলে গুণে বাড়া সুধন্য দক্ষিণ রাঢ়া
সুপণ্ডিত সুকবি সমাজ।
কাজরি কুলের জার মহামিশ্র অলঙ্কার
শব্দকোষ কাব্যে পুনিধান
কয়াড়ি কুলের রাজা সুকৃতি তপন ওঝা
তস্য সুত উমাপতি নাম
তস্য সুত শ্রুতকর্মা সুকৃতি মাধব শর্মা
তার তনয় সহোদর
উদ্ধব পুরন্দর নিত্যানন্দ মহেশ্বর
গর্ভেশ্বর মহেশ সাগর।
বাসুদেব অনুজাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পুজিল শঙ্কর
তস্য সুত গুণবান গুণিরাজ মিশ্র নাম
কবিচন্দ্র তার বংশধর।
অনুজ মুকুন্দ শর্মা সুকবি কৃত কর্মা
নানা শাস্ত্র বিদ্যায় বিদ্বান
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।'

বাঘনাপাড়া

(ধর্ম সমন্বয়ের পীঠস্থান)

কালনা থানার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীপাট বাঘনাপাড়া (রাধানগর মৌজা—জে. এল. নং ৭৮) ভ্রমণের ইচ্ছা হলে ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া রেলপথে বাঘনাপাড়া স্টেশনে নেমে পশ্চিমমুখী সড়ক পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। এই প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রামটি বহু কাল ধরে প্রসিদ্ধ হলেও ষোড়শ শতকে বল্লুকা নদীর তীরে নূতন করে গ্রাম পত্তন হয়েছিল। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে বৈষ্ণব সাধক বংশীবদন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত বাঘনাপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। বংশীবদনের পৌত্র ও চৈতন্য-দাসের পুত্র রামাই পণ্ডিত বা রামচন্দ্র (জন্ম ১৪৫৬ শকাব্দ) জাহ্নবা দেবীর পালিত

পুত্র ছিলেন এবং তাঁর সময়ে এতদঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের যথেষ্ট প্রচার ও প্রসার লাভ ঘটেছিল। ১৫৮৩ খ্রীস্টাব্দে রামচন্দ্র গোস্বামী জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় পাঁচ বছর অবস্থানের পর বৃন্দাবনের প্রস্কন্দন-তীর্থ হতে কৃষ্ণ-বলরামের বিগ্রহ নিয়ে আসেন ও বাঘনাপাড়ায় শ্রীপাটে প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি এই যে, রামচন্দ্র একটা বাঘকে পোষ মানিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রভাবে এই স্থানে বাঘের উপদ্রব দূর হওয়ায় গ্রামের নামকরণ করা হয়েছিল,—'বাঘ-না (নাই)—পাড়া'। অন্য মতে শোনা যায় যে, ব্যাঘ্রপাদ নামক ঋষির অবস্থানের জন্য স্থানটি 'বাঘনাপাড়া' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

ষোড়শ শতক হতে একালের বাঘনাপাড়ার পরিচয় পাওয়া গেলেও এই গ্রাম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আরও প্রাচীন। অধ্যাপক ডঃ কাননবিহারী গোস্বামী গোপীশ্বর শিবলিঙ্গ ও দুটি ভগ্ন প্রস্তর স্তম্ভের নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বেলে পাথরে নির্মিত কীর্তিমুখসহ রত্নমালা ক্ষোদিত শিলাফলকটির দৈর্ঘ্য ৩ ফুট এবং প্রস্থ ১ ফুট। শিলাফলকের বাম ভাগে সিংহমুখ বা ব্যায়ত কীর্তিমুখ হতে রত্নমালা সকল বিলম্বিত হয়ে আছে। কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির হতে গোপীশ্বর মন্দির যাবার পথে স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠিত আছে। ডঃ গোস্বামীর মতে এই শিলাফলকটির সঙ্গে বীরভূম জেলার পাইকোর গ্রামে স্থাপিত চেদীরাজ কর্ণদেবের শিলাস্তম্ভে ক্ষোদিত কীর্তিমুখ ও রত্নমালার সাদৃশ্য আছে।

গোপীশ্বর শিবলিঙ্গের ভাস্কর্য বড়ই বিচিত্র ধরনের এবং মূর্তিশিল্পে এরূপ ভাস্কর্য অত্যন্ত বিরল। বৃন্দাবনের গোপীশ্বরের ন্যায় বাঘনাপাড়ার গোপীশ্বর শিবের স্ত্রীলোকের বেশভূষা নাই। বর্ধমানেশ্বর শিবলিঙ্গের ন্যায় তিনটি পৃথক পৃথক প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা শিবলিঙ্গটি নির্মিত। কিন্তু গোপীশ্বর শিবলিঙ্গের রুদ্র-ভাগে একটি দশভুজামূর্তি ক্ষোদিত আছে। শিবের বিভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্য রুদ্র-ভাগে একটি মুখাবয়ব ক্ষোদিত থাকলে সেটি মূর্তিশিল্পে এক মুখলিঙ্গ নামে কথিত হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে একটি অষ্ট-মুখলিঙ্গ শিবমূর্তি রক্ষিত আছে। রাজস্থানের কোটা জেলায় গৌরীপট্ট বিহীন একমুখ লিঙ্গ শিব আছে। কিন্তু বাঘনাপাড়ায় শিবলিঙ্গের রুদ্রভাগে উৎকীর্ণ দশভুজা মূর্তিটি বদ্ধ-পদ্মাসন ভঙ্গীতে আসীন এবং দশ-প্রহরণধারিণী। এরূপ অসাধারণ মূর্তি বিরল। কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতের বিষ্ণুকাঞ্চিতে শিবলিঙ্গে উমামূর্তি ক্ষোদিত আছে। গলসী থানার আদরাহাটী গ্রামে শিবলিঙ্গের রুদ্রভাগে ক্ষোদিত মূর্তি আছে এবং অনুরূপ একটি মূর্তি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে, যেটি আদরাহাটি গ্রাম হতে সংগ্রহ করা হয়েছিল। দশভুজার-মূর্তির নিম্নে সদাশিবের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। সদাশিব ছিলেন সেন রাজাদের কুলদেবতা এবং সেন রাজাদের কয়েকটি তাম্রশাসনে সদাশিব মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। মনে হয় সদাশিব বিগ্রহ ও কীর্তিস্তম্ভটি সেনবংশের কোন রাজা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তারপর স্থানটি কোন কারণে পরিত্যক্ত হওয়ায়

জঙ্গলে পরিণত হয়। পুনরায় ষোড়শ শতকে গ্রাম পত্তনের সময় সদাশিব বিগ্রহকে গোপীশ্বর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এক মুখলিঙ্গ সদাশিব বিগ্রহ ও শিলাস্তম্ভ বাঘনাপাড়ার সুপ্রাচীন ইতিহাসের স্মারক চিহ্ন।

রামচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও ভগবত ভক্তির জন্য দলে দলে লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। শোনা যায়, বীরভদ্র প্রভু এক সময়ে বার হাজার শিষ্যসহ রাত্রি দ্বিপ্রহরে বাঘনাপাড়ায় উপস্থিত হয়ে তাঁদের অভিরুচি মত আহার্য দ্রব্য দিতে বলেন। রামচন্দ্র পৌষ মাসে আম্রফল প্রদান করে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। বৃন্দাবন হতে আগত মীনকেতন ও কায়স্থ কৃষ্ণদাস রামচন্দ্রকে রেবতী ও রাধারাণী বিগ্রহদ্বয় অর্পণ করায় তিনি সানন্দে তাঁদের কৃষ্ণ-বলরামের পার্শ্বে স্থাপন করতে পারায় তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধ হয়। শেষ জীবনে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দন ও তাঁর তিন পুত্রের (রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও কেশব) হস্তে শ্রীপাটের দায়িত্ব অর্পণ করে একান্তে সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৫০৬ শকাব্দে (মতান্তরে ১৫১৯ শকাব্দ) মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে রামচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন। আজও রামচন্দ্রের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে ছয় দিন ধরে মহোৎসবের সময় বহু বৈষ্ণব ও ভক্তের আগমন ঘটে বাঘনা-পাড়ার শ্রীপাটে। চৈতন্যদাস ও রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষগণ হলেন এই শ্রীপাটের সেবক।

বাঘনাপাড়ার উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য বস্তু হল রামচন্দ্রের ভ্রাতা শচীনন্দন কর্তৃক নির্মিত কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে চারিছত্র শ্লোক উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু প্রথম দুই ছত্র অত্যন্ত অস্পষ্ট হওয়ায় পড়া যায় নাই। শেষ দু'ছত্রের পাঠ হতে মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় জানা যায়। যথা,—

'শাকে নাগাগ্নি কামেষু বিধৌ শ্রীরামচন্দ্রতঃ।
আবিরাসীদিষ্ট স্তম্ভং কার্যেঽস্মিন্ শ্রীরমাপতেঃ॥

অর্থাৎ নাগ = ৮, অগ্নি = ৩, কাম = ৫ ও বিধু = ১ ধরে অঙ্কস্য বামাগতি অনুযায়ী ১৫৩৮ শকাব্দ বা ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের গর্ভগৃহ আটচালা ও জগমোহনটি চারচালা রীতিতে নির্মিত হয়েছিল। ইষ্টক নির্মিত প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে কুলীন গ্রামের গোপেশ্বর শিবমন্দির, শ্রীরামপুরের পুরাতন রাধা-বল্লভ মন্দির, আমাদপুরের গোপাল মন্দির, এক্তেশ্বরের শিব মন্দির, কেশিয়াড়ীর সর্বমঙ্গলা মন্দিরের পরেই বাঘনাপাড়ার কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরের স্থান। কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরের উত্তরে সমউচ্চতা বিশিষ্ট রেবতী-রাধারাণীর মন্দিরটি আটচালা পদ্ধতিতে নির্মিত। কিন্তু এই মন্দিরে টেরাকোটা অলঙ্করণের পরিবর্তে স্টাকো পদ্ধতিতে লতাপাতা, ফুল, পক্ষী ইত্যাদি উৎকীর্ণ আছে।

রেবতী-রাধারাণী মন্দিরের বিপরীত দিকে অবস্থিত জগন্নাথ মন্দিরটি একচালা দুর্গামণ্ডপের ন্যায়। এই মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। দারুবিগ্রহ তিনটি পুরীর আদলে তৈরী হলেও নবকলেবর হয় না। গোপীশ্বর শিবমন্দিরটি চারচালা রীতিতে নির্মিত এবং প্রবেশ পথের উর্দ্ধভাগে টেরাকোটা অলঙ্করণ আছে।

নাটমন্দিরের সম্মুখে কোষ্ঠী পাথরের নন্দীবৃষ স্থাপিত রয়েছে। এই মন্দিরের মধ্যে অষ্টধাতুর জয়দুর্গা প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রাচীন মূর্তি অপহৃত হওয়ায় নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যে রামচন্দ্র গোস্বামীর পিতৃব্য ও বৈষ্ণব পদকর্তা নিত্যানন্দদাসের গোকুলচাঁদ, নিতাই-গৌর, গোপাল, লক্ষ্মী, ১০৮টি শালগ্রাম শিলাসহ রাজরাজেশ্বর, ১০৮টি ক্ষুদ্রাকৃতির শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দির চত্বরের মধ্যে সুপ্রশস্ত নাটমন্দির, দ্বিতল নহবৎখানা, অষ্টকোনাকার ঘড়িঘর, জগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাঘর, রন্ধনশালা, দুর্গামণ্ডপ, গাজন মন্দির, দোলমঞ্চ আছে। সমগ্র দেবক্ষেত্রটি ঠাকুরবাড়ী নামে কথিত এবং প্রাসাদোপম ঠাকুর বাড়ীটি সুউচ্চ সিংহদ্বার দ্বারা শোভিত।

গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় ইষ্টক নির্মিত চারচালা মন্দিরে মনসা, শীতলা ও জগৎগৌরীর নিত্য পূজা হয়। দোলমঞ্চের পূর্বে অবস্থিত টেরাকোটা অলংকরণে শোভিত একটি চারচালামন্দিরে কষ্ঠিপাথরের শিবলিঙ্গের নিত্যসেবাপূজা হয়। এছাড়া বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের জোড়া মন্দির, নন্দ গোস্বামীর যমুনাঘাটের মন্দির, নাথ পরিবারের মন্দির, পূর্বপাড়ায় সেনগুপ্ত পরিবারের মন্দির, বড়াল ঘাটের মন্দির মাঝের পাড়ায় রঘুনাথ গোস্বামীর মন্দির হল গ্রামের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু।

বাঘনাপাড়ার উৎসবগুলি বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হলেও এখানকার বৈষ্ণব পরিবারের উদার মনোভাবের জন্য শিব, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, মনসা ও অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীকে উপলক্ষ করে বছরের বিভিন্ন সময়ে পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শিবক্ষেত্র রূপে বাঘনাপাড়ার আদি পরিচিতি হলেও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে তা ম্লান হয়ে যায় এবং স্থানটি বৈষ্ণবতীর্থ রূপে পরিগণিত হয়। গোস্বামী পরিবারের উদার মনোভাবের জন্যে একই ঠাকুর বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণ, শিব, শক্তি ও লৌকিক দেবীর সেবা পূজা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত আছে। তবে ঠাকুর বাড়ীতে কোন পশুবলি হয় না।

রামচন্দ্র গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে মাঘ মাসে অনুষ্ঠিত মহোৎসবের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বাঘনাপাড়ায় ছ'দিন ধরে মহোৎসব পালিত হয়। রামচন্দ্র বাৎসল্যভাবে কৃষ্ণ-বলরামের সেবা করেছিলেন; তাই তাঁর তিরোধান তিথির দিনে পিতৃশ্রাদ্ধের মত কৃষ্ণ-বলরাম বিগ্রহদ্বয়কে 'কাছা' পরিধান করান হয়। বিগ্রহদ্বয়কে দ্বিতীয় দিনে নবীন বেশ, তৃতীয় দিনে রাখাল বেশ, চতুর্থ দিনে নটবর বেশ, পঞ্চম দিনে রাজ বেশ ও ষষ্ঠ দিনে সিঙ্গার বেশে সাজান হয়। ষষ্ঠ দিন সকাল ও বৈকালে বিগ্রহদ্বয়কে ফকিরের বেশে সাজান হয়, যেন তাঁরা পিতৃশ্রাদ্ধ পালন করে সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন। শিবরাত্রিতে গোপীশ্বর মন্দিরে বহু ভক্তজনের সমাবেশ হয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় কৃষ্ণ-বলরামের ফুলদোল উৎসব ও দোলযাত্রায় কৃষ্ণ-বলরাম ও রাধারাণী—রেবতী দেবীর গ্রাম প্রদক্ষিণের সময় বাঘনাপাড়া ও আশপাশ গ্রামে বিশেষ উৎসবের মেজাজ ফিরে আসে। এছাড়া চৈত্র মাসে গোপীশ্বর শিবের গাজন, আষাঢ় মাসে

জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা, চৈত্র মাসে বংশীবদনের জন্মোৎসব, হোড়া পঞ্চমী প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে সারা গ্রাম মেতে উঠে। গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে 'রাধানগর'-এ নাথ যোগী বা যুগীদের উপাস্য দেবতা ধর্মরাজের পূজা ও উৎসব হয়। একটা লম্বা কাল রঙের শিলাখণ্ডে ধর্মরাজ ও একটা গোলাকার পাথরকে কূর্মশিলা জ্ঞানে পূজা করা হয়। ধর্মরাজ মন্দিরে মঙ্গলচণ্ডী নামে পূজিত প্রস্তরখণ্ডটি কোন বিগ্রহের ভগ্ন পাদপীঠ। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ধর্মরাজের জাত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বল্লুকা নদীর তীরে অবস্থিত বাঘনাপাড়া হল ধর্মঠাকুর ও মনসার পীঠস্থান। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মনাসাদেবীর ঝাঁপান উৎসব পালিত হয়।

বৈষ্ণবতীর্থ বাঘনাপাড়ায় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে শৈব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম ও লৌকিক ধর্মের সমন্বয় দেখে বিস্ময় জাগে। এই শ্রীপাটের প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। কিন্তু অন্যান্য স্থানের ন্যায় দেবসেবার নামে সম্পত্তি কুক্ষিগত করার প্রয়াস বাঘনাপাড়ার গোস্বামীদের নাই। তাঁরা 'শ্রীবলদেবকৃষ্ণ জীউর ব্যবস্থাপক সমিতি' গঠন করে দেবালয় সংরক্ষণ ও সারা বছরের উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করেন—যা একালে অত্যন্ত দুর্লভ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। বর্ধমান সম্মিলনী (হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৭৪ সাল) ঃ প্রবন্ধ ঃ বাঘনাপাড়ার মন্দির বিগ্রহ ও সাহিত্য—অধ্যাপক ডঃ কাননবিহারী গোস্বামী।

মৌলায় রঙ্কিনী বন্দো

জামালপুর থানার অধীনস্থ চকদীঘি হতে ৩ কিলোমিটার পূর্বে গোপীকান্তপুরের (মৌজা নং ৫৬) দক্ষিণে রঙ্কিনী মহুলা বা মৌলায় রঙ্কিনীদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। রঙ্কিনীদেবীর আদি অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হল ধলভূমের মহুলিয়ায় এবং পরবর্তীকালে কোন একসময়ে দেবীকে ধলভূমের রাজধানী ঘাটশিলায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং রঙ্কিনীদেবী হলেন ধলভূম রাজবংশের কুলদেবী। ধলভূমের আদিবাসীদের বেঁধা পরব অনুষ্ঠান হয় দেবীর সম্মুখে। ছোটনাগপুরের অরণ্য অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলে রঙ্কিনী হলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী দেবী। কিন্তু কালক্রমে দেবীর পূজা মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি এতদঞ্চলে লৌকিক দেবীতে পরিণত হয়েছেন। বরাকরের সন্নিকটে দেবীস্থানে দেবী কল্যাণেশ্বরী সম্ভবতঃ আদিতে রঙ্কিনী নামে পূজিতা ছিলেন এবং পরে তিনি কল্যাণেশ্বরীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। এ কথার সমর্থনে একটি প্রাচীন লোকগাথার উল্লেখ করা যায়,

—'ধলেতে রঙ্কিনী মাগো শিখরে কল্যাণী' অর্থাৎ ধলভূমে যিনি রঙ্কিনী, শিখরভূমে (অতীতে দেবীস্থান বা কল্যাণেশ্বরী শিখরভূমের অন্তর্গত ছিল) তিনিই কল্যাণেশ্বরী। রঙ্কিনীদেবীর সঙ্গে মহুয়া বা মৌল গাছের সম্পর্ক থাকায় তাঁর অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের স্থাননামের পূর্বে মৌলা বা মহুলা শব্দের যোগ আছে।

'মহুল বৃক্ষের তলে বিশ্রাম আমার।
মহুলিয়া নামে গ্রাম হইবে প্রচার॥'

বর্ধমান জেলায় কোন সময়ে বা কতকাল পূর্বে রঙ্কিনীদেবী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে তথ্য অজ্ঞাত। সম্ভবতঃ কোন আদিবাসীগোষ্ঠীর মানুষ দামোদরের (কানা দামোদর) প্রবাহপথে অরণ্য অধ্যুষিত জলার নির্জন প্রান্তরে দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তবে ষোড়শ শতকের পূর্বে রঙ্কিনীদেবীর পূজা অত্র স্থানে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, তার উল্লেখ পাওয়া যায় মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে',—'মৌলায় রঙ্কিনী বন্দো মস্তকের পাগে'। বলরামদাসের 'কালিকামঙ্গলে' বর্ণিত আছে,—

'মৌলায় রঙ্কিনী বন্দো জোড় করি পানি।
ভাণ্ডারহাটে বন্দিলাম সাবিত্রি গোসানি॥'

রূপরাম ও মানিকরামের দিগ্‌বন্দনায় 'মৌলায় রঙ্কিনী দেবীর' উল্লেখ আছে বর্ধমান জেলায় রঙ্কিনীদেবীর পূজা সুদীর্ঘ কাল ধরে চলে আসছে।

ওড়িযায় 'রঙ্ক' শব্দের অর্থ হল 'উন্মাদ' এবং সিংভূম জেলায় 'বহড়াগড়'-এ শব্দটি রাক্ষসী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ঘাটশিলার রঙ্কিনী মূর্তি অষ্টভুজা, পাদপীঠে শবমূর্তি। প্রস্তর ক্ষোদিত উপরের দুই বাহুতে দুটি হস্তী ধরা আছে। তবে সর্বত্র দেবীর মূর্তি নাই—কোথাও শিলামূর্তিতে পূজিত হন। কোন কোন স্থানে গ্রামের পার্শ্বে বড় বৃক্ষের মূলদেশে দেবীর স্থান আছে। পোড়ামাটির তৈরী হাতী-ঘোড়া সিঁদুর লিপ্ত করে দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার প্রথা আছে। সম্ভবতঃ অরণ্যাচারী মানুষ হস্তীভয় হতে পরিত্রাণের জন্য পোড়া মাটির হাতী মানত করত। গলসী থানার কয়েকটি গ্রামে ধর্মরাজের স্থানে হাতী উৎসর্গ করার প্রথা আছে। হাতীর সঙ্গে দেবীর সম্পর্ককে অনেকে মনে করেন যে, আদি উপাসকগণের টোটেম ছিল 'হস্তী'।

রঙ্কিনীদহের পশ্চিমভাগে অরণ্যের মধ্যে একটি মন্দিরে দেবী অধিষ্ঠিতা। প্রায় ১২ ফুট উচ্চ রঙ্কিনী দেবীর শিবোপরি শায়িত মৃন্ময়ী মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। শোনা যায় যে, রাম ব্রহ্মচারী নামে জনৈক তান্ত্রিক সাধক কানাদামোদরের তীরে অরণ্য-মধ্যে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে তান্ত্রিক মতে সেবাপূজা করতেন। রঙ্কিনী গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গণ্য হলেও পার্শ্ববর্তী গ্রামের সর্বসাধারণের কাছে তিনি ঈশ্বরী। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা তাঁর নিত্যপূজা হয়। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাস হতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবারে দেবীর বিশেষ পূজা হয় এবং ১লা বৈশাখ চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে বিভিন্ন গ্রামের লোকেরা পালাক্রমে (গ্রামের সকল মানুষের নিকট হতে পূজার উপকরণ সংগ্রহ করার রীতি আছে)

ষোড়শোপচারে পূজার উপকরণ, বস্ত্র, অলংকার, দক্ষিণা ও বলিদানের জন্য ছাগ প্রেরণ করেন। গ্রাম্য সাধারণের পূজা প্রেরণের প্রথাটিও সম্ভবতঃ ঘাটশিলার অনুকরণে এখানেও প্রচলিত হয়েছে। প্রতি বৎসর শারদীয়া অষ্টমী ও মহানবমীতে বলিদানসহ জাঁকজমক সহকারে বিশেষ পূজা হয়। মন্দির হতে কিছুটা দূরে চড়ক উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

রঙ্কিনীদেবীর পূজার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হল বলিদান। ধলভূমে দেবীর নিকট ছাগ ও মহিষ বলিদানের প্রথা আছে; এমনকি অতীতে নরবলি প্রদান করা হত। নরবলি দেওয়ার জন্য ধলভূমের রাজাকে এক সময়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বর্ধমান জেলায় রঙ্কিনীদেবীর উদ্দেশ্যে নরবলি দেওয়ার ঘটনাগুলি ঊনবিংশ শতকের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি (৯ই মাঘ, ১২৪৩) 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার খবরে প্রকাশ—'এক দিবস দেবীর পূজক ব্রাহ্মণ যথা-নিয়মে প্রাতঃস্নানাদি সমাধাপূর্বক মহামায়ার অর্চনার্থে মন্দিরের সন্নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে খর্পরের স্থান রক্তে প্লাবিত চারিপার্শ্বে ধূপ ও ঘৃতের গন্ধ আমোদ করিয়াছে ইহাতে পুরোহিত অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করত আরও বিস্ময়াপন্ন হইলেন যেহেতুক ঘরের চারিদিগে দেবীকে বেষ্টিত করিয়া রুধির জমাট হইয়াছে। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড চিনির নৈবেদ্য এবং তদুপযুক্ত আরও সামগ্রী ও একখানা চেলির শাটী তদুপরি এক স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা এবং প্রায় ১০০০ রক্তজবা পুষ্প তম্মধ্যে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার তাহাও প্রায় দুই সহস্র মুদ্রার অধিক হইবেক পরে পুরোহিত ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া কিয়তকাল বিলম্বে মন্দিরের নিকটস্থ দহ অর্থাৎ প্রাচীন নদ হইতে জল আনয়ন পূর্ব্বক সেই সকল শ্রোণিত ধৌত করতঃ সর্ববস্ত্রাভরণ দক্ষিণার মুদ্রা চেলির শাটী ও নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্রব্য সমূহ গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যরূপে আপন ভবনে আগমন করিলেন। পরন্তু তাহার দুই চারি দিবস পরে উক্ত নদ হইতে এক মুণ্ডহীন শব ভাসিয়া উঠিল ইহাতে সুতরাং তত্রস্থ বিচক্ষণগণেরা বিলক্ষণ রূপেই অনুমান করিলেন যে ঈশ্বরীর নিকটে ঐ শব বলি হইয়াছিল, কিন্তু পূজার বাহুল্য দেখিয়া সকলে কহিলেন কোন রাজা আপনার সাধনার নিমিত্তই এ প্রকার ভয়ানক মহাকর্ম্ম সমাধা করিয়াছেন।

এই বিষয় সর্বত্র রাষ্ট্র হইলে বর্দ্ধমান জিলার অধীন চারি থানার দারোগা আসিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না বরং নরবলির পক্ষেই বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল কেন না সেস্থান সিদ্ধ এবং পূর্ব্বে অনেকবার এরূপ ঘটিয়াছিল।' ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ '…সর্ব্বসাধারণের মনে এই অনুভব হইয়াছে যে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার বর্দ্ধমানস্থ রাজার তরফে হইতেছে এবং ঐ বংশের মধ্যে যখন কোন ভারি অস্বাস্থ্য উপস্থিত হয় তখন নরবলিদানের আবশ্যক বোধ করেন।' রাজবাড়ীর এক বিধবা দাসীর পুত্রকে বলি দেওয়া হয়েছিল বলে লোকে সন্দেহ প্রকাশ করে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড)—স. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (৫ম খণ্ড)—স. অশোক মিত্র।
৩। বাংলার লৌকিক দেবতা (প্রবন্ধ : রংকিণী)—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।
৪। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪১ সাল (প্রবন্ধ : রঙ্কিণীদেবী -প্রিয়রঞ্জন সেন)।

জামালপুরের বুড়োরাজ

(শিব ও ধর্ম পূজার মিলনক্ষেত্র)

(১)

রাঢ়ের লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যে শিব ও ধর্মরাজ সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। উভয় দেবতাই বিশিষ্ট গ্রামদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও কোথাও কোথাও লৌকিক দেবতায় পর্যবসিত হয়েছেন। বহু অজস্র ধর্মবিশ্বাস, যাদু প্রক্রিয়া ও লোক-কাহিনীর স্রোত একত্রীভূত হয়ে উভয় দেবতার পূজা ও অনুষ্ঠান লোকধর্মের এমন গভীর স্তরে পৌঁছে গেছে, যা অন্যান্য দেবদেবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শিব ও ধর্মরাজের পূজার আচার, ক্রিয়াকলাপ ও গাজনের সমারোহ দেখে এই দুই দেবতার পূজা প্রকাশের ক্ষেত্রে রাঢ়ের আদিম মানব সমাজের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না—যদিও বহিরঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ছাপ রয়ে গেছে।

শিবপূজার উৎপত্তি হয়েছিল প্রাক্-বৈদিক যুগে বা প্রাগৈতিহাসিক যুগে, একথা সকলেই স্বীকার করেছেন। সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনে নরম প্রস্তর বা পোড়া মাটির নির্মিত এমন কতকগুলি বস্তু পাওয়া গেছে, যেগুলিকে মার্শাল সাহেব লিঙ্গপ্রতীক বলে অনুমান করেছেন। বৈদিক আর্যগণ শিশ্নদেবের পূজকগণকে অবজ্ঞার চোখে দেখলেও পৌরাণিক শিবের মধ্যে বৈদিক রুদ্রদেবের আরাধনার প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার মন্তব্য করেছেন যে, 'প্রলয়ঙ্কর ঝড়, বাত্যা, অশনি, বিশ্বদাহী অগ্নি, মৃত্যু আনয়নকারী সংক্রামক ব্যাধিপুঞ্জ প্রভৃতি নানা প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সংহার লীলার মধ্যে বৈদিক ঋষিগণ ভীতি উদ্রেককারী রুদ্রের উগ্র রূপের প্রকাশ দেখতে পেতেন।' এইভাবেই আর্য ও আর্যেতর জাতি-গোষ্ঠীর দ্বারা পূজিত হয়ে শিব মিশ্রদেবতায় পরিণত হয়েছেন।

পৌরাণিক বিবরণে শিবকে অনাদিলিঙ্গ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে অর্থাৎ শিবের মহিমার কোন তলদেশ খুঁজে পাওয়া যায় না। শিব ঠাকুরের পূজা ও অনুষ্ঠানে পৌরাণিক মত ও লৌকিক মত প্রচলিত থাকলেও লোকধর্মের আশ্রয়ে বা অবলম্বনে

রাঢ়ে ধর্মপূজার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্য ব্যতীত মেয়েরাও শিবঠাকুরকে আপন করে নিয়ে সামান্য গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র দিয়ে মাটির তৈরী শিবের পূজা অর্চনা করে থাকেন। অনুরূপভাবে ধর্মের পূজায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্য ব্যতীত হাড়ি, ডোম, বাগদি প্রভৃতি অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষেরা পুরোহিতের ভূমিকা পালন করেন। ধর্ম অনাদি-অনন্ত এবং তাঁর স্বরূপ হল—

'নহি রেখ নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন।
রবি শশী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জলস্থল নহি ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার নহি ছিল না ছিল কৈলাস॥
নহি ছিল সৃষ্টি আর না ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পর্বত সকল।
দেবতা দেহারা না ছিল পূজিবাক দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে পরভুর নহি আর কেহ॥
ঋষি যে তপস্বী নহি নহিক ব্রাহ্মণ।
পাহাড় পর্বত নহি স্থাবর জঙ্গম॥'

এইভাবেই ধর্মের রূপ বর্ণনা করা হয়েছে। এই স্বরূপ দেখা যায় বিষ্ণুর কূর্ম অবতারের মধ্যে। সৃষ্টির আদিপর্বে কূর্ম অবতারে তিনি পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। কূর্মাবতার হল বিষ্ণুর দশাবতারের দ্বিতীয় রূপ। পৃথিবীর জলভাগ ও স্থলভাগ এক কঠিন ও দুর্ভেদ্য শিলাস্তরের উপর অবস্থিত হয়ে সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে। ধর্মকে কূর্মাকৃতি শিলারূপে কল্পনার পিছনে পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই ময়ূরভট্টের মতে,—'শিলরূপে রহে বিষ্ণু বল্লুকার তীরে।' আবার শিবের গাজনের সময় সন্ন্যাসীরা জলকাদা মেখে কূর্মাসন ভঙ্গীতে যে নৃত্য করেন তা সম্ভবতঃ ধর্মের রূপ কল্পনার কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ঘনরাম চক্রবর্তীর মতে,—গোলোকপতি বিষ্ণুই ধর্মরাজ।

অনেকের মতে সূর্য পূজা হতে ধর্ম পূজার উদ্ভব হয়েছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন যে, ধর্মঠাকুর প্রাক-আর্য অধিবাসী কোমের দেবতা ছিলেন এবং আদিতে অনার্য দেবতা হলেও 'তিনি একে একে বৈদিক বরুণ, অশ্ববাহিত সূর্য, উদীচ্য বেশী অর্থাৎ বুট পরিহিত ঘোড়ায় চড়া মিহির বা সূর্য, পৌরাণিক কূর্মাবতার ও কল্কি অবতার প্রভৃতির সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে বর্তমান ধর্মঠাকুরে রূপান্তরিত হয়ে প্রধানতঃ রাঢ় অঞ্চলেই পূজা লাভ করছেন।' উক্ত মন্তব্যের সঙ্গে রাঢ়ের অষ্ট্রিক জাতি কর্তৃক শিলাপূজা ও 'ধর্মশিলা নামে তাহা ব্যাপিল ব্রহ্মাণ্ডে' বর্ণনাটির মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আরও পরে বৈদিক ও পৌরাণিক নানা দেবতার সঙ্গে এক হয়ে রাঢ়ে ধর্মপূজার উদ্ভব হয়েছিল। পৌরাণিক বিবরণে যমকে ধর্মরাজ বলা হয়েছে। কিন্তু স্কন্দপুরাণে (কাশীখণ্ড, উত্তরার্ধ—৭৮/৪৩) সূর্যনন্দন যমকে

'ধর্মরাজ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে (বনপর্ব) বকরূপী ছদ্মবেশী যক্ষ স্বীয় আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ধর্মরাজ যম। সূর্যের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কের একটা ইঙ্গিত মিলছে মল্লসারুল লিপির উপর ক্ষোদিত চিত্রে। মল্লসারুল লিপিতে রথাস্ব বাহিত ক্ষোদিত চিত্রটিকে অনেকে ধর্মরাজ বলে অনুমান করেছেন এবং উক্ত তাম্রশাসনের প্রথমেই উল্লেখ আছে,—

'জয়তি শ্রীলোকনাথঃ যঃ পুংসাং স্কৃতি-কর্ম্মফল হেতুঃ।
সত্য-তপো-ময়-মূর্তির্লোক-দ্বয়-সাধনো ধর্ম্মঃ॥'

ননীগোপাল মজুমদার লোকনাথ অর্থে বুদ্ধদেবকে ইঙ্গিত করেছেন। অপরপক্ষে লেখতত্ত্ববিদ্ বি. সি. চাব্বা লোকনাথ অর্থে বিষ্ণু ও ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুকুমার সেনের মতে শীলমোহরে উৎকীর্ণ মূর্তিটি ধর্মরাজ সূর্য দেবতার। বিষ্ণু ও সূর্যের সঙ্গে ধর্মরাজের সম্পর্কের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আবার মৃত্যু ও আধিব্যাধির দেবতা যমের উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদানের মন্ত্রটি হল,—

'ঔঁ যমায় ধর্মায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূত ক্ষময় চ॥'

ডঃ অমলেন্দু মিত্র উক্ত মন্ত্রে রঘুনাথ নামক ধর্মরাজ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে মন্ত্র ও অর্ঘ্য প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন (রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর, পৃঃ ১৪৩)। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ছোটনাগপুর অঞ্চলে ওঁরাও গোষ্ঠী সূর্যের উপাসনা করে ধর্মের নামে। রূপ কল্পনায় এই বিগ্রহের রং সাদা এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সাদা ছাগ অথবা সাদা মোরগ বলি দেওয়ার প্রথা আছে। দৃষ্টিহীনতা ও কুষ্ঠরোগের হাত হতে পরিত্রাণ লাভের আশায় তাঁর পূজা করা হয়।

বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত রুদ্রের উপাসনার ন্যায় রাঢ়ে অতিবৃষ্টিপাত রোধ, অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টিপাত, সুফসলের আশা, রোগমুক্তির কামনা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ধর্মের পূজা করা হয়। সেজন্য অনেকে ধর্মের সঙ্গে বরুণ দেবতার সম্পর্কের কথা অনুমান করেন। ধর্মের বাহন হল উলূক (শ্বেত অশ্বের কথাও উল্লেখ আছে) এবং ধর্মের অশ্বারোহী যোদ্ধার বেশে রূপ কল্পনার মাধ্যমে সূর্য অথবা রেবন্তের সম্পর্ক অনুমান করা যায়। অতীতে কুষ্ঠ ও অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধি হতে মুক্তি-লাভের জন্য শাকদ্বীপের অধিবাসীরা সূর্যের উপাসনা করতেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা সংস্কৃতিতে শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ বা গ্রহাচার্যগণ এদেশের ব্রাহ্মণগণের নিকট অপাঙক্তেয় ছিলেন। কৃষ্ণপুত্র সাম্ব (সাম্বপুরাণ) ও মহামদ (ধর্মমঙ্গল) উভয়ে কুষ্ঠরোগ হতে মুক্তি লাভের জন্য সূর্যরূপী ধর্মের উপাসনা করায় উভয় দেবতার স্বরূপ যে, এক বা অভিন্ন একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সূর্য ও বরুণ হলেন কৃষির উৎস। মঙ্গলকাব্যে শিবকে কৃষকের কর্মে নিয়োজিত হতে দেখা যায় এবং সুফল ও বৃষ্টির জন্য ধর্ম পূজার বিধান আছে। মনে হয় প্রাক্-আর্যযুগে সকলেই কৃষি ও আধিব্যাধির দেবতারূপে পূজিত হতেন। এইখানেই ধর্মপূজার সঙ্গে শিবপূজার মিল রয়েছে।

পরবর্তীকালে শিব পৌরাণিক ধর্মের আশ্রয়ে মঙ্গলময় দেবাদিদেবরূপে পূজিত হলেও কোন এক সময়ে ধর্মের পূজা লুপ্ত হয়ে যায়। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী হতে প্রমাণিত হয় যে, মধ্যযুগে পুনরায় ধর্মপূজার প্রচলন শুরু হয় নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠীর দ্বারা।

শিব ও ধর্ম পূজার আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল চড়ক ও গাজন। তবে শিবের গাজনের নির্দিষ্ট সময় চৈত্র মাসের শেষ পাঁচ দিন হলেও বৎসরের যে কোন সময়ে ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হতে পারে। যদিও প্রধান প্রধান ধর্মরাজের গাজন বৈশাখী ও জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। চড়ক ও গাজন উৎসবের যে সকল আচার-অনুষ্ঠান চোখে পড়ে সেগুলি মূলতঃ আদিম নরগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এখনও তাদের উত্তরসূরী হিসাবে ঐ সকল আচার-অনুষ্ঠান রাঢ়ের নিম্নবর্ণের লোকেদের মধ্যে প্রচলিত আছে। গাজনে আগুন ঝাঁপ, বাণফোঁড়া ও কাঁচা মড়ার মাথা নিয়ে কালকেপাতার উদ্দাম নৃত্য কোন শাস্ত্রানুমোদিত ধর্মকর্মের বিধিতে উল্লেখ নাই। শিব ও ধর্মের সঙ্গে সোম অর্থাৎ চন্দ্রের সম্পর্ক রয়েছে। উভয় দেবতার পূজা হয় পূর্ণিমায় এবং সোমবার হল উভয়ের লৌকিক বার। রুদ্ররূপে শিব ছিলেন রোগস্রষ্টা ও সংহারকর্তা এবং ধর্মের পূজা করা হয় দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য। আবার সোম বা চন্দ্র হলেন অমৃতবর্ষী ঔষধিপতি। তাই শিবের রূপ কল্পনায় সোম চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছে তাঁর ললাটে। তাই ঔষধের দেবতা বা রোগ নিরাময়ের জন্য সোমবারের সঙ্গে শিব ও ধর্মের পূজা ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মরাজকে বুদ্ধদেবের প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং তাঁর মতে বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন (বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ) মতবাদ হতে ধর্মপূজার উৎপত্তি। একথা অনেকে মেনে নিলেও, একালের অধিকাংশ গবেষকগণ উক্ত মতবাদ গ্রহণের বিপক্ষে। ধর্মরাজের রূপ কল্পনায় সৃষ্টিতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা আছে তা শূন্যবাদী বৌদ্ধদের পূর্বেও এদেশে প্রচলিত ছিল এবং তার অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে ঋগ্বেদে (১০।১২৯।১)। বুদ্ধদেব বুদ্ধ পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের পূজা ও গাজন হয়—একথা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ধর্মের পূজায় বলিদান হল পূজার অত্যন্ত আবশ্যিক অঙ্গ। ধর্মের মূর্তিকল্পনা বা বাহনসহ প্রতীক বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুমোদিত নয়। তাছাড়া আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ধর্ম শব্দটি সম্ভবতঃ প্রাচীন কোন অস্ট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর এবং বৌদ্ধ ত্রয়ীর মধ্যম শব্দ অর্থাৎ 'ধর্ম' ও তাঁর পূজা মূলতঃ আদিবাসী কোমের ধর্মপূজা হতেই গৃহীত হয়েছিল।

জামালপুরে বুড়োরাজের পূজা ও অনুষ্ঠান দেখে অনুমান করা যায় যে, আদিতে এখানে ধর্মের পূজার প্রচলন ছিল এবং কোন কারণে এই পূজা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হওয়ায় অতীতের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ পুনরায় শিবের মাধ্যমে পূজা প্রকাশ ঘটে, যার বহিরাঙ্গের রূপটি শিবের হলেও আচার-

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধর্মরাজ বিরাজ করছেন। রাঢ়ের বহু জায়গায় শিবলিঙ্গকে উপলক্ষ করে ধর্মরাজ পূজিত হচ্ছেন। অধ্যাপক ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, শিবের ন্যায় ধর্মরাজের বর্ণ শুভ্র। তিনি আরও বলেছেন যে, শিবের সঙ্গে মনসা কন্যারূপে সংশ্লিষ্টা; মনসা ধর্মরাজের আবরণ দেবতা বা কামিনী হিসাবে সংশ্লিষ্টা। সেকারণে রাঢ়ে মনসা পূজার আধিক্য দেখা যায়। উভয় দেবতার মূল অবস্থান ক্ষেত্র যে কৈলাসে তার উল্লেখ পাওয়া যায়,—

'কৈলাস ছাড়িয়া গোঁসাঞি করহ গমন।'

ধর্মরাজ ও শিব উভয়েই শূন্য নিরঞ্জন, তাই একই মন্ত্রের দ্বারা দুই দেবতাকে আরাধনা করা যায়, এইখানেই জামালপুরের বুড়োরাজের পূজার বৈশিষ্ট্য। পূজার মন্ত্রটি হল,—

'নিরঞ্জনং নিরাকারং মহাদেব মহেশ্বরম্।
শরনং পাপখণ্ডনং ধর্মরাজ নমোহস্তুতে॥'

(২)

পাটুলী রেল স্টেশন হতে বাসে অথবা রিক্সায় জামালপুরের 'বুড়োরাজ' তলায় পৌঁছান যায়। আবার কাটোয়া হতে সরাসরি বাস যোগে এখানে যাওয়া যাবে। জামালপুর গ্রামনাম হ'তে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অতীতে এখানে মুসলমান বসতি ছিল, যদিও একালে একঘরও মুসলমান নাই। গ্রামের পূর্বভাগে জঙ্গলের মধ্যে জীর্ণদশাগ্রস্ত মসজিদের অস্তিত্ব মুসলমান বসতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মনে হয় কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা মহামারীর প্রকোপে গ্রামটি কোন এক সময়ে জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। জামালপুরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ক্ষীণ নদীর স্রোত যা এককালে ভাগীরথী নদীর শাখা রূপে চিহ্নিত ছিল।

গ্রামটি ক্ষুদ্র হলেও জামালপুরের খ্যাতি হল গ্রামদেবতা 'বুড়োরাজের' অধিষ্ঠানক্ষেত্রের জন্যে। 'বুড়োরাজ' কেবলমাত্র জামালপুরের গ্রামদেবতা নন, তিনি রাঢ়ের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের লৌকিক দেবতায় পরিগণিত হয়েছেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ ও মাঘী পূর্ণিমায় বুড়োরাজের বিশেষ উৎসব উপলক্ষে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয় এবং বৈশাখী পূর্ণিমার মেলাটি প্রায় এক মাস ধরে চলে। রাঢ়ের বুড়োরাজ একদিকে শিবরূপে পূজিত হচ্ছেন আবার তিনি ধর্মরাজ নামে খ্যাত। 'বুড়োরাজের' মূল নৈবেদ্যটি ২ ভাগ করে ১ ভাগ শিবকে ও অপর অংশ ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন, "রাঢ়ের ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে সংস্কৃতিতত্ত্বের দিক দিয়ে জামালপুরের বুড়োরাজের গুরুত্ব যে কতখানি, অনুসন্ধানী ও কৌতূহলীরা তা বুঝতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের পর আমার মনে হয়েছে যে, রাঢ়ের অন্যতম গণদেবতা ধর্মঠাকুরকে ক্রমে হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ দেবতা শিবঠাকুর অনেক স্থানে আত্মসাৎ করে ফেলেছেন। জামালপুরের বুড়োরাজ তার অন্যতম ঐতিহাসিক সাক্ষী।"

বুড়োরাজের আবির্ভাব কাহিনীটি হল,—স্থানীয় যদু ঘোষ নামক এক গোয়ালার শ্যামলী নামক গাভীটি জামালপুরের একটি ঢিবিতে দাঁড়িয়ে আছে ও তার বাঁট থেকে দুধ ঝরে পড়ছে। এই দৃশ্য দেখে যদু ঘোষ বিস্মিত হ'য়ে নিকটস্থ নিমদহ গ্রামের চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করায় তিনি দেখলেন যে, শ্যামলীর দুগ্ধ জমা হয়ে আছে একটি অনাদিলিঙ্গ শিবের মাথায়। সেই দিন রাত্রে স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে তিনি আরাধ্য দেবতার পুজা শুরু করলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সর্বপ্রথম যদু ঘোষের নামে পুজা করেন, তাই আজও বুড়োরাজের পুজায় সর্বাগ্রে নিমদহের পুজা হয়। রাঢ়ের শৈবধর্মের সঙ্গে গোপজাতির সুসম্পর্ক সুদীর্ঘ কাল ধরে চলে আসছে। প্রায় প্রত্যেকটি শিবলিঙ্গ আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গোপ ও গাভীর কিম্বদন্তী জড়িত হয়ে আছে। বুড়োরাজের পুজায় আজও অন্যান্য উচ্চবর্ণের মানুষের সম্পর্কের সংগে গোয়ালা, বাগদি, সদগোপ, বাউরি ইত্যাদির নিম্নবর্ণের লোকেরা উপেক্ষণীয় নয়। একালের সেবাইতগণ হ'লেন চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দৌহিত্র বংশের লোকেরা। বৈশাখী পুর্ণিমায় বুড়োরাজের বাৎসরিক পুজা উপলক্ষে গাজন ও বলিদানের সংগে অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি দেখে নিঃসংশয়ে মন্তব্য করা যায় যে, সমগ্র অঞ্চলে লোকসংস্কৃতির এরূপ গভীর ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অন্যত্র বিরল।

ধর্মরাজ হ'লেন বর্ধমান জেলার অন্যতম প্রধান গ্রামদেবতা তথা লৌকিক দেবতা। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই ধর্মরাজের পুজায় নির্দ্বিধায়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে, বুড়োরাজের পুজায় জাতবিচারের কোন স্থান নেই। এমন কি মুসলমানেরাও ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে পুজা দেয় ও বলিদানের জন্য পাঁঠা মানত করে; কিন্তু তাঁরা বলিকৃত ছাগটিকে বলি না দিয়ে ছেড়ে দিত। ঐ ছাগপশুর দাবী নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা হওয়ার ফলে একালে পুরোহিতের বাড়ীতে বেঁধে রেখে আসার রেওয়াজ চালু হয়েছে। এই বিখ্যাত শিবক্ষেত্রে দেবাদিদেবের অবস্থানরত মন্দিরটি খড়ের ছাউনি দিয়ে তৈরী। স্থানীয় লোকের এরূপ বিশ্বাস যে, ইটের তৈরী মন্দির নির্মাণে বুড়োরাজের নিষেধ ছিল—তাই তিনি খড়ের ঘরে বাস করছেন। বুড়োরাজের মেলা ও উৎসবের সময় অতীতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কয়েকবার দাঙ্গা হওয়ায় স্থানীয় প্রশাসন মেলার সময় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকেন। আজও সময়ে সময়ে মুসলমান ও গোয়ালাদের মধ্যে মেলার সময় দাংগাহাংগামার খবর পাওয়া যায়। একটি ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ১৯৪৬ সালে বুদ্ধ পুর্ণিমার সময় হিন্দু-মুসলমানের দাংগায় মেলায় লক্ষ লক্ষ টাকা মুল্যের দ্রব্য লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়েছিল। সেবাইতগণের সম্পত্তিও লুণ্ঠিত হয়েছিল এবং তাঁরাও অগ্নি সংযোগের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু বুড়োরাজের খড়ের ঘরে আগুন লাগাবার চেষ্টা করা হলে বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড ধারায় বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং অলৌকিকভাবে মন্দির ও বিগ্রহ রক্ষা পায়। মেলার সময় একটা অত্যন্ত 'কুরুচিপুর্ণ' দৃশ্য দেখা যায়; সেটি হ'ল বলিদানের পর মানতকারীগণের নিকট হ'তে

বলিদানের ছাগটিকে কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টা—সেকারণে পুলিশের সহায়তা ছাড়াও মানতকারীগণ সশস্ত্র হ'য়ে মেলায় আসেন। বিশেষ উৎসবের দিনে মূল মন্দির ব্যতীত সমগ্র অঞ্চলটিতে স্থানে স্থানে ঘট স্থাপন করে বুড়োরাজের উদ্দেশ্যে পূজা ও বলিদান অনুষ্ঠান হয়। জামালপুর নিবাসী মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় বুড়োরাজের পুজার বিভিন্ন আঙ্গিক দিক হ'তে অনুষ্ঠানগুলির বর্ণনা করেছেন। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল বারের নিয়ম, হত্যাদান, ভর, সন্ন্যাসের নিয়ম, ফুলচড়ান, নুড়িবাঁধা ইত্যাদি। যাত্রী, ভক্ত ও মানসিকদাতারা বুড়োরাজের কাছে আসেন প্রধানতঃ রোগমুক্তির কামনায়। যক্ষা, মৃগী, বাত, অম্লশূল ইত্যাদি যে কোন কঠিন ব্যাধি দেবাদিদেবের কৃপায় সেরে উঠে। লোকের বিশ্বাস এই যে, বহু ক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ অপারগ হলেও বুড়োরাজের কৃপায় রোগ থেকে মুক্তি লাভ ঘটেছে। ধর্মপূজাবিধানে ধর্মের উপাসনা হল অত্যন্ত ক্লেশকর ও কঠোর; অনুরূপভাবে বুড়োরাজের পূজায় পূজার সামগ্রীর কোন বাধ্যবাধকতা না থাকলেও কয়েকটি কঠোর নিয়ম মেনে চলার বিধি আছে।

শিব ও ধর্মের উপাসনায় সোমবার হল উৎকৃষ্ট বার। তাই এই বারটি ভক্ত অথবা মানতকারীগণের পক্ষে পালন করা অত্যাবশ্যক; ফলমূল অথবা হবিষ্যান্ন আহার করে বারমাসে বারটি শুক্লপক্ষের সোমবার পালন করতে হয়। পালন বা পারণের বৎসরে বৃথা মাংস, পেঁয়াজ, গুগলি ও হাঁসের ডিম আহার এবং এক বৎসরকাল কোন শ্রাদ্ধ বাড়ীতে খাওয়া নিষেধ। কঠিন ব্যাধি হতে মুক্তিলাভের জন্য অনেকে চরম সাত্ত্বিকভাবে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে সংসার হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে মন্দিরের সম্মুখে পড়ে থাকেন যা হত্যেদান বা হত্যাদান নামে খ্যাত। কাপড়ে মুখ ঢেকে অবিরাম নাম জপ করতে করতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থার মধ্যে ঔষধের কথা জানা যায়। আবার সন্তান কামনা করে মায়েরা মন্দিরের চালে অথবা গাত্রে নুড়ি বেঁধে রাখেন। কামনা সিদ্ধ হলে পুজা দিয়ে নুড়ি খুলে দিয়ে যায়। শিবের গাজনের ন্যায় বুড়োরাজের গাজন চৈত্র মাসে হয় না—বৈশাখী পূর্ণিমায় বুড়োরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে শুদ্ধভাবে যে কোন ব্যক্তি সন্ন্যাসী হতে পারেন। মূল সন্ন্যাসীকে একমাস ধরে হবিষ্যান্ন করতে হয়। অন্যান্যেরা পূর্ণিমার পাঁচদিন অথবা সাতদিন পূর্বে কামায়। কামানের দিন একবেলা নিরামিষ আহার ও পরের দিন উত্তরীয় পরিধান উপলক্ষে হবিষ্যান্ন। তৃতীয় দিন অর্থাৎ ত্রয়োদশীতে সারাদিন উপবাস করে পুজার পর রাত্রে ফলাহার গ্রহণ করে। চতুর্থ দিন বা চতুর্থী-তিথিতে সারাদিন উপবাস থাকার বিধি আছে এবং এই দিন বাণ ফোঁড়ার পর তরল পানীয় গ্রহণ করা যায়। পরদিন অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমার দিন উত্তরীয় পরিত্যাগ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারে এবং এই দিনও নিরামিষ আহার গ্রহণ করার বিধি আছে। পূর্ণিমার দিন তৈল, কাঁচা হলুদ, নিমপাতা ইত্যাদি দেবতার নামে উৎসর্গ করে সারাগায়ে মার্জনা করা হয়। বুড়োরাজের বা শিবের গাজনে দন্ডীখাটা

বা প্রণাম খাটা হল দেবার্চনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। মন্দির হতে দূরে একটা নির্দিষ্ট স্থানকে 'বাবার সীমানা' নামে চিহ্নিত করা আছে। স্নানের পর সিক্তবস্ত্রে পূর্বোক্ত সীমানা হতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে মন্দির পর্যন্ত পেঁছানোর পর দণ্ডীখাটা সমাপ্ত হয়। বুড়োরাজের নাম মাহাত্ম্যে বহু কষ্ট ও ক্লেশ সহ্য করেও হাজার হাজার লোক সন্ন্যাসে ব্রতী হয়। পূজার আচার-আচরণ দেখে মনে করা যায়, 'বুড়োরাজ আদিম সমাজে সন্তান লাভ জনিত ফার্টিলিটি কাল্টের দেবতা এবং সেই সঙ্গে রোগ নিরাময় জনিত এক বিশেষ শ্রেণীর যাদু সংস্কার সমন্বিত বিচিত্র জাতি ও সংস্কৃতির সমন্বয় কারী অসামান্য গ্রামদেবতা।'

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। হিন্দুদের দেবদেবী (৩য় খণ্ড)—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য।
২। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (৫ম খণ্ড)—স. অশোক মিত্র
৩। রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর—ডঃ অমলেন্দু মিত্র।
৪। লোকশ্রুতি—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

গাজন

(শিব ঃ ধর্মরাজ ঃ বলরাম)

(১)

রাঢ়ে পঞ্চোপাসনা (শিব, বিষ্ণু, সূর্য, শক্তি ও গণপতি) বর্ণহিন্দু সমাজে প্রচলিত হলেও, পঞ্চ দেবতার মধ্যে শিব, সূর্য ও শক্তি শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সীমা অতিক্রম করে লৌকিক দেবদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। বিষ্ণু ও সূর্য পূজার সমন্বয়ের লৌকিক রূপের বিকাশ ঘটেছে ধর্মপূজায়। লৌকিক দেবতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হলেন ধর্ম ও শিব। শিব ও ধর্মের পূজা, আচার ও অনুষ্ঠানে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা আচার হতে কয়েকটি বিষয়ের পার্থক্য দেখা যায়। ধর্ম ও শিব উভয়েই হলেন শূন্য নিরঞ্জন এবং রোগ নিরাময় ও পুত্র কামনা করে উভয়কে তুষ্ট করা হয়। রঞ্জাবতীর শালে ভর পালায় দেখা যায় সকল প্রকার শারীরিক ক্লেশ সহ্য করে—এমন কি নিজেকে হত্যা দিয়ে রাণী ধর্মের কৃপালাভ করেছেন। 'শূন্য পুরাণ' মতে ধর্মের উৎসবের নাম গাজন। তাই গাজনের সময়ে ভক্ত বা সন্ন্যাসীরা নিজ নিজ কায়া বা শরীরকে নানা প্রকার দুরূহ কষ্টকর আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিব ও

ধর্মের পূজায় অংশগ্রহণ করেন। শিবের গাজন উৎসবের সময় নির্দিষ্ট আছে। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ধর্মের গাজন প্রধানতঃ বৈশাখী পূর্ণিমায় হলেও কোন বাঁধাধরা নিয়ম লক্ষিত হয় না অর্থাৎ বছরের যে কোন সময়ে ধর্মের গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

কোষগ্রন্থে সংস্কৃত 'গর্জ্জন' শব্দ আছে। অনেকের মতে সংস্কৃত 'গর্জ্জন' শব্দ হতে প্রাকৃত-এ 'গজ্জন' শব্দ এসেছে এবং বাংলা ভাষায় তা 'গাজন'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। ধর্মঠাকুরের উৎসবের সময় ভক্ত বা সন্ন্যাসীরা উচ্চৈঃস্বরে 'জয় ধর্মরাজের জয়' বলে গর্জন ধ্বনি দিতে থাকে। আবার চড়ক পার্বণ ও শিবের গাজনে সন্ন্যাসীরা 'জয় শিবো শম্ভু—মহাদেব!' বলে উচ্চৈঃস্বরে দেবাদিদেবের নামে ডাক দেয়। উচ্চৈঃস্বরে নাম-ডাকের সঙ্গে বড় বড় পালকওয়ালা ঢাকের বাদ্যের তালে তালে সন্ন্যাসীদের উদ্দাম নৃত্য শুরু হয়। এককথায় গাজন হল শিব বা ধর্মের বাৎসরিক পূজার বিশেষ অঙ্গ ও অনুষ্ঠান।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে,—'শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হল হরকালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাদের গর্জন হেতু 'গাজন' শব্দ এসেছে। ধর্মের গাজনে মুক্তির সঙ্গে ধর্মের বিবাহ হয়। দুই বিবাহই প্রচ্ছন্ন।' কিন্তু আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, 'সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিবাহ দেওয়াই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। চৈত্র মাস হতে বর্ষার প্রারম্ভ পর্যন্ত সূর্য যখন প্রচণ্ড অগ্নিময় রূপ ধারণ করে তখন সূর্যের তেজ প্রশমন ও সুবৃষ্টি লাভের আশায় কৃষিজীবী সমাজ এই অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করেছিল।' শিব ও ধর্মের কাছে নিজেকে নিবেদন করে কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়াস হল গাজনের তাৎপর্য। এই উৎসবের কোন শাস্ত্রীয় বাধা বা নিষেধ নাই। তাই গাজনের মূল অনুষ্ঠানে কোন পার্থক্য সূচিত না হলেও স্থানান্তরে লৌকিক আচার অনুষ্ঠানে পার্থক্য দেখা দেয়। শিব ও ধর্মের তুষ্টির জন্য সাময়িকভাবে সন্ন্যাস ব্রত ধারণ, উপবাস, হবিষ্যান্ন ও ফল আহার, উত্তরী গ্রহণ, বেত্র দণ্ড ধারণ, ব্রহ্মচর্য, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, পাটভাঙ্গা, বাণফোঁড়া, আগুন খেলা (ফুলখেলা) ইত্যাদি কৃচ্ছ্র সাধন হল গাজন অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। আবার কোথাও কোথাও গাজনে চড়ক অনুষ্ঠানকে অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসাবে মনে করা হয়।

আপাতদৃষ্টিতে শিবের গাজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও চড়ক পূজার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য হল ভিন্ন প্রকৃতির। চড়কের প্রধান দেবতার নাম হল 'কালাকরুদ্রদেব'। 'ইনি ভীষণাঙ্গ কোটি মার্তণ্ডের মত ইঁহার দেহের দীপ্তি; চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি ইঁহার তিন নেত্র; ইনি প্রণতদের ভয় হরণ করেন, ইঁহার মুখে অট্টহাস্য। ইঁহার বা ইঁহার শক্তির উদ্দেশ্যে পশু বলির রীতি আছে। এই অর্চিত দেবীর নাম নীলচণ্ডিকা বা নীল পরমেশ্বরী। নীলা বা নীলাবতী নামে ইনি সাধারণের নিকট পরিচিতা।' তাই চড়কের পূর্বদিন নীলাবতী ও রুদ্রদেবের বিবাহ অনুষ্ঠান কল্পনা করে নীল পূজা করা হয় এবং বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা 'নীলের ঘরে বাতি' দেয়। চড়কের জন্য পঁচিশ/

ত্রিশ ফুট উঁচু বাঁশ বা কাঠকে শক্ত করে মাটিতে পোঁতা হয়। তার মাথায় 'তারাজুর' দাঁড়ির আকারে (আড়াআড়িভাবে দুটি কাঠকে গাঁথা হয়—যার চারটি মাথা থাকে) বাঁশ বা কাঠের মাথায় বেঁধে কাঠে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ঐ দড়ির প্রান্ত ভাগে লোহার 'বঁড়শী' বেঁধে সন্ন্যাসীর পীঠের চামড়া ভেদ করে গেঁথে সজোরে ঘোরান হয়। মাংস কেটে গিয়ে চড়ক গাছ হতে পড়ে অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছিল। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের এক আইন বলে এই নৃশংস প্রথা রদ হয়ে যায়। এখন কোমরে গামছা বা বস্ত্রখণ্ড বেঁধে তার সঙ্গে বঁড়শী গাঁথা হয়ে থাকে। শিবের নিকট সন্তান কামনা ও রোগ নিরাময়ের জন্য ভক্তরা এরূপ প্রাণঘাতী মানত করে। ধর্মের গাজনে রঞ্জাবতীর কৃচ্ছ্র সাধনের কথা বিভিন্ন ধর্মমঙ্গল গ্রন্থে পাওয়া যায়। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ছাতার পরব উৎসবটিও চড়কের অনুরূপ।

শিব ও ধর্মের গাজনে দেবতাকে চতুর্দোলা, ঝুড়ি বা অন্য কোন উপাদানের উপর স্থাপন করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হয়। ধর্মের গাজনে ধর্মশিলা ও তাঁর প্রতীক শ্বেত অশ্ব (পোড়ামাটি অথবা কাঠের তৈরী) মাথায় নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। শিবের গাজনে ক্ষুদ্রাকার শিবলিঙ্গ অথবা বাণেশ্বরকে কাঁধে নিয়ে সন্ন্যাসীরা গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায়। আবার অনেকক্ষেত্রে দুটি শিব গাজনের সময় এক স্থানে মিলিত হতে দেখা যায়। গাজনে 'দাদুর ঘাটা' নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। সংস্কৃত ভাষায় দর্দুর > প্রাকৃত দদ্দুর হতে বাঙলা ভাষায় দাদুর শব্দ ব্যাঙ বা ভেক অর্থে প্রযুক্ত। গাজনের সময় সন্ন্যাসী বা ভক্তগণ শিবের সম্মুখে কূর্মাসনে বা ভেকের আকৃতিতে অবস্থান করে এবং তাদের সর্বাঙ্গে জল ঢেলে দেওয়ার পর কূর্মাসন ভঙ্গিতে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে। ভেকের ন্যায় স্নান-নৃত্য হতে শিবের স্নান উপলক্ষে 'দাদুর ঘাটা'র প্রচলন হয়েছে। পল্লীগ্রামে প্রবাদ আছে যে, 'ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি হয়'; তাই ভেকের ন্যায় অবস্থানরত সন্ন্যাসীর গায়ে জল ঢালার প্রথা চালু হয়েছে। গাজনে ব্রতধারী বা ভক্ত হওয়ার অধিকার সকলের আছে। ব্রাহ্মণ হতে মুচি, চণ্ডাল, হাড়ী, ডোম, বাগদী, বাউরী সকলেই ব্রত গ্রহণের অধিকারী। বস্ত্র, উত্তুরী (উত্তরীয়) ও বেত্রদণ্ড হল গাজনের সন্ন্যাসীর পরিচয়। গাজনের চার দিন পূর্বে মূল সন্ন্যাসী বা পাটভক্তে ও পুরোহিতের সম্মুখে উত্তুরী গলায় গ্রহণের সময় তারা বলে—'অমুক গোত্র (নিজগোত্র) পরিত্যাগ পূর্বক শিব / ধর্ম / বলরামের গোত্র গ্রহণ করলাম।' গাজন অন্তে উত্তরীয় ত্যাগের সময় উচ্চারিত হয়,—'শিবগোত্র ত্যাগ করে নিজ গোত্র গ্রহণ করলাম।' গাজনে আরও একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, যা অত্যন্ত বীভৎস বলে একালে গণ্য হয়। কাঁচা ও শুকনো মড়ার মাথা তরোয়াল বা বেত্রদণ্ডের আগায় গেঁথে পিশাচ বা ডাকিনী বেশে 'কালিকা পাতা', 'মায়ের পাতা' বা 'চামুণ্ডা পাতা' নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় দিন ভোর রাত্রে। গাজনের পূজা-পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান দেখে তাই মনে করা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল হতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসার লাভের পূর্ব হতে এরূপ আদিম অনুষ্ঠান

গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং আদিম অধিবাসীদের সংস্কৃতি উত্তরাধিকার সূত্রে রাঢ়ের আধুনিক সমাজেও উচ্চস্থান লাভে সমর্থ হয়েছে। ধর্মের গাজনে, —'মদ্যের পুষ্করিণী দিব মাংসের জাঙ্গাল' নিবেদনের বিধি আছে। অনেক গ্রামে ধর্ম পূজায় মদ্য ও মাংসের আধিক্য দেখা যায়। ধর্মরাজের স্নানযাত্রার সময় কলসী ভর্তি মদ নিয়ে নৃত্য করতে করতে বিগ্রহকে অনুসরণ করার সময় নৃত্যকে 'ভাণ্ড নৃত্য' বলে যা চলতি কথায় 'ভাঁড়ার আনা' বা 'ভাঁড়াল নাচ'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। এটি হল আদিম আচার-অনুষ্ঠানের রীতি।

ধর্মের গাজন ও শিবের গাজনের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে মনে হয়েছে যে, ধর্ম-পূজা হল এর আদি রূপ এবং পরবর্তীকালে অনার্য দেবতা শিব বা রুদ্র ধর্মের স্থান অধিকার করেছে। শিবের গাজনে হোম হয়—এই অনুষ্ঠানটি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অবদান। 'ধর্মের গাজনকে শিবের গাজনে রূপান্তরিত করার অন্যতম কারণ হল, গাজন উৎসবটিকে উচ্চমর্যাদার স্তরে উন্নীত করা, যাতে উচ্চবর্ণের সকল সম্প্রদায়ের লোক-উৎসবে যোগদান করতে পারে।'

(২)

বর্ধমান জেলায় শিবের গাজন উৎসবের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে কুড়মুন গ্রামের। গ্রামের মধ্যে একটি দালান মন্দিরে ঈশানেশ্বর শিব ও ইন্দ্রাণী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু গাজন উৎসব হয় গাজনতলার আটচালা গাজন মন্দিরে। ১৩ই চৈত্র ঈশানেশ্বরকে গাজনতলার মন্দিরে নিয়ে আসা হয় এবং ১লা জ্যৈষ্ঠ তিনি স্ব-মন্দিরে ফিরে যান। মণ্ডল উপাধিধারী উগ্রক্ষত্রিয়গণ ঈশানেশ্বর গাজনের পরিচালক হলেও এটি হল গ্রামের সার্বজনীন উৎসব। শোনা যায়, গ্রামের সন্তোষ মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি খড়ি নদীর তীর হতে ঈশানেশ্বরকে নিয়ে এসে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রামে তন্তুবায় পরিবারে কালাচাঁদ নামক ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ব্রাহ্মণদের সহায়তায় উচ্চবর্ণের লোকেরা ঈশানেশ্বরকে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করে সাড়ম্বরে গাজন উৎসব পালন করে আসছে। কালাচাঁদের গাজন বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হলেও উৎসবের মধ্যে কোন আড়ম্বর নাই। তাছাড়া ঈশানেশ্বরের গাজন উৎসব অনুষ্ঠানের পরও তিনি এক মাস গাজনতলার মন্দিরে অবস্থান করেন। সম্ভবতঃ কালাচাঁদের গাজন না হওয়া পর্যন্ত ঈশানেশ্বরের পূজো গাজনতলায় অনুষ্ঠান করে বর্ণহিন্দুরা কালাচাঁদের উৎসবকে ম্লান করতে চেয়েছিল—তাই স্ব-মন্দির ত্যাগ করে মহাদেব দেড় মাস কাল অন্যত্র অবস্থান করেন।

কুড়মুনের শিবের গাজন শুরু হয় চৈত্র মাসের ২৫ / ২৬ তারিখ হতে। পালকি করে ঈশানেশ্বরকে গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম প্রদক্ষিণের রীতি আছে। গ্রাম প্রদক্ষিণের সময় সন্ন্যাসীরা মুখে রঙ চিত্রিত করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এবং এই সঙ্গে দশ-বারোখানি ঢাকের বাদ্যের সংগে তালে তালে নাচ শুরু হয়। পূর্বে এখানে 'খেস্যা' গান হত—একালে তা বন্ধ হয়ে গেছে। ২৯শে বা ৩০শে (চড়কের পূর্বদিন) শ্মশান সন্ন্যাসীরা

কাঁচা ও শুকনো মড়ার মাথা সংগ্রহ করে তরোয়াল ও বেতের আগায় গেঁথে কালিকাপাতার উদ্দাম নৃত্য করতে থাকে আর সেই সঙ্গে শুরু হয় বড় বড় ঢাকের বাদ্য। কালিকাপাতার নৃত্য দেখে মনে হয় যেন শ্মশানবাসী শিবের নিত্য সহচর হল গাজনের সন্ন্যাসীরা। গাজনতলার দু'পাশে বড় বড় বাঁশের তৈরী থাকা বা গ্যালারীতে সাজান থাকে পৌরাণিক কাহিনী সম্বলিত বহু দেবদেবীর মূর্তি। মাটির তৈরী মূর্তিগুলির গড়ন ও রঙের ব্যবহার সত্যই অপূর্ব। শৈব প্রধান অঞ্চলে হাড়ি, বাগদি, দুলে, ডোম, প্রভৃতি নিরঞ্জন ধর্মপন্থীদের উৎসবের সঙ্গে শৈবতান্ত্রিক উৎসবের মিলন মিশ্রণে ঈশানেশ্বর শিবের গাজন শুরু হয়েছে। আগাগোড়া গাজনের সমস্ত অনুষ্ঠান দেখলে একথাই মনে হয়।

(৩)

প্রসিদ্ধ শাক্তপীঠ বহুলা দেবীর অধিষ্ঠানক্ষেত্র হল কেতুগ্রামে। কাটোয়া হতে সরাসারি বাসযোগে ৩০ মিনিটের পথ হল কেতুগ্রাম। কেতুগ্রাম হাইস্কুলের শিক্ষক ও কলেজ জীবনের সহপাঠী মধুসূদন সেনগুপ্ত আলাপ করিয়ে দিলেন এক সদাশয় ব্যক্তির সঙ্গে। গ্রামের মানুষ ও বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে কেতুগ্রাম ও সন্নিকটবর্তী গ্রামের ইতিকথা শোনার সৌভাগ্য হল। কথা প্রসঙ্গে শিবের গাজনের বৈশিষ্ট্যের কথা উঠলে তিনি কাটোয়া ও কেতুগ্রাম থানার 'বোলান গান' বিষয়ে আলোচনা করলেন।

চৈত্র মাসের শেষ পাঁচ দিন ধরে কেতুগ্রামে গাজন উৎসব হয়। ভক্তা বা সন্ন্যাসীরা ক্ষৌরকর্ম করে ব্রহ্মচর্য পালন পূর্বক বেত্রদণ্ড হাতে নিয়ে শিবের নামে জয়ধ্বনি দেয়। আর সেই সঙ্গে চড়াৎ চড়াৎ করে বাজতে থাকে গোমাই গ্রামের বড় বড় ঢাক। মূল সন্ন্যাসী শিবকে মাথায় করে গাজন মন্দিরে নিয়ে আসেন। সেই সময়ে অন্যান্য সন্ন্যাসীরা মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং তাদের উপর দিয়ে হেঁটে শিবকে গাজন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে গাজনের অন্যান্য পর্বগুলি অনুষ্ঠিত হয়। বাণেশ্বরকে স্নান করানো উপলক্ষে দ্বিতীয় দিন হয় খাজুর ভাঙ্গা, তৃতীয় দিন জল সন্ন্যাস ও চতুর্থ দিন হোম অনুষ্ঠান হয়। শেষ দিন নীলপূজা বা নীল সন্ন্যাস-এর পর শিব পুনরায় স্বীয় মন্দিরে গমন করেন এবং সন্ন্যাসীরা উত্তরী ত্যাগ করে পূর্বাশ্রমে ফিরে যান। কেতুগ্রামে গাজনের সময় বোলান গানের দল এসে হাজির হয়। কোন চুক্তি করার প্রয়োজন হয় না, তারা স্বেচ্ছায় বোলান গান করতে আসে। উত্তর রাঢ়ে সাধারণতঃ চার রকমের বোলান গান শোনা যায়, যথা,—পোড়ো বোলান, পালাবন্দী বোলান, সাঁওতালী বোলান ও ছল বোলান।

পোড়ো বোলান—এই বোলান গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল মুখে রঙ দিয়ে চিত্রিত করে শিবের অনুচরদের ন্যায় মড়ার মাথা নিয়ে নাচ ও গান।

ডাক বোলান বা পালাবন্দী বোলান—পালাগানের পক্ষে প্রযোজ্য এরূপ সাজসজ্জা করে ধারাবাহিকভাবে গান করাকে পালাবন্দী বোলান বলে। আবার

কবির গানের লড়াই-এর মত গানও কখনো কখনো হয়।

সাঁওতালী বোলান—দলবন্ধ ভাবে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে পৌরাণিক গান হল সাঁওতালী বোলানের বৈশিষ্ট্য।

ছল বোলান—ছোট ছোট বালকেরা পালাবন্দী অথবা স্থানীয় সামাজিক আচার-ব্যবহার বোলান গানের মধ্যে ফুটিয়ে তোলে।

বোলান গান শুরু করার পূর্বে শিব, সরস্বতী, গণেশকে বন্দনা করে গান শুরু করার পর শুরু হয় বোলান গান। কেতুগ্রাম সম্পর্কিত একটি গান হল,—

'ওগো কেতুগ্রাম বাড়ি, এ দলের সবাই
উত্তরপাড়ায় দল করেছি।
আমরা সারা বছর পরে, চৈত্র মাসেতে
বুড়ো শিবের চরণ ধরেছি।
পলাল বাবু দলপতি, গানে যে তার অতিভক্তি
উজ্জ্বল হয় মেনেজার এই দলে।
সিপাই বাজায় ঢোল মহাদেবের দল বলে দিলে
ফুলের মালা যেন শোভে তার গলে।
সাঙ্গ হল বোলান গানের পালা
তোরা ঘরে যা সব হরি হরি বলে।'

(৪)

জাড়গ্রামের কালুরায় হলেন জাগ্রত ও প্রসিদ্ধ ধর্মঠাকুর। কালুরায় অতীতে হুগলী জেলার দেখীড় গ্রামে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোন এক সময়ে দেখীড় গ্রামে কালুরায়ের পুজো বন্ধ হওয়ায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে একজন যুবক কালুরায়কে জাড়গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। জাড়গ্রামের সাহা পরিবার যুবকের এই কাজে বিশেষ সহায়তা করেছিল। সেকারণে কালুরায়কে চৈত্র মাসের গাজনের সময় দেখীড় গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয় এবং গাজনের পর পুনরায় জাড়গ্রামে ফিরিয়ে আনা হয়।

কালুরায়ের গাজন অনুষ্ঠান হয় বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের যে কোন মঙ্গলবার। এইদিন ধর্মরাজের মন্দিরে ঘট স্থাপন করে গাজন শুরু হয় এবং বার দিন ধরে কালুরায়ের পুজো সহ প্রতিদিন অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যায় ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম-মঙ্গলের পালাগান হয়। তবে কি ঘনরাম বারমতির উল্লেখ করেছেন কালুরায়ের পুজা-পদ্ধতি অনুসরণ করে? কালুরায়ের প্রসিদ্ধি যে বহুকালের সেকথা রূপরামের ধর্ম-মঙ্গলে বর্ণিত আছে,—

'জাড়গ্রামের কালুরায় বন্দো সাবধান।'

আবার মুকুন্দরামের আমলে জাড়গ্রামের প্রসিদ্ধি ছিল,—

'রঘুদত্ত আইসে যার জাড়গ্রামে বাস।'

গাজনের নবম দিন অর্থাৎ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পরের বুধবার শ্মশান সন্ন্যাসীরা

পাটাধারণ করে এবং দুপুরে মালাকাড়ান ও পরমান্ন ভোগ হয়। সন্ধ্যায় মন্দির প্রাঙ্গণে আগুনে ঝুল অনুষ্ঠানের পরে গাজন সন্ন্যাসীরা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে। দশম দিন উপবাসের পর ফলাহার এবং সন্ধ্যায় আগুনে ঝুল ও অধিবাস উৎসব হয়। একাদশীর দিন 'কপুরের ভিক্ষা' পালাগান হয়। এই দিন গ্রামের লোকে গায়েনদের প্রভৃত ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করে। রাত্রে মালাকাড়ান পর্ব অনুষ্ঠানের পর কালুরায়ের বিবাহ উৎসব উপলক্ষে বাদ্য ও মশাল সহ শোভাযাত্রা সহকারে স্নান অভিষেকের জন্য পুষ্করিণী তীরে যাত্রা করা হয়। এই সময়ে প্রচুর আতস বাজী পোড়ান হয়। স্নানান্তে প্রত্যাবর্তনের পর চৌঘর বা পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে ধর্মের পদ অঙ্কন করে পুজা করা হয়। ধর্মরাজের বিবাহ অনুষ্ঠানের পর সন্ন্যাসীরা লুচি-মিষ্টি প্রসাদ খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করেন। দ্বাদশতম দিন হল শনিবার। এই দিন অতি প্রত্যুষে 'পশ্চিম উদয় পালা' গান শুরু হয়। দুপুরে সন্ন্যাসীদের স্নানের পর শোভাযাত্রা সহকারে 'শালেভর', 'মালা-কাড়ান' 'ঝাঁপ', 'বৈতরণী পার' ইত্যাদি নানা প্রকার অনুষ্ঠান হয়। এই দিন বৈকালে পার্শ্ববর্তী গ্রাম হতে সঙ বের হয় এবং শোভাযাত্রা সহকারে তাঁরা নৈবেদ্য নিয়ে কালুরায়ের মন্দিরে উপস্থিত হয়। রাত্রে 'লুয়ে' পুজায় লুয়ে ছাগ (সাদা ছাগ) বলির পর নুতন মাটির হাঁড়িতে ছাগ-মুণ্ড রেখে ও ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়ে মন্দিরে পুজা হয়। ত্রয়োদশতম দিন অর্থাৎ রবিবার দুপুরের আগে লুয়ে-হাঁড়ি নদীতে বিসর্জন দিয়ে সন্ন্যাসীরা ক্ষৌরকর্ম করে। মধ্যাহ্নের পুজার পর সন্ন্যাসীরা পাটা ত্যাগ করেন। রাত্রে 'অষ্টমঙ্গলা' গানের পর উৎসব শেষ হয়।

রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' ও ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্মমঙ্গল'-এ বর্ণিত আছে যে, ধর্মের সকাশে রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রাণী মদনা পুত্র লুইচন্দ্রকে বলি দিয়ে তার মাংস ধর্মরাজকে নিবেদন করেছিলেন। রাণী মদনা পুত্রের মুণ্ড লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাই মনে হয় লুয়ে ছাগের মুণ্ড হাঁড়িতে পুরে কালুরায়ের মন্দিরে পুজা করার বিধি আছে। আবার এমনও হতে পারে যে, জাড়গ্রামে হয়ত অতীতে নরবলি দিয়ে ধর্মের পুজা করা হত। তৃতীয়তঃ বিষ্ণু যজ্ঞেশ্বররূপে অর্চিত হয়ে আসছেন। বৈদিক বিষ্ণু-যজ্ঞে পশুবলি প্রচলিত ছিল এবং বলিকৃত ছাগ শ্বেতবর্ণের হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। 'ধর্মপুজায় পশুবলি কেবলমাত্র অনার্য ধর্মবিশ্বাস হতে আগত নয়।'

(৫)

বর্ধমান জেলায় শিবের গাজন ও ধর্মের গাজনের ব্যাপকতা থাকলেও বলরামের গাজন একমাত্র বোড়ো গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। বলরামের গাজন পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র অনুষ্ঠিত হয় কিনা জানা নাই। বলরামের পুজো প্রকাশের কথা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বৈশাখ মাসে নৃসিংহ চতুর্দশীতে বলরামের চক্ষুদান পর্ব ও গাজনের সমাপ্তি হলেও প্রকৃত উৎসব শুরু হয় একাদশী তিথিতে। এইদিন স্নানান্তে সাদা কাপড় ও গামছা ব্যবহার করার রীতি আছে। দিনে নিরামিষ আহার করে সন্ধ্যায় মন্দির চত্বরে সন্ন্যাসী বা ভক্তরা সুউচ্চ মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হন। সন্ন্যাসীরা উত্তরীয় বা উত্তুরী

পরিধান পূর্বক সাময়িকভাবে নিজ নিজ গোত্র পরিত্যাগ করে বলরাম গোত্র গ্রহণ করেন। অতঃপর নিজ নিজ শরীরকে নানা প্রক্রিয়ায় বলরামের কাছে উৎসর্গ করে পুরোহিতের সাহায্যে ভক্তরা পূজা করেন। দ্বাদশীর দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও এই দিন সন্ধ্যায় সন্ন্যাসী পূজা হয়। সন্ন্যাসী পূজার পর গ্রাম প্রদক্ষিণের রীতি আছে। নূতন করে ইচ্ছুক সন্ন্যাসীরা এদিন উত্তুরী গ্রহণ করতে পারে। এই দিন আহারের সময় কানে তুলো দিতে হয়, যাতে আহারের সময় কানে কোন শব্দ প্রবেশ না করে। ত্রয়োদশীর দিন পূজার পর গ্রাম প্রদক্ষিণের পালা এবং সন্ধ্যার পূজার পর ফলাহার। এদিন সন্ন্যাসীরা চুরি করে ফল খেলে কোন দোষ হয় না। চতুর্দশীর দিন বলরামের চক্ষুদান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সন্ন্যাসীরা এ দিন উপবাসী থাকে এবং রাত্রি প্রায় ৯টার পর চক্ষুদান কার্য সমাধান করা হয়। এ দিনের পূজার সকল উপাচার মিস্ত্রার প্রাপ্য।

পূর্ণিমার দিন হোমের পর সন্ন্যাসীরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহ প্রদক্ষিণ করে এবং গ্রাম প্রদক্ষিণের সময় পূজার বহু উপাচার পেয়ে থাকে। প্রদক্ষিণ-অন্তে স্নান করে সন্ন্যাসীরা পাটে (একতলার সমান উচু দালান) উঠে। পাটের নীচে বিচালি পাতা থাকে এবং সন্ন্যাসীরা পাটের উপর উঠে ক্রমান্বয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ে—এই প্রথার নাম হল পাটভাঙ্গা। পাটভাঙ্গা অনুষ্ঠানের পর উত্তুরী খুলে সন্ন্যাসীগণ স্বগোত্রে ফিরে যান। বলরামের সেবাপূজা-অন্তে সন্ন্যাসীরা আহার গ্রহণ করে উপবাস ভঙ্গ করেন। বোড়ো গ্রামে এর নাম হল 'পান্নভোজ'। বর্ধমানের মাটিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আরাধ্য বিগ্রহ বলরাম তাই গ্রামদেবতা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। পূজা-পার্বণ—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।
২। ভারতকোষ (৩য় খণ্ড)।
৩। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা—স. অশোক মিত্র।
৪। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড)—বিনয় ঘোষ।

পালসিট-ভৈটা

বৈষ্ণব শ্রীপাটরূপে পালসিট-ভৈটার খ্যাতি বহুকালের। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে বল্লুকা নদীর তীরে অরণ্যের মধ্যে বৈষ্ণব সাধক শ্যামাদাস যে আশ্রম স্থাপন করে মদন-গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে এক বৈষ্ণব পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল।

বর্ধমান হতে ব্যণ্ডেল আসার পথে পালসিট স্টেশনে নেমে রিক্সা যোগে ২ কিলো-মিটার উত্তরে এগিয়ে গেলে পালসিট-ভৈটা গ্রামে পেঁছান যায়। ষোড়শ শতকে বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে এই গ্রাম দুটির বিশেষ ভূমিকা ছিল। শ্যামাদাস আচার্য নামক একজন বৈষ্ণব সাধক সাধন-ভজনের নিমিত্ত কালনা থানার মতিসর হতে এসে এই গ্রামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্যামাদাসের নিত্যসঙ্গী মদনগোপাল বিগ্রহ আজও ভৈটা গ্রামের গোস্বামী বংশের কুলদেবতা। শোনা যায়, শ্যামাদাস অদ্বৈত আচার্যের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীদেবীর পুত্র ছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিনি পুত্র নন—শিষ্য। বৈষ্ণব বন্দনা ও অদ্বৈত প্রকাশে বর্ণিত বিবরণে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সম্ভবতঃ তিনি অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য ছিলেন। মদনগোপাল বিগ্রহের খ্যাতির কথা শুনে বিগ্রহের সেবাপূজার জন্য বর্ধমানের রাজারা বহু নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি দান করেন। জনশ্রুতি যে, মদনগোপাল বিগ্রহ দর্শনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে ভৈটা গ্রামে এসেছিলেন। তাঁর আগমনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রয়েছে 'বিবেক কুঠি'। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী কিছুকাল এখানে আত্মগোপন করেছিলেন। শ্যামাদাসের তিরোভাবের পর তাঁর নির্দেশে তাঁর সমাধির উপর রত্নবেদী নির্মাণ করে মদনগোপালকে তার উপর স্থাপন করা হয়। মূর্তিটি হল নিমকাঠের তৈরী শ্রীকৃষ্ণের বালগোপালের ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান দেববিগ্রহের, যার চোখ ও মুখমণ্ডল দর্শন করলে নয়ন সার্থক হয়। প্রতি বৎসর রাস ও দোলের সময় উৎসব ও মেলা উপলক্ষে প্রচুর জনসমাবেশ হয়। বিভিন্ন স্থান হতে কীর্তনীয়ার দল নাম সংকীর্তন করতে এখানে হাজির হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্যামাদাসের শ্রাদ্ধবাসর উপলক্ষে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামের দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে গোস্বামীপাড়ায় মদনগোপাল জীউর নাটমন্দির সহ সুউচ্চ আটচালা মন্দিরটি অন্যতম। মন্দিরের ভিতরে সিঁড়ি দিয়ে উপরিভাগে উঠার ব্যবস্থা আছে। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ জানা যায় না। তবে মন্দিরের স্থাপত্যরীতি দেখে অনুমান করা যায় যে, এটি অষ্টাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের এক স্থানে 'বাংলা ৯৬০ সাল' লেখা আছে। সম্মুখভাগে ফুল, লতাপাতা, বিভিন্ন নক্সা, পাখি ইত্যাদি পোড়ামাটির অলঙ্করণ রয়েছে। নাটমন্দিরের প্রাচীন স্তম্ভ হতে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন উপাদানকে নূতন নাটমন্দির নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবতঃ শ্যামাদাসের আমলে মন্দিরটি ৯৬০ বঙ্গাব্দে

নির্মিত হয়েছিল—তাই নূতন মন্দির নির্মাণের সময় প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নকে ধরে রাখার জন্য পূর্বোক্ত মন্দির নির্মাণের তারিখ খোদাই করা হয়েছে। রাসমঞ্চটি জীর্ণদশাগ্রস্ত।

গোস্বামী বংশও যেমন সমৃদ্ধশালী ছিল, তেমনি মদনমোহনের নিত্যভোগের রাজসিক ব্যবস্থা আছে। ভোর ৪টায় লুচি, ক্ষীর, ছানা, মিষ্টান্ন সহযোগে ভোগ ও মঙ্গল-আরতি। সকাল ৮টায় দুখানি নৈবেদ্য সহ পূজা এবং সকাল সাড়ে আটটায় চিড়ে, কলা, ও দই সহযোগে ফলার ভোগ, কেবলমাত্র রাস ও দোলযাত্রার সময় খিচুড়ি ভোগ হয়। দুপুর ১২টায় আতপ ও সিদ্ধ চাউলের অন্নভোগ; তৎসহ অন্যান্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে চচ্চড়ী, সুক্ত ও পরমান্ন অত্যাবশ্যক। সন্ধ্যা ৬টায় সন্ধ্যা আরতির পর লুচি ভোগ হয়। অন্নভোগের ব্যবস্থার মধ্যে রাস হতে দোল পর্যন্ত গরম ভোগ এবং দোল হতে রাস পর্যন্ত ঠাণ্ডা ভোগ নিবেদন হল উল্লেখযোগ্য।

মন্দির সংলগ্ন পাকশালা কর্ম একটি দালান-এ অনুষ্ঠিত হয়। পাকশালার গায়ে একটি প্রতিষ্ঠালিপি আছে, যথা,—

"শ্রীশ্রী ৺মদনগোপাল জীউর পাকশালা
ভৈটাগ্রাম নিবাসী স্বর্গত ৺প্রাণচন্দ্র পালিত মহাশয়ের
অক্ষয় স্বর্গপ্রার্থী তদীয় ভাগিনেয় বদান্যবর শ্রীমান
হরিপদ মিত্র কর্তৃক ইহা পুনর্নির্ম্মিত হইল। তজ্জন্য আমরা ইহার

রামচন্দ্র পাকশালা

নাম রাখিলাম। ইতি সন, ১৩০৭ সাল মাহ ফাল্গুন।"

পালসিট গ্রামে হীরালাল চট্টোপাধ্যায় নামক এক তান্ত্রিক সাধকের গৃহে দেবী জগদ্ধাত্রীর শিলা মূর্তির নিত্য সেবাপূজা এবং কার্তিক মাসে জগদ্ধাত্রী পূজার সময় বিশেষ বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পালসিট গ্রামের হাটতলায় ১৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট চারচালার দুটি শিবমন্দির আছে। মন্দির দুটিতে টেরাকোটা অলঙ্করণ আছে। তবে একটি মন্দিরের নিম্নাংশ সংস্কার করার সময় টেরাকোটার কাজ নষ্ট হয়ে গেছে। হাটতলার পশ্চিমে একটি শিবমন্দিরে টেরাকোটা অলঙ্করণ ও পঙ্খের কাজ আছে। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি হল,—

"TEMPLE। শকাব্দা ১৭২৮"

উক্ত মন্দিরের বিপরীত দিকে একটি চারচলা শিবমন্দির আছে—যা ১৩০০ বঙ্গাব্দে ৺জয়গোপালের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পালসিট-ভৈটা পিছিয়ে ছিল না। এক সময়ে এই গ্রামের টোলে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রচর্চার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ভৈটা গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয়টি ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য অবদান হল ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতি।

পালসিট-ভৈটা গ্রামের প্রধান উৎসব হল শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ও দোলযাত্রা। দুটি উৎসবেই বহু ভক্ত ও সাধারণ মানুষ এখানে সমবেত হন। মদনগোপাল হলেন ভৈটা গ্রামের গোস্বামীদের কুলদেবতা এবং তাঁরাই উৎসবগুলি পরিচালনা করেন। অনেকে বর্ধমানের রাজকুমার প্রতাপচাঁদ ও শ্যামাদাসের মিলন বিষয়ে গল্প-কথার অবতারণা করেছেন। কিন্তু এ তথ্য ভুল। কারণ শ্যামাদাসের আবির্ভাব কাল হল ষোড়শ শতকে এবং রাজকুমার প্রতাপচাঁদ ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামাদাসের জন্মস্থান নিয়ে মতপার্থক্য আছে। অনেকের মতে তিনি মতিসর নিবাসী নারায়ণ সিদ্ধান্তের পুত্র এবং ১৪১৪ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামাদাসের বংশধরগণ বিজুর, মতিসর, পালসিট-ভৈটা ও নবগ্রামে বসবাস করছেন।

অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ

(ভক্তের ভগবান)

কাটোয়া থানার অন্তর্গত ভাগীরথীর উত্তর তীরে অবস্থিত অগ্রদ্বীপ একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বৈষ্ণবতীর্থরূপে অগ্রদ্বীপের খ্যাতি বহুকালের। গোপীনাথ বিগ্রহকে দর্শন ও বারুণী উৎসব উপলক্ষে হাজার হাজার লোক এখানে সমবেত হয়। কাটোয়া অথবা নবদ্বীপ হ'তে রেলপথে অগ্রদ্বীপে আসা যায়। রেলস্টেশন হ'তে কিছুটা পাকা এবং কিছুটা মেঠো পথ ধরে ভাগীরথীর তীরে পৌঁছান যায়। অতঃপর দেশী নৌকায় নদী পার হ'য়ে অগ্রদ্বীপে যাওয়া যাবে।

পূর্বতন অগ্রদ্বীপ বর্তমান স্থানের প্রায় ১'৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত ছিল এবং গঙ্গার-ভাঙ্গনের ফলে প্রাচীন গ্রাম বিলুপ্ত হওয়ায় নূতন করে গ্রাম পত্তন হয়েছে। ভন. ডেন. ব্রুক ও রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় ভাগীরথীর বামতীরে অগ্রদ্বীপ, ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে হেনরী মার্টিনও দেখেছিলেন নদীর বাম তীরের গ্রামটিকে। কিন্তু ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে বিধ্বংসী বন্যায় নদীখাতের বিরাট পরিবর্তন আসে। মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রেভাঃ লঙের বিবরণীতে আছে যে, নদীর দক্ষিণ তীরে অগ্রদ্বীপের অবস্থিতি ছিল। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সার্ভে মানচিত্রে উক্ত উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে বিধ্বংসী বন্যার ফলে নদীখাত পরিবর্তিত হয়ে নদীর বামতীরে বর্তমান গ্রামটি রয়েছে। অগ্রদ্বীপের উত্তরে মরিগঙ্গার খাত ও ভালশুনি বিল অতীতের নদী-প্রবাহের সন্ধান দেয়। অগ্রদ্বীপের দক্ষিণে প্রবাহিত সাইণী খাল ও পাঠান নালা দিয়ে ভাগীরথীর সঙ্গে ব্রহ্মাণী ও খড়ি (খড়্গেশ্বরী) নদীর যোগাযোগ ছিল। ঐ সকল নদী ও খালের অস্তিত্ব বর্তমানেও দেখা যায়।

অগ্রদ্বীপের নামকরণ সম্পর্কে আভিধানিক অর্থ হল—অগ্রদ্বীপ (ক্লীবলিঙ্গ)—অগ্রে (প্রথমে) উৎপন্নং দ্বীপম্, দ্বয়োর্গতা আপো যস্মিন্নিতি দ্বীপম্। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে আছে—দ্ব্যন্ত রুপেভ্যো হপ ঈৎ। পদানি-দ্বি, অন্তর, উপসর্গেভ্যঃ, অপ, ঈৎ দ্বি ও অন্তর শব্দ এবং উপসর্গের পর অপশব্দের আকার স্থানে 'ঈ' কার হয়। যথা দ্বি-আপ=দ্বীপ (অষ্টাধ্যায়ী ৬/৩/৯৮)। উক্ত ব্যুৎপত্তি হতে পাওয়া যায় ভাগীরথীর গর্ভে চড়া পড়ে প্রথমে যে দ্বীপ বা ভুখণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল তা-ই অগ্রদ্বীপ। বর্তমানে আলোচ্য অগ্রদ্বীপের ভৌগোলিক পরিবেশ এই মতকেই সমর্থন করে। টলেমী Aganagara (অগনগর)-এর উল্লেখ করেছেন। ম্যাক্রিণ্ডল, সেণ্ট মার্টিন ও উইলফোর্ডের মতে অগ্রদ্বীপ পূর্বে অগনগর বা আগনগর নামে পরিচিত ছিল। অতঃপর সুদীর্ঘকাল ধরে অগ্রদ্বীপের ইতিহাস ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে ভন. ডেন. ব্রুকের মানচিত্রে দেখা যায়, মেদিনীপুর হতে উত্তরমুখী রাজপথটি সরাই শহর বর্ধমানকে অতিক্রম করে উত্তর-পূর্ব মুখে মেমারী, মন্তেশ্বর ও কাটোয়া থানার মধ্য দিয়ে Gasiapoer (বর্তমান গাজীপুর)-এ গঙ্গা অতিক্রম করে Haodia (বর্ত্তমান অগ্রদ্বীপ), পলাশী হয়ে কাশিমবাজার পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে অঙ্কিত রেনেলের মানচিত্রে—হুগলী হতে একটি রাজপথ Amboca (অম্বিকা), Culna (কালনা), মীর্জাপুর, জাহান্নগর হয়ে Pattolu (পাটুলী) পর্যন্ত চিহ্নিত আছে এবং এই স্থানে নদী পারাপারের ঘাট ছিল। Aghedeap ও পলাশী অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদ যাওয়া যেত। এই পথ ধরে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুন রবার্ট ক্লাইভ পাটুলীতে এসে শিবির স্থাপন করে এর পরদিবস অপর একটি রাজপথ ধরে কাটোয়ায় উপস্থিত হন। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে আগস্ট তারিখে 'বাংলা সমাচারের' এক খবরে প্রকাশ যে যশোহর জেলায় বকচর নিবাসী কালীপ্রসাদ পোদ্দার নামক এক স্বুবর্ণবণিক যশোহর হতে অগ্রদ্বীপ পর্যন্ত একটি নূতন রাস্তা প্রস্তুত করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ঐ রাস্তা কাটোয়া পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। এখনও স্থানে স্থানে ঐ পুরাতন রাস্তার নিদর্শন দেখা যায়। অগ্রদ্বীপের প্রসিদ্ধি শুরু হয় গোপীনাথ বিগ্রহ ও গোবিন্দ ঘোষের প্রতিষ্ঠার পর হতে।

গোপীনাথ বিগ্রহের প্রথম সেবাইত অগ্রদ্বীপ শ্রীপাটের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে জানা যায় যে, কাটোয়া শহর হতে ১৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অজয় নদের উত্তর তীরে অবস্থিত কুলাই গ্রামে প্রসিদ্ধ পদকর্তা ও শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ বাসুদেব ঘোষঠাকুরের জন্মস্থান এবং গ্রামটি বৈষ্ণব সমাজে মান্য হয়। বাসুদেবের পিতামহ গোপাল ঘোষ ফতেসিং পরগণার (কাঁদি মহকুমার) অন্তর্গত রসোড়া হতে কুলাই গ্রামে এসে বসবাস করেন। তাঁর পুত্র বল্লভ ঘোষ বাইশী করণ করে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কুলপঞ্জিকাতে আছে,—

"ধন্যরে গোপাল ঘোষ সকলি বৈষ্ণব।
যে কুলে জন্মিলা বাসু, গোবিন্দ, মাধব।"

বল্লব ঘোষের ৩টি বিবাহ। প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব ; দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র দনুজারি, কংসারি ও মীনকেতন ও তৃতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ছিলেন জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দ এবং এঁরা প্রত্যেকেই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। অগ্রদ্বীপের সঙ্গে কুলাইয়ের ঘোষ পরিবারের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ গোবিন্দ ঘোষ কর্তৃক শ্রীপাট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে গোবিন্দ ঘোষ কষ্টিপাথরে নির্মিত গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। অপূর্ব এই গোপীনাথ বিগ্রহ! দেখলে নয়ন সার্থক হয়। দক্ষিণ-মুখী দালান মন্দিরের মধ্যে বেণু হস্তে দণ্ডায়মান মূর্তিটি বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের এক অনুপম সৃষ্টি বলে মনে হয়—বা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সত্যই যেন মন্দিরের মধ্যে গোপাল দাঁড়িয়ে হাসছেন! সম্মুখে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে হঠাৎ শ্রীমূর্তি দর্শন করলে মনে হবে যেন স্বয়ং গোপীনাথ বৃন্দাবন হ'তে মুরলীহস্তে অগ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ব্রহ্মশিলা নামক প্রস্তরখণ্ডে ক্ষোদিত কৃষ্ণ বিগ্রহটি সারা বাংলাদেশে সুপরিচিত ছিল এবং এই বিগ্রহের সেবাকার্য করার দৌলতে গোবিন্দ ঘোষ পরিচিত হলেন ঘোষঠাকুর নামে।

গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর ঘোষঠাকুর বহুকাল জীবিত ছিলেন। তাঁর অবর্তমানে সেবা পুজার যেন কোন বিঘ্ন না হয়, তজ্জন্য মৃত্যুর পূর্বে এ নির্দেশ শিষ্যগণকে দিয়েছিলেন। গোপীনাথ বিগ্রহ ও গোবিন্দ ঘোষের পরস্পরের প্রতি সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের ন্যায়। গোবিন্দ ঘোষের একমাত্র পুত্র ইহলোক ত্যাগ করায় ঘোষঠাকুরকে পুত্রের মৃত্যুতে মনস্তাপ করতে নিষেধ করেছিলেন গোপীনাথজীউ। গোপীনাথের প্রতি বাৎসল্যভাবে সেবাপূজা করায় স্বয়ং গোপীনাথ বলেছিলেন যে, ঘোষঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধাদি কার্য গোপীনাথের দ্বারাই সম্পন্ন হবে। পুত্রস্নেহে গোপীনাথকে সেবা করে চলেছেন ঘোষঠাকুর। একদা বারুণী উৎসবের পূর্বে চৈত্র মাসের একাদশী তিথিতে ঘোষঠাকুর ইহলোক ত্যাগ করেন।

জনশ্রুতি এই যে, সেদিন গোপীনাথের চোখে বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণা দেখা দিয়েছিল। ঘোষঠাকুরকে দাহ না করে মন্দির পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হয়। দ্বাদশ দিবসে স্বয়ং গোপীনাথ শ্রাদ্ধের বাস ও কুশাঙ্গুরীয় পরিধান করে পুত্ররূপে ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ধ-কার্য সমাধান করেন। এখনও প্রতি বৎসর ঐ তিথিতে বিগ্রহকে শ্রাদ্ধের বসন পরিধান করান হয় এবং পূজারীরা মন্দিরের মেঝেয় কুশ বিছিয়ে বিগ্রহের হাতে পিণ্ড তুলে দিয়ে দ্বার রুদ্ধ করে বাইরে আসেন এবং কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে দেখতে পান যে, কুশের উপর পিণ্ড পড়ে আছে—এ ঘটনা নাকি আরো অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন।

গোবিন্দ ঘোষের তিরোধানের পর তাঁর শিষ্য ও ভক্তগণের প্রচেষ্টায় গোপীনাথ বিগ্রহের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেবোত্তর সম্পত্তি হ'তে প্রচুর আয় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে ঘোষ বংশের কোন এক শাখা গোপীনাথ বিগ্রহকে পূর্ববঙ্গে

সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী গোপীনাথ বিগ্রহের অধিকার ছাড়তে রাজী না হওয়ায় ষড়যন্ত্রকারীরা গোপনে শ্রীবিগ্রহ নিয়ে পলায়ন করেন। এই সংবাদে বিচলিত হ'য়ে অগ্রদ্বীপের অধিবাসীরা পাটুলির জমিদারকে (পরবর্তীকালের বংশবাটির জমিদার) গোপীনাথ বিগ্রহ উদ্ধারের অনুরোধ করায় তিনি একদল সৈন্য পাঠিয়ে কুণ্ঠিয়ার নিকট হতে বিগ্রহ উদ্ধার করেন। অতঃপর পাটুলী-নারায়ণপুরের রাজবাটীতে গোপীনাথজীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইরূপে গোপীনাথ তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যায়—কেবলমাত্র চৈত্র মাসের একাদশীর দিন গোপী-নাথকে অগ্রদ্বীপে পাঠিয়ে ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান নিবাহ করা হ'ত।

এরপর গোপীনাথ বিগ্রহ পুনরায় অধিকারচ্যুত হয়। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বারুণী উৎসবের সময় প্রভূত জনসমাগমের ফলে ভিড়ের চাপে কিছু লোকের প্রাণহানি ঘটে—এই সংবাদে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ প্রতিপক্ষ পাটুলীর জমিদারকে প্রাণহানির কারণ দর্শাইতে আদেশ করেন। জমিদারের উকিল স্বীয় প্রভুর বিপদের সম্ভাবনা দেখে ভয়ে কোন উত্তর না দেওয়ার সুযোগে নদীয়ার রাজা রঘুরামের উকিল নবাবকে জানান যে, মেলায় প্রচুর জনসমাগমের ফলে প্রাণহানি ঘটেছে, তবে ভবিষ্যতে মেলায় লোক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নদীয়ারাজ বিশেষ সাবধানতা গ্রহণ করবেন। উত্তরে নবাব সন্তুষ্ট হ'লেন এবং উকিলের কৌশলে গোপীনাথ বিগ্রহসহ অগ্রদ্বীপের জমিদারী নদীয়ার রাজার হস্তগত হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে গোপীনাথের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু সে মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। পাটুলীর জমিদারের কর্তৃত্ব হ'তে গোপীনাথ বিগ্রহ অধিকারচ্যুত হ'লে পুনরায় গোপীনাথকে অগ্রদ্বীপে স্থানান্তরিত করা হয়। কেবলমাত্র, বারদোল উৎসবের সময় শ্রীবিগ্রহকে রেউড়ে (কৃষ্ণনগর) নিয়ে যাওয়া হ'ত—এ প্রথা আজও পালিত হয়ে আসছে।

অষ্টাদশকের ষাটের দশকে গোপীনাথ বিগ্রহ নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদের সংবাদ জানা যায়। ভুকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের কাশী যাত্রার সময় গোপীনাথ বিগ্রহ অগ্রদ্বীপে অধিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু ১১৭৮ সালে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় যাত্রীরা সংবাদ পান যে, গোপীনাথজী কলিকাতাস্থ শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে আছেন। এ কথার সমর্থনে প্রমাণ মিলবে কৃষ্ণচন্দ্রের সহযাত্রী, চিকিৎসক ও কবি বিজয়রাম গুপ্তের রচিত "তীর্থমঙ্গল" কাব্যে,—

"চাপান করিয়া তাহা চলিল ত্বরিত।
অগ্রদ্বীপ আসি নৌকা হৈল উপস্থিত ॥১০১২
সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর।
অপূর্ব নিৰ্ম্মাণ বাটী দেখিতে সুন্দর ॥১০১৩
রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী আছেন গোপীনাথ।
দর্শন না পায়্যা যাত্রী মাথে মারে ঘাত ॥১০১৪

উদ্দেশ্যে তাঁহার স্থানে প্রণাম করিয়া।
কথোদূরে আসি নৌকা দিলা চাপাইয়া ॥" ১০১৫

তীর্থমঙ্গলের বর্ণনা হ'তে জানা যাচ্ছে যে, ঐ সময়ে গোপীনাথ বিগ্রহের খ্যাতি সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। জনপ্রবাদ যে, লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান নবকৃষ্ণ মুন্সী স্বীয় মাতৃশ্রাদ্ধের পর শোভাবাজারে একটি কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। তাঁর আরও ইচ্ছা ছিল শোভাবাজারের মূর্তিটি বঙ্গদেশে যে কোন বিগ্রহ অপেক্ষা ভাস্কর্যে ও মনোহারিতায় শ্রেষ্ঠ হ'বে। কিন্তু তাঁর মনোমত মূর্তি নির্মাণ করতে শিল্পীরা সক্ষম হ'ন নাই—তাই মাতৃশ্রাদ্ধের সময় আনীত অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ বিগ্রহটিকে ফেরত না দিতে মনস্থ করেন। এ বিষয়ে অন্য একটি মতে জানা যায় যে, এই অপূর্ব মূর্তিটিকে নবকৃষ্ণ মুন্সী স্বীয় ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সেকারণে ১১৭০ সালের শেষভাগে অতি সঙ্গোপনে রাত্রিকালে নৌকাযোগে বিগ্রহটিকে আনা হয়েছিল—উক্ত ঘটনার কিছুকাল পূর্বে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবকৃষ্ণ মুন্সীর নিকট ৩ লক্ষ টাকা কর্জ করেন। বিগ্রহ চুরি বা কার্যান্তে তা ফেরত দিতে রাজী না হওয়ায় নবকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাদ উপস্থিত হয়। নবকৃষ্ণের বক্তব্য ছিল—যেহেতু এই বিগ্রহ ঘোষঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং নদীয়ারাজের এই বিগ্রহের উপর কোন অধিকার নেই—তিনি আরও দাবী করেন যে, অর্থের বিনিময়ে তিনি গোপনাথ বিগ্রহ গ্রহণ করেছিলেন। অতএব ব্যাপারটি এতদূর গড়িয়ে গেল যে, শেষ পর্যন্ত বড়লাটকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল।

দু' বছর ধরে বাদানুবাদের পর ১১৭২ সালে বড়লাট নদীয়ারাজের হস্তে মূর্তি প্রত্যার্পণের আদেশ দিলে নবকৃষ্ণ অনুরূপ একটি বিগ্রহ নির্মাণের জন্য সময় প্রার্থনা করেন। নবনির্মিত মূর্তিটিও এত সুন্দর হয়েছিল যে, প্রকৃত গোপীনাথকে চিনতে পারা দুষ্কর ছিল। বিগ্রহ আনতে গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র ও সেবাইতগণ, উভয় মূর্তির পার্থক্য নির্ণয় করতে অক্ষম হ'ন। কিন্তু, সেই রাত্রে স্বয়ং গোপীনাথ কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে নদীয়ারাজ জানতে পারেন, যে বিগ্রহের কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দেবে সেটি প্রকৃত বিগ্রহ। অবশেষে প্রকৃত বিগ্রহ চিহ্নিত হওয়ায় ১১৭২ সালের চৈত্র মাসে নবকৃষ্ণ ক্ষুণ্ণ মনে গোপীনাথকে বিদায় দিলেন। শোভাবাজার হ'তে শ্রীবিগ্রহ আনীত হ'য়ে অগ্রদ্বীপে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হ'লে অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে বারুণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ উৎসব আজও চলে আসছে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে গঙ্গাসাগরের মেলা অগ্রদ্বীপের বারুণীমেলা অপেক্ষা কম আকর্ষণীয় ছিল। সুদূর পূর্ববঙ্গ, বিহার, ওড়িযা ও অন্যান্য স্থান হতে পুণ্যার্থীগণ অগ্রদ্বীপে সমবেত হত। ১২১৮ সালের ১৮ই চৈত্র (৩০শে মার্চ ১৮১২ খ্রীস্টাব্দ), তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, এই উৎসব উপলক্ষে অগ্রদ্বীপে প্রায় ৫০ হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল, পক্ষান্তরে কাটোয়ার মেলায় মাত্র ২০ হাজার লোক এসেছিল। দু'বছর পর অর্থাৎ ১২৩০ সালের ২৩শে চৈত্র মহাবারুণী উৎসবের দিন

এত অধিক জনসমাবেশ ঘটেছিল, যা অতীতের সমস্ত নজীরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রেভাঃ লঙের এক বিবরণে জানা যায় যে, ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বারুণী উৎসব উপলক্ষে প্রায় এক লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল এবং মেলায় প্রায় ১০/১২ লক্ষ টাকার জিনিষপত্র কেনাবেচা হয়েছিল। বারুণী স্নান ছাড়াও ঢাকা, যশোহর, পাটনা, রাজশাহী প্রভৃতি স্থান হতে মানত রক্ষার নিমিত্ত বহু লোক গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দিতে এখানে উপস্থিত হত। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে দুজন স্ত্রীলোক এখানে সন্তান বিসর্জন দেয় এবং ব্রাহ্মণদের যথাক্রমে প্রণামী দিয়ে তাদের পিতা গঙ্গাজল হতে সন্তানকে কুড়িয়ে নেয়। অনুরূপ একটি ঘটনা কাটোয়াতেও ঘটেছিল; শিশুর পিতা গঙ্গাজল হতে সন্তান কুড়িয়ে নিলে তার মা শিশুর ঘাড় ভেঙ্গে পুনরায় জলে নিক্ষেপ করে।

বারুণী উৎসবের সময় সাধারণ পুণ্যার্থী ছাড়াও দলে দলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তগণ অগ্রদ্বীপে সমবেত হয়ে স্থানটিকে নাম-কীর্তনে মুখরিত করে তোলে। এমনকি মুসলমানগণও এই মহোৎসবে যোগদান করে থাকেন। গোস্বামী মহান্তগণ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে চিড়া ও অন্ন মহোৎসব। অগ্রদ্বীপে সমবেত বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সাহেবধনী ও বলরামভজা সম্প্রদায়ের প্রাধান্য অধিক। সাহেব-ধনী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক পল্লব ঘোষবংশীয় চরণ পাল ছিলেন নদীয়া জেলার খড়ীনদীর তীরে লক্ষণগাছা গ্রামের বাসিন্দা। আবার কেহ কেহ বলেন যে, চরণ পালের পিতা দুঃখীরাম পাল ও বাগাড় নিবাসী রঘুনাথ দাস দুজনে সাহেবধনী নামে এক উদাসীনের নিকট বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে কর্তাভজার অন্যতম শাখা সাহেবধনী সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে চরণ পালের সময়ে এই সম্প্রদায়ের প্রসার লাভ ঘটে এবং তাঁর বহু শিষ্য ও ভক্ত ছিল।

সারা বছর ধরে সাহেবধনী-সম্প্রদায়ের সংগৃহীত অর্থ অগ্রদ্বীপের বারুণী মেলার মহোৎসবে ব্যয় হয়। সাহেবধনীরা জাতিভেদ মানে না। মুসলমান সহ নানা সম্প্রদায়ের লোক এই সম্প্রদায়ের ভক্ত। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে চরণ পাল জীবিত ছিলেন এবং ঐ শতকের শেষভাগে তাঁর মৃত্যু হলে চরণ পালের পুত্র আসনের অধিকারী হন। এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য হল নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের তারা কাছে টেনেছে।

বৈষ্ণব তীর্থ হিসাবে অগ্রদ্বীপের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেও এই স্থানের দ্রষ্টব্য বস্তু সকল বারবার ভাগীরথীর বন্যা ও নদীর খাত পরিবর্তনের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। নদীয়ারাজ কর্তৃক নির্মিত প্রাচীন মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমান মন্দিরটিও নদীয়ারাজ কর্তৃক নির্মিত বলে কথিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যায় যে, ঐ মন্দিরটি নদীয়ারাজ কর্তৃক নির্মিত হয় নাই। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের এক সংবাদে জানা যায় অগ্রদ্বীপে শ্রীশ্রীগোপীনাথ ঠাকুরের বাটী ভাগীরথীর কুলভাঙ্গাতে ভগ্নপ্রায় হওয়ায়, তৎপ্রযুক্ত পূর্ববাটির দক্ষিণ-পূর্বদিকে নূতন মন্দির নির্মিত হয়েছিল। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল সম্বাদ ভাস্করে প্রকাশিত হয় যে, যশোহর নিবাসী দানবীর কালিপ্রসাদ পোদ্দার অগ্রদ্বীপস্থ গোপীনাথজীউর ইষ্টক নির্মিত

দুটি গৃহ ও আশাননগরে ৪টি পুষ্করিণী খননের নিমিত্ত ৫০০০ টাকা ব্যয় করেন। গোপীনাথ মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে প্রোথিত আছে—"শকাব্দা ১৭৪৫" অর্থাৎ ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে গোপীনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে গোপীনাথ বিগ্রহের পার্শ্বে শ্রীরাধিকার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। গোপীনাথের দক্ষিণমুখী দালান মন্দিরের চতুর্দিকে সুউচ্চ ৩২টি থাম ছিল এবং মূল মন্দিরের চারিপাশে বারান্দা ছিল। দক্ষিণ দিকের বারান্দাসহ ৮টি থাম বাদে অবশিষ্ট থামগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। গোপীনাথের দালান মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট ও প্রস্থ ৩০ ফুট। পূর্বে মন্দিরের পশ্চিমে একটি দালান ছিল। ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের তিন পাশের দেওয়াল ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট নাই। অগ্রদ্বীপে অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, সাহেবধনী সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরু চরণ পালের সমাধি গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হয়েছে।

গোপীনাথ জীউর মন্দির প্রাঙ্গণের পশ্চিমভাগে অতি আধুনিককালে নির্মিত একটি চারচালা শিবমন্দির আছে। কোন টেরাকোটা নাই। ঐ মন্দিরে ক্ষোদিত লিপি হতে মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। লিপিটি এরূপ,—

'তারিখ ১৭ই চৈত্র রামনবমী রবিবার ১৩৭২ বাংলা সম্বতে সন্তানেশ্বর মহাদেবের মন্দির নির্মাণ করা হইল। নির্মাতা শ্রী ১০০৮ স্বামী শ্রীরামকিঙ্কর দাসজী মহারাজ ত্যাগী, মহন্ত তেরহ ভাই ত্যাগী শ্রীশ্রী ১০০৮ শ্রীগুরু স্বামী বামদেব দাসজী মহারাজকে অসীম কৃপাসে।'

বাংলার অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় অগ্রদ্বীপের খ্যাতি ম্লান। তবে আজও একটা বিশেষ তিথিতে দলে দলে ভক্তমন্ডলী এই স্থানে হাজির হয়। চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান দিবসে নাম-কীর্তন সহকারে বিশেষ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আর মহোৎসবে বিশেষ আকর্ষণ সাহেবধনী সম্প্রদায়ের নামগান ও চিড়া ভোগ যা হিন্দু মুসলমান সকল জাতি নির্বিশেষে গ্রহণ করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নামমাহাত্ম্য সত্যই অসীম।

বোড়গ্রামের বলরাম

(লৌকিক দেবতার স্বরূপ)

রায়না থানার অন্তর্গত বোড় বলরাম (জে. এল. নং ৮৩) হল একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। শক্তিগড় স্টেশন হতে বাসযোগে ৪ কিলোমিটার দূরে বড়শূল গিয়ে দেশী নৌকায় শম্ভুপুরে দামোদর নদ পার হয়ে দক্ষিণমুখী হাঁটা রাস্তায় ৫ কিলোমিটার এগিয়ে বোড় বলরাম গ্রামে পৌঁছান যায়। আবার মসাগ্রাম স্টেশনে নেমে সাদীপুরে দামোদর নদ পার হয়ে ৩ কিলোমিটার হাঁটা পথে এই গ্রামে যাওয়া যায়। সেটেলমেন্ট রেকর্ডে অতীতে এই গ্রামের নাম ছিল 'বোড়'। কিন্তু গ্রামদেবতা

বলরামজিউর নামানুসারে একালে 'বোড়বলরাম' নামে পরিচিত। পঞ্চদশ শতকে রচিত মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে ও অষ্টাদশ শতকে মানিক গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে বোড়গ্রামের বলরামের উল্লেখ আছে।

বোড়গ্রামে বলরামের প্রতিষ্ঠার কোন সময় জানা যায় না। তবে প্রবাদ যে, বহুকাল পূর্বে দেবখাল বেয়ে এক বৃদ্ধ এই গ্রামের উত্তরভাগে ডিঙ্গিদহে নৌকাডুবির ফলে নিকটস্থ উঁচু জমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাত্রে বলরাম বিগ্রহ তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন—'আমি বাসুদেবদহে আছি, আমাকে প্রতিষ্ঠা কর'।

এ প্রসঙ্গে অপর এক কাহিনী শোনা যায়। কাহিনীটি হল যে, দ্বাদশজন সেবাইতের মধ্যে মাত্র একজনের পুত্র সন্তান ছিল। ছেলেটির বয়স যখন বারো বছর সেই সময় একদিন তার পিতা সেবা পূজায় ভার পুত্রের উপর দিয়ে গ্রামান্তরে কার্যোপলক্ষে গিয়েছিলেন। বালকটি গায়ত্রী মন্ত্র জপের পর দুধ ও কাঁচা গুড় নিয়ে বলরাম বিগ্রহকে তা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেও দেববিগ্রহ থাকেন নিশ্চল। নিয়মমত পূজা করা হয় নাই ভেবে বালকটি ক্রন্দনরত অবস্থায় বারংবার বলরামকে অনুরোধ জানিয়েও কোন ফল না হওয়ায় বিগ্রহের হাতের গদা নিয়ে হৃদয়ে জোরে আঘাত হানায় দেবতা হাত বাড়িয়ে দুধ পান করেন এবং ঠিক সেই সময়ে পূজারী মন্দিরে প্রবেশ করে দেখেন যে, বলরামের ঠোঁট বেয়ে দুধের ধারা নেমে আসছে। বিগ্রহের হতে হতে দুধের পাত্র পড়ে ভেঙ্গে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণহীনদেহে বালকটি লুটিয়ে পড়ে। আজও বলরাম মূর্তিতে দুধের ধারা দেখিয়ে সেবাইতরা দর্শনার্থীদের অতীত কাহিনী শুনিয়ে থাকেন। বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে শ্রীরঘুনন্দন ও কৃষ্ণবিগ্রহ সম্পর্কিত অনুরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে।

বলরাম পূজার প্রাচীনতার দিক হতে বিচার করলে বাঘনাপাড়া, সিমলাপাল, কানাইডাঙ্গা ও শব্রাকোণ (বাঁকুড়া) উল্লেখযোগ্য স্থান। এই দেবতার আবির্ভাব সম্পর্কে হরিবংশে বর্ণিত আছে,—বাসুদেব রোহিণীকে বলেন—"তোমার উদর মধ্যে স্থাপিত এই যে গর্ভ উহা আকর্ষণ পূর্বক দেবকীর গর্ভ হইতে তোমার গর্ভে স্থাপিত হওয়ায় এই পুত্র সঙ্কর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ হইবে।" তাঁর আয়ুধ হ'ল এক হাতে হল ও অপর হাতে মুসল। হরিবংশে আছে,—

"লাঙ্গলেনাবসিক্তেন ভুজগাভোগ বর্ত্তিনা।
তথা ভুজাগ্রশ্লিষ্টেন মুসলেন চ ভাস্বতা ॥ বিষ্ণুপর্ব ৪৬/২৮।

(অনু ঃ তাঁর এক হস্তে সর্পদেহতুল্য বিশাল হল শোভিত এবং অন্য হস্তে দেদীপ্যমান মুসল ধৃত ছিল।)

বিষ্ণুধর্ম নামক উপপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে তাঁর দ্বিতীয় অংশরূপে স্বীকার করেছেন, যথা,—'দ্বিতীয়ো যো মমাংশস্তু রামো'নন্ত স লাঙ্গুলী'। (৬৬তম অধ্যায়)। বিষ্ণুপুরাণে (অধ্যায় ৫/১) বলরামের সঙ্গে নাগ বা সর্পকুলের একটা সুসম্পর্ক রয়েছে। কংসবধের নিমিত্ত মথুরা যাওয়ার পথে অক্রুর, যমুনার হ্রদ মধ্যস্থ পাতালপুরীতে

প্রবেশ পূর্বক দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নাগরাজ অনন্তের ক্রোড়ে উপবিষ্ট এবং অপর জন উপবেশন ভঙ্গিমায় শূন্যে ভেসে আছেন এবং যিনি নাগরাজের ন্যায় এক কুণ্ডলধারী। এই ব্যক্তিই হচ্ছেন,—

অপরাংচৈব সোমেন তুল্য সংহননং প্রভুম্।

সঙ্কর্ষণ মিবাসীনং তং দিব্যং বিষ্টরং বিনা ॥ (হরিঃবিষ্ণুপর্ব ২৬/৫০)।

(অনু ঃ তথায় চন্দ্রতুল্য গৌরবর্ণ দেহধারী অন্য এক (প্রথম জন শ্রীকৃষ্ণ) প্রভাবশালী দেবতা ছিলেন, যাঁর সঙ্গে সঙ্কর্ষণের অবিকল মিল আছে এবং তিনি বিনা আসনে উপবিষ্ট।)

নাগকুলের সঙ্গে বলরামের সম্পর্কের বিষয় জানা যায় যোগাসনে তাঁর দেহত্যাগের সময়ে। বিষ্ণুপুরাণে আছে,—

চান্দ্রম্যমানৌ তৌ রামং বৃক্ষ মূল কৃতাসনম্।

দদৃশতে মুখাচ্চান্য নিষ্কমন্তং মহোরগম ॥ বিষ্ণু (৫।৩৭/৪০)।

(অনুঃ অনন্তর তাঁরা (শ্রীকৃষ্ণ ও দারুক) ভ্রমণ করার সময় দেখলেন যে, বৃক্ষতলে যোগাসনে উপবিষ্ট বলদেবের মুখ হতে প্রকাণ্ড সর্প নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে।) এই প্রকাণ্ড সর্পটি হল নাগরাজ অনন্ত' (বিষ্ণু ৫।৩৭।৫১) এবং কর্ণ কুণ্ডল দুটির একটি বলরামের কর্ণে ও অপরটি নাগরাজের কর্ণে শোভিত। আবার বিষ্ণু ও বলরাম উভয়েই নাগছত্রধরী। বলরামের উপর দেবত্ব আরোপিত হওয়ায় দেব প্রতিমা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তায় মূর্তি শাস্ত্রে প্রতিমা লক্ষণ প্রসঙ্গে বৃষ্ণিকুলের বীরগণের বর্ণনা পাওয়া যায়। অগ্নি-পুরাণে বর্ণিত আছে,—

"লাঙ্গল্য মুষল্য রামো গদা-পদ্মধরঃ স্মৃতঃ। ৪৯।২২।

বরাহমিহির বলদেবের প্রতিমা নির্মাণকল্পে উল্লেখ করেছেন,—

বলদেবো হলপানির্মদ-বিভ্রম-লোচনশ্চ কর্তব্য

কুণ্ডলমেকং বিভ্রত শংখেন্দু-মৃণাল-গৌরতনুঃ। বৃহৎসং ৫৭।৩৬।

মহাভারতে রাম ও কৃষ্ণকে এক ও অভিন্ন ভাবা হয়েছে। শান্তিপর্বে শরশয্যাগত ভীষ্মদেব কর্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি' অধ্যায়ে আছে,—

যোহলী মুসলী শ্রীমান নীলাম্বরধরঃ স্থিতঃ।

রামায় রৌহিণেয়ায় তস্মৈ ভোগাত্মনে নমঃ ॥ মহাঃ ৭৪ অধ্যায়।

লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে রক্ষিত যক্ষ মূর্তির সাদৃশ দ্বিভুজ বলরামের মূর্তিটি সর্পছত্র শোভিত, বাম কর্ণে কুণ্ডল এবং হস্তে হল ও মুসল। আবার মথুরা মিউজিয়ামে রক্ষিত গুপ্ত যুগের মূর্তিটির চারটি হাত। গুপ্ত পরবর্তী যুগে বালিপাথরে নির্মিত বলরাম মূর্তি পাওয়া গেছে পাহাড়পুরে। এই মূর্তির গঠনপ্রণালী বিচিত্র ধরনের। হাতের সংখ্যা চারটি, কর্ণ কুণ্ডল দুটির গঠনপ্রণালীতে সাদৃশ নাই এবং পাত্র হাতে একটি নারী মূর্তি মদিরা বা সোমরস ঢেলে দিচ্ছেন। মূর্তির মস্তকের উপরের সর্পছত্রটি ছ'টি ফণা বিস্তার করে আছে।

পাতঞ্জলের মহাভাষ্যে (২/২/২৩) বলরামকে কৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক বলবান বলা হয়েছে। বীরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ও দলপতি বলরাম তাই পূজার আসনে স্থান পেলেন এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য বৃষ্ণি বীরগণও পূজিত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব যুগে বাসুদেব আরাধনা মুখ্য স্থান লাভ করলেও অপরাপর বীরগণও পূজা লাভে বঞ্চিত হন নাই এবং চারজন বৃষ্ণি বীরকে একত্রে আরাধনা করার যে ব্যবস্থা হল, তা ব্যূহপূজা নামে প্রসিদ্ধ। ঘোড়র বলরাম বিগ্রহের ন্যায় দারুমূর্তি বিরল এবং এরূপ বিগ্রহ কোন পৌরাণিক বর্ণনায় অনুপস্থিত। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারের মতে এক সময়ে শ্রেষ্ঠ চারজন যাদব বীরকে দেবতার আসনে স্থান দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা হলেন সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এঁদের মধ্যে সঙ্কর্ষণই অগ্রজ এবং পর্যায়ক্রমে বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে সমষ্টিগতভাবে একজনকে আশ্রয় করে চারজন দেবতার পূজার প্রচলন হয়, যা চতুর্ব্যূহ আরাধনা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এটি হ'ল পঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অন্যতম বিশিষ্ট মতবাদ। অহিবুর্ধ্ন্য সংহিতার (৫।২৯-৩০) মতে সর্বশক্তিমান বাসুদেব সৃষ্টির ইচ্ছায় নিজের মধ্যে নিজেকে বিভাগ করেন এবং এই বিভক্ত রূপ হল সঙ্কর্ষণ। এই ভেদাভেদ অবস্থার ভিতর বাসুদেব—তত্ত্ব নিহিত আছে। "বাসুদেব, ষড়গুণান্বিত ভগবান সঙ্কর্ষণে এই ষড়গুণের জ্ঞান ও বলগুণের প্রকাশ, প্রদ্যুম্ন ঐশ্বর্য ও বীর্যের প্রকাশ, আবার প্রদ্যুম্নকে সৃষ্টি, অনিরুদ্ধকে শক্তি ও সঙ্কর্ষণকে লয়ের দেবতা বলা হয়।"

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বেসনগরে (প্রাচীন বিদিশা) প্রাপ্ত অর্ধভগ্ন প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভ-শীর্ষ হতে প্রমাণ মিলেছে যে, ঐ স্থানে বাসুদেব-কৃষ্ণ, সঙ্কর্ষণ (বলরাম) ও প্রদ্যুম্নের (কামদেব) মন্দির ছিল। একই স্থানে হেলিওদোরাসের ক্ষোদিত লিপি সম্বলিত গরুড়ধ্বজ সহ তালধ্বজ ও মকরধ্বজ চিহ্ন সম্বলিত অর্ধভগ্ন স্তম্ভদ্বয় বলরাম ও প্রদ্যুম্নের মন্দিরের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বাসুদেবের লাঞ্ছন গরুড়, বলরামের লাঞ্ছন তালবৃক্ষ ও মকরধ্বজ হল প্রদ্যুম্নের লাঞ্ছন। মথুরার সন্নিকটে মোরা গ্রামে প্রাপ্ত খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের শিলালিপিতে শকমহাক্ষত্রপ রজুকুলের পুত্র মহাক্ষত্রপ ষোড়াশের রাজত্বকালে তোষা নাম্নী এক রমণী প্রস্তর নির্মিত মন্দিরে বৃষ্ণি বংশীয় পঞ্চবীরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক লুডারস্-এর মতাবলম্বী অনেকে বাসুদেব ও সংকর্ষণ ব্যতীত অন্যান্যদের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন না। অথচ বায়ুপুরাণে মনুষ্য প্রকৃতির পঞ্চবীরের উল্লেখ আছে। শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে চতুর্ব্যূহের প্রথম ব্যক্তি বাসুদেব কৃষ্ণ। কিন্তু রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ও ডঃ জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সংকর্ষণ বাসুদেবের অগ্রজ এবং সেকারণে তাঁর স্থান সর্বাগ্রে। বীরশ্রেষ্ঠ মনুষ্যদেহধারী দেবতা পঞ্চজনের মধ্যে সঙ্কর্ষণ যে প্রথমজন তার প্রমাণ মেলে জৈন গ্রন্থে—"বলদেবপমোথ্খা পঞ্চ মহাবীরা।" নাগরী গ্রামে (চিতোড়গড়ের নিকট) প্রাপ্ত শিলালিপিতে উল্লেখ আছে, —"ভগবভ্যাং সঙ্কর্ষণ—বাসুদেবাভ্যাং" এবং সাতবাহনরাজ তৃতীয় সাতকর্ণির পত্নী

নয়নিকার ননাঘাট শিলালিপিতে ক্ষোদিত আছে, "সংকর্ষণ—বাসুদেবা"। চতুর্ব্যূহ-রূপে পূজা প্রকাশের পর বাসুদেবকে পঞ্চরাত্রে তাঁর বিভবরূপ কল্পনা করা হয়েছে। বিভবরূপের তাৎপর্য হল যে, শ্রীভগবান কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত পার্থিব রূপ গ্রহণ করে মর্তে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং বিভব রূপের এই অবতার 'বলরাম' নামে পূজিত।

সময়ের আবর্তে উত্তর ও পশ্চিম ভারত হতে বঙ্গদেশে বিষ্ণুপূজার প্রচলন ও মূর্তি নির্মাণ শুরু হয়। নবম-দশম শতকে নির্মিত বিষ্ণুমূর্তিগুলির মধ্যে নাগছত্রধারী লোকেশ্বর বিষ্ণু ও ছত্রবিহীন বিষ্ণুবাসুদেব মূর্তি বহুল পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবতঃ এইভাবেই বঙ্গদেশে বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে বলরাম মূর্তির সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। কিন্তু প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের উপাসনা এদেশে যে প্রচলিত ছিল তার কোন প্রমাণ নাই। কৃষ্ণ-সহোদর বলরামকে গোপালকরূপেও দেখা যায়, আবার তিনি কৃষি ও শস্য-ক্ষেত্রের অধিদেবতা। তৎসত্ত্বেও অনন্ত নাগের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই; তাই দেখা যায় যে, বলরামের কর্ণকুণ্ডল একটি এবং অপর কর্ণকুণ্ডলটি নাগরাজ অনন্তের কর্ণে শোভিত; আর সেই সঙ্গে তিনি অহিছত্রধারী। অনেকে 'কাঁধে বারী বলরাম' অর্থে লাঙ্গলকে অনুমান করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে লাঙ্গলের পরিবর্তে তালবৃক্ষ মনে করাই শ্রেয়। তালবৃক্ষের আঘাতে তিনি ধেনুকাসুরকে বধ করেছেন এবং এরূপ একটি মূর্তি গোয়ালিয়র মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। বলরামের পৌরাণিক রূপে দেখা যায় যে, একাধারে মুষল হস্তে ধেনুকাদি বন্য গর্দভকুলকে সংহার করে শস্যক্ষেত্র রক্ষা করে চলেছেন এবং অপরদিকে তিনি লাঙ্গল কাঁধে কৃষি-দেবতার রূপ পরিগ্রহ করেছেন।

বোড়গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বলরাম মূর্তিটি বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ উভয়ের মিলিত রূপ এবং এই মূর্তির বিশেষত্ব হল রাম-কৃষ্ণ উভয়ের শাস্ত্রানুমোদিত আয়ুধসমূহ বলরামের হস্তে শোভিত। নিম কাঠের তৈরী প্রায় ১২ / ১৩ ফুট উচ্চ দণ্ডায়মান দেবমূর্তির মস্তকের উপর ত্রয়োদশ অহিছত্র বিস্তার করে আছে। সম্ভবতঃ বিষ্ণু-বাসুদেবের অহিছত্রের সংখ্যা সাতটি এবং সঙ্কর্ষণের অহিছত্রের সংখ্যা ছটি (পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মূর্তি)। বিষ্ণু-বাসুদেব দশ হাতে দশ দিক রক্ষা করছেন এবং অগ্নিপুরাণ মতে বলরামের চারটি হাত। চতুর্ব্যূহতত্ত্বের মধ্যে বোড়র বলরাম মূর্তির সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। যাদব বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুজনের মিলিত রূপটি ধরা পড়েছে এই মূর্তিতে। অনন্ত শয্যায় শায়িত বিষ্ণুর রূপটির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে হরিবংশে উল্লেখিত নাগরাজ অনন্তের কোলে কিশোর শ্রীকৃষ্ণ এবং নাগরাজ সন্নিধানে পৃথকভাবে বলদেবের অবস্থানের, আর সেই সঙ্গে নাগপ্রীতি বা নাগছত্রের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। বিষ্ণুলোককেশ্বর মূর্তির শিরেও নাগছত্র শোভিত। পুরাণে বলরামের দেহত্যাগের পর তাঁর নাসিকা হতে নাগ নির্গমনের কাহিনীতে তাঁর নাগ স্বরূপতা তথা সম্পর্কের ইঙ্গিত রয়েছে, তাই তাঁর মাথায় নাগছত্র। লাঙ্গলবাহী বলরাম হলেন কৃষিদেবতা এবং নাগ বা সর্প হল উর্বরতার প্রতীক। আলোচ্য দারুমূর্তির চৌদ্দটি হাত দেহভাগের

সঙ্গে খিলানের দ্বারা গ্রথিত। তাঁর হাতে ধরা আছে মুষল, গদা, লাঙ্গল, শঙ্খ, ডমরু, চক্র, পদ্ম এবং অবশিষ্ট হাতগুলি বিভিন্ন মুদ্রায় প্রসারিত। শুভ্র বর্ণের মূর্তিটির ত্রিনয়ন গোলাকার ও ঘূর্ণয়মান এবং মূর্তির উর্ধ্বাংশ পুরুষের এবং নিম্নাংশ প্রকৃতির, যার সমর্থন শ্রীমদ্‌ভাগবতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে মন্ত্রে বলরামের ধ্যান করা হয় তার সঙ্গে মূর্তির কোন মিল খুঁজে পাওয়া না। ধ্যান-মন্ত্রে আছে,—

"ওঁ রেবতী সহিতানন্ত বাসুদেবায় বিদ্মহে হলাদি যুক্তায়
অনন্ত-বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো ভগবান্‌ অনন্ত বাসুদেবায় প্রচোদয়াৎ।"

মন্ত্রে বাসুদেব ও রেবতীর উল্লেখ আছে। ব্যূহদেবতারূপে বাসুদেব বলরামের সঙ্গে একদেহীভূত হয়ে বিরাজমান হলেও পুরাণ বা প্রতিমালক্ষণ গ্রন্থে এবং বোড়র বলরাম মূর্তির পাশে রেবতীকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ধ্যানমন্ত্রটি আসলে প্রকৃতি ও পুরুষের যোগসূত্রের প্রয়াস মাত্র, বাস্তবে যিনি অনুপস্থিত।

বোড়র বলরাম হলেন কৃষিদেবতা। হল বা লাঙ্গল কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে প্রাচীনতম হাতিয়ার, যার প্রচলন আজও বর্তমান। বোড়র বলরামের পৌরাণিক রূপ অপেক্ষা লৌকিক রূপটি জনমানসে অধিক সমাদৃত। সারা বছর ধরে যেভাবে তাঁর পুজো ও উৎসবের অনুষ্ঠান হয় তাতে দেখা যায় যে, এর মূলে রয়েছে কৃষিদেবতার আরাধনা। এতদঞ্চলে বলরাম হলেন বৃষ্টির দেবতা। অনাবৃষ্টির বছরে শস্যনাশের আশঙ্কায় বোড় সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা বলরামের উদ্দেশ্যে 'জলো ভোগ' নিবেদন করেন। দুধকে ঘন ক্ষীরে পরিণত করে দেবতাকে উৎসর্গ করার বিধান আছে এবং ঐ দিন বলরামের লাঙ্গল বা হল নাড়িয়ে দেওয়া হয়। বোড় সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে ঐ দিন হলকর্ষণ বন্ধ থাকে এবং গ্রামস্থ সকলের ধারণা যে, ক্ষীর নিবেদন করলে সুবৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

বলরামের বার মাসের আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বলরাম আরাধনার কোন সম্পর্ক নাই। রাঢ়ের অন্যান্য দেবদেবীর ন্যায় ইনিও একজন লৌকিক দেবতা। এই দেবতার পুজো ও উৎসব অনুষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করলে লৌকিক দেবতার রূপটি ধরা পড়বে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বলরামের স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান হয় এবং মূর্তির গায়ে প্রথমে জল ঢেলে স্নানযাত্রা অনুষ্ঠান-অন্তে অঙ্গরাগ করে নূতনভাবে সংস্কার করা হয়। অক্ষয় তৃতীয়া হতে নৃসিংহ চতুর্দশী বা শুক্লা চতুর্দশী পর্যন্ত মন্দির বন্ধ থাকে। এই সময়ে সেবাইতের বাড়ীতে শালগ্রাম শিলার উদ্দেশ্যে পুজো ও ভোগ হয়। চতুর্দশীর দিন দেবমূর্তির চক্ষুদান উৎসব উপলক্ষে গাজন অনুষ্ঠান শুরু হয়। গাজন ও মেলা উপলক্ষে বোড় সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহেও বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণতঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বলরামের গাজন অন্যত্র অনুষ্ঠিত হয় না বা এ সম্পর্কে কোন পৌরাণিক ব্যাখ্যাও মেলে না। তবে কি বলরাম আদিতে ছিলেন

ধর্মরাজ ? অথবা ধর্মঠাকুরের বেদীতে লোকদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও লোক-উৎসবের ক্ষেত্রে ধর্মপূজার প্রধান বিধি বা পূজার রীতিগুলি লুপ্ত হয় নাই। গাজন উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশ নিম্নবর্ণের মানুষ। একাদশী তিথিতে স্থানীয় মানুষেরা আত্ম-গোত্র পরিত্যাগ পূর্বক বলরাম-গোত্র গ্রহণের পর মন্ত্র পাঠ করেন এবং গলায় উত্তরীয় ধারণ করে বলরামের সন্ন্যাসী হয়। ধর্ম ও শিবের গাজনে একই প্রথা প্রচলিত আছে। সন্ন্যাসীদের পরনে সাদা থান কাপড় এবং দিনান্তে একাদশীর দিন নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন। অতঃপর দ্বাদশীর দিন হবিষ্যান্ন, ত্রয়োদশীতে ফলভোগ এবং চতুর্দশীতে সম্পূর্ণ উপবাস করার প্রথা আছে। পূর্ণিমার দিন মন্দিরের বহির্ভাগে একতলা সমান উঁচু ছাদ হতে সন্ন্যাসীরা নিচের খড়ের গাদার উপর একে একে লম্ফ প্রদান করেন ; এর নাম 'পাটভাঙ্গা'।

চক্ষুদান ও গাজন উৎসবের পর জন্মাষ্টমী, ভাদ্র মাসে অনন্ত চতুর্দশী, বলরামের রামলীলা উৎসব উপলক্ষে লোক সমাগম হলেও কোন মেলা বসে না। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিনে বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে বলরামের বাহান্ন ভোগ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণ-বলরাম হল বৈভবের প্রতীক ; সম্ভবতঃ এ কারণেই এরূপ রাজসিক ভোগের ব্যবস্থা। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথি হতে পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে এবং ১১ দিন ধরে প্রচুর লোক সমাগম হয়ে থাকে। দোলযাত্রার পর পঞ্চমী তিথিতে পঞ্চমদোল বা বলরামের পঞ্চমদোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবাপূজা বন্দোবস্তের জন্য বর্ধমানের রাজ এস্টেট হতে ৩৬৫ দিনের জন্য ৩৬৫ বিঘা ভুমি দান করা হয়েছিল। জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির নষ্ট হয়ে যায় এবং বর্তমানে ঐ সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৯৩ বিঘা। মূল সেবাইতগণের কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁদের দৌহিত্র বংশীয় ছ'জন সেবাপূজার মালিক।

গ্রামের মধ্যস্থলে বলরামজীউর মন্দিরটি অবস্থিত। গ্রামস্থ ভূমিভাগ হতে প্রায় ১৪ ফুট উঁচু এক বিশাল চত্বরের উপর ৮০ × ৬৫ ফুট প্রাঙ্গণের পশ্চিম ভাগে দুটি মন্দির আছে। মূল মন্দিরটির গঠনপ্রণালী পীড়া দেউলের আকৃতির এবং এর অভ্যন্তর ভাগের আয়তন প্রায় ৫০ বর্গফুট এবং উচ্চতা ৪০ ফুট। মূল মন্দিরের প্রবেশ পথটি বাংলা দোচালা আকৃতির। বাংলার চিরায়তন খড়ের চালের ন্যায় ইষ্টক নির্মিত ও চুন-সুড়কী দিয়ে গাঁথা প্রবেশ পথ। বর্তমান মন্দির ২৫০/৩০০ বছরের অধিক পুরাতন নয়। তবে অতীতে কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবায়তনের উপর বর্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে এবং মন্দির সংলগ্ন ভুখণ্ডের দিকে নজর দিলে এ অনুমানের সত্যতা যাচাই করা যাবে। মূল মন্দিরের সংলগ্ন ৮ × ৮' ফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। মন্দির চত্বরের প্রবেশ পথটি (সিংহদরজা) ১৩১৮ সালে ৺রামলাল বসু ও ৺রাজকুমারী দাসীর স্মরণার্থে তাঁদের পুত্র নৃসিংহ বসু কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। প্রবেশ পথের বামভাগে সাদিপুরের

মদনমোহন মন্দিরের অনুরূপ একটি ঘড়িঘর আছে।

যানবাহনের প্রতিকূলতার জন্য পশ্চিমবঙ্গে এরূপ বহু গ্রাম আছে যেগুলিকে আশ্রয় করে লোকদেবতারা অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। যদি বিশেষ যত্ন সহকারে গ্রাম ও দেবতাদের অনুসন্ধান করা যায় তাহলে বঙ্গ সংস্কৃতির বেশ কয়েকটি বিশেষ দিকের আবরণ উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

উখরা

(বহিরাগত সংস্কৃতির সমন্বয়)

অণ্ডাল হ'তে ট্রেন অথবা বাসযোগে সহজেই উখরা (১৮, অণ্ডাল) গ্রামে পেঁছান যায়। যে-কালে অণ্ডালের কোন অস্তিত্ব ছিল না সেই সময়ে ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে উখরার প্রসিদ্ধি ছিল, তবে এই স্থানের খ্যাতি শুরু হয় মেহেরচাঁদ হাণ্ডার আগমনের পর থেকে। তাঁর কন্যা বিষণকুমারী দেবীর সঙ্গে রাজা তিলকচাঁদের বিবাহ হয়েছিল। ফলে মেহেরচাঁদ এতদঞ্চলের জমিদারী লাভ করেন। মেহেরচাঁদ দাঁইহাটে প্রস্তর নির্মিত গোপীনাথ বিগ্রহ উখরায় স্থাপন করেন। গোপীনাথ বিগ্রহের জন্য একটি পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মিত হয়েছিল তাঁর পুত্র বক্তার সিংয়ের আমলে। মন্দিরে ক্ষোদিত শিলালিপি হ'তে এই সকল তথ্য জানা যায়—

"গোপীনাথ বিহার মন্দিরমিদম্ বক্তারসিংহৈ কৃতম্
শকাব্দে'ঙ্ক বসুন্ধরা বসুধয়া নাম পিতৃভ্যাম ততঃ।
সংস্কারোস্য কৃতো রস রস ফনি ক্ষোণী মিতেব্দে
বৈশাখে স চ সপ্তবিংশ দিবসে যাতোদ্য সম্পূর্ণতাম।"

মন্দিরটি বক্তার সিং নির্মাণ করলেও নির্মাণের তারিখ জানা যায় না। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে এটির সংস্কার সাধন করা হয়েছিল। একই মন্দির প্রাঙ্গণে মেরুচন্দ্র রায় নামক কোন এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে সীতারাম মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরে গ্রথিত শিলালিপি হ'তে এর নির্মাণকাল জানা যায়,—

"ভূর্জ তর্ক রস ক্ষোণী মিতে অব্দে চ শিলাময়ম্
রাজন্যঃ শ্রীমেরুচন্দ্র রায়োদাৎ বিষ্ণবে গৃহম্।"

উখরা গ্রামে প্রাচীনতম মন্দির হ'ল শ্যামরায়ের মন্দির। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে ঘনশ্যাম দাস কর্তৃক এই মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে আছে—

"শকাব্দাঃ ১৬০৮ সন ১০৯৩"
"বসু ব্যোমর্তু ভূমূক্তে
শাকে কার্ত্তিক মাসকে।

শ্রীঘনশ্যাম দাসেন
দত্তম্ শ্রীমন্দিরম্ মহৎ।"

উথরায় আরও কয়েকটি জীর্ণদশাগ্রস্ত পাথরের মন্দির আছে—যেগুলির সময়কাল নির্দেশ করা যায় না। দু-একটি মন্দিরের স্থাপত্যরীতি দেখে মনে হয় যে, ইসলামী স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করে এগুলি নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া প্রস্তর নির্মিত দ্বারবাসিনী দেবীর প্রাচীন মন্দিরটি এখনও বিদ্যমান। এই মন্দির কোন সময়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা জানা যায় না, তবে বর্ধমানের রাজারা সেবাপূজার জন্য দেবোত্তরের ব্যবস্থা করেছিলেন। দ্বারবাসিনী মন্দিরের পশ্চাতে রয়েছে নান্দুনী-কান্দুনী নামে ষষ্ঠী দেবীর স্থান। গ্রামের কোন সন্তানের জন্ম হ'লে মাতা ও সন্তানকে কুগ্রহের নজর হ'তে রক্ষা করার জন্য ষষ্ঠীতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। নাটমন্দির সহ দুর্গা মন্দিরটিও বহুকালের। এছাড়া কয়েকটি শিবমন্দির ও প্রস্তর নির্মিত ধর্মরাজের মন্দির রয়েছে। গোপীনাথজীউর স্মরণে রথযাত্রা, গোষ্ঠযাত্রা, রাসযাত্রা, জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে ঝুলনযাত্রা উৎসবটি হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ। বাংলা ১২২০ সাল হ'তে জমিদার স্বর্গীয় শম্ভুনাথ লক্ষ্মণসিং হাণ্ডে মহাসমারোহে ঝুলনযাত্রা উৎসব শুরু করেন। এই উৎসব উপলক্ষে ১৫ দিন ধরে একটি মেলা হয় এবং মেলা ও উৎসব উপলক্ষে প্রচুর জনসমাগম হয়। সমস্ত গ্রামবাসী আন্তরিকতার সঙ্গে ঝুলনযাত্রা উৎসব সম্পন্ন করেন।

উথরার রথযাত্রা উৎসবটিও ঝুলনযাত্রা উৎসবের সমপর্যায়ভুক্ত। নয় চূড়া বিশিষ্ট পিতলের রথটি অব্যবহার্য হয়ে যাওয়ায় স্বর্গীয় শৈলবিহারীলাল হাণ্ডে একটি মনোহর কারুকার্য খচিত নূতন রথ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, নিকটবর্তী অবারপুর নিবাসী রামবল্লভ মিস্ত্রী ৪ বছরে এই রথটি নির্মাণ করেছিল। পিতলের উপর ক্ষোদিত মূর্তিগুলি দেখে মনে করা যায় যে, শিল্পীর প্রাচীন ও নবীন উভয় ধারার শিল্প সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ছিল। রথের সময় গোপীনাথ বিগ্রহ ও রাধিকাকে রথে আরোহণ করিয়ে হাজার হাজার লোক রথ টানায় অংশগ্রহণ করে পুণ্যার্জন লাভ করে। ৭ দিন পর বিগ্রহদ্বয়কে পুনরায় স্ব-মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে। এখানে মহাসমারোহে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে শক্তি পূজার প্রচলন আছে। দুর্গা দেবীর নামগুলিও বড় বিচিত্র—ক্ষ্যাপা দুর্গা, বীজখেকো মা ইত্যাদি। তাছাড়া মা-সন্ন্যাসী, ভয়ঙ্করী ইত্যাদি নামে কালিকা দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। মা-সন্ন্যাসী দেবীকে স্থানীয় বাসিন্দারা অত্যন্ত জাগ্রত দেবী বলে মান্য করেন। কালী পূজায় সাড়ম্বরে বাৎসরিক পূজো ও বহু ছাগ বলি হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, মা-সন্ন্যাসীর মাথার উপর কোন ছাদ নাই।

উথরার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি মোহান্ত অস্থল সম্বন্ধে দু' এক কথা বলা না হয়। বর্ধমান অঞ্চলের মোহান্ত নরহরি দেব তদীয় শিষ্য দয়ারাম দেবকে

উখরায় গোপাল বিগ্রহ স্থাপন করে অস্থল নির্মাণের আদেশ দেন। তাঁরা কীর্তিচাঁদের নিকট হতে ২৫১ বিঘা জমি দেবোত্তর পান। উখরা অঞ্চলের গোপালজীউর মন্দির এবং ১২২০ সালে মোহান্ত মনসারাম দাস বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সারা বছর ধরে নানা তিথিতে বৃন্দাবনচন্দ্রকে ঘিরে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া অস্থলের মধ্যে শ্যামসুন্দরের মন্দিরও রয়েছে। অস্থলের ঝুলনযাত্রা উৎসবটিও মহাসমারোহে পালিত হয়; উখরার মন্দির ও বিগ্রহ নির্মাণের সঙ্গে ভাস্কর পরিবারের সম্পর্ক বিদ্যমান। মেহেরচাঁদ হাণ্ডার আমলে দাঁইহাট হ'তে কয়েকটি ভাস্কর পরিবারকে এখানে নিয়ে আসা হয়। এদের তৈরী বিগ্রহগুলি উখরা ও বঙ্গদেশের বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। শোনা যায় বাংলার বাইরেও এঁরা বিগ্রহ নির্মাণ করে পাঠাতেন।

সুকবি ও কৃষ্ণযাত্রা প্রচলনের জনক নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের জুড়িদার ছিলেন দুর্গাদাস ও দেবীদাস তেওয়ারী নামক যমজ ভ্রাতৃদ্বয়; যাঁরা ছিলেন এখানকার অধিবাসী। তাছাড়া নীলকণ্ঠের দলে উখরায় বনোয়ারীও চুনারীর বেহালাবাদক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। শোনা যায় পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র সরকার নামক এক ব্যক্তি শতরঞ্জ খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এখানকার ১০০ বিঘা আয়তনের শুকাবাঁধ নামক পুষ্করিণীটি আঞ্চলিক ইতিহাসে গৌরবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

উখরা হল প্রাচীন, বর্ধিষ্ণু ও বড় গ্রাম। বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে উখরা পিছিয়ে ছিল না। আশুতোষ স্মৃতিতীর্থের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য দূর-দূরান্ত হতে ছাত্ররা এখানে আসত। অত্র স্থানের ইংরাজী বিদ্যালয়টি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। বিশিষ্ট কবি ও চিকিৎসক ডাক্তার কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এই গ্রামের সুসন্তান।

দিগনগর

মানকর অথবা গুসকরা হতে সরাসরি বাস রাস্তা ধরে দিগনগরে পৌঁছান যায়। অতীতে ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল রূপে দিগনগরের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। বর্গী হাঙ্গামার সময় দিগনগর বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিছুকাল পূর্বে এখানে কয়েকটি প্রস্তর নির্মিত দেবদেবীর বিগ্রহ পাওয়া গিয়েছিল। মনে হয় গোপভুমের রাজাদের আমলে দিগনগরের মন্দিরে এঁরা পূজিত হতেন। গোপভুমের সদ্গোপ রাজবংশের সঙ্গে দিগনগরের সম্পর্ক বহুকালের। শোনা যায় সদ্গোপ রাজা মহেন্দ্রনাথের সময়ে রাণী অমরার নামে অমরারগড়ে রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পরে সদ্গোপ রাজবংশের অন্য এক শরিক দিগনগরে রাজধানী স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকে দিগনগরের পত্তন হয়েছিল।

দিগনগরের প্রাচীন ঐতিহ্যের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদের আমলে হৃত গৌরবের কিছুটা ফিরে আসে। দিগনগরের প্রাচীন কীর্তি

দেখতে হ'লে বাসে আনন্দবাজার স্টপেজে নেমে গ্রামে যাওয়া যায়। অতীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাধান্যের জন্য দিগনগরের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল এবং আনন্দবাজারকে ঘিরে গঞ্জটি গড়ে উঠেছিল। রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে, বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। খাদ্যশস্য, তৈলজাত দ্রব্য, চিনি, গুড়, পশম ও সুতীবস্ত্র—এই গঞ্জের প্রধান বিক্রয় দ্রব্য ছিল। অতীতে এখানে পিতল-কাঁসার দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হত এবং এদের গুণগত মান ছিল অত্যন্ত উন্নত ধরনের। আনন্দবাজারের পাশেই দিগনগরের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টি ঊনবিংশ শতকে স্থাপিত হয়েছিল। বাসস্ট্যাণ্ড হ'তে পূর্বমুখে এগিয়ে গেলে জমিদার কীর্তিচাঁদ রায়ের প্রতিষ্ঠিত হাট-কীর্তিনগরের অতীত গৌরবের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। হাট-কীর্তিনগরে একটি সুন্দর বাঁধান পুকুর আছে। এই পুকুরটির প্রবেশদ্বার বা তোরণটি প্রায় বিনষ্ট হ'য়ে গেছে। পুকুরের চারিদিকে ইটের তৈরী বসবার জায়গা আছে। পুকুরের মধ্যস্থলে বাঁধান চাঁদনিতে পূর্ণিমার রাত্রে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসত এবং শ্রোতারা পুকুরের চারপাশে বসে সঙ্গীত উপভোগ করত। চাঁদনির মধ্যে একটি ফলকে লেখা আছে,—

"বর্ধমানে বাড়ী তোমার মহারাজ দিগনগরে হাট
রাজা রাজবলহো
এই পুরাতন হাভেলি বর্ধমানাধিপতি প্রবল
প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের
প্রতিষ্ঠিত ও দিগনগরও তাঁহার স্থাপিত।
তাঁহার রাজত্বকাল ১৭০১ হইতে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্য্যন্ত
—বঙ্গাব্দাঃ ১১০৮ হইতে ১১৪৭ পর্য্যন্ত।"

জমিদার কীর্তিচাঁদও নেই, আর সেই সঙ্গে চাঁদনিও, তার অতীতের জৌলুস হারিয়েছে। চাঁদনি হ'তে গ্রামে যাওয়ার পথে চতুর্ভুজা দুর্গার শিখর দেউলটি একটি পুষ্করিণীর তীরে অবস্থিত। এই দেউলের কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই। তবে স্থাপত্য-রীতি দেখে অনুমান করা যায় যে, এটি অষ্টাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। দেউলের অভ্যন্তরে চতুর্ভুজা দুর্গাদেবীর মহিষমর্দিনী রূপের পাষাণ মূর্তি স্থাপিত আছে এবং তার পার্শ্বে অখিলেশ্বরী নামে চামুণ্ডা মূর্তি নিত্য পূজিত হন। ভাদ্র মাসে অনন্ত চতুর্দশীতে অখিলেশ্বরীর বিশেষ পূজা হয়। আশ্বিন মাসে মহানবমীর দিন বৈকালে ও কার্তিক মাসে অমাবস্যায় চতুর্ভুজা দুর্গার পূজা ও বলিদান অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামস্থ দেউড়ী ব্রাহ্মণ পরিবার হ'ল দেবীর পূজারী ও সেবাইত।

গ্রামের মধ্যস্থলে জগন্নাথবাড়ী নামক ঠাকুরবাড়ী আছে। একটি দালান মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিরাজমান। কীর্তিচাঁদ রায়ের আমলে নির্মিত জগন্নাথ-দেবের আদি মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় মহারাজা বিজয়চাঁদের আমলে এই নূতন মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। এখানে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব জাঁকজমক সহকারে

পালিত হয়। মন্দিরের পাশে একটা আচ্ছাদনের নীচে সুউচ্চ কাঠের রথটিকে সারা বছর রেখে দেওয়া হয়। জগন্নাথ মন্দির থেকে একটু পূব দিকে এগিয়ে গেলে একটি চারচালা মন্দির দেখা যাবে। এই মন্দিরের মধ্যে বাঁকুড়া রায় নামক ধর্ম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বাঁকুড়া রায়ের দেয়াসী হলেন ছুতোর পরিবারের লোকেরা। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, বাঁকুড়া রায়ের মূর্তিটি কূর্ম মূর্তি বা প্রচলিত ধর্মশিলার অনুরূপ নয়। একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর খোদিত, এটি কোন যোগীমূর্তি বলে মনে করা যায়। বাঁকুড়া রায়ের মূর্তির পাশে রয়েছে সর্বাঙ্গসুন্দর প্রস্তরের উপর ক্ষোদিত একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। বাঁকুড়া রায়ের গাজন উৎসব শুরু হয় দশহরার দিন এবং জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিন গাজনের সমাপ্তি। গ্রামের মধ্যে বুড়োরায়, সুন্দররায় ও স্বরূপনারায়ণ নামে ধর্মশিলা আছে। গ্রামস্থ 'পোড়ার গড়ে'র বটতলায় গাজনের সময় চার ধর্মঠাকুরের মিলন ঘটে। এছাড়া ধারাপাড়ার ধর্মের গাজন অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। রথতলায় একটি মন্দিরের মধ্যে মহাপ্রভুর সেবাপূজা হয়। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে রক্ষাকালীর পূজা হয়। শোনা যায়, সাধক কমলাকান্ত এই রক্ষাকালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু এর সত্যাসত্য নির্ণয় করা বড়ই দুষ্কর। গ্রামের দেবদেবীর পূজা ও বিশেষ উৎসব উপলক্ষে রথ ও স্নানযাত্রার মেলা এবং ফাল্গুন মাসের শিবরাত্রির মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দিগনগর একটি বর্ধিষ্ণু ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। অতীতে সংস্কৃত চর্চার জন্য— এখানে কয়েকটি চতুষ্পাঠী ছিল। দিগনগরের গালা শিল্প—কাঁসা পিতলের ন্যায় একসময়ে উল্লেখযোগ্য লোকশিল্পে পরিণত হয়েছিল; কিন্তু বর্গী হাঙ্গামার পর দিগনগরের পূর্ব গৌরব একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, এই স্থানে মারাঠারা একটি শিবির স্থাপন করায় দিগনগর সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নবাব আলীবর্দী খানের পক্ষে মুস্তাফা খাঁ ও রাজা জানকী-রাম দিগনগরের শিবিরে ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে সন্ধির প্রাথমিক কথাবার্তার আলোচনা শুরু করেন এবং তাঁদের কথায় আস্থা স্থাপন করে ভাস্কর পণ্ডিত মানকরা যাত্রার পর অনুচরবৃন্দ সহ নিহত হন।

নবগ্রাম

গুসকরার ৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে পালি গ্রামের সন্নিকটবর্তী নবগ্রামের অবস্থিতি। গ্রামের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করলেও মুসলমানেরা হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে এখানে একটি এক গম্বুজ-বিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। গ্রামের মধ্যে একটি ইদগাহ আছে এবং তথায় নমাজ পড়া হয়। মাদার পীরতলায় দানশা দরবেশ নামক এক বিদেশী

ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সমাধি আছে। শোনা যায়, গ্রামের লোক তাঁকে খাঁদা ফকির বলত। দানশা দরবেশ রাজস্থানের ফুলেরা হ'তে এখানে এসেছিলেন এবং স্বদেশে ফিরে যাননি। প্রতি বৎসর মহরমের সময় মরশিয়া পালিত হয়। অতীতে নবগ্রামে যাত্রা ও লেটো গানের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। একালেও ষাটের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিরা কোন না কোন সময়ে যাত্রা অথবা লেটো দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই গ্রামের হরেন বিগ নামক এক ব্যক্তি সুনামের সঙ্গে নবরঞ্জন অপেরায় অভিনয় করতেন এবং তিনি 'হরেন রাণী'—উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সাহিত্য রসিক প্রয়াত মহম্মদ খোদাদাদ ছিলেন এই গ্রামের অধিবাসী।

নবগ্রাম হ'তে মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে কিছু বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে এই গ্রামের অধিবাসী নজরুল রহিমের প্রত্যক্ষ সাহায্যে। বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে মুসলমান সমাজের বিবাহের রীতি-নীতি ও লৌকিক আচরণ নবগ্রাম হ'তে সংগ্রহ করা হয়েছে। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানগুলি তাঁদের ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়, কিন্তু লৌকিক আচার-আচরণগুলির (শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বাদ দিলে) হিন্দুদের বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে অনেক জায়গায় মিল রয়েছে। বর্ধমান জেলায় হিন্দুদের বিবাহ রীতিতে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের প্রভাব খুবই সংক্ষিপ্ত। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, মুসলমান সমাজেও মুসলিম শাস্ত্রের ভূমিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

পাত্র-পাত্রীর নির্বাচনের পর বিবাহের দিন স্থির হয় এবং বিবাহের দিনক্ষণ স্থির হলে শুভদিন দেখে লগন অনুষ্ঠান হয়। লগন অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট কোন সময় নেই ; তবে বিবাহের ৩ দিন হতে ৭ দিনের মধ্যে লগন অনুষ্ঠান হয় লৌকিক প্রথামতে। লগন হ'ল পাত্রের বাড়ী থেকে পাত্রীর ব্যবহারযোগ্য বস্ত্রাদিসহ নানাপ্রকার দ্রব্য পাত্রীর বাড়ীতে পাঠান হয়। মোটামুটিভাবে ১০ খানি শাড়ি পাঠাবার রীতি আছে, তম্মধ্যে ৮ খানি পাত্রীর, ১ খানি পাত্রীর মায়ের ও ১ খানি ধাত্রীমায়ের জন্য। এছাড়া নিত্‌কনে ও পাত্রীর চুল বাঁধার জন্য আরও ২ খানি শাড়ি দিতে হয়। লগনের দ্রব্যাদির সঙ্গে আলতা রাঙা ঝুড়িতে মাছ, ডাব, দই, কলা ও মিষ্টি প্রেরণ করা হয় এবং দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যে, ঐ সকল দ্রব্যাদি যেন পাড়াপড়শীদের মধ্যেও বিতরণ করা যায়। লগনের দিন বৈকালে পাত্রীকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে আঙ্গিনায় বসান হয় —এর নাম 'মুখদেখা' অনুষ্ঠান। আঙ্গিনায় পাত্রীর সামনে কিছুটা চিনি রাখা হয়। পাত্রপক্ষের লোকেরা সামান্য একটু চিনি মুখে দেওয়ার পরে পাত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, সঙ্গে ছোট সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে পাত্রী একটু চিনি তার মুখে দেয়। মুখ দেখার জন্য পাত্রীকে দর্শনী দিতে হয়। গ্রামে যাঁদের অধিক সামর্থ্য আছে তাঁরা অলঙ্কার দিয়ে থাকেন। এই অনুষ্ঠানের শেষে দেবর সম্পর্কিত ব্যক্তিরা পাত্রীর হাতে রেশম সুতো বেঁধে দেয় নূতন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে। লগনের দিন পাত্রীর গায়েহলুদ হয়। একই দিনে পাত্রের বাড়ীতে গায়েহলুদ অনুষ্ঠান হয়।

এই দিন সধবা মহিলারা একজন কুমারী মেয়ে সহ কিছু চাল নিয়ে ঢেঁকিশালে যায় এবং সকলে ঢেঁকির উপর চাপে। পাত্রের বোন অথবা বৌদি নূতন শাড়ি পরে একটি নূতন কুলাতে সিঁদুর দিয়ে সেই চাল ঢেঁকির গর্তে রাখে এবং পাড় দিতে থাকে। ঐ চালের গুঁড়ি দিয়ে পিঠে তৈরী করে আইবুড়োভাত খাওয়ার রাত্রে খেতে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানটিকে ঢেঁকিমঙ্গলা বলা হয়।

ঢেঁকিমঙ্গল অনুষ্ঠানের দিন হ'তে বিবাহের পূর্বদিন পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় পাত্রকে বাড়ীর আঙিনায় বসিয়ে মেয়েরা পায়স খাওয়ায়। অনুরূপ অনুষ্ঠান পাত্রীর বাড়ীতেও হয়। পাড়াপ্রতিবেশীরাও এই অনুষ্ঠানে সানন্দে দল বেঁধে যোগদান করেন। ঢেঁকিমঙ্গলার দিন হ'তে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ীর আঙিনায় গানের আসর বসে। বিয়ের আনন্দ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বছরের পর বছর ধরে মেয়েরা মুখে মুখে তৈরী করেছে বিয়ের গান। এই গানের মধ্যে একদিকে কন্যা বিদায়ের দুঃখের সুর যেমন ফুটে ওঠে অপরপক্ষে পাত্রের বাড়ীতে নবাগতাকে বরণের জন্য আনন্দ অনুভূতি-পূর্ণ সঙ্গীত গাওয়া হয়। পশ্চিম মঙ্গলকোট ও আউলগ্রাম থানার মুসলমান মা বোনেরা ঢোল বাজিয়ে গান গাইতে বেশ পটু। এঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে বিয়ের আসরে সঙ্গীতচর্চা করে আসছেন। আবার অনেকে সঙ্গীত ছাড়াও বাজনার তালে তালে নৃত্যেও পারদর্শিতা দেখিয়ে থাকেন। বাড়ীর উঠানে ঢোল বাজিয়ে দলবদ্ধভাবে যে সকল সঙ্গীত পরিবেশিত হয় তার দুই একটা নমুনা দেওয়া গেল,—

কারা নিয়ে যাবে গো বেটিকে
রঙীন পালকি সাজিয়ে
কার জন্য করলাম গো মানুষ
তেল কাজল পরিয়ে।
যারা দিয়েছে বাকসো ভরা লগন
তারা নিয়ে যাবে বেটিকে।

আবার অনেক সময় পাত্র—পাত্রীর চেহারার তুলনা করে গান গাওয়া হয়,—

বাঁশের পাতা চিকণ চাকণ
জামের পাতা হেরো
এত সুন্দর রাধিকা আমার
কৃষ্ণ কেন কালো।

অনেক সময় পাত্রের সমর্থকেরা গেয়ে উঠে,—

কালো নয়রে কালো নয়
কালো জগতের আলো।

লগনের দিন থেকে বিবাহের পূর্ব দিন পর্যন্ত পাত্রপাত্রীকে নিজ নিজ বাড়ীতে স্নানের আগে তেল হলুদ মাখান হয়। আবার আইবুড়ো ভাতের দিন তেল হলুদের

সঙ্গে ময়দার 'রূপটান' মাখান হয়। এইদিন দুপুরে উভয়ের বাড়ীতেই 'শিরতেল' নামে একটি অনুষ্ঠান হ'তে দেখা যায়। পাত্র ও পাত্রীর বাড়িতে পাড়ার মেয়েরা একত্রে জড়ো হ'য়ে তাদের মাথার উপর নিজ নিজ হাত একের পর এক রাখে। কোন নিকট আত্মীয়া হাতের উপর তেল ঢেলে দিলে ঐ তেল গড়িয়ে পাত্র বা পাত্রীর মাথার উপর পড়ে। পাত্র বা পাত্রী আঙিনায় যে চৌকিটির উপর বসে থাকে তার নীচে একটি কাঁসার থালায় পাঁচপোয়া চাল, পাঁচ সিকে মুদ্রা, একটি পান ও সুপুরি রাখা হয় এবং এই সামগ্রীগুলি নাপিতের প্রাপ্য। অনুষ্ঠানের পূর্বে ২টি কাঁসার ঘড়ায় জল ভরে তার উপর আম্রপল্লব রাখা হয়। 'শিরতেল' অনুষ্ঠানের শেষের দিকে পাত্র ও পাত্রীকে বৃত্তাকারে ঘিরে হাতে তালি বাজিয়ে গান গাওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষে অংশ-গ্রহণকারী প্রত্যেকটি মেয়েকে তেল ও খই-মুড়ি বিতরণ করা হয়। শিরতেলের দিন রাত্রে আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠান হয়। তক্তপোষের উপর কার্পেট বা অন্য কোন মূলবান চাদর বিছিয়ে তার উপর পাত্র বা পাত্রীকে বসান হয়। পাত্র ও পাত্রী নূতন পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে এইস্থানে বসে পায়স খায়। এই জায়গাটির নাম 'আলমতালা'। পায়স খাওয়ার পর নানা ধরনের দামী ও মুখরোচক খাবার আসে।

বিবাহের দিন বরযাত্রীর দল পাত্রকে নিয়ে দুপুরের দিকে পাত্রীর বাড়ী পেঁছায়। বিবাহের দিন দুপুরে প্রধানতঃ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করা হয়। পাত্র পক্ষের নির্বাচিত উকিল পাত্রীর নিকট 'দেনমোহরে'র উল্লেখ করে তিনবার পাত্রীকে এই বিবাহে সম্মতির কথা জিজ্ঞাসা করেন। পাত্রীর সম্মতি লাভের পর উকিল ও তিনজন সাক্ষী বিবাহের মজলিসে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে পাত্রী অসম্মতি জ্ঞাপন করলে কিন্তু বিবাহ হবে না। অতঃপর মৌলবী সাহেব মুসলমান শাস্ত্র হ'তে কিছু শাস্ত্রবাক্য পাঠ করে পাত্রের সম্মতি জানতে চান। শাস্ত্রমতে মৌলবী সাহেব হ'লেন বিবাহ বন্দনের উপযুক্ত ঘোষণাকারী। মৌলবী সাহেব মজলিসের সমস্ত মানুষকে জানিয়ে দেন যে, নবদম্পতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল এবং তাদের সুখ, সমৃদ্ধির জন্য আল্লার কাছে 'মোনজাত' করেন অর্থাৎ প্রার্থনা করেন। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলেই মিষ্টিমুখ করেন। হিন্দুদের বিবাহের সময় পাত্রপাত্রীর 'শুভদৃষ্টি' বিনিময় হয়; কিন্তু মুসলমান সমাজে এই প্রথা চালু নেই। তবে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের শেষে পাত্রকে পাত্রীর ঘরে নিয়ে এসে উভয়কে পাশাপাশি বসান হয় এবং বউদি অথবা বন্ধু স্থানীয় কোন মহিলা আয়নায় পাত্রকে পাত্রীর মুখ দর্শন করায়। মুখ দর্শন অনুষ্ঠানের পর উভয়পক্ষের গুরুজনেরা এসে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেন।

বিবাহ অনুষ্ঠানের পরদিন পাত্র পাত্রীকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে যায় এবং এই সময়ে পাত্রীর বাড়ীর কোন মহিলা তার শ্বশুর বাড়ীতে যায়। মুসলমান সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানে ফুলশয্যার প্রথা চালু নেই, তবে মেয়েটি শ্বশুর বাড়ীতে তিন দিন বসবাস করার পর চতুর্থ দিন নবদম্পতি মেয়ের বাপের বাড়ী চলে আসে। এই সময়ে

পাত্রকে তার শ্বশুর বাড়ীতে অন্ততঃপক্ষে ৮ দিন থাকতে হয়। একে অষ্টমঙ্গলা বলে। এই প্রথা কেবলমাত্র বর্ধমানের মুসলমান সমাজের মধ্যেই প্রচলিত রয়েছে। বর্ধমান ব্যতীত বীরভুম, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুরে সামান্য কিছু আচার অনুষ্ঠানের পার্থক্য থাকলেও সকলেই মোটামুটি একই প্রথা মেনে চলে। ঊনবিংশ শতকে ওয়াহাবি ফারাজি আন্দোলনকারীরা মুসলমান সমাজ থেকে ইসলাম ধর্মের বহির্ভূত আচার-অনুষ্ঠান তুলে দেওয়ার জন্যে আন্দোলন করেছিলেন ; কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা যে লৌকিক রীতিনীতি বা লোকধর্ম বিবাহ পদ্ধতিতে মেনে চলেন তাঁরা পুরাতন প্রথাকে ত্যাগ করতে রাজি হননি। মুসলমান সমাজের মহিলাদের মনে সংস্কার আছে যে, বিবাহের সময় সমস্ত লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান পালন না করলে নবদম্পতির অমঙ্গল হ'তে পারে ; তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শাস্ত্রীয় অনুমোদন না থাকলেও লোকধর্মে বিশ্বাসী মহিলারা চিরাচরিত লৌকিক প্রথা আজও পালন করে চলেছেন। লোকধর্মে হিন্দু মুসলমানের কোন ভেদাভেদ নেই।

মুসলমান সমাজে পরদা প্রথা চালু থাকলেও তাঁদের বিবাহের গান উপলক্ষে বহু মহিলা শিল্পী খ্যাতি লাভ করেছিলেন। অনেকেই সুকণ্ঠের অধিকারিণী, আবার অনেকের হস্তনৈপুণ্যে ঢোল যেন কথা বলে চলেছে! প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে নবগ্রামের প্রয়াত সাকিনা বেগম সংগীত ও বাদ্যে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর পিত্রালয় ছিল বীরভুম জেলার দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত শাহাপুর গ্রামে। তাঁর যোগ্যা শিষ্যা নবগ্রামের মেয়ে শ্রীমতী শাহানারা বেগম নৃত্য ও গীতে অত্যন্ত পারদর্শিনী। শ্রীমতী শাহারানা বেগম বিবাহের গানের আসরে হারমোনিয়ম সহযোগে সুর দিতেন। শাহারানা বেগমের কনিষ্ঠ ভগিনী শ্রীমতী মনোয়ারা বেগম বর্ধমান শহরে বসবাস করলেও বিবাহের গানের অনুশীলন ত্যাগ করেননি। এছাড়া এই গ্রামের শ্রীমতী আম্বাজান বেগম, শ্রীমতী রাইমা বেগম ও শ্রীমতী ফেরদৌসী খাতুন প্রমুখ মহিলারা আজও গান গেয়ে বিবাহের আসরকে মাতিয়ে রাখেন। আশা করা যায় যে, এই সংগীতের ধারা আরও বহুকাল ধরে অক্ষুণ্ণ থাকবে।

রূপান্তরের পথে

(গ্রাম হতে শহরে রূপান্তরিত দু'টি মহানগরীর ইতিকথা)

"আড্ডা" নামে কোন শহর অঞ্চলের পরিচয় পেলে মনের মধ্যে বেশ কৌতূহল জাগে, কিন্তু কৌতূহলের অবসান মিটে যাবে যদি "ADDA"-র পরিবর্তে লেখা হয়, "Asansol Durgapur Development Authority". আসানসোল ও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল নিয়ে আড্ডা গঠিত হয়েছে। আড্ডার রুক্ষ ও অরণ্য-সঙ্কুল অঞ্চলের দক্ষিণ

ভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে দেবনদ দামোদর। দামোদরের তীরে রাঢ়ের প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যায় এবং এতদঞ্চলের বসতির ইতিহাসের অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে, অধিকাংশ প্রাচীন গ্রামে আদিম জনবসতির নিদর্শন রয়েছে। এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ও গ্রামনাম হ'তেও সেকথা প্রমাণিত হয়। ১০০ বছর পূর্বে রানীগঞ্জ মহকুমার একমাত্র খ্যাতি ছিল কয়লাখনির জন্য এবং কালো হীরের দৌলতে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী হাওড়া হ'তে প্রথম যাত্রীবাহী রেলগাড়ীটি রানীগঞ্জে পেঁছায়। আরও ২/৩ বছরের মধ্যে আসানসোল পর্যন্ত রেলপথটির সম্প্রসারণ ঘটেছিল। আসানসোল পল্লীটি শহরে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান অবদান হল রেলকর্মচারীদের বসবাসের ফলে সৃষ্ট রেলওয়ে কলোনি। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে আসানসোলের পরিচয় ছিল গ্রাম হিসাবে এবং ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে জনগণনার পর গ্রামটি একটি সাধারণ শহরে পরিণত হয় এবং ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে শহরটি পৌরসভার আওতায় আসে (Asansol was constituted as Municipality in 1896 and the Municipal Board consists of nine Commissioners, the area within Municipal limit is 3·73 square miles)।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে রানীগঞ্জ হ'তে মহকুমা সদর কার্যালয়টি আসানসোলে স্থানান্তরিত হয়। অপরপক্ষে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গভীর শাল অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত দুর্গাপুরের পরিচিত ছিল একটি গণ্ডগ্রাম রূপে। আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং তৎসহ ভারত সরকার ও কলম্বো পরিকল্পনা মিশনের উদ্যোগে ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভারতের তৃতীয় ইস্পাত কারখানাটি শাল অরণ্যের মধ্যে স্থাপনের ফলে অরণ্যের গ্রামীণ সত্তাগুলি হারিয়ে একটি আধুনিক শহরে পরিণত হয়েছে। শিল্প ও খনি অঞ্চলের মধ্যে আসানসোল ও দুর্গাপুর শহরের অবস্থিতি হলেও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির প্রাচীন ধারা ও লোকধর্মের ঐতিহ্যের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়।

(১)

বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে আসানসোল মহকুমার সদর কার্যালয় আসানসোল শহরটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কয়লাখনি ও রেলপথ সম্প্রসারণের ফলে গ্রাম হ'তে শহরে পরিণত হয়েছে। গ্রান্ট ট্রাঙ্ক রোড ও রেলস্টেশনকে ঘিরে রেলওয়ে কলোনি গড়ে উঠেছে এবং রেলওয়ে কলোনি হ'ল শহর আসানসোলের আদিরূপ। কলিকাতা ও হাওড়া ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের যে কোন শহরের সঙ্গে তুলনা করলে আসানসোলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। সম্প্রতিকালে আসানসোল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে নিয়ে একটি 'Municipal Corporation' গঠন করা হয়েছে।

আসানসোল স্থাননামটি এসেছে আসন নামক বৃক্ষ হতে ও সোল বা শুলী শব্দের অর্থ নিম্নভূমি ; তাহ'লে স্থাননামের অর্থ হ'ল, যে নিম্নভূমিতে আসন গাছের বাহুল্য আছে। একালে একটিও আসন গাছ খুঁজে না পাওয়া গেলেও গ্রামনামের প্রাচীন

স্মৃতিচিহ্নটি আসানসোলের মধ্যে ধরা আছে।

আসানসোলের গ্রামীণ সংস্কৃতি বিকাশের কেন্দ্রস্থলে আছেন অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঘাগরা চণ্ডী। নুনিয়া নদীর তীরে একটি বিশাল বৃক্ষের নীচে ৩টি ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডে ঘাগরা চণ্ডী বা ক্ষ্যাপা বুড়ী নামে তিনি পূজিতা হন। দেবীর আবির্ভাব সম্পর্কে জনশ্রুতি হ'ল এই যে, আসানসোলের অধিবাসী কাঙাল চক্রবর্তী নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দেবী চণ্ডিকার ধ্যানে শিলা তিনটিকে সেবাপূজো করতে আদেশ দিয়েছিলেন। কাঙাল চক্রবর্তী স্বপ্নে তাঁকে ঘাগরা পরিহিতা অবস্থায় দেখেছিলেন বলে এতদঞ্চলে তিনি ঘাগরা চণ্ডী নামে খ্যাত। সম্ভবতঃ দেবী আদিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের আরাধ্যা দেবী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশের ফলে আদিবাসীদের দেবী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। ঘাগরা চণ্ডীকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যেই স্বপ্নাদেশটি প্রচারিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে কেলেজোড়া গ্রামে টিলাবুড়ি ইত্যাদি দেবীরা চণ্ডীর ধ্যানে পূজিতা হলেও তাঁদের পূজোয় সাঁওতাল আদিবাসীদের যোগদানের তাৎপর্য হ'ল দেবী আদিতে ছিলেন এদেরই। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ বাৎসরিক প্রজা উপলক্ষে বহু জনসমাগম হয়। এ সময়ে যজ্ঞ, মানত ও বলিদান সহ দেবীর পূজো আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এই যে, ঘাগরা বুড়ি সন্তুষ্ট হ'লে মৃতবৎসা, বন্ধ্যাত্ব ও বসন্ত রোগ নিরাময় হ'য়ে থাকে।

হটন রোডে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে রাখাল চক্রবর্তী নামে একজন তান্ত্রিক সাধক দক্ষিণা কালীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। দেবী পূর্বে একটি কুঁড়েঘরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু মায়ের কৃপায় আসানসোলের যুধিষ্ঠির গরাই-এর একমাত্র পুত্র দুরারোগ্য ব্যাধি হ'তে মুক্তি লাভ করায় তিনি ইঁটের মন্দির নির্মাণ করে দেন। কালীমন্দিরের কাছে একটি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির ছিল। এই মন্দিরটি বিনষ্ট হওয়ায় ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে নির্মিত মন্দিরে দামোদর জীউর শালগ্রাম বিগ্রহ ভরদ্বাজ বংশীয় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক নিত্য পূজিত হচ্ছে। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে আগুরী পাড়ায় একটি দালান মন্দিরে দেবী কালিকার বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং বিসর্জনের পর সারা বছর ধরে কাঠামোটিকে পূজো করা হয়। কালীমন্দিরের পশ্চিমে নাটমন্দির সহ নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মহাসমারোহে নীলকণ্ঠেশ্বরের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। নমো-পাড়ায় বৈশাখী পূর্ণিমাতে ধর্মরাজের গাজন উৎসবটিও বহুকালের। নিকটবর্তী সাতা পল্লীতে ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরটি ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। শ্মশানে নির্জন পরিবেশের মধ্যে তন্ত্র সাধনার পক্ষে উপযুক্তস্থলে দেবী ছিন্নমস্তা প্রতিষ্ঠিতা আছেন। মাঘী-পূর্ণিমায় দেবীর উদ্দেশ্যে পূজো ও বলিদান সহ বিশেষ উৎসব হ'য়ে থাকে। হস্পিটালের নিকট জি. টি. রোডের কালীবাড়িতে শতাধিক বৎসর পূর্বে কালিকা দেবীর বিগ্রহ ও একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। শিবরাত্রির সময় জাঁকজমক সহকারে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

রেল লাইন পার হয়ে গোবিন্দদাস সাধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রেলপারের

শিবমন্দির। স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে গোবিন্দদাস একটি শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হন এবং শিবলিঙ্গটি এইখানেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া রাধানগর পল্লীতে একটি কালীবাড়ী আছে। আসানসোলের কল্যাণেশ্বরী আশ্রম ও বিমলা সেবা সংঘ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কালী-বাড়ীটিও বহুকালের। পম্মবাঁধের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির, জি· টি রোডে রাধাগোবিন্দ মন্দির, হরিবোল মন্দির, শ্মশান কালী মন্দির, সত্যনারায়ণ মন্দির প্রভৃতি আসান-সোলের দর্শনীয় বস্তু। কেবলমাত্র মন্দির প্রতিষ্ঠাই নয়, এখানে বিংশ শতকের প্রথম-ভাগে খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী রেলকর্মচারীদের জন্য গীর্জা ও শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রেল-স্কুলের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। বৈষ্ণব মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে রাস, ঝুলনযাত্রা ও দোল উপলক্ষে সাড়ম্বরে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর জেলেপাড়ায় শ্রাবণ মাসে মনসা মন্দিরে মাটির মনসা মূর্তি তৈরী করে পুজো করা হয়।

এ তো গেল ধর্ম ও সংস্কৃতির কথা, আসানসোল শহর পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। শিল্পনগরী আসান-সোলকে ঘিরে রেলওয়ে, কয়লাশিল্প, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, কাঁচ শিল্প সহ অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান এই অঞ্চলের মানুষকে জীবিকার উপায় অবলম্বনের সন্ধান দিয়েছে। এছাড়া শহরে রয়েছে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

(২)

ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে দুর্গাপুর শিল্পনগরী একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। একালের দুর্গাপুরকে বলা হয় ভারতের "রুঢ়"। সমগ্র শিল্পাঞ্চলটি 'দুর্গাপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি' নামে পরিচিত। মহকুমা-সদরশহর দুর্গাপুর তিনটি থানা এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছে। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে 'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন'-এর অধীনস্থ দুর্গাপুর ব্যারেজের কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদঞ্চলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। অতীতের জঙ্গলমহলের অন্তর্গত দুর্গাপুর, বেনাচিতি ও ভিরিঙ্গি গ্রামকে ৫0 বছর পূর্বে যাঁরা দেখেছেন, বর্তমানকালে তার সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পাবেন না।

আধুনিক শিল্পশহর হিসাবে খ্যাতি লাভের পূর্বেও ১৯0৫ খ্রীস্টাব্দে বার্ণ এণ্ড কোম্পানির উদ্যোগে স্টেশন সংলগ্ন স্থানে একটি টালির কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। দুর্গাপুরের নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহের খাত হ'তে বিভিন্ন আকারের পাথরের নুড়ি সরবরাহের ব্যবসাটিও বহুকালের। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকার ও ইস্কনের যৌথ উদ্যোগে বিশাল লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কারখানা গড়ে ওঠে। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন 'দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেডে'র ভিত্তি স্থাপিত হ'লে এতদঞ্চলে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে ব্যাপকভাবে শিল্পোন্নয়ন বৃদ্ধি পায়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বড় বড় কারখানা ব্যতীত অসংখ্য মাঝারি ও ক্ষুদ্র কারখানায় কয়েক লক্ষ লোক নিযুক্ত আছেন। শ্রমশিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বাসস্থানের

জন্য সমগ্র দুর্গাপুরকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। দুর্গাপুরকে নিয়ে একটি আদর্শ শিল্পনগরীরূপে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ছিল শুরু থেকেই তাই নগর উন্নয়নের সমস্ত রকম প্রচেষ্টার নিদর্শন এখানে দেখা যায়। শিল্পনগরীরূপে গড়ে ওঠার সময় অরণ্য অধ্যুষিত ও ল্যাটেরাইট ভূখণ্ডের মধ্যে ১৩টি গ্রামের জনসাধারণকে আদি বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে যে সকল গ্রাম শিল্পনগরীর আওতাভুক্ত হয়েছিল সেগুলি হল—মেজেডিহি, সুজড়া, মোহনপুর, যগুরবাঁধ, ধনাড়া, পুনাবাদ, কমলপুর, ওয়ারিয়া, রাতুড়িয়া, অঙ্গদপুর, পুড়ষা, পিয়ালা, ফরিদপুর ইত্যাদি। এছাড়া আরও কয়েকটি মৌজাকে আংশিকভাবে অধিগ্রহণ করার ফলে সমগ্র শিল্পনগরীর আয়তন হ'ল ১৬.২২৫ একর। জঙ্গলাকীর্ণ একটি বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শিল্পনগরী স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায়ের স্বপ্ন সফল হয়েছে সত্য, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দুর্গাপুরের কলকারখানার উৎপাদন ব্যবস্থা দেখে হতাশ হ'তে হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে উপরাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ দুর্গাপুর ব্যারেজ উদ্বোধন করেছিলেন এবং ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর স্বাধীন ভারতের রূপকার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ইস্পাত কারখানার উৎপাদন একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চালু করেন। দুর্গাপুরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ব্যতীত যে সকল সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে ভারতের আধুনিক অর্থনীতি ব্যবস্থায় ঐগুলির গুরুত্ব অসীম। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনাভুক্ত দামোদর নদের উপর দুর্গাপুরে কংক্রিট ও ইস্পাতের বাঁধ দিয়ে খালপথে বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার কৃষিতে সবুজ বিপ্লব ঘটান হয়েছে। কলকারখানা স্থাপন ও নগরোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য ও পরিবহন ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। দুর্গাপুরের প্রধান সমস্যা হ'ল পরিবেশ দূষণ ও বাসস্থানের অভাব। প্রায় লক্ষাধিক লোক যত্রতত্র নিজেদের আবাসস্থলের জন্য অপরিকল্পিত ভাবে বাড়ী ঘর তৈরী করার ফলে কর্তৃপক্ষ বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অসীম। এ তো গেল আধুনিক শিল্পনগরীর কথা। যে গ্রামটিকে কেন্দ্র ক'রে শিল্পনগরীটি স্থাপিত হয়েছে তার পূর্ব ইতিহাস খুঁজতে হ'লে আরও ২৫০ বছর পিছিয়ে যেতে হবে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাঁকুড়া জেলার জগন্নাথপুরবাসী গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় দুই পুত্র ও এক কন্যা সহ দুর্গাপুরের সন্নিকটবর্তী নডীহা গ্রামে বসবাসের নিমিত্ত আসেন।

মৃত্যুকালে গোপীনাথ নডীহা গ্রামের ভূ-সম্পত্তি তাঁর এক মাত্র কন্যা আনন্দময়ীকে দান করে যান এবং তাঁর দৌহিত্র মুখোপাধ্যায় বংশ আজও নডীহা গ্রামে বসবাস করছেন। গোপীনাথের কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাচরণের নামে দুর্গাপুর গ্রামটির নামকরণ হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। দুর্গাচরণের সময়েই বসতবাটি ও জমিদারি সেরেস্তা

দুর্গাপুরে স্থানান্তরিত হয়। দুর্গাচরণ গৃহদেবতা কালিকাদেবীর ও মহাদেবের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ২টি মন্দিরের নির্মাণকার্য একসঙ্গে শুরু হ'লেও শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা ফলক হ'তে জানা যায় যে, ১৭১৫ শকাব্দে (১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে) দুর্গাচরণ দেবশর্মা কর্তৃক মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে কালিকাদেবীর মন্দিরটির নির্মাণ-কার্য শেষ হ'তে আরও ১২ বৎসর সময় লেগেছিল। এইভাবেই জঙ্গলের মধ্যে শুরু হ'ল একটি গ্রামপত্তন। এবং উত্তরকালে এই গ্রামটিকে ঘিরে মহানগরী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লোকসংস্কৃতির বিচিত্র ধারা

অকালপৌষ (১০৬ : কালনা*) : বৈঁচি রেলস্টেশন হ'তে অথবা কালনা হ'তে ৯ কিলোমিটার পশ্চিমে বাসযোগে অকালপৌষ গ্রামে যাওয়া যায়। বিপ্লবী অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ (১২৭৬-১৩৩০ সাল, কার্তিক মাস) ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র ভারততত্ত্ববিদ বটকৃষ্ণ ঘোষের জন্মস্থানরূপে এই গ্রামের প্রসিদ্ধি আছে। স্বদেশী আন্দোলন ও প্রচারের যুগে অরবিন্দপ্রকাশ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত থাকা-কালীন গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনের কথা বলে ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতেন। বাংলা সবাক চলচ্চিত্রের প্রথম যুগের চিত্র পরিচালকরূপে প্রসিদ্ধ দেবকীকুমার বসু ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

অগ্রদ্বীপ (১১২ : কাটোয়া) : বিশেষ বিবরণ ১৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অট্টহাস (৮৫ : কেতুগ্রাম) : তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে অট্টহাস নামক শাক্তপীঠের প্রসিদ্ধি রয়েছে ২টি গ্রামকে কেন্দ্র করে। প্রথমটি হ'ল কেতুগ্রামের সন্নিকটে ও দ্বিতীয়টির অবস্থিতি হ'ল বীরভূম জেলার লাভপুরে। কেতুগ্রাম হ'তে ১·৫ কিলোমিটার দূরে বহুলা বা বকুলা নদীর তীরে অবস্থিত মড়াঘাট শ্মশান এবং মড়াঘাটে নদী পার হ'য়ে আরও ১ কিলোমিটার হাঁটাপথে এগিয়ে গেলে একটি নির্জন বৃক্ষগুল্ম আচ্ছাদিত স্থানের মধ্যে মন্দিরে দেবী বিরাজমানা। পীঠ-নির্ণয় গ্রন্থ অনুসারে স্থানটি হ'ল অট্টহাস নামক শাক্তপীঠ। এই জাগ্রত মহাপীঠের শক্তিদেবী ফুল্লরা ; কিন্তু তাঁর ভৈরব বিল্বনাথ রয়েছেন নিকটবর্তী বিল্বেশ্বর গ্রামে। দেবীমূর্তি বিনষ্ট হলে ঘট ও যন্ত্রে দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে আরাধনা করা হয়। জয়দুর্গার ধ্যানমন্ত্রে পীঠদেবীর পূজা হয় এবং প্রত্যহ শিবাভোগ হয়।

অণ্ডাল (৫২ : অণ্ডাল) : বর্ধমান হ'তে আসানসোলের পথে একটি বড় রেলওয়ে জংশন স্টেশন। অণ্ডাল শহরটি প্রধানতঃ রেলকর্মচারীদের বসবাসের কলোনীরূপে গড়ে উঠেছিল। অণ্ডালের নিকটবর্তী কয়েকটি কয়লাখনির অবস্থিতির জন্য শহরের গুরুত্ব অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অণ্ডাল ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি প্রাচীন গ্রামকে ঘিরে এই অঞ্চলের সংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে।

অবুঝহাটী (১১১ : জামালপুর) : হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে জৌগ্রাম স্টেশন হতে তিন কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবুঝহাটি গ্রামের গোঁসাই ঢিবিতে পালযুগের প্রস্তর নির্মিত হর-পার্বতীর যুগল মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

অভিরামপুর (৯৮ : আউসগ্রাম) : গুসকরা রেলস্টেশন হ'তে পাকা সড়কপথে

* স্থাননামের পর বন্ধনীর মধ্যে মৌজা নম্বর ও থানার উল্লেখ আছে।

বাসযোগে মানকরের দিকে এগিয়ে গেলে অভিরামপুর গ্রামে পৌঁছান যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই গ্রামটি নন্দগ্রাম নামে উল্লিখিত। সম্ভবতঃ অভিরাম গোস্বামীর নামানুসারে গ্রামের নাম অভিরামপুর হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও গদাধর পণ্ডিতের শাখা-সন্তান ধ্রুবানন্দের শ্রীপাটরূপে গ্রামটি বিখ্যাত। ধ্রুবানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল শিবানন্দ। ধ্রুবানন্দ বৃন্দাবন হ'তে রাধা ও অনুরাধা সহ বিজয়গোবিন্দ বিগ্রহ আনিয়ে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি যে, গয়া যাত্রার সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব শিবানন্দের গৃহে পদার্পণ করেছিলেন।

অমরপুর (৭৩ ঃ জামালপুর) ঃ বর্ধমান-তারকেশ্বর বাস রাস্তায় অমরপুরে খেয়াঘাটে নেমে দামোদর পার হ'য়ে গ্রামে পৌঁছান যায়। এখানে একটি জীর্ণদশাগ্রস্ত মন্দিরে অভয়াদেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। শারদীয়া নবমী তিথিতে বলিদান সহ ষোড়শোপচারে অভয়াদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বৈশাখী পূর্ণিমাতে ধর্মপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে জয়চণ্ডীপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসার ঝাঁপান ও মহাপ্রভুর ভোগ উৎসব অনুষ্ঠান গ্রামের ধর্মসংস্কৃতির গৌরব বৃদ্ধি করছে।

অমরারগড় (৮৮ ঃ আউসগ্রাম) ঃ আঞ্চলিক ইতিহাসের ধারার সঙ্গে জাতিতত্ত্বের প্রাচীন কাহিনী গড়ে উঠেছে অমরারগড়ের ইতিহাস ও কিম্বদন্তীকে অবলম্বন করে। অমরারগড়, ভালুকি, দিগনগর, কাঁকশা ও ভরতপুরে এক সময়ে সদ্গোপ জাতির ঐতিহ্য ছিল এবং পরবর্তীকালে এতদঞ্চলের সম্ভ্রান্ত সদ্গোপগণ পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। অধিকাংশ সদ্গোপ গোষ্ঠী নিজস্ব পরিচিতির সঙ্গে গোপভূমের সদ্গোপ জমিদার বংশের সম্পর্ক গড়ে তুলে তাঁরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেন।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত গোপভূমের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। তবে প্রামাণ্য ইতিহাসের পরিবর্তে কিম্বদন্তী বা লোককথা হ'ল প্রবল। মানকর রেলস্টেশন হ'তে তিন কিলোমিটার এগিয়ে গেলে অমরারগড়ে পৌঁছান যায়। স্থানটির নামকরণ প্রসঙ্গে জনশ্রুতি এই যে, সদ্গোপ রাজা মহেন্দ্রনাথের পত্নী অমরাবতীর নাম অনুসারে রাজধানীর নাম হয়েছিল 'অমরারগড়'। মহেন্দ্রনাথ তাঁর রাজধানীকে সুরক্ষিত করার জন্য একটি গড় নির্মাণ করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, মহেন্দ্রনাথের রাজ্য কাটোয়া হ'তে পঞ্চকোট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে কাটোয়ার সন্নিকটবর্তী খাজুরডিহি গ্রামে উগ্রক্ষত্রিয় জমিদার জগৎ সিংহের গৃহ হ'তে বলপূর্বক দশভুজা সিংহবাহিনী মূর্তি নিয়ে এসে অমরারগড়ে প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবী শিবাখ্যা নামে বিখ্যাত। মহেন্দ্রনাথ ও এই বংশের পরবর্তী রাজাদের বীরত্ব কাহিনী অবলম্বনে দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩১৯ সালে 'শিবাখ্যা কিঙ্কর' কাব্য রচনা করেন। গ্রামস্থ একটি মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত একটি পঞ্চরত্ন মন্দিরের নারায়ণের শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

অমরারগড় গ্রামটিও যেমন প্রাচীন তেমনি এর পুরাকীর্তির প্রচুর নিদর্শন রয়ে গেছে। গ্রামদেবতা বুদ্ধেশ্বর শিব একটি শিখরদেউলে অধিষ্ঠিত আছেন। গ্রামের দক্ষিণ

প্রান্তে একটি আটচালা মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এই মন্দিরের পাশেই রয়েছে শিবাখ্যা দেবীর দালান মন্দির। আশ্বিন মাসের মহানবমীর দিন দেবীকে গ্রামের উত্তরভাগে জঙ্গলের মধ্যে 'রাজবাড়ী' নামক স্থানে এক দিনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় সাঁওতাল আদিবাসীরা দেবীর নিকট ছাগ বলি দেয় এবং তৎপরিবর্তে বলিকৃত মহিষটি তারা আহারের নিমিত্ত লাভ করে। মনে হয় শিবাখ্যা দেবীর সঙ্গে সুদূর অতীতকালে আদিবাসী সমাজের যোগাযোগ ছিল। রাজবাড়ীর কিছুটা দূরে সাঁওতালদের 'ছাতার পরব' অনুষ্ঠান হয় এবং 'ছাতার পরব' উপলক্ষে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের মধ্যস্থলে রায় উপাধিধারী সদ্গোপ পরিবারের নির্মিত ১০টি মন্দির আছে। তন্মধ্যে ৬টি আটচালা শিবমন্দির ও ২টি শিখরদেউলে বারমাস শিবের নিত্যপূজা হয়। পঞ্চরত্ন শিবের মন্দিরটি টেরাকোটা অলংকরণে সুসজ্জিত এবং একই মন্দির চত্বরের মধ্যে একটি এক বাংলা মন্দির আছে। প্রায় ৮০ বৎসরের প্রাচীন ক্ষীরোদবিহারী রায় মহাশয়ের নিকট জানা যায় যে, তাঁর ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ গোকুলকৃষ্ণ রায় উপরোক্ত মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মন্দির চত্বরের বহির্ভাগে একজোড়া আটচালা মন্দির ও একটু দূরে অপর একটি আটচালা মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। সাঁওতাল পাড়ায় প্রাচীন গৃহের ধ্বংসাবশেষটি রাজবাড়ী নামে পরিচিত। গ্রামের মধ্যে অবস্থিত দুর্গামণ্ডপটির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য অত্যন্ত মনোরম। অমরারগড়ের সদ্গোপ রাজাদের গৌরব ও রাজ্যপাট বিনষ্ট হয়েছে, কিন্তু গড়ের কিছু কিছু অংশের অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান।

আউরিয়া (৬২ঃ কাটোয়া)ঃ শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গুরু কেশব ভারতীর জন্মস্থানরূপে আউরিয়া গ্রামের প্রসিদ্ধি। কেশব ভারতী ছিলেন শংকরাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী এবং "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা"র মতে তিনি ছিলেন মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। শ্রীচৈতন্যদেবের অগ্রজ বিশ্বরূপও কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা নিয়ে স্বামী শঙ্করারণ্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আউরিয়ার ভারতী পরিবার হ'লেন কেশব ভারতীর ভ্রাতার বংশ; মাঘ মাসের ভীম একাদশী তিথিতে তাঁর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা হয় এবং বিভিন্ন স্থান হ'তে আগত কীর্তনীয়ার দল হ'ল উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। মেলা উপলক্ষে একটি স্থানীয় ছড়া আছে—

> "ওরে চল রে চল আসল জায়গায় চল।
> আউরিয়াতে কেশবের জন্মভূমে
> দেখবি কত হরিনামের দল॥"

বৈষ্ণব সাহিত্যে বৃন্দাবন দাস, কেশব ভারতীর প্রতি যে ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তা অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়,—

> "কেশব ভারতী পদে কোটি নমস্কার
> অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ শিশুরূপ যার।"

গ্রামের মধ্যে বাণলিঙ্গ শিব ও ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

আউসা (২৮ : মেমারি) : বর্ধমান-কালনা রাস্তা অথবা শক্তিগড় রেলস্টেশন হ'তে উত্তরমুখে হাঁটা পথে এই গ্রামে যাওয়া যায়। এখানে গোপালজীউ বিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রামের একাংশ 'গোবিন্দর ঘাট' নামে পরিচিত। কমলাকান্তের রচিত "সাধকরঞ্জন" পুঁথিতে আছে,—

"শ্রীপাদ গোবিন্দ ঘাট গোপালের স্থান।
প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাজন॥"

আউসা গ্রামে কিছুকাল পূর্বে তাম্রাশ্মীয় যুগের কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ এই বিষয়ে অধিকদূর অগ্রসর হ'ন নাই।

আকন্ধারা (৪৭ : কাঁকসা) : আকন্ধারা গ্রামের খ্যাতি শুরু হয়েছিল এখানকার জমিদার গুরুচরণ রায়ের আমলে। গুরুচরণের পুত্র তারাচরণ প্রাসাদতুল্য গড়বাড়ী, লক্ষেশ্বর, রামেশ্বর, ভুবনেশ্বর ও বাণেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া লক্ষ্মী-জনার্দন ও কালীমন্দিরটি তাঁর আমলে নির্মিত হয়েছিল।

আকাইহাট (২৫ : কাটোয়া) : দাঁইহাট স্টেশনে নেমে ২·৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে রিক্সাযোগে বৈষ্ণব শ্রীপাট আকাইহাটে যাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী ও নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কালাকৃষ্ণদাসের শ্রীপাট আছে, যা পাটবাড়ী নামে খ্যাত।

এই স্থানে কালাকৃষ্ণদাসের সমাধি আছে, কিন্তু গোপীনাথ বিগ্রহ বর্তমানে কড়ুই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত। পাবনা জেলার সোনাতলা গ্রাম হ'তে আসার সময় তিনি গোপীনাথ বিগ্রহ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের 'শাখা নির্ণয়' গ্রন্থ হ'তে জানা যায় আকাইহাটে রঘুনন্দনের পায়ের নূপুর যে স্থানে পড়েছিল তা নূপুরকুণ্ড নামে খ্যাত। ফাল্গুন মাসে এখানে বারুণী উৎসব পালিত হয়। কবি গঙ্গারাম দত্তর 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' হ'তে জানা যায় যে, বর্গীরা এই গ্রামের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছিল।

আখড়া (৯৯ : কাটোয়া) : দাঁইহাট স্টেশন হতে ২·৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে আখড়া গ্রামের অবস্থিতি। এই গ্রামে প্রস্তর নির্মিত সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠিত আছেন। কালীপূজা ও প্রতি অমাবস্যায় বলিদান সহ জাঁকজমক সহকারে বিশেষ পূজা হয়। চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব হয়। গ্রামে একটি প্রাচীন শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

আঝাপুর (২০ : জামালপুর) : মেমারি অথবা মশাগ্রাম রেলস্টেশন হ'তে আঝাপুর গ্রামে পৌঁছান যায়। জনশ্রুতি যে, গ্রামের পূর্বনাম ছিল রাজাপুর, যা অপভ্রংশে আজাপুর বা আঝাপুরে পরিণত হয়েছে। এতদঞ্চলের জনপ্রবাদ আছে, সদ্গোপ রাজা শালিবাহনের রাজধানী ছিল আঝাপুর গ্রামে। আঝাপুরের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী সাতদেউলিয়া গ্রামের কোন যোগাযোগ ছিল, তাই একালে সাতদেউলিয়া-আঝাপুর

বলে পরিচিত। গ্রামের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ঢিবি আছে এবং এটি কোন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বলে অনুমান করা হয়। এই ধ্বংসস্তূপ থেকে যে বিষ্ণুমূর্তিটি পাওয়া গেছে সেটি আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। গ্রামে মিত্র পরিবারের শিব মন্দিরটি ব্যতীত আরও ৩টি শিবমন্দির আছে। মন্দিরগুলি টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত এবং এদের নির্মাণকাল ঊনবিংশ শতকে। সুপ্রসিদ্ধ কবি তরু দত্ত, ঐতিহাসিক ও সুদক্ষ প্রশাসক স্যার রমেশচন্দ্র দত্তের পৈত্রিক বাসস্থান ছিল এই গ্রামে। সাহিত্যিক কৃষ্ণধন দে ও ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

আদরা (৭৮ : গলসী) : গলসী থেকে বাসযোগে সরাসরি আদরা গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি যে অত্যন্ত প্রাচীন তার অন্যতম প্রমাণ হ'ল মল্লসারুল তাম্রশাসনে এই গ্রামের উল্লেখ আছে। মল্লসারুল তাম্রশাসনে 'অধকরক' স্থানের উল্লেখ হ'তে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন যে, এটি আধুনিক আদরা হতে অভিন্ন। একালে মৌজা নাম আদরা হ'লেও গ্রামনাম আদরাহাটি নামে পরিচিত। গ্রামের মধ্যে একটি উঁচু ভূখণ্ডের উপর আদরেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত। এই শিবলিঙ্গের বিশেষ বৈচিত্র্য হ'ল মূর্তির রুদ্রভাগে একটি দেবমূর্তি ক্ষোদিত আছে। সেই কারণে এরূপ শিববিগ্রহ মুখলিঙ্গ শিব নামে শিল্পশাস্ত্রে বর্ণিত হয়। অনুরূপ একটি মূর্তি-ক্ষোদিত শিবলিঙ্গ এই গ্রামেই পাওয়া গিয়েছিল, যা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, মূর্তি-ক্ষোদিত শিবলিঙ্গ বহু প্রাচীনকালে পূজিত হ'ত —সেই হিসাবে গ্রামটি অত্যন্ত প্রাচীন বলে মনে হয়। শিবলিঙ্গের পাশে একটি প্রস্তর নির্মিত জয়দুর্গা দেবীর মূর্তি আছে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মহাসমারোহে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোস্বামী পরিবারের আরাধ্য দেবতা রাধাগোবিন্দের মহোৎসব হয় কার্তিক মাসে। বেনে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির দু'টি অষ্টাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। দত্ত পরিবারের পঞ্চরত্ন বিষ্ণুমন্দিরে কোন দেববিগ্রহ নেই। মুখার্জী পরিবারের পঞ্চরত্ন শিবমন্দিরের সম্মুখভাগ টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত। মন্দিরের সম্মুখভাগে একটি টেরাকোটার মিথুনচিত্র স্থাপিত আছে।

আনুখাল (১০৪ : কালনা) : কালনা শহর হ'তে ৫ কিলোমিটার বাসযোগে পশ্চিম মুখে এগিয়ে গেলে আনুখাল গ্রামে পৌঁছান যায়। গ্রামটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু। গ্রামের মধ্যে অবস্থিত বহু মন্দির আছে, যেগুলি পুরাকীর্তির উল্লেখযোগ্য নিদর্শনস্বরূপ। মজুমদার পরিবারে অষ্টধাতু নির্মিত জয়দুর্গা বিগ্রহের নিত্য সেবাপূজা হয়। এখানকার জয়দুর্গা পূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল দেবীর গাজন অনুষ্ঠান। গাজন উপলক্ষে বহু জনসমাবেশ হয় ও একটি মেলা বসে। গ্রামের চড়ক উৎসবটিও অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

আমগাড়িয়া (৩০ : কেতুগ্রাম) : বল্লাল সেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে উল্লিখিত 'আম্রগর্ত্তিকা' হ'ল একালের আমগাড়িয়া। কুমারপুর রেলস্টেশন হ'তে কিছুটা

হাঁটাপথে এগিয়ে গেলে এই গ্রামে যাওয়া যায়। প্রায় ৪ ফুট উচ্চ রাধাকৃষ্ণের দারুমূর্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে, যা 'রাধামাধব' নামে খ্যাত। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে রাধামাধবজীউর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলাটি বহুকাল ধরে চলে আসছে। রাধামাধব মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত জগন্নাথদেবের নিত্যপূজা হয়।

আমডাঙ্গা (৭৭ ঃ কাটোয়া) ঃ চাণ্ডুলি গ্রামের কাছে ব্রহ্মাণী নদী পার হ'য়ে আমডাঙ্গায় পৌঁছান যায়। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকরূপে খ্যাত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরজীবনে স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধি লাভ পূর্বক আমডাঙ্গায় আশ্রম স্থাপন করে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। মূল মন্দিরের মধ্যে স্বামিজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। আশ্রম হ'তে কিছুটা উত্তরে রয়েছে একটি নীল-কুঠির ভগ্নাবশেষ। নীলকুঠির চৌবাচ্চাগুলি ও চৌবাচ্চার অভ্যন্তরে গাঁথা ২৪টি লোহার প্লেটে ১৫০ বৎসরের মধ্যে মরিচা ধরে নাই।

আমাইপুর ঃ বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থমতে বর্ধমান শহরের সন্নিকটবর্তী আমাইপুরা গ্রামের অবস্থিতি ছিল। এ কালে গ্রামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেকের মতে বর্ধমান থানায় রায়ান গ্রামের নিকটে রামাইপুর হ'ল অতীতের আমাইপুরা। এখানে "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থের রচয়িতা ও গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য জয়ানন্দ মিশ্রের জন্মভূমি। শ্রীচৈতন্যদেব পুরী হ'তে প্রত্যাবর্তনের পথে কোন এক জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁর ছাত্র তথা জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে পদার্পণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব সুবুদ্ধি মিশ্রের শিশুপুত্রের নামকরণ করেন "জয়ানন্দ"। অনেকের মতে সুবুদ্ধি মিশ্র ও জয়ানন্দ ছিলেন গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য।

আমাদপুর (২৮ ঃ মেমারি) ঃ মেমারি রেলস্টেশন হ'তে ২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে বেহুলা নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থানরূপে আমাদপুরের খ্যাতি। ঊনবিংশ শতকে ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙালীর স্বনির্ভরতার পরিচয় দিয়ে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন এই গ্রামের মহেশচন্দ্র চৌধুরী। তিনি স্বগ্রামে বহু অর্থ ব্যয় ক'রে আনন্দময়ীর মন্দির, অতিথিশালা, সুবৃহৎ জলাশয়, ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। গ্রামে ২০টি টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত প্রাচীন মন্দির আছে ; তন্মধ্যে গোপাল মন্দিরের প্রসিদ্ধি সর্বাপেক্ষা অধিক। গ্রামস্থ খাঁ-পুকুরের পশ্চিম পাড়ে দক্ষিণমুখী এই শিখরদেউলটি মহাকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ১৫ ফুট ও উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট। বর্তমানে মন্দিরটি কিছুটা মাটিতে বসে গেছে। শিখরের বিন্যাস ত্রিরথাকৃতির ; অবৈজ্ঞানিকভাবে সংস্কারের ফলে টেরাকোটা অলংকরণগুলি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মন্দিরের ক্ষয়প্রাপ্ত শিলালিপিটি হ'তে জানা যায় যে, এটি ১৪৯৪ শকাব্দ বা ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে মন্দিরটি একবার সংস্কার করা হ'য়েছিল। ষোড়শ শতকে নির্মিত বঙ্গদেশে যে কয়টি মন্দির অবশিষ্ট

আছে তম্মধ্যে এটি অন্যতম।

আমারুন (**৯৯ : ভাতাড়**) : বর্ধমান শহর হ'তে বাস অথবা ট্রেনে আমারুন স্টপেজে নেমে কিছুটা পূর্ব দিকে এগিয়ে গেলে গ্রামে পৌঁছান যায়। ক্ষ্যাপা কালীর অধিষ্ঠানের জন্য গ্রামটির খ্যাতি। হুগলী জেলার 'পিরোলের' ন্যায় এখানেও ক্ষ্যাপা কালীর বালা দেওয়া হয়।

আলমপুর (৪০ : কাটোয়া) : কাটোয়া হ'তে দক্ষিণ দিকে বাসযোগে এই গ্রামে যাওয়া যায়। তরিতরকারীর বাজারে অত্যন্ত সুস্বাদু আলমপুরের ডাঁটার প্রথম চাষ হয় এই গ্রামে। সুপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ বৈকুণ্ঠনাথ সেন এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহুজনহিতকর কার্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ পঞ্চাননের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এখানে একটি মেলা হয়।

আলিপুর (**২১৬ : মেমারি**) : দেবীপুর রেলস্টেশনের দক্ষিণে হ'ল আলিপুর গ্রামের অবস্থিতি। ১২১২ বঙ্গাব্দে শ্যামাপূজার রাতে সাধককবি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এখানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেবীপুর স্টেশনের উত্তর-পূর্বভাগে একটি আম-বাগানের মধ্যে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে শ্যামামায়ের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এখানেই ছিল নীলাম্বরের সাধনপীঠ বা যোগপীঠ। স্থানীয় লোক নীলাম্বরকে 'ছোট রাম-প্রসাদ' বলে আখ্যা দিয়েছিল।

আসানসোল : পশ্চিমবঙ্গের যে কোন অঞ্চলের সঙ্গে রেলপথ বা সড়ক পথে আসানসোল মহকুমার সদর শহর আসানসোলে যাওয়া যায়। রেলপথে হাওড়া ও বর্ধমান হতে আসানসোলের দূরত্ব যথাক্রমে ২০০ কিলোমিটার ও ১০৫ কিলোমিটার। (বিশেষ বিবরণ ২০৫ পৃষ্ঠা)

আহিরা (**৮০ : মেমারি**) : মেমারি-মন্তেশ্বর বাস-রাস্তায় ঝিকড়া স্টপেজ নেমে ১ কিলোমিটার হাঁটাপথে গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামে টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত শিবমন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল ১৭৮০ শকাব্দ বা ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-লিপি হ'তে নির্মাতা ও মিস্ত্রীর নামও জানা যায়,—

"শ্রীশ্রীশিব শকাব্দ ১৭৮০ শক
সৃষ্টিধর ঘোষ
মিস্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ।"

আহিরা গ্রামে চৈত্র মাসে মহাসমারোহে মনসা পূজা হয়। পূর্বে দেবী গ্রামের মুচীপাড়ায় অধিষ্ঠিতা ছিলেন, কিন্তু চামড়ার গন্ধে অতিষ্ঠ হ'য়ে সাতগাছিয়া গ্রামে কোন যুগী পরিবারের বাড়ীতে চলে যান এবং যুগীরা দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে। কিন্তু চৈত্র মাসে বাৎসরিক উৎসবের সময় মনসা দেবীকে চতুর্দোলায় চাপিয়ে মহাসমারোহে সাতগাছিয়া হ'তে আহিরা গ্রামে নিয়ে আসা হয়। ঐ দিন পূজা-অন্তে প্রসাদ ও স্নানজল বিতরণের পর ব্রাহ্মণের অনুমতি নিয়ে রন্ধনের জন্য ঘরে ঘরে আগুন জ্বালান হয়। চৈত্র মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয় কেবলমাত্র একজন

সন্ন্যাসীর দ্বারা। গ্রামের রামনবমী উৎসবটিও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

ইছাবাছা (**১৮৯** ঃ মেমারি) ঃ দেবীপুর রেলস্টেশনের সন্নিকটে ইছাবাছা গ্রামের অবস্থিতি। প্রায় ৩০০ বছর ধরে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে ধর্মরাজের 'জাত' উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ইটা (**১৩০** ঃ মঙ্গলকোট) ঃ কৈচর হ'তে বাস-রাস্তায় ইটা গ্রামের স্টপেজে নেমে কিছুটা দক্ষিণে এগিয়ে গেলে গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের দক্ষিণ ভাগে এক-স্থানে ৯ ইঞ্চি উচ্চ একটি গরুড় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মূর্তিটির সম্পর্কে বিশেষ কোন খবর জানা যায় নাই। গ্রামের মধ্যস্থলে টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত অষ্টকোণবিশিষ্ট একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। অতীতে এই স্থানে দ্বাদশটি শিব মন্দির ছিল, তম্মধ্যে ৩টি চারচালা ও ২টি আটচালা এবং অবশিষ্ট ৭টি ধ্বংস-প্রাপ্ত মন্দিরের ভিত্তিবেদী দেখা যায়। মন্দিরগুলি ১০ ফুট × ১০ ফুট আয়তনের এবং উচ্চতা হ'ল প্রায় ১৫ ফুট। রায়চৌধুরী পরিবারের এলাইচণ্ডীর ১০ ইঞ্চি উচ্চতা-বিশিষ্ট প্রস্তর মূর্তিটির নিত্যসেবাপূজা হয়। উক্ত পরিবারের একটি খড়ের চালের মন্দিরে একদিকে রয়েছেন শ্যামরায় ও অপর একটি কক্ষে মহিষমর্দিনী, তারা, সিংহবাহিনী, মঙ্গলচণ্ডী ও দক্ষিণাকালীর যন্ত্র রক্ষিত আছে। রায়চৌধুরী পরিবারের আদি পুরুষ গঙ্গাধর রায় বীরভূম জেলার শাহশিলামপুর হ'তে এখানে এসেছিলেন। গ্রামের দক্ষিণাংশে পীরের আস্তানায় গ্রামস্থ সকলে পীরের নিকট মানত করেন। দোলতলায় রাজদোল উপলক্ষে প্রতি বৎসর মেলা বসে।

ইন্দ্রাণী ঃ বিশেষ বিবরণ ৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ইরকোনা (**১০৩** ঃ গলসী) ঃ সাঁকো হ'তে গলসীগামী বাসে অথবা গলসী স্টেশন হ'তে আদ্রাহাটি যাওয়ার পথে ইরকোনা গ্রামের অবস্থিতি। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে রাধাকৃষ্ণের বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে বৈষ্ণব প্রভাবিত উৎসবটিতে যোগদানের জন্য গ্রামবাসীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলাটিও আকর্ষণীয়।

ইলসরা (১২৬ ঃ জামালপুর) ঃ জৌগ্রাম রেলস্টেশন হ'তে ৩ কিলোমিটার পূর্বে ইলসরা নদীর তীরে ইলসরা গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামের প্রান্তে নদী তীরবর্তী স্থানে বাবুসাহেব, পীরসাহেব, বদরসাহেব ও বড় পীরসাহেব নামে ৪টি পীরের আস্তানা আছে। এই গ্রামের উত্তরে শালমূলা গ্রামে শালিবাহন নামে এক রাজা ছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। ইলসরা গ্রামে রায় বংশের কুলদেবতা কৃষ্ণরায়ের দোল উৎসব জাঁকজমক সহকারে রামনবমীতে অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র মাসে গাজন উৎসবও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা সাড়ম্বরে ঈদ উৎসব পালন করে। গ্রামস্থ একটি প্রাচীন মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং শিবরাত্রিতে বিশেষ উৎসব পালিত হয়। গ্রামের মধ্যে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহের সদর দরজাটি বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। কারণ এই দরজাটির উচ্চতা হ'ল প্রায় ৩০ ফুট যা একালে দেখা যায় না।

প্রসিদ্ধ শল্যচিকিৎসক প্রয়াত ডাক্তার শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইলসরা গ্রামের বাসিন্দা এবং যিনি বর্ধমানের বিধান রায় নামে খ্যাত ছিলেন।

উখরা (অণ্ডাল) ঃ বিশেষ বিবরণের জন্য ১৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উজানি-কোগ্রাম (৫৮ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ও পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্মস্থানরূপে খ্যাত উজানি-কোগ্রামের উল্লেখ রয়েছে মঙ্গলকাব্যে। তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত উজানি হ'ল একটি শাক্তপীঠ এবং এখানে দেবী মঙ্গলচণ্ডী ও ভৈরব কপিলাম্বর অধিষ্ঠিত আছেন। উজানি ও কোগ্রাম দুটি পৃথক স্থান হলেও একালে কেবলমাত্র কোগ্রামের অস্তিত্ব আছে। শোনা যায় কোগ্রামের প্রাচীন নাম ছিল সুগ্রাম, কিন্তু লোচনদাসের পত্নী তাঁর স্বামীর নিকট হ'তে সুব্যবহার না পাওয়ায় তিনি এই গ্রামকে কুগ্রাম আখ্যা দিয়েছিলেন, যা অপভ্রংশে কোগ্রামে পরিণত হয়েছিল। মঙ্গলচণ্ডী মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে লোচনদাসের শ্রীপাটে তাঁর সমাধি রয়েছে। অজয়-কুনুর নদের সঙ্গমস্থলের পশ্চিমে অবস্থিত মহাশ্মশানটি খড়্গমোক্ষণ নামক পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিচিত ছিল। গ্রামের পাশে মারগড়া নামক স্থান সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে, ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয়া পত্নী খুল্লনা ছাগল চরাবার সময় এখানে ভাত রেঁধে মাড় গালিয়ে ফেলতেন। কুনুর ও অজয়ের সঙ্গমস্থলে ছিল ভ্রমরাদহ—উজানির বণিককুল ভ্রমরাদহে বাণিজ্য তরণীগুলি নোঙর করে রাখত। মঙ্গলচণ্ডী-মন্দিরের অনতিদূরে উঁচু ঢিবিটিকে শ্রীমন্তের ডাঙ্গা বলা হয়। ধনপতি সাধুর পুত্র শ্রীমন্ত সিংহল যাত্রার প্রাক্কালে এইখানে মহামায়ার পূজা করেছিলেন। মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরের মধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তিটি পুরাকীর্তির অন্যতম নিদর্শন। বহুকাল পূর্বে এই স্থানে ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। গঙ্গামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা দ্বিজ কমলাকান্তের নিবাস ছিল উজানি-কোগ্রামে। অবসরপ্রাপ্তির পর কবি কুমুদরঞ্জন আমৃত্যু এই গ্রামে বসবাস করেছিলেন। কবির গৃহে বহু সাহিত্যিকের পদার্পণ ঘটেছিল। এ-কালে অখ্যাত গ্রামরূপে গণ্য হলেও এক সময়ে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রসারের ফলে উজানির খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

উড়ো (১৩৭ ঃ গলসী) ঃ বর্ধমান হ'তে জি. টি. রোড ধরে সরাসরি উড়ো গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের একটি দালান মন্দিরে রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত জয়দুর্গা বিগ্রহের নিত্যসেবা পূজা হচ্ছে। মূর্তিটির ৮ হাত ও সিংহোপরি অধিষ্ঠিতা মহিষমর্দিনীর পাষাণ মূর্তি। বোধনবমী হতে বিজয়া দশমী পর্যন্ত দেবীর পূজোর-উৎসব ও অনুষ্ঠানগুলি হ'য়ে থাকে। উড়োর গ্রামবাসী মণীন্দ্রনাথ রায় ও অরুণ রায় ঊনবিংশ শতকে জোড়া রেখদেউল রীতিতে একটি শিব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কালাচাঁদ নামে ধর্মবিগ্রহ এখানে অধিষ্ঠিত আছেন। কালাচাঁদের উদ্দেশ্যে পোড়ামাটির হাতি মানত করা হয়। পূর্বে কালাচাঁদের গাজন হ'ত কিন্তু বর্তমানে গাজনটি বন্ধ হয়ে গেছে। পাথরের মনসামূর্তি দুর্গাপদ রায়ের গৃহে প্রতিষ্ঠিতা

আছেন। দশহরার দিন বিশেষ বাৎসরিক পূজা হয়। এছাড়া ভট্টাচার্য পরিবারে পাথরের বিশালাক্ষী ও ডোমপাড়ায় ডাকাতে কালীর পূজা হয়। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে ৭ দিন ধরে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

উদয়পুর (১৩৪ ঃ কালনা) ঃ বেহুলা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত উদয়পুর গ্রামে বেহুলা দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। মনসামঙ্গল গ্রন্থের উদয়পুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। জনশ্রুতি যে, মৃতপতিসহ বেহুলা কলার ভেলায় চেপে এই গ্রামে উদয় হয়েছিলেন বলে গ্রামের নাম উদয়পুর হয়েছে। পূর্বে নদীর দক্ষিণ তীরে এক বিশাল বটবৃক্ষের নীচে বেহুলার প্রাচীন মন্দির ছিল- কিন্তু দেবীর স্বপ্নাদেশের ফলে তাঁকে উত্তর তীরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অতীতের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঝাঁপানের দিন দেবীকে সর্বাগ্রে পূর্বোক্ত বটবৃক্ষের নীচে প্রথম পূজা করা হয়। দেবীপূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ঝাঁপানের দিন সর্বাগ্রে হাসানহাটি গ্রামের মুসলমানদের পূজা। উদয়পুরে ঝাঁপান উৎসব অনুষ্ঠিত হয় আষাঢ় নবমীতে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের ওঝারা নানা জাতের বিষধর সাপ নিয়ে খেলা দেখায়। অনুষ্ঠানটি একদিকে যেমন ভয়াবহ অপর-দিকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। গ্রামের পণ্ডিত উপাধিধারী বাগদী সম্প্রদায়ের লোকেরা দেবীর মূল সেবাইত।

উদ্ধারণপুর (১১৮ ঃ কেতুগ্রাম) ঃ কাটোয়া শহরের উত্তরাংশে অজয় নদ পার হ'য়ে রিক্সা অথবা বাসযোগে উদ্ধারণপুরে পৌঁছান যায়। সপ্তগ্রামের জমিদারের সন্তান উদ্ধারণ দত্তের নামানুসারে এই শ্রীপাটের নামকরণ করা হয়েছে। নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হ'য়ে উদ্ধারণ দত্ত নৈহাটি বা নবহট্টের সন্নিকটে নই রাজার মনোরম উদ্যানে শ্রীপাট স্থাপন করেন। তিনি এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৬৩ শকাব্দে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন। গঙ্গার ঘাটের সন্নিকটে গঙ্গেশ্বর শিবমন্দিরটি ব্যতীত আরও ২টি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। গ্রামের মধ্যে একটি দালান মন্দিরে গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবাপূজো হয় এবং উক্ত মন্দিরের পাশে রয়েছে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সমাধি। মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে সোনারুন্দির জমিদার কর্তৃক অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে রত্নেশ্বর শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ সারা বছর সোনারুন্দির রাজবাড়ীতে অধিষ্ঠিত আছেন। কেবলমাত্র পৌষ সংক্রান্তি ও উত্তরায়ণ উৎসবের সময় ৭ দিনের জন্য উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের স্মৃতিচারণ উৎসব উপলক্ষে শ্রীবিগ্রহটিকে এই শ্রীপাটে নিয়ে আসা হয়। বাজার পার হ'য়ে একটু উত্তরে এগিয়ে গেলে উদ্ধারণপুরের মহাশ্মশান। মহাশ্মশানের একপাশে বহু বৈষ্ণব মোহান্তের সমাধি আছে।

এই মহাশ্মশানের মধ্যে কালিকানন্দ অবধূত কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন এবং তার ফলশ্রুতিস্বরূপ 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' নামক গ্রন্থখানি উদ্ধারণপুরকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। উদ্ধারণপুরের সন্নিকটবর্তী ঝামটপুর নিবাসী নিত্যানন্দ সেবক কৃষ্ণদাস কবিরাজ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সম্পর্কে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ

করেছেন,—

"মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥"

'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র মতে দত্তঠাকুর ছিলেন নিত্যানন্দ শাখার দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ব্রজের 'সুবাহু গোপাল'।

উপলতি (৬৪ঃ কালনা)ঃ বেহুলা নদীর তীরে উপলতি গ্রামে বেহুলার মন্দিরে ৩টি প্রস্তর নির্মিত মুখমণ্ডল মনসা, বেহুলা ও নেতা ধোপানীর প্রতীকরূপে পূজিত হয়। দেবী বিগ্রহের সেবক পঞ্চানন রজক সন্ন্যাসীর জীবনযাপন পূর্বক নিজেকে সেবা পূজায় নিযুক্ত রেখেছিলেন। গ্রামস্থ একটি পুকুর পাড়ে গদা কাঁধে দণ্ডায়মান অবস্থায় একটি পাথরের হনুমানজীর মূর্তি আছে। জনশ্রুতি এই যে, হনুমানজী মন্দিরের মধ্যে অবস্থান করেন না। একসময়ে মন্দির নির্মাণ করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হ'লে মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের নিদর্শন এখনও দেখা যায়।

এড়াল (৯৩ঃ আউসগ্রাম)ঃ পারাজ রেলস্টেশন হ'তে অথবা অভিরামপুর বাস স্টপেজে নেমে কিছুটা কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে এড়াল গ্রামে যাওয়া যায়। এখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন বুদ্ধেশ্বর শিব। বুদ্ধেশ্বর এই নামটি হ'তে অনুমান করা যায় যে, একসময়ে এখানে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। তাই পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের পূজার্চনা ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হ'য়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে তাঁর রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি হিন্দুদের শিবঠাকুরে রূপান্তরিত হয়েছেন। শিব পূজা-অন্তে ধ্যানের শেষে উচ্চারিত হয়—'ওঁ নমো বুদ্ধেশ্বরায় নমঃ'। বুদ্ধেশ্বর শিবের আবির্ভাব সম্পর্কে অন্যান্য শিবলিঙ্গ উৎপত্তির ন্যায় গোয়ালা ও গরুর সম্পর্ক আছে। গ্রামের মধ্যে কালীপূজার আধিক্য দেখা যায়। ১৫ ফুট উচ্চ একটি কালীমূর্তি দেখার জন্য বহু জনসমাবেশ হয় এবং কালীপূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। এছাড়া ধর্মঠাকুর (যাত্রসিদ্ধি, বাঁকুড়া রায় ও সদাশিব নামধারী), শীতলা ও মনসাপূজার সমারোহ আছে। দোলযাত্রা অনুষ্ঠানটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত হলেও এটি হ'ল গ্রামের সার্বজনীন উৎসব। জনৈক পীরের উরস উৎসব প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়। এড়াল গ্রামে শিবের গাজন উৎসবটিও বৈচিত্র্যময়। গাজনের সময় গ্রামের উত্তর ভাগে অবস্থিত তালপুকুরে স্নানের জন্য শিবকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্নানের পূর্বে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় শিব কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন বলে স্থানটি বিশ্রামতলা নামে পরিচিত। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের সোমবারে বুদ্ধেশ্বর শিবের যে বিশেষ উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় তা 'মানুই' উৎসব নামে প্রচলিত। এই দিন ১ সের চালে ২ মন খাঁটি দুধের পরমান্ন প্রস্তুত হয়।

এথোড়া (৭৬ঃ আসানসোল)ঃ আসানসোল শহরতলির মধ্যে অবস্থিত একটি পল্লী এবং চন্দ্রচূড় শিবমন্দিরের জন্য স্থানটি প্রসিদ্ধ। শোনা যায়, জনৈক কৃষক চাষের

জমি হ'তে এই শিবলিঙ্গটি প্রাপ্ত হয়েছিল। ভট্টাচার্য পরিবারের উপর দেবসেবার ভার অর্পিত হ'লে তাঁরা মন্দির নির্মাণ করেন। দেবসেবার নিমিত্ত কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী কিছু ভূসম্পত্তি ও একটি পুষ্করিণী দান করেছিলেন।

এড়ুয়ার (৩৮ ঃ ভাতাড়) ঃ বলগনা হ'তে গুসকরার পথে এড়ুয়ার গ্রামে পৌঁছান যায়। এড়ুয়ার গ্রামের বিশেষ প্রসিদ্ধি হ'ল মহারুদ্রদেবের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি। মন্দির সংলগ্ন আটচালায় ভক্তদের অপেক্ষা করার জায়গা। মহারুদ্রদেবের সেবাইত হ'লেন মালাকার পরিবার। এড়ুয়ার গ্রামে প্রায় ৭০টির অধিক মন্দির আছে এবং অধিকাংশ মন্দির টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত। মহারুদ্রদেবের মন্দিরের কারুকার্য অন্যান্য মন্দিরের কারুকার্য হ'তে উৎকৃষ্টতর বলে মনে হয়। এই গ্রামে 'ষষ্ঠী-গড়ে' নামক পুকুরের পাড়ে একটি প্রাচীন শিবমন্দির রয়েছে। এই শিবমন্দিরের গায়ে উল্লেখযোগ্য অলংকরণ হ'ল তাজিয়ার কারুকার্য। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা উপলক্ষে গ্রামে একটি মেলা বসে। শোনা যায় যে, বহুকাল পূর্বে সন্ন্যাসী গোঁসাই নামে পরিচিত কোন একজন সাধু গ্রামের পার্শ্বে একটি কুঁড়েঘরে কালী ও মদনগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দেহরক্ষার পর ভক্তেরা ইষ্টক নির্মিত মন্দির নির্মাণ করে কালী ও মদনগোপাল বিগ্রহদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সন্ন্যাসী গোঁসাইয়ের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে শ্রাবণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে দেবীমূর্তিকে তাঁর সমাধির উপর স্থাপন করে সাড়ম্বরে সারাদিন ধরে সেবাপূজা করা হয়। অপরাহ্নে দেবীকে চতুর্দোলায় শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হয় এবং সন্ধ্যায় পুনরায় দেবীকে মন্দিরে স্থাপন করে এই দিনের উৎসবটি শেষ হয়। গ্রাম সম্পর্কে আরও শোনা হায় যে, বর্গী হাঙ্গামার সময় গ্রামটি ধ্বংস হয়েছিল এবং গ্রামের বাসিন্দারা প্রাণের ভয়ে নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিভিন্ন গ্রামের বহু বিশিষ্ট পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানা গেছে যে, তাঁদের আদিনিবাস ছিল এড়ুয়ার গ্রামে।

ওকড়সা (১২৯ ঃ কাটোয়া) ঃ দাঁইহাট অথবা কাটোয়া হতে বাসযোগে সিঙ্গি হয়ে ওকড়সা গ্রামে পৌঁছান যায়। খড়ীনদীর সন্নিকটবর্তী উর্বর পলি গঠিত অঞ্চলে একসময়ে নীলের চাষ হত, তার প্রমাণ রয়েছে নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ হ'তে। এখানকার উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়টি উনবিংশ শতকে স্থাপিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বৃন্দাবনের গোবিন্দজীউর মন্দিরের সেবাইতগণের আদি বাসস্থান ছিল ওকড়সা গ্রামে।

করন্দা (১০৩ ঃ মন্তেশ্বর) ঃ মেমারি হ'তে মন্তেশ্বর আসার পথে করন্দা গ্রামের অবস্থিতি। এখানে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্মীয় আচরণ দেখা যায়। গ্রামদেবী করন্দেশ্বরী মাটির ঘর ও খড়ের ছাউনির একটি মন্দিরে অধিষ্ঠিতা আছেন। দেবীর মূর্তিটি হ'ল মহিষমর্দিনীর রূপে ও বার মাস নিত্যপূজা হয়। শ্রাবণ মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে বার্ষিক পূজা উপলক্ষে বিশেষ উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বাৎসরিক পূজার প্রথম অধিকার হ'ল হাড়িদের এবং সর্বপ্রথম তাদের পূজা ও শূকর বলি হওয়ার পর অন্যান্যদের পূজা ও বলিদান হ'য়ে থাকে। এই দিন সকাল হ'তে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেবীকে নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। গ্রাম প্রদক্ষিণের সময় প্রতিটি বাড়ীর সামনে বলিদানের ব্যবস্থা আছে। দেবীপূজার সেবাইত হ'লেন চট্টোপাধ্যায় বা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার যাঁরা বর্ধমানের রাজার নিকট হতে দেবোত্তর সম্পত্তি লাভ করেছিলেন। চৈত্র মাসের গাজন উৎসবটিও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। করন্দা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামকে ঘিরে পূর্বস্থলী থানার জামালপুরের ন্যায় এখানেও লৌকিক দেবতা বুড়োরাজের পূজা হয় মাঘী পূর্ণিমা ও বৈশাখী পূর্ণিমায়। অতীতে বুড়োরাজের পূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, প্রথমে মুসলমানদের পূজা ও বলিদান, বর্তমানে এই প্রথা রদ হয়েছে।

কলসা (৫০ : কাটোয়া) : কাটোয়া থানার দক্ষিণাংশে অবস্থিত কলসা গ্রামে চাটুজ্যে পরিবারে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাধাগোবিন্দ বার মাস একটি আটচালা মন্দিরে অবস্থান করেন এবং দোলের সময় তাঁকে দোলমঞ্চে নিয়ে আসা হয়। প্রতি বৎসর পঞ্চম-দোল উপলক্ষে বিশেষ উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

কলাইঝুটি (৯৬ : আউসগ্রাম) : সুয়াতা গ্রামের নিকট কলাইঝুটি গ্রামের অবস্থিতি। এই গ্রামের এক বৈষ্ণববংশে ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে রূপমঞ্জরী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সরগ্রাম নিবাসী গোকুলানন্দ আচার্যের নিকট সাহিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করে মানকরের নিকট কোটা গ্রামে টোল স্থাপন করেন এবং এই সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুশীলন করতেন। অধ্যাপিকার জীবন গ্রহণ করা পর তিনি হটুবিদ্যালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ হন এবং পুরুষদের ন্যায় মস্তক মুণ্ডন, শিখা ধারণ, উত্তরীয় পরিধান ও ভট্টাচার্যগণের ন্যায় বিদায় গ্রহণ করতেন।

কলা নবগ্রাম (৫২ : মেমারী) : পাল্লা রোড রেলস্টেশনে নেমে রিক্সাযোগে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলে গ্রামের মধ্যে অবস্থিত একটি আবাসিক শিক্ষায়তনে পেঁছান যাবে। জাতীয়তা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ও গান্ধিবাদী শিক্ষক প্রয়াত বিজয় ভট্টাচার্য হ'লেন কলা নবগ্রাম বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আজীবন সাধনা ও পরিশ্রমের দ্বারা "আশ্রম"টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানকার দ্রষ্টব্যের মধ্যে আশুতোষ গ্রন্থাগার, আম্রকুঞ্জ, একটি স্থায়ী মঞ্চ, অরবিন্দ প্রকাশ উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, সতীশচন্দ্র শিল্প বিদ্যালয়, বুনিয়াদী ট্রেনিং কলেজ ও ছাত্রাবাস হল উল্লেখযোগ্য।

কলিগ্রাম (১০৩ : বর্ধমান) : বর্ধমান হ'তে কুসুমগ্রামের পথে বাসযোগে সরাসরি কলিগ্রামে যাওয়া যায়। অতীতে গ্রামটি ডিহি কলিগ্রাম নামে পরিচিত ছিল। গ্রামদেবী জয়দুর্গা একটি সুউচ্চ চারচালামন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা আছেন। জয়দুর্গা মন্দিরের পাশে একটি শিবমন্দির ছিল যা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মন্দিরের মধ্যে জয়দুর্গার মূর্তি ব্যতীত একটি মনসা মূর্তি, একটি সূর্য মূর্তি ও একটি বিষ্ণুমূর্তিকে শীতলাদেবী জ্ঞানে পূজা করা হয়। জয়দুর্গার মূর্তি হ'ল প্রস্তর নির্মিত অষ্টভুজা

মহিষমর্দিনীর মূর্তি। দেবীর নিত্যপূজা ব্যতীত আষাঢ় মাসে রথযাত্রার এক পক্ষ কাল পরে দ্বিতীয়া তিথিতে বাৎসরিক পূজা হয়, তবে অধিবাস কার্য সম্পন্ন হয় রথের পূর্বদিন। পূজার দিন প্রস্তরময়ী বিগ্রহটিকে রথে চাপিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হয়। জয়দুর্গার বাৎসরিক পূজা অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পূজার দিন মহিষ, শূকর ও ছাগ বলি দেওয়ার বিধি আছে। গ্রামের পঞ্চাননতলায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষেরা দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা করেন এবং এই পূজা 'রাখালী পূজা' নামে খ্যাত। রাখালী পূজা শেষ না হ'লে মূল মন্দির প্রাঙ্গণে বলি হয় না। প্রতি রবিবারে সর্দি, কাশি ও হাঁপানির ঔষধ নিতে বহু ব্যক্তি মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন; এছাড়া বৎসরের বিভিন্ন সময়ে মঙ্গলচণ্ডী, পঞ্চানন, রক্ষাকালী, সিদ্ধেশ্বরী, মনসা ও যোগাদ্যা দেবার বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কল্যাণপুর (মৌজা-বিজুর-১২ ঃ মেমারী)ঃ বর্ধমান-বিজুর বাস-রাস্তায় বিজুরে নেমে ১ কিলোমিটার হেঁটে কল্যাণপুর গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামস্থ সর্দার পরিবারের (চণ্ডাল) পূর্বপুরুষ মায়ানদীর তীরে জঙ্গলের মধ্যে নবগ্রহ শিলা লাভ করেন এবং সর্দার পরিবার হল প্রধান সেবাইত। নবগ্রহ পূজায় কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। প্রতি বৎসর উত্তরায়ণের দিন (১লা মাঘ) বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নবগ্রহের মানত শোধের জন্য কল্যাণপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষেরা পূজা ও ছাগ বলিদান দেয় এবং একদিনের জন্য মেলা বসে।

কল্যাণেশ্বরী (দেবীপুর-১ ঃ কুলটি)ঃ বিশেষ বিবরণ ১১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাইতি (১৬৪ ঃ রায়না)ঃ বর্ধমান হ'তে বাসযোগে উচালনে নেমে কাইতি গ্রামে যাওয়া যায়। মুকুন্দরাম ও রূপরাম চক্রবর্তীর উল্লেখ হ'তে অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, কাইতি একটি প্রাচীন গ্রাম। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে আছে,—

"কাইতি চাপিয়া বন্দ বানরাজার পাট।
উষাবালিপোতাবন্দ শ্বেতগঙ্গার ঘাট।"

রূপরামের বানরাজার পাট, উষাবালিপোতা ও 'শ্বেত গঙ্গার' উল্লেখ অত্যন্ত অর্থবহ। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কাইতির প্রাচীন ঐতিহ্য কবি উল্লেখ করেছেন এবং গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে শ্বেতগঙ্গা নামক পুষ্করিণীর পাড়ে একটি মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল; যার জীর্ণ দশাগ্রস্ত সিংহদ্বারটি এখনও বিদ্যমান। গ্রামের মধ্যে বানেশ্বর শিবের অবস্থিতি দেখে রূপরাম বর্ণিত বানরাজার পাট উল্লেখের কিছুটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। শ্বেতগঙ্গার পাড়ে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদটির উপাদানগুলি দেখে অনুমান করা যায় যে, কোন হিন্দু দেবমন্দির হ'তে উক্ত উপাদানগুলি সংগ্রহ করা হ'য়েছিল। গ্রামের পার্শ্বে নাদারীর বাঁধকে অনেকে উষাপোতা বলে সনাক্ত করার চেষ্টা করেছেন। কাইতি গ্রামের প্রসিদ্ধ গ্রামদেবী হ'লেন সিদ্ধেশ্বরী কালী। কালীপূজার সময় মহিষ, মেষ ও ছাগ বলি সহ সাড়ম্বরে দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধেশ্বরী কালিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠা

নিয়ে এই গ্রামে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উপলক্ষে শ্বেতগঙ্গার পাড়ে মেলা বসে। কাইতির প্রাচীনত্ব নির্ধারিত হ'তে পারে যদি গ্রামের পাশে উষাপোতা দীঘির পাড়টিকে খনন করা হয়।

কাজলী ঃ শ্রদ্ধেয় হরিদাস দাস মহাশয় কাজলী গ্রামটি বর্ধমান জেলায় অবস্থিত ছিল বলে তাঁর বৈষ্ণব অভিধানে উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু একালে এই গ্রামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ প্রভুর মাতা পদ্মাবতী দেবী কাজলী গ্রামের বাসিন্দা মহেশ্বর শর্মার কন্যা ছিলেন।

কাঞ্চননগর (২৬ ঃ বর্ধমান) ঃ বর্ধমান রেলস্টেশনে নেমে টাউন বাস সার্ভিসে রথতলা স্টপেজ হ'তে রিক্সা অথবা হাঁটাপথে কাঞ্চননগরে যাওয়া যায়। কাঞ্চননগর ছিল প্রাচীন বর্ধমান শহরের একাংশ ; কিন্তু দামোদরের খাত পরিবর্তনের ফলে শহর ক্রমশঃ পূর্বদিকে সরে আসায় ও দামোদরের খাল খননের ফলে কাঞ্চননগর ও বর্ধমানের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। 'বাসুলী মঙ্গল' কাব্য হ'তে জানা যায় যে, প্রাচীন বর্ধমান শহরের অস্তিত্ব ছিল কাঞ্চননগরে। শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সঙ্গী গোবিন্দদাস কর্মকার রচিত "কড়চা"তে উল্লেখ আছে,—

"বর্ধমানে কাঞ্চননগরে মোর ধাম।
শ্যামাদাস পিতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম॥"

গোবিন্দদাসের পিতার নাম শ্যামাদাস, মাতা মাধুরী দেবী ও পত্নীর নাম ছিল শশিমুখী। গোবিন্দদাসের ভিটায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ ও একটি স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীল ভূগর্ভ ঠাকুর বৃন্দাবনবাসী হওয়ার পূর্বে এখানে শ্রীপাট স্থাপন করেছিলেন। পূর্বে বর্ধমানের রাজাদের বাসগৃহ ছিল কাঞ্চননগরে। বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদ বিষ্ণুপুরের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বিজয়োৎসব পালনের জন্য স্বীয় আবাসস্থলের নিকটে ১২টি তোরণ নির্মাণ করেছিলেন যা বারদুয়ারী নামে খ্যাত। কাঞ্চননগরের উত্তরভাগে বারদুয়ারীর একটিমাত্র তোরণ অবশিষ্ট আছে।

কাঞ্চননগরের ঐতিহ্যের সঙ্গে দেবী কঙ্কালেশ্বরীর সম্পর্ক দীর্ঘকালের। কঙ্কালেশ্বরী সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে, অতীতে বাঁকা নদীর গর্ভে একটি পাথরকে রজকেরা বস্ত্র ধৌত করার জন্য ব্যবহার করত ; কিন্তু কোন এক সময়ে ঐ পাথরটি উল্টাইয়া গেলে দেখা যায় যে, এটি একটি অষ্টভুজা চামুণ্ডার মূর্তি। এই মূর্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল মানবদেহের শিরা উপশিরা ও কঙ্কালের ন্যায় পাথরের উপর ক্ষোদিত হয়েছে ও অত্যন্ত পরিস্ফুট আকারে দেখা যায়। মূর্তির মস্তক ভাগের উপর একটি হস্তী ও পদতলে শায়িত অবস্থায় রয়েছেন দেবাদিদেব। এরূপ ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন খুবই কম দেখা যায়। একটি নবরত্ন মন্দিরে দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। এই মন্দিরে কোন টেরাকোটা অলংকরণ নেই। মন্দিরের স্থাপত্য দেখে অনুমান করা যায় যে, নবরত্ন মন্দিরটি অন্ততঃপক্ষে ২৫০ বছরের প্রাচীন। মন্দির সংলগ্ন বিল্বকুঞ্জে তন্ত্র-সাধনার ও পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। বহু তান্ত্রিক সাধক এখানে তন্ত্র সাধনায়

সিদ্ধিলাভ করতে আসতেন। কঙ্কালেশ্বরীর মন্দিরের সন্নিকটে একটি পরিত্যক্ত রেখ দেউল দেখা যায়। শোনা যায়, এখানে একটি বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কঙ্কালেশ্বরীর মন্দির দেখে প্রত্যাবর্তনের পথে একটি টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত পঞ্চরত্নের শিবমন্দির দেখা যায়; আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে একটি পরিত্যক্ত জোড়-বাংলা মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। এই মন্দিরটি শিবদুর্গা মন্দির নামে খ্যাত।

কাঞ্চননগরের রথযাত্রার উৎসব হ'ল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। রাজাদের আমলে রথযাত্রার দিন রথতলায় হাতি দিয়ে রথ দুটিকে টানা হ'ত। ২টি রথের একটি ছিল রাজার রথ ও অপরটি রানীর রথ নামে পরিচিত। জমিদারী প্রথা বিলোপের পূর্বে রথযাত্রার সমুদয় ব্যয়ভার রাজারা বহন করতেন। একালে জাঁকজমক হ্রাস পেলেও স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ এখনও প্রাচীন ঐতিহ্যটিকে বজায় রেখে চলেছেন। রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে একটি মেলা বসে ও বহু জনসমাগম হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, গুণগত মানের জন্য কাঞ্চননগরের ছুরি, কাঁচি ও শাঁখের করাতের চাহিদা সমগ্র বঙ্গদেশে ছিল।

কাটোয়া ঃ বিশেষ বিবরণ ১১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কণ্টকনগর ঃ কাটোয়ার নামান্তর। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে উল্লিখিত কণ্টকপত্তন এবং বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত কণ্টকনগর হ'ল একালের কাটোয়া।

কানপুর (১২০ ঃ মেমারি) ঃ মেমারি-কাটোয়া বাস রাস্তায় ভাগড়া স্টপেজে নেমে রিক্সা অথবা হাঁটাপথে কানপুর গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের জমিদার বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর নির্মিত মহিষমর্দিনী মূর্তিটি দেবী সর্বমঙ্গলা নামে পূজিতা হচ্ছেন এবং তিনি একটি সুন্দর মন্দিরের মধ্যে অধিষ্ঠিতা আছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে দেবীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন গ্রামের একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব। এই গ্রামে দুর্গোৎসবের সময় প্রাচীন শাস্ত্রানুমোদিত রীতিতে দুর্গাদেবীর মূর্তি নির্মাণের প্রচলন আছে।

কানাইডাঙ্গা (১১৬ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ কৈচর বাস স্টপেজ হ'তে ১ কিলোমিটার পূর্বমুখে এগিয়ে গেলে কানাইডাঙ্গা গ্রামে পৌঁছান যায়। গ্রামস্থ গোস্বামীগণ নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর। গোস্বামী পরিবারে বলরামজীউর সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে এবং পালাক্রমে বার মাস নিত্যসেবা হয়। অতীতে কানাইডাঙ্গা গ্রামে বৈষ্ণব শাস্ত্রচর্চার নিদর্শনস্বরূপ গোস্বামী পরিবারে বহু পুঁথি রক্ষিত আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে জয়পুরের পণ্ডিতের সঙ্গে এদেশীয় পণ্ডিতগণ পরকীয়াতত্ত্বের বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তন্মধ্যে কানাইডাঙ্গার একজন প্রথিতযশা পণ্ডিত ছিলেন।

কামারকিতা (১১৮ ঃ বর্ধমান) ঃ বর্ধমান শহরের পশ্চিম দিকে দামোদর ও বাঁকা নদীর প্রবাহ পথের মধ্যভাগে অবস্থিত একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে পরিখা বেষ্টিত বিশাল গড়বাড়ীটি দেখে কোন প্রাচীন রাজবাড়ী

বলে অনুমান করা হয় ; কিন্তু কোন প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। গড়ের দৈর্ঘ্য হল প্রায় ২ কিলোমিটার এবং প্রস্থ হ'ল প্রায় ১·৫ কিলোমিটার। দূর হ'তে গড়ের উচ্চ প্রাকার দেখে অতীতের কোন বৃহৎ জলাশয় বলে ভ্রম হয়। জনশ্রুতি এই যে, গড় ও গ্রাম পত্তনের সঙ্গে রাজা রামপাল নামক এক ব্যক্তির কাহিনী জড়িত আছে। রামপাল মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে অথবা বর্ধমানের রাজার অধীনস্থ রাজস্ব আদায়-কারী কর্মচারীরূপে এখানে বসবাস করতেন। রাজারাম হ'তে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে রাধাগোবিন্দজীর মন্দির, সুবৃহৎ পুষ্করিণী ও একটি মনোহর উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে (১১৬৫ বঙ্গাব্দ) স্নানযাত্রার দিন রাধাগোবিন্দ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দেবসেবার নিমিত্ত ২২০০ বিঘা নিষ্কর সম্পত্তি দান করা হয়েছিল বলে শোনা যায়। মন্দিরটি কামারকিতা গ্রামের প্রাচীন পুরাকীর্তির অন্যতম নিদর্শন। পালবংশের দক্ষিণেশ্বর পালের ইচ্ছানুসারে তাঁর পুত্র দয়ারাম কুলদেবতা রঘুনাথের মন্দির, ২টি শিবমন্দির ও আরো কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

কামারপাড়া (মৌজা বনপাস—২১ ঃ ভাতাড়) ঃ বর্ধমান-গুসকরা বাস-রাস্তায় বর্ধমান হতে ২০ কিলোমিটার উত্তরে কামারপাড়া গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামটি যে একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম তা গ্রামে প্রবেশ করলেই জানা যায়। অতীতে কর্মকার জাতির বসবাসের জন্য কামারপাড়া গ্রামের প্রসিদ্ধি ছিল। এই গ্রামে কর্মকারেরা এক-সময়ে তরোয়াল, গাদা বন্দুক, ছোট কামান প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করার সুবাদে মুর্শিদাবাদের নবাবের ফতওয়ানামা বলে ১৪৮৪ বিঘা ভূসম্পত্তি লাভ করেন। কামারপাড়ার কর্মকারদের উপাধি ছিল মেহতরী > মাহাত্মা এবং পরবর্তীকালে তাঁরা রায় উপাধি লাভ করেন। কিন্তু তাঁদের পূর্বগৌরব অস্তমিত। যুদ্ধাস্ত্রের পরিবর্তে পিতল, তামা ও কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয় বনপাস-কামারপাড়ায়। কিন্তু সেদিনও শেষ হয়েছে ; একালে কেবলমাত্র স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রঞ্জের অলঙ্কার প্রস্তুত হয়।

কামারপাড়া গ্রামের লোকেদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল প্রবাদের ন্যায়। একটা গ্রাম্য প্রবাদ আছে,—

যদি পাও ঢাকের সাড়া
তবে জানবে কামার পাড়া।

কামারপাড়া গ্রামে অন্ততঃপক্ষে ৩০টি মন্দির আছে, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল গ্রামের মধ্যস্থলে বুড়ো শিবের শিখরদেউল ও বাস-রাস্তার ধারে অষ্টকোণাকৃতি দেউলেশ্বরের শিখরদেউলটি। বুড়ো শিবের মন্দিরে সামান্য টেরাকোটা অলঙ্করণ দেখা যায়। কিন্তু মন্দিরটির স্থাপত্যরীতি দেখে অনেকে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মন্দির বলে অনুমান করেছেন। মিস্ত্রীপাড়ায় দেউলেশ্বর শিবমন্দির নির্মিত হয়েছিল ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে। মন্দিরের নিম্নভাগ অষ্টকোণাকৃতি ও উর্ধ্বভাগ শিখরদেউল রীতিতে নির্মিত। নিম্নভাগের আটটি দেওয়ালের গায়ে প্রচুর টেরাকোটা

অলঙ্করণের কাজ আছে। উন্নতমানের ও শিল্পীর নিপুণ হস্তে নির্মিত টেরাকোটা অলঙ্করণগুলির সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়। এছাড়া গ্রামের বিভিন্ন অংশে রেখ-দেউল, পঞ্চরত্ন মন্দির, আটচালা, চারচালা, জোড়বাংলা, দালান মন্দির, জোড়া মন্দির বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সকল মন্দিরে শিবলিঙ্গ, কালী, দুর্গা, এলোকেশী, লক্ষ্মীনারায়ণ, শ্যামসুন্দর, রাধাগোবিন্দ, ডাকাতের কালী, শ্রীধর, চতুর্ভুজা দুর্গা প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। কয়েকটি মন্দির ইতিমধ্যেই পরিত্যক্ত হয়েছে। গ্রামের চারদিকে ৪টি রক্ষাকালীর পুজো হয়। চাঁদাই পাড়ায় চৈত্র মাসে পঞ্চাননের পুজো উপলক্ষে মেলা হয়। তাছাড়া গ্রামের মধ্যস্থলে বার মাসের জন্য বাজার থাকায় গ্রামবাসীরা সারা বছরের সাধারণ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হন।

কামাল (৫৯ ঃ কাটোয়া) ঃ দাঁইহাট হ'তে সরাসরি বাসযোগে কামালে পেঁছান যায়। সরস্বতী পুজোর পরের ষষ্ঠী তিথিতে খড়্গেশ্বরী নদীর তীরে একটি বটবৃক্ষের কাছে কদম্বিনী পুজো অনুষ্ঠিত হয়। যেসকল শিশু 'রিকেট' রোগগ্রস্ত হয়ে ভোগে তাদের কদম্বিনীতলায় নদীতে স্নান করিয়ে মানত পূর্ণ করার রেওয়াজ আছে। এই উপলক্ষে একদিনের জন্য মেলা বসে। মনে হয় এটি নদী পুজোর নামান্তর এবং নদীতে স্নান করলে রোগমুক্তির সম্ভাবনা নিয়েই এই পুজোর সূত্রপাত হয়েছিল।

কামালপুর (৭৪ ঃ খণ্ডঘোষ) ঃ বর্ধমান শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে কাঠগোলাঘাট পার হ'য়ে সোনামুখী যাওয়ার পথে কামালপুরে পেঁছান যায়। এখানে কয়েকটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন দেখে ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্মমঙ্গলে' উল্লেখিত 'উড়ের গড়' বলে স্থানটিকে সনাক্ত করা হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি প্রাচীন শিবমন্দিরের ভিত্তি-বেদীর উপর নূতন শিবমন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। এই গ্রামে বসু পরিবার বহুকাল ধরে বসবাস করছেন। দেওয়ান দেবনারায়ণ বসু একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একটি দুর্গামণ্ডপ, ২০টি শিবমন্দির ও লক্ষ্মী-জনার্দন মন্দির নির্মাণ করে-ছিলেন, তন্মধ্যে নীলকণ্ঠ শিবমন্দিরের টেরাকোটা অলংকরণের কাজ সত্যই অতুলনীয়। এখানে বহুকাল ধরে জাঁকজমক সহকারে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে দেওয়ান দেবনারায়ণ দুর্গোৎসব ট্রাস্টের পরিচালনায়। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মন্দির ও তৎসহ টেরাকোটা অলংকরণগুলির অধিকাংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কালনা ঃ বিশেষ বিবরণ ১১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কালাচাঁদতলা ঃ ভাতাড় হ'তে সামন্তী যাবার পথে ৩ কিলোমিটার দূরে কাঁচগাড়িয়া-বেলগ্রাম মৌজায় কূর্মমূর্তিতে ধর্মরাজ অধিষ্ঠিত আছেন। স্থানীয় তাঁতি পরিবার ধর্মরাজের দেওয়াসীন পদে নিযুক্ত আছে। রাঢ়ের অন্যান্য স্থানের ন্যায় কালাচাঁদ নামক ধর্মরাজ অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা। প্রতি দিনই শিশু ও স্ত্রীলোকেরা মানত ও পুজো দেওয়ার জন্য এখানে উপস্থিত হ'ন এবং ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে মাটির ঘোড়া মানসিক নিবেদন করে থাকেন। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুর দশাবতারের দ্বিতীয় অবতার কূর্ম এই স্থানে ধর্মরাজরূপে

অধিষ্ঠিত। তাই ধর্মরাজের পূজার মধ্য দিয়ে সম্ভবতঃ প্রাচীন বিষ্ণু পূজাকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

কালীগঞ্জ (৭৯ : নিউটাউনশিপ দুর্গাপুর) : আড়া গ্রামের ১ কিলোমিটার পশ্চিমে কালীগঞ্জ গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামের কালীতলায় একটি ভগ্ন দেবীমূর্তিকে কালিকার ধ্যানে পূজা করা হয়, কিন্তু মূর্তিটির বক্ষের নিম্নাংশ ভগ্ন হওয়ায় দেবী প্রতিমার সঠিক পরিচয় জানা যাচ্ছে না। এখানে 'খাড়াৎ' উপাধিধারী ডোম সম্প্রদায়ের বাস—তারা দাবী করে যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা এতদঞ্চলে রাজার সৈনিক ছিল, আবার অনেকে খাড়াৎ শব্দটিকে খড়্গধারী বা যুদ্ধে খড়্গ বহনকারী বলে অনুমান করেন। হয়ত অত্র স্থানের ডোম সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঢেকুরগড়ের রাজার সুসম্পর্ক ছিল।

কালিকাপুর—(১১১ : কাটোয়া) : দাঁইহাট অথবা অগ্রদ্বীপ রেলস্টেশনে নেমে কালিকাপুর গ্রামে যাওয়া যায়। জনশ্রুতি যে, এই স্থানের প্রাচীন নাম ছিল কালিকানই। জয়দুর্গা কালীর নামানুসারে গ্রামের নাম হয় কালিকাপুর। গ্রামস্থ চিরঞ্জীব নামে একজন সাধক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মাঘ মাসের মকর সপ্তমী তিথিতে কুমরীর বিল হ'তে দেবীর বিগ্রহ উদ্ধার করেন। চিরঞ্জীব দেবীর পাষাণ-মূর্তিটিকে কালিকাপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠা করে নিত্যসেবার ব্যবস্থা করেন। প্রতি বৎসর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে কুমরীর বিলে মহা আড়ম্বর সহকারে পূজার ব্যবস্থা হয়ে আসছে। জয়দুর্গার অষ্টভুজা প্রস্তর মূর্তিটির বামপার্শ্বে ধ্যানরত অবস্থায় মহাদেব উপবিষ্ট এবং ডানদিকে পদ্মাসনে পদ্মযোনি করবদ্ধ অবস্থার আসীন—দেবীর দুই পার্শ্বে জয়া ও বিজয়া এবং শিরোপরি শিবের পঞ্চানন মূর্তি ক্ষোদিত আছে। পঞ্চানন মূর্তির দুই পার্শ্বে কালভৈরব ও মহারুদ্র ভৈরব উপবিষ্ট। এই সুন্দর প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্তিটি প্রায় ৩ ফুট উচ্চ।

কালীপূজার সময়ে প্রায় ১৫ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট বিশাল ভয়ঙ্করী মাটির তৈরী কালিকা মূর্তি পূজিত হয়। নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর বংশে শ্রীরাধামাধব-জীউর নিত্যসেবা প্রতিষ্ঠিত আছে। কালিকাপুরের গোস্বামী বংশ, জ্যোতিষশাস্ত্র বিশারদ ভট্টাচার্য বংশ ও সেন উপাধিধারী কবিরাজ বংশ হ'ল এখানকার আদি বাসিন্দা। এই গ্রামের সাধক প্রেমানন্দ গোস্বামী শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার সমন্বয় সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাধামাধব বিগ্রহ এখানে নিত্য পূজিত হচ্ছে। কালিকাপুরে শাক্ত ও বৈষ্ণবদের বিদ্বেষ ছিল প্রবল এবং এ সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কবিরাজ মহাশয় কোন এক বৈষ্ণবকে ঔষধের সঙ্গে বিল্বপত্রের অনুপান দেওয়ায় গোস্বামী তাঁর এক শিষ্যকে বিল্বপত্র যোগাড় করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শিষ্য স্নান করে 'সেই পাতা' স্পর্শ করতে অক্ষমতা জানায়। ঘটনাটি অতিরঞ্জিত হলেও শাক্ত-বৈষ্ণবের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কালিপাহাড়ী-মঞ্জুলা (৭৪ : ভাতাড়) : বলগনা হ'তে ৩ কিলোমিটার রিক্সা যোগে অথবা হাঁটা পথে এই গ্রামে যাওয়া যায়। কালীপাহাড়ী ও মঞ্জুলা নামক

২টি ক্ষুদ্র গ্রাম একত্রে সন্নিবেশিত হ'য়েছে। এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির নিদর্শন হল ১ ফুট উচ্চ প্রস্তর নির্মিত হংসের উপর উপবিষ্ট ব্রাহ্মণী দেবীর মূর্তিটি। আষাঢ় নবমীর পরবর্তী কৃষ্ণা নবমী তিথিতে দেবীর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে উৎসব ও বলিদান অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি মেলা বসে। কালীপাহাড়ী গ্রাম হ'তে নির্গত কাঁদড় খালটি ব্রাহ্মণী দেবীর নামানুসারে ব্রাহ্মণী নদী নামে পরিচিতি লাভ করেছে। শ্রাবণ মাসে 'বন নাগিণী' নামে মনসা দেবীর পূজা হয়। কিম্বদন্তী এই যে, দত্ত বংশের কোন কন্যার গর্ভে একটি সর্পের জন্ম হয় এবং সেই সর্পটিকে দত্ত পরিবার দেবতা জ্ঞানে পূজা করতেন।

কাশিয়াড়া (৩৩ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ নূতনহাট হ'তে বাসযোগে কাশিয়াড়া গ্রামে পেঁছান যায়। এই গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে নবাব আবদুল জব্বার খান বাহাদুর নামক একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কাসেমনগর ঃ মঙ্গলকোট থানার অধীনস্থ কাসেমনগর গ্রামে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা মৌলবী আব্দুল কাসেমের ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে জন্ম হয়। কাসেম সাহেবের নামানুসারে গ্রামের নাম হয়েছিল কাসেমনগর। চল্লিশের দশকে অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিমের পৈত্রিক বাসস্থান ছিল কাশেমনগরে ; যাঁর 'In Retrospection' গ্রন্থখানি একসময়ে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও ভূমি-রাজস্ব বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণেতা বদরউদ্দিন উমর হলেন আবুল হাশিমের পুত্র।

কাঁকড়া (৮৪ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ কাটোয়া থেকে মাজিগ্রামের পথে বাস-রাস্তা ধরে এখানে আসা যায়। গ্রামস্থ উপাস্য দেবতা কর্কট নাগের নাম অনুসারে গ্রামের নাম কাঁকড়া হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। আবার অনেকে কঙ্কন নগর হ'তে কাঁকড়ার রূপান্তরের কথা অনুমান করেছেন। কাঁকড়া গ্রামে বহুকাল ধরে নাগ পূজোর সমারোহ আছে। অষ্টম নাগের অন্যতম কর্কট নাগের পূজা হয় দশহরার পরের নাগপঞ্চমীতে। অতীতে নাগ পূজার অধিকারী ছিল বাগদী সম্প্রদায়ের লোকেরা, কিন্তু একালে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ পূজা করেন। নাগপঞ্চমীর দিন পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। এছাড়া সিংহবাহিনী দেবী এখানে অধিষ্ঠিতা আছেন।

কাঁকসা (৮৬ ঃ কাঁকসা) ঃ পানাগড়ের ৩ কিলোমিটার উত্তরে সড়ক পথে কাঁকসা থানার সদর কার্যালয় কাঁকসা গ্রামের অবস্থিতি। প্রবাদ আছে যে, কনকসেন নামক স্থানীয় ভুস্বামী কর্তৃক কঙ্কেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কঙ্কেশ্বর হতে অপভ্রংশে স্থাননামটি 'কাঁকসা'য় রূপান্তরিত হয়েছে। গোপভুমের সদগোপ রাজ্য বহুধা বিভক্ত হওয়ায় একটি গোষ্ঠী কাঁকসাতে রাজপাট স্থাপন করেন। কিংবদন্তী আছে যে, সদগোপ রাজা কনকসেনকে পরাজিত করে সৈয়দশাহ সইফুদ্দীন খান বোখারী এতদঞ্চল অধিকারপূর্বক বসবাস করেন। কঙ্কেশ্বর গড়ের নিকট রাজার মসজিদের ধ্বংসাবশেষ

রয়েছে। কাঁকসার প্রয়াগপুরের কাছে একটি তেঁতুলতলায় সৈয়দ বোখারীর কবরস্থান দেখা যায়। দেওয়ান সাহেবের আস্তানায় হিন্দু মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে। কাঁকসার আয়মাদার বংশের আচারব্যবহারে আভিজাত্যের ছাপ বিদ্যমান আছে এবং অনেকের ধারণা এই যে, তাঁরা সৈয়দ বোখারীর উত্তরপুরুষ।

কাঁকসায় হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল। একসময়ে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কঙ্কেশ্বর শিবের পূজা বহুকাল ধরে চলে আসছে এবং আজও মহাসমারোহে শিবরাত্রির অনুষ্ঠান হয়। এছাড়া দুর্গোৎসব, কালীপুজা, চড়ক ইত্যাদি ধর্মানুষ্ঠানের সময় ধর্মীয় সহ-অবস্থানের চিত্র দেখা যায়। আবার চৈত্র মাসে দেওয়ান সাহেবের উরস উৎসবের সময় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক আস্তানায় জড়ো হয়।

কাঁটারিয়া (৫২ ঃ কাটোয়া) ঃ কৈচর হ'তে বাসে ইটা অথবা ক্ষীরগ্রামে নেমে কাটারিয়ায় যাওয়া যায়। এখানে পরীক্ষিৎ ভট্টাচার্য নামক এক ব্যক্তি প্রায় ২৫০ বছর পূর্বে একটি আটচালা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মন্দিরের সম্মুখ ভাগে বিপরীতমুখে অবস্থানরত একজোড়া মকর-মুখ, নৃত্যরতা রমণী, জোড়ায় জোড়ায় পক্ষী ও লতাপাতার বিচিত্র নক্সা মন্দিরটির সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক হ'য়ে উঠেছে। গ্রাম হ'তে কিছুটা দূরে অবস্থিত একটি পুষ্করিণীর বাঁধান ঘাট দেখে অনুমান করা যায় যে, অতীতে গ্রামটি আরও পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

কাঁদড়া (৩৬ ঃ কেতুগ্রাম) ঃ কাটোয়া-আহমদপুর রেলপথে অথবা কাটোয়া হতে বাসযোগে কাঁদড়া গ্রামে যাওয়া যায়। একালে এই গ্রামটি জ্ঞানদাস-কাঁদড়া নামে প্রসিদ্ধ। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে আছে,—

> "রাঢ় দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
> তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়॥"

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি ও পদকর্তা জ্ঞানদাস ও যদুনন্দন দাসের শ্রীপাট ছিল কাঁদড়াতে। এখানে শ্রীজ্ঞানদাসের প্রতিষ্ঠিত মঠে পৌষ মাসের পূর্ণিমাতে ৩ দিনের জন্য একটি মেলা হয়। ১৫৩১ খ্রীস্টাব্দে মঙ্গলঠাকুরের বংশে কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। জ্ঞানদাস ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। জ্ঞানদাসের চরিত্র মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে চন্দ্রশেখর, শশিশেখর ও মনোহর দাস তাঁর, শ্রীপাটে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া গোকুলানন্দ, বংশীবদনঠাকুর সহ বহু বৈষ্ণব পদকর্তা ও প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া কাঁদড়ার শ্রীপাটে অবস্থান করতেন।

মনোহরশাহী কীর্তনের প্রচলন শুরু হয়েছিল কাঁদড়ার শ্রীপাটে। শ্রীখণ্ড ও কাটোয়া মহোৎসবে মনোহরশাহী কীর্তনে কাঁদড়ার মঙ্গলঠাকুর বংশীয় বংশীবদন অগ্রণী ছিলেন। এই গ্রামের কায়স্থ বংশীয় বাসিন্দা বলরাম দাস ও তাঁর পিতা জয়গোপাল বৈষ্ণব সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। জয়গোপাল 'দাস ঠাকুর' নামে খ্যাত ছিলেন এবং তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ বিলাস ও 'জ্ঞান প্রদীপ' গ্রন্থের রচয়িতা, কিন্তু জয়গোপাল কোন

ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেওয়ায় বীরভদ্র কর্তৃক তিরস্কৃত হ'য়েছিলেন। শ্রীপাটের নিকট পুকুরের ধারে একটি পাথর আছে যেখানে বীরভদ্র প্রভু উপবেশন করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। কাঁদড়ায় মঙ্গলঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি রাধাবল্লভ নামে খ্যাত। শোনা যায়, শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পরের দিন এখানে মঙ্গলঠাকুরের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। কাঁদড়া গ্রামে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বহু দেবদেবীকে কেন্দ্র করে সারা বছর ধরে নানা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের ঈশান কোণে বহুলা দেবী, অগ্নি কোণে কালিকা, নৈঋত কোণে রক্ষাকালী, বায়ু কোণে কালিকা দেবী এবং গ্রামের মধ্যস্থলে দুর্গা ও চণ্ডী দেবী অবস্থান করছেন। গ্রামের দক্ষিণ ভাগে ঘণ্টাকর্ণ ভৈরবের অবস্থানক্ষেত্র। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিগ্রহগুলির মধ্যে রাধা-বল্লভ, বৃন্দাবনচন্দ্র, রাধাগোবিন্দ, রাধাকান্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মনসা, শীতলা ও পীর-ফকিরের আস্তানা রয়েছে। রক্ষাকালী দেবীর সন্নিকটে ধর্মরাজ শিলা পূজিত হয়। নিত্য পূজা ব্যতীত জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় ধর্মরাজের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কাঁদড়ায় কৃষ্ণ বিগ্রহগুলিকে কেন্দ্র করে বহুকাল ধরে সাঁজি উৎসব পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে পিতৃপক্ষের নবমী তিথি হ'তে ৭ দিন ধরে বৃন্দাবনে রাধারাণীকে যেভাবে সাজান হয় অনুরূপভাবে এখানে সাঁজি উৎসবটি অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে মঙ্গলঠাকুরের সময় হতে। কাঁদড়ায় প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে জ্ঞানদাসের তিরোধান, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল ও একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় সা সাহেব নামে জনৈক পীরের সমাধিতে উরস উৎসব পালিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, রাধাবল্লভজীউর মন্দির সংলগ্ন গৌরাঙ্গডাঙ্গা নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গৌরাঙ্গদেবের আগমনের স্মারকচিহ্নস্বরূপ প্রস্তরফলক সংরক্ষিত আছে।

কাঁশরা (৪৪ ঃ জামালপুর) ঃ বর্ধমান শহর হ'তে সরাসরি বাস যোগে কাঁশরায় পৌঁছান যায়। এখানে একটি প্রাচীন শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিব-চতুর্দশীতে জাঁকজমক সহকারে শিবের বাৎসরিক পূজা হয়, কিন্তু বৈশাখ মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হওয়ায় অনুমান করা যায় যে, ইনি আদিতে ধর্মরাজ ছিলেন।

কুড়মুন (১০৬ ঃ বর্ধমান) ঃ বর্ধমান শহর হ'তে উত্তর-পূর্ব মুখে কুসুমগ্রামের পথে বাসযোগে কুড়মুন গ্রামে পৌঁছান যায়। কুড়মুনের উত্তরভাগ দিয়ে খড়ি নদী প্রবাহিত হয়েছে। বিনয় ঘোষ কুড়মুন গ্রামের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রথমতঃ গ্রামদেবতা ঈশানেশ্বর শিবের মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি হ'তে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৬৬৭ শকাব্দে (১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীনত্বের দ্বিতীয় নিদর্শনটি হ'ল এখানে মোকদুম সাহেবের আস্তানা আছে। শোনা যায় খাজা মোকদুম সাহেব ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী। ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করার পর বিহার শরীফ হ'তে ঘুরতে ঘুরতে তিনি কুড়মুন গ্রামে এসেছিলেন। এই আস্তানাটি মোল্লা পরিবারের আদি পুরুষ ফতে

আহম্মদ মোল্লার দ্বারা পরিচালিত হ'ত এবং তাঁর আদি নিবাস ছিল চৌঘুর রসুলপুর গ্রামে। মোকদুম সাহেবের 'রওজা' অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমান সকলেই যোগদান করেন। একটি প্রাচীন 'তায়দাদ' হ'তে জানা যায় যে, বর্ধমানের জমিদার কৃষ্ণরাম রায় ১০৯৩ সালে মোকদুম সাহেবের আস্তানার চেরাগি ফকিরান খরচ বাবদ নিষ্কর সম্পত্তি দান করেছিলেন। আস্তানার বর্তমান খাদিম হলেন মোল্লা রওশান আলির পুত্র মোল্লা মোরশেদ আলি। গ্রামের লোকেরা পীরের আস্তানায় পোড়ামাটির ঘোড়া ও ছাগ মানত করেন। নবান্নের সময় গ্রামের সমস্ত মানুষ পীরের স্থানে পুজো ও নৈবেদ্য প্রদান করেন। কুড়মুন গ্রামে ফকিরডাঙ্গা নামে একটি স্থান আছে। ফকির-ডাঙ্গায় কয়েকটি নিদর্শন হ'তে অনুমান করা যায় যে, এখানে একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল। একালে ঐ স্থানে ২/১ টি পাথরের থাম দেখা যায় যা উক্ত মসজিদের নিদর্শন-রূপে গণ্য করা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের উপাসনালয়টি হ'ল একটি মাটির ঘর ও খড়ের চাল বিশিষ্ট মসজিদ।

গ্রামের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছে কালাচাঁদ নামক ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তি। বৈশাখী পূর্ণিমায় কালাচাঁদের গাজন হয়। গ্রামের দুলে পাড়ায় ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায়। ঈশানেশ্বরের মূল মন্দিরে অধিষ্ঠিতা আছেন হস্তি পৃষ্ঠে আরোহিতা ইন্দ্রাণী দেবীর প্রস্তর মূর্তি। বঙ্গদেশে ইন্দ্রাণী মূর্তি অত্যন্ত বিরল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যে জানা যায় যে, ইন্দ্রাণী দেবীর অপর মূর্তিটি আছে রাজশাহী জেলায়। এই মন্দিরে ঈশানেশ্বর শিব সারা বছর অধিষ্ঠিত থাকেন ; কেবলমাত্র ১৩ই চৈত্র হ'তে ৩১শে বৈশাখ পর্যন্ত তিনি গাজন-তলার মন্দিরে থাকেন। ঈশানেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সন্তোষ মণ্ডল নামক গ্রামস্থ উগ্র ক্ষত্রিয় পরিবারের কোন ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে খড়ি নদীর কলমি সায়রের দহ হ'তে শিবলিঙ্গটি নিয়ে এসে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। চক্রবর্তী পরিবারের আরাধ্যা দেবী হ'লেন সিংহবাহিনী। গোবিন্দ দত্তের বাড়ীতে জয়দুর্গার শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামে পুণাহার নামক পুষ্করিণীতে প্রতি রবিবারে শিশুরোগে আক্রান্ত শিশুদের স্নান করান হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী রাধাগোবিন্দ দত্ত এই গ্রামে জন্মেছিলেন।

কুড়মুনের প্রধান উৎসব হ'ল শিবের গাজন এবং গাজন সম্পর্কিত খুঁটিনাটি বিবরণ ১৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

কুড়ুরিয়া ঃ দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের 'এ' জোন হ'তে ২ কিলোমিটার পশ্চিমে কুড়ুরিয়া গ্রামের অবস্থিতি। এখানে একটি প্রস্তর নির্মিত প্যানেলে সূর্য মূর্তির নিম্নাংশ আবিষ্কৃত হয়েছিল। সূর্য মূর্তিটিকে গ্রামের সর্বজনীন হরিমন্দিরে রাখা হয়েছে। এই মূর্তিটি আবিষ্কারের ফলে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, এক-সময়ে এতদঞ্চলে সূর্য পুজার প্রচলন ছিল।

কুমারডিহি (১৪ ঃ অণ্ডাল) ঃ অণ্ডাল মোড় হ'তে ৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে

কুমারডিহি গ্রামের অবস্থিতি ; আবার উখরা হ'তে সিলভার জুবিলী রোড ধরে এখানে যাওয়া যায়। কুমারডিহি, নবগ্রাম, ভাটমুড়া, নবঘনপুর ও চকঝরিয়া মৌজা নিয়ে কুমারডিহির এলাকাভুক্ত হয়েছে। অতীতে এই এলাকাটি ছিল জঙ্গলপূর্ণ, কিন্তু একালে ঐ জঙ্গল পরিষ্কার করে কয়লাখনি অঞ্চল গড়ে উঠেছে। কয়েক শতাব্দী পূর্বে বরিশালের রায়চৌধুরী উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ পরিবারের এখানে আগমনের পর হ'তে অঞ্চলটির শ্রীবৃদ্ধি হয়। সমগ্র এলাকাটি ২০টি পাড়া নিয়ে গঠিত। গ্রামের প্রধান প্রধান উৎসব ও মন্দিরগুলি জমিদারদের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দুর্গাপূজার মধ্যে চৌধুরী পাড়ায় বড় থান নামক দুর্গা মন্দিরে ৪ দিন ধরে তান্ত্রিক মতে দুর্গাপূজা হয়। নিকটবর্তী কোন্দা গ্রামের গ্রহবিপ্রগণ পূজায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া মেজ থান ও ছোট থানে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২/১ টি বাড়িতে পটপূজার প্রচলন আছে। কালীপূজার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, মুক্তকেশী কালী। এই দেবীর বর্ণ নীল। বাউরি পাড়ায় অগ্রহায়ণ মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজার পূর্বে গোয়ালা পাড়ায় সাড়ম্বরে ভগবতী পূজা হয় এবং এই পূজাতেও গ্রহবিপ্রগণ বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন। সরপী যাওয়ার পথে সায়র নামক দীঘির পাড়ে শিবমন্দিরে শিবরাত্রিতে বিশেষ উৎসব হয় এবং অত্র অঞ্চলে অনাবৃষ্টি হ'লে এই শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালা হয়। গ্রামে বুড়োরায় নামক ধর্মঠাকুর অধিষ্ঠিত আছেন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সায়র হ'তে দণ্ডী খাটতে খাটতে বুড়ো রায়ের থানে আসে এবং অনেকে নিজ নিজ বাহুতে শূল বিদ্ধ করে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সাড়ম্বরে ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। রায়চৌধুরীরা তাঁদের গৃহদেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যে-কোন ব্যক্তি দ্বিপ্রহরে লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে ভোগ ও প্রসাদ পাওয়ার অধিকারী। এই গ্রামের পাশের ছোটকুমারডিহিতে পীরের থানে নবগ্রামের মুসলমানেরা বাদ্য বাজাতে বাজাতে এসে মাটির ঘোড়া রেখে যায়।

গ্রামের মধ্যে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে, তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত শিবের শিখরদেউলটি। প্রতিষ্ঠালিপি হ'তে জানা যায় যে, ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে জমিদার রাজবল্লভ চৌধুরী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। জমিদার বাড়ির লক্ষ্মী-নারায়ণ জীউর মন্দিরটিও উক্ত মন্দিরের সমসাময়িক বলে অনুমান করা হয়। কুমারডিহির সঙ্গে নবঘনপুর গ্রামের সম্পর্ক আছে। জমিদার ঘনশ্যাম রায়চৌধুরীর নামানুসারে গ্রামনাম হয়েছিল নবঘনপুর। তিনি এই স্থানে একটি বিশাল বাঁধ ও পুষ্করিণী খনন করান। কিন্তু কোঁদা গ্রামের তান্ত্রিক সাধক ঘনশ্যাম গোস্বামীকে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা করায় জমিদার সমস্ত ধনদৌলত হারিয়ে নির্ধন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

কুমীরকোলা (৯ : খণ্ডঘোষ) : দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে খণ্ডঘোষ থানার উত্তরাংশে একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বর্ধমান-বাঁকুড়া রোডে বাসযোগে গ্রামের

কাছাকাছি যাওয়া যায়। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে হুগলী জেলার কাঁটাদহ নিবাসী পিয়ারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্থানে বসবাসের পর হতে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। পিয়ারীমোহন অত্যন্ত কৃতী পুরুষ ছিলেন। তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা বর্ধমানের মহারাজার দরপত্তনীদাররূপে এখানকার জমিদার হয়েছিলেন। এই বংশের অন্যতম সুসন্তান ছিলেন স্বর্গীয় জহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের প্রতিষ্ঠিত দুর্গোৎসবটি বিশেষ বৈচিত্র্যের অধিকারী। রেবতী-বলরাম বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ও রাধাগোবিন্দের মন্দিরটি আজও দেখা যায়। পৌষ মাসের রাধাগোবিন্দের বাৎসরিক পূজার সময় বিশেষ উৎসব ও ৪ দিন ধরে একটি মেলা হয়।

কুরুম্বা (১০৯ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ কাটোয়া অথবা কৈচর হ'তে বাসে ক্ষীরগ্রাম স্টপেজে নেমে ১ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এগিয়ে গেলে কুরুম্বা গ্রামে পেঁছান যায়। গ্রামের নাম কুরুম্বা হ'লেও মৌজার নাম হ'ল পূর্ব গোপালপুর! অনেকের মতে কূর্মস্থান বা ধর্মপূজার পীঠরূপে চিহ্নিত হয়েছিল বলে গ্রামের নাম হয়েছিল কুরুম্বা। আবার অনেকে দাবী করেন যে, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর এখানে আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তিনি গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করায় গ্রামের নাম হয়েছিল পূর্ব-গোপালপুর, কিন্তু উক্ত মতের অনুকূলে কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। ডাঃ সুকুমার সেনের মতে, অন্নের যিনি জননী তিনি কুরুম্বা নামে খ্যাত। গ্রামের মধ্যে অধিকারী বংশে মদনগোপাল ও রাধারাণী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানে কয়েকটি বিষ্ণু বাসুদেবের প্রাচীন মূর্তি রয়েছে, তন্মধ্যে ২½ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি বিষ্ণুমূর্তি দেখে মনে হয় যে, এটি ভাস্কর্য শিল্পের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। গ্রামের মধ্যে টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত জীর্ণদশাগ্রস্ত একটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। মুসলমান পাড়ায় ৩টি গম্বুজ ও ৪টি মিনার বিশিষ্ট যে মসজিদটি রয়েছে তার প্রতিষ্ঠালিপি বিনষ্ট হওয়ায় মসজিদের নির্মাণকাল জানা না গেলেও অনুসন্ধানের ফলে এ তথ্য পাওয়া যায় যে, ফুলন শেখ নামক এক ব্যক্তি এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং তাঁর পিতামহ আজম শাহ শেরশাহের আমলে বঙ্গদেশে এসেছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে কয়েক বৎসর যাবৎ মহোৎসব ও একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে উৎসব ও মেলা উভয়ই বন্ধ হয়ে গেছে।

কুলটি ঃ কুলটি থানার সদর কার্যালয় কুলটি শহরকে ঘিরে একটি শিল্প-শহর গড়ে উঠেছে। পূর্ব ভারতে সর্বপ্রথম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা কুলটিতে নির্মিত হয়েছিল। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি শিবমন্দির এবং শিব-মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে।

কুলাই (৬৫ ঃ কেতুগ্রাম) ঃ কাটোয়া শহর হ'তে প্রায় ১৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অজয় নদের তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ গোপাল ঘোষের বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব নামক তিন পুত্রের জন্মস্থানরূপে

গ্রামটি প্রসিদ্ধ এবং বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত আছে,—

"ধন্য রে গোপাল ঘোষ সকলি বৈষ্ণব।
যে কুলে জন্মিলা বাসু, গোবিন্দ, মাধব॥"

এছাড়া ঘোষ বংশীয় অন্যান্য উত্তররাঢ়ী কায়স্থ পরিবারের বসবাসের জন্য এই গ্রামের খ্যাতি আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ফতেসিং পরগণা হ'তে গোপাল ঘোষ এই স্থানে বসবাসের নিমিত্ত আসেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরদিবস শ্রীচৈতন্যদেব রাঢ় ভ্রমণকালে এখানে বিশ্রাম করেছিলেন বলে গ্রামটিকে বিশ্রামতলা নামেও চিহ্নিত করা হয়। কুলাই নিবাসী যাদব কবিরাজ, দৈত্যারি ঘোষ, কংসারি ঘোষ, প্রমুখ গৌরগণ মুগ্ধ ভক্তবৃন্দ শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। রামগোপাল দাস রচিত 'নরহরি শাখা নির্ণয় গ্রন্থে' পাওয়া যায় যে, দৈত্যারি ঘোষ ও কংসারি ঘোষ ৩টি নিমকাঠের গৌরবিগ্রহ নরহরি সরকার ঠাকুরের হস্তে অর্পণ করেন। নরহরির আদেশে মধ্যম ঠাকুর শ্রীখণ্ডে, ছোট ঠাকুর গঙ্গানগরে ও বড় ঠাকুরকে কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কুলাই গ্রামের সংলগ্ন স্থলে বাসুদেব ঘোষের সাধনপীঠ ছিল। বাসুদেব ঘোষ ছিলেন পদকর্তা ও মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ। শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ মূর্তি স্থাপন করেন এবং ঐ স্থান গোবিন্দ ঘোষের শ্রীপাট নামে খ্যাত। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধব ঘোষ গৃহী হলেও অষ্ট পার্ষদের অন্যতম পার্ষদ ছিলেন।

মাধব ঘোষের পরবর্তী বংশধরেরা দিনাজপুর রাজবংশের (মাতুল বংশের) জমিদারী লাভ করেন। এই বংশের মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায়বাহাদুর ও রায় রাধাগোবিন্দ বাহাদুর বিংশ শতকের প্রথম ভাগে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জমিদাররূপে খ্যাত ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, কুলাইয়ের ঘোষ বংশে মীনকেতন নামে একজন পদকর্তা জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কুলিনগ্রাম ঃ বিশেষ বিবরণ ১৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুলুট (৩২ ঃ কেতুগ্রাম) ঃ বাদশাহী সড়কের উপর অবস্থিত কুলুট গ্রামে হোসেন শাহের আমলে নির্মিত মসজিদটি এতদঞ্চলের প্রাচীনতম পুরাকীর্তির নিদর্শন। মসজিদটির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কিছু কিছু বিনষ্ট হ'লেও উক্ত মসজিদের টেরাকোটা অলংকরণগুলি পঞ্চদশ শতকের ভাস্কর্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। হোসেন-শাহী আমলে নির্মিত গৌড় ও হজরত পাণ্ডুয়ার মসজিদের অলংকরণের ন্যায় কুলুটের মসজিদের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে।

কুলুট (৭২ ঃ মন্তেশ্বর) ঃ কুসুমগ্রাম হ'তে পুটশুড়ি যাওয়ার পথে এই গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামটি বর্তমানে মুসলমান প্রধান হ'লেও অতীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের বসবাসের প্রমাণ রয়েছে বেনেপুকুর, ঠাকুরপুকুর ইত্যাদি পুষ্করিণীর নাম হ'তে। কিছুকাল পূর্বে গ্রামে একটি বটগাছ কাটার সময় গাছের নিম্নভাগে একটি শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়। গ্রামের মানুষের তত্ত্বাবধানে ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠানের

জন্য ৫টি মসজিদ আছে ; কিন্তু এগুলির প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা যায় নাই। গ্রামের দক্ষিণভাগে মকদম সাহেবের আস্তানায় প্রতি বৎসর উরস উৎসব উপলক্ষে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা যোগ দেয়।

কুসুমগ্রাম (৭১ ঃ মন্তেশ্বর) ঃ মেমারি অথবা বর্ধমান হ'তে সরাসরি এই গ্রামে পেঁছান যায়। এখানে মধ্যযুগে একটি ইসলাম সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল এবং বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান কুসুমগ্রামকে কেন্দ্র করে চারিদিকে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ কে. মল্লিক বা খুদাবক্স মল্লিক এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হ'ল ৩টি গম্বুজ ও চার মিনার বিশিষ্ট অষ্টাদশ শতকে নির্মিত মসজিদটি। অতীতে এই গ্রামে বিদ্যাচর্চার জন্যে কয়েকটি মাদ্রাসাও স্থাপিত হয়েছিল।

কেতুগ্রাম (৮৫ ঃ কেতুগ্রাম) ঃ কাটোয়া হতে সরাসরি বাসে ৪৫ মিনিট সময় কাটাতে পারলে ঈশানী নদীর তীরে কেতুগ্রাম থানার সদর কার্যালয়ে পেঁছান যায়। জনপ্রবাদ যে, চন্দ্রকেতু নামক একজন ভুস্বামীর নামে গ্রামের নামকরণ করা হয়েছিল কেতুগড়। বহুলা ও অট্টহাস নামক যুগ্ম মহাপীঠের অবস্থিতির জন্য শাক্তপীঠ কেতুগ্রামের খ্যাতি বহুকালের। শোনা যায়, ভুপাল নামক স্থানীয় রাজার গড়-বাড়ী ছিল গ্রামের পশ্চিমাংশে এবং এই শতকের গোড়ার দিকে উক্ত দালানের ধ্বংসাবশেষ দেখা গিয়েছিল। অতীতে এই গ্রামের নাম ছিল বহুলাপুর বা বহুলাপীঠ। তবে সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণব পদকর্তা রামগোপাল দাস গ্রামের নাম 'কেতুগ্রাম' বলে উল্লেখ করেছেন। বহুলাপুরের উত্তরাংশের নাম ছিল লাটভগবতীপুর এবং এখানে স্থানীয় জমিদারের আরাধ্যা দেবী বিশালাক্ষী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিশালাক্ষীর পুরোহিত ছিলেন চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের পূর্বপুরুষ ফুলিয়া (কীর্তিবাস ওঝার বংশ) হতে বসবাসের উদ্দেশ্যে এখানে আসেন। চণ্ডীদাসের উত্তরপুরুষ নৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের 'গণ-মার্তণ্ড'-এর টীকায় (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষিত) বর্ণিত আছে যে, তিনি ছিলেন কেতুগ্রামবাসী। চণ্ডীদাস পরিণত বয়সে বাশুলী বিগ্রহ সহ নানুরে গমন করেন। আজও নানুরের বিশালাক্ষী পূজায় মহানবমীর দিনে কেতুগ্রামের তিলিদের পূজার অগ্রাধিকার বলবৎ আছে।

প্রাচীন কেতুগ্রাম কেতুগড়, লাটভগবতীপুর, বহুলাপুর অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছিল। কেতুগ্রামের পটীবহুলাপুরে বহুলাদেবী একটি মন্দিরের মধ্যে আছেন। পূর্বে দেবী গ্রামের বহির্ভাগে মরাঘাটে ছিলেন, পরে মন্দির নির্মাণ করে গ্রামের মধ্যে দেবীকে নিয়ে আসা হয়। তন্ত্রচুড়ামণি মতে সতীর বামবাহু এই স্থানে পতিত হওয়ায় শাক্তপীঠ বহুলায় তিনি বহুলা দেবী নামে প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চ অতি সুন্দর মূর্তি, যা দেখলে চক্ষু সার্থক হয়। দেবীর ডান পার্শ্বে গণেশ ও বাম পার্শ্বে শক্তিধর। কিন্তু মূর্তিটি সর্বদাই কাপড়ে ঢাকা থাকে। দেবীর কোন ভৈরব এই গ্রামে নাই। শ্রীখণ্ডের ভুতনাথকে বহুলা ভৈরবরূপে পূজা করা হয়।

কেতুগ্রাম বা বহুলাপুর হতে এক কিলোমিটার দূরে বহুলা নদীর তীরে অবস্থিত মহাশ্মশানটি স্থানীয় লোকে মরাঘাট বলে। শিবচরিতে এই স্থানটি রণখণ্ড নামে উল্লিখিত। এখানে দেবী বহুলাক্ষী ও তাঁর ভৈরব মহাকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। নামের মিল থাকলেও বহুলা ও বহুলাক্ষী ভিন্ন দেবী। এই মহাশ্মাশানে তন্ত্র সাধনার জন্য বহু তান্ত্রিক সাধকের আগমন ঘটত। তান্ত্রিক সাধনার পীঠরূপে এখানে কালী পূজা ও শিবের গাজনের আধিক্য আছে। গাজন উপলক্ষে পার্শ্ববর্তী গ্রাম হতে বোলানের দল এসে অহোরাত্র বোলান গান করে এবং এটি গাজনের আকর্ষণীয় অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়েছে। কেতুগ্রামে প্রাপ্ত অষ্টভুজ গণেশ মূর্তি প্রাচীন ভাস্কর্যের উল্লেখ-যোগ্য অবদান। এখানে সাধক সনৎবাবা ও তাঁর পতিব্রতা স্ত্রীর (যিনি এতদঞ্চলে বড়মা নামে প্রসিদ্ধ) স্মরণে গীতা ভবনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৩৮৫ সালের ২৬শে মাঘ তারিখে। গ্রামের বাইরে 'বর্গীডাঙ্গা' ও 'ব্রহ্মডাঙ্গা' নামক দুটি বর্গীদের অবস্থান ও ব্রাহ্মণগণের বসবাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেতুগ্রামে এক সময়ে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বসবাস ছিল এবং তাঁরা মসজিদও নির্মাণ করেছিলেন।

কেন্দলো (২৮ ঃ ফরিদপুর) ঃ বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব হ'তে ৮ কিলো-মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে কেন্দলো বা কেন্দুলা গ্রামে সুপণ্ডিত ও সাধক বিরূপাক্ষ গোস্বামীর জন্মস্থান ও পীঠস্থান রূপে খ্যাত। এই গ্রামটি কেন্দলো-জগন্নাথপুর নামেও পরিচিত। বিরূপাক্ষ গোস্বামী কিছুকাল আঢ়া-বামুনাড়া গ্রামে আরাধ্যা দেবীর সাধনা করেছিলেন। শোনা যায়, অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে বিরূপাক্ষ গোস্বামী এখানে মহিষমর্দিনী মূর্তি ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, মহাষ্টমীর দিন দেবীর সম্মুখে রক্ষিত একটি থালায় সিন্দুরের চিহ্ন অঙ্কিত হ'লে অলৌকিকভাবে মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণ নির্ধারিত হয়েছিল এবং তারপর তিনি পূজা ও বলিদান সম্পন্ন করেন। উক্ত ঘটনা বিরূপাক্ষের জীবিতকালেই ঘটেছিল। বিরূপাক্ষের পুত্র কবীন্দ্রও একজন সিদ্ধ সাধক ছিলেন।

কেশবপুর (জামালপুর) ঃ কুলীনগ্রামের সন্নিকটবর্তী কেশবপুরে বিষ্ণুদাস আচার্যের বাসস্থান ও শ্রীপাট অবস্থিত ছিল। অনেকে অনুমান করেন, ইনি মাধবেন্দ্র পুরীর পূর্বাশ্রমের পুত্র জয়কৃষ্ণ দাস নামে খ্যাত ছিলেন।

কৈচর (১১৪ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ বর্ধমান বা কাটোয়া হ'তে সরাসরি বাস ও রেলপথের সঙ্গে এই গ্রামের যোগাযোগ আছে। একালে পল্লী অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসাকেন্দ্ররূপে কৈচরের প্রসিদ্ধি। গ্রামের মধ্যে মোরগতলায় প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে পঞ্চমী তিথিতে মনসাদেবীর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের পশ্চিম ভাগে মুসলমান পাড়ায় একটি পুরাতন মসজিদ আছে।

কৈতারা (৭৪ ঃ গলসী) ঃ গলসী হ'তে গোহগ্রামের পথে বাসযোগে কৈতারায় যাওয়া যায়। মল্লসারুল তাম্রশাসনে কপিত্থবাটক নামক স্থানের উল্লেখ আছে, যা ডক্টর সুকুমার সেনের মতে একালের কৈতারা গ্রাম। এখানে একসময়ে মাহাতা

উপাধিধারী কর্মকারেরা বসবাস করতেন। বর্তমানে কর্মান্তর গ্রহণ করে তাঁরা পুরাতন পিতলের তৈজসপত্র গালিয়ে নূতন দ্রব্য উৎপাদন করেন। এখানকার পিতলের দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল তেলের ঘটি, যার বিশেষত্ব হ'ল কোন পালিশের প্রয়োজন হয় না। গ্রামস্থ গন্ধবণিকেরা একসময়ে বর্ধিষ্ণু পরিবার বলে গণ্য হতেন। লাহা-পরিবারে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ও শ্রীধর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর রাস উৎসবের সময় মেলা বসে। কর্মকার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দালানমন্দিরে ভাদ্র মাসে মনসা পূজা হয়। গ্রামের মধ্যে সুউচ্চ শিবের শিখরদেউলটি কর্মকার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত। একটি আটচালা মন্দিরে বুড়োরায় নামক ধর্মশিলা নিত্য পূজিত হন। মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরটি ১৩৪৮ সালে নির্মিত হয়েছিল একথা ক্ষোদিত লিপি হ'তে জানা যায়। গ্রামের পূর্বভাগের একটি গাছতলায় বেদীতে বিশালাক্ষীর শিলামূর্তি স্থাপিত আছে। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের নবমী ও মহানবমী তিথিতে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণপাড়ায় রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩০২ সালের চৈত্র মাসে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব হয়। গ্রামের মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য কর্তৃক শিবের দক্ষিণমুখী শিখর দেউলটি ১৭৪৮ শকাব্দে নির্মিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠালিপি হ'তে জানা যায়, কৈতারা নিবাসী রামচন্দ্র মিস্ত্রী এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিল। গ্রামস্থ একটি দালান মন্দিরে ডোম পরিবারের কালিকাদেবীর মৃন্ময়ী মূর্তিটি কার্তিক মাসের অমাবস্যা হ'তে পরবর্তী বৎসরের মহালয়া পর্যন্ত পূজিত হন এবং মহালয়ার দিন দেবীকে বিসর্জন দেওয়া হয়। তারপর এক মাস ধরে ঘট ও যন্ত্রে দেবীর নিত্যপূজা হয় এবং পুনরায় কালী পূজার দিন দেবীর নূতন মৃন্ময়ী মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। ভট্টাচার্য পরিবারের জোড়া চালা মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, যার একটির নাম কৈবল্যেশ্বর শিব। একটি পরিত্যক্ত দালান মন্দিরে অতীতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মন্দিরটির দেওয়াল প্রায় ২ ফুট চওড়া।

কৈয়র (৯৬ ঃ খণ্ডঘোষ) ঃ বর্ধমান হ'তে বাসযোগে কৈয়র গ্রামে যাওয়া যায়। এখানে অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য বেদগর্ভের শ্রীপাট। শোনা যায়, সঙ্কীর্তনের সময় অভিরাম গোস্বামী বহু অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করেছিলেন। বেদগর্ভের সেবিত লক্ষ্মীজনার্দন বিগ্রহ ব্যতীত মদনগোপাল, বিজয়গোপাল ও রাইরাণীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বেদগর্ভের উত্তরপুরুষ আউলিয়া গোস্বামী একজন সিদ্ধ সাধক ছিলেন। গোস্বামী ও তাঁর সহধর্মিণীর সমাজ তারকেশ্বর হ'তে ১০ কিলোমিটার পশ্চিমে সোনালুপ গ্রামে অবস্থিত এবং ঐ গ্রামের গোপীনাথ মন্দিরে তাঁর পাদুকা রক্ষিত আছে। শ্রীধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী কৈয়রকে মোগল আমলের রাজস্ব আদায়ের কার্যালয় বলে উল্লেখ করেছেন।

কোটশিমূল (২০৮ ঃ রায়না) ঃ রায়না থানার সর্বদক্ষিণে অবস্থিত কোটশিমূল গ্রামের সঙ্গে মোগল আমলের ইতিহাস জড়িত আছে। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে

বঙ্গবারা খাঁ নামক একজন মুসলমান উজির সরকার সুলেমানাবাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে গড়বাড়ী নির্মাণপূর্বক বসবাস শুরু করেন ; কিন্তু তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করার প্রচেষ্টা করায় সম্রাটের নির্দেশে তাঁকে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়ার সময়ে পথিমধ্যে হীরক গলধঃকরণের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। বঙ্গবরা খাঁর স্ত্রী ও পুত্র সম্রাটের দয়া প্রার্থনা করায় তিনি তাঁদের কোটশিমূলে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন। বঙ্গবারা খাঁর পুত্র খানজাদ খাঁ এখানে সুপরিকল্পিতভাবে একটি গড়, প্রাসাদ ও একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। কোটশিমূল গড়ের দৈর্ঘ্য ছিল ১০৬০ ফুট এবং প্রস্থ ৮৯০ ফুট। গড়ের চতুর্দিকে ৭০ ফুট বিস্তৃত ও ৩০ ফুট গভীর একটি পরিখা খনন করা হয়েছিল। খানজাদ খাঁয়ের বদান্যতা ও বিলাসিতার জন্য এতদঞ্চলে একটি প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে,—"ব্যাটা যেন নবাব খানজাদ খাঁ।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, মনসামঙ্গলের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বঙ্গবারা খাঁয়ের অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন, সেকথা কবির উক্তি হতে জানা যায়।

কোন্দা (৭ : অণ্ডাল) : অণ্ডাল থেকে বাসযোগে অজয় নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত কোন্দা গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটির পরিচিতি হ'ল কোন্দা-গোবিন্দপুর নামে। এখানে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সাধক এবং সিদ্ধযোগী ঘনশ্যাম গোস্বামীর সাধন স্থান ছিল। ঘনশ্যাম গোস্বামী শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় মতের সাধনার সমন্বয় সাধন করেছিলেন, তাই এই শ্রীপাট সম্পর্কে প্রবাদ আছে,—

"নাড়াও নাড়ে পাঁঠাও কাটে।
দেখে এলেম কোন্দার পাটে॥"

ঘনশ্যামের অধস্তন অষ্টম পুরুষ দোলগোবিন্দ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যকিঙ্কর গোস্বামী ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে কোন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে তিনি জ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নিকট যোগদীক্ষা ও সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করে ভাস্করানন্দ সরস্বতী নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কোঁয়ারপুর (৯৬ : মঙ্গলকোট) : কৈচর হ'তে একটি পাকা রাস্তা ধরে কোঁয়ারপুরে পৌঁছান যায়। কোঁয়ারপুর নামকরণের মধ্যে কোঁয়ার সদ্গোপ জাতির বাসস্থান অথবা কোঁয়ার উপাধিধারী পরিবারের বসবাসের স্থান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোঁয়ারপুরের লোকসংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে রয়েছেন দেবী যোগাদ্যা। নেপাল ভাস্করের তৈরী দেবী মূর্তিটি স্থাপত্য শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। যোগাদ্যা পূজায় বাগদী সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। দেবীপূজায় গ্রামের সকল মানুষ যোগ দিলেও বাগদীদের ভূমিকা রয়েছে সর্বপ্রথম। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর পূজা পদ্ধতি দেখে এখানে পূজা শুরু হয়েছিল। সম্ভবতঃ ক্ষীরগ্রাম হ'তে কোন গোষ্ঠি এখানে বসবাস করার সময় যোগাদ্যা পূজার প্রচলন করেছিলেন। এই গ্রামে বৈষ্ণব ধর্মেরও প্রভাব আছে। রাধামাধবের সেবা প্রতিষ্ঠা হ'তে তার প্রমাণ মেলে। এখানে ১২১১, ১২৫৮ ও ১২৬১ বঙ্গাব্দে

নির্মিত ৩টি শিবমন্দির ব্যতীত একটি রঘুনাথ মন্দিরের অস্তিত্ব রয়েছে। মাথরুন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন সময়ে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁর একটি শুভেচ্ছা বার্তায় লিখেছিলেন,—

"মাথরুন যবে অজ্ঞাত ছিল কাটোয়া বহুদূর।
জ্ঞানের আলো জ্বালিল যে এই সে কোঁয়ারপুর॥"

কবির উক্তি হ'তে স্বচ্ছন্দে মন্তব্য করা যায় যে, এই গ্রামে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' ধনপতি সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে কোঁয়ারপুরের উল্লেখ আছে।

ক্ষীরগ্রাম (১২৮ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ বর্ধমান অথবা কাটোয়া হতে সরাসরি বাসযোগে এই গ্রামে পেঁছান যায়। গ্রামের মধ্যে বিশাল চত্বরে অবস্থিত মন্দিরে যোগাদ্যা দেবীর নিত্যপূজা অনুষ্ঠিত হয় ঘটে ও যন্ত্রে। দেবীর প্রস্তর নির্মিত মহিষমর্দিনী মূর্তি বারমাস জলের মধ্যে থাকে। ৩১শে বৈশাখ মহাপূজার দিন সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য একটি ছোট মন্দিরে রাখা হয় এবং হাজার হাজার লোক দেবীদর্শনের নিমিত্ত উপস্থিত হয়। মহাপূজা উপলক্ষে ১৫ দিনব্যাপী মেলায় বহু দূর দূর গ্রাম হতে যাত্রীরা উপস্থিত হন। এই প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রামে বার মাসে তের পার্বণ লেগে আছে। মহিষমর্দিনী মূর্তি গ্রামে নিত্য সেবাপূজা লাভ করায় দুর্গাপূজায় মূর্তিপূজা হয় না। পাঁচটি পরিবারে নবপত্রিকায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অগ্রহয়াণ মাসে নবান্ন উৎসব হল এই গ্রামের অন্যতম সর্বজনীন উৎসব। এছাড়া মনসা পূজা, দোল, সরস্বতী পূজা, গ্রহ পূজা, ধর্মরাজ, গাজন ইত্যাদি উৎসব বৎসরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। তন্ত্র সাধনা ও শাক্তপীঠরূপে খ্যাত ক্ষীরগ্রামের কালী পূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। যোগাদ্যা মন্দিরের অনতিদূরে দেবীর ভৈরব ক্ষীরকন্টক মহাদেবের নিত্যপূজার জন্য এক উঁচু মন্দির আছে। দূর-দূরান্তরের যাত্রীদের জন্য একালে একটি যাত্রীনিবাস নির্মিত হয়েছে যা পল্লীগ্রামে বিরল। এই গ্রামে একটি প্রচলিত লোক-সংস্কার ছিল যে, দেবী ও তাঁর ভৈরবের সেবাপূজার স্থান ভিন্ন পাকা ইষ্টক নির্মিত গৃহ তৈরী করা নিষেধ। সেকারণে বিত্তশালী ব্যক্তিগণের পারিবারিক বিগ্রহ মাটির ঘর ও খড়ের চালের গৃহে সেবাপূজা পেয়ে থাকেন। গ্রামে বিভিন্ন দেবদেবী সেবা-পূজার প্রচলন থাকলেও সমগ্র গ্রামের লোকসংস্কৃতির ধারা দেবী যোগাদ্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। (বিশেষ বিবরণ ৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

খাজুরডিহি (১২৮ ঃ কাটোয়া) ঃ কাটোয়া শহর হ'তে সরাসরি বাসযোগে এই গ্রামে পেঁছান যায়। গ্রামটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু। মোগল আমলে বঙ্গাধিকারী ভগবান রায়ের আদি বাসস্থান ছিল এই গ্রামে। ভগবান রায়ের পুত্র হরিনারায়ণ রায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে অর্ধেক বঙ্গের কানুনগো নিযুক্ত হন। তিনি স্বগ্রামে হরিসাগর নামে হ্রদতুল্য এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করান। 'শিবাখ্যা কিঙ্কর-'নামক একটি কাব্যগ্রন্থ হতে জানা যায়, খাজুরডিহি গ্রামে কোন উগ্রক্ষত্রিয়ের বাড়ী হতে দেবী শ্যামা-

রূপাকে জোরপূর্বক নিয়ে গিয়ে শ্যামারূপাগড়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

খটনগর (৪৪ ঃ আউসগ্রাম) ঃ পাণ্ডুরাজার ঢিবি পরিদর্শন করে পার্শ্ববর্তী খটনগর গ্রামে গেলে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর মন্দির চোখে পড়বে। গ্রামস্থ রায় পরিবার দাবি করেন যে, ১১০০ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে মূলচাঁদ রায়ের বসবাসের ফলে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত পঞ্চরত্ন লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটি মূলচাঁদ রায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মন্দিরটি প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ। এছাড়া একটি চারচালা শিবমন্দির রয়েছে যার উপর তাম্রকলস স্থাপিত আছে। এছাড়া রেখদেউল রীতিতে নির্মিত ও টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত অপর একটি শিবমন্দির রয়েছে। রায় পরিবারের বাসস্থানের সন্নিকটেই একটি দুর্গাদালান আছে। দুর্গাদালানে শ্বেত প্রস্তরের উপর ক্ষোদিত প্রতিষ্ঠালিপি হ'তে জানা যায়, ১৫৩৭ শকাব্দে ৺কীর্তিচাঁদ রায় কর্তৃক এটি নির্মিত হয়েছিল ; কিন্তু মন্দিরটির প্রাচীনতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। গ্রামের বহির্ভাগে প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ একটি রেখদেউলের মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরের টেরাকোটা অলংকরণগুলি অত্যন্ত উচ্চমানের। কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও সম্প্রতিকালে একটি শ্বেত পাথরের উপর ক্ষোদিত আছে যে, "এই মন্দির মূলচাঁদ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত—১১৮০।" রায় পরিবারের দোলমঞ্চটিতে দোলযাত্রার সময় রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহকে স্থাপন করা হয়।

খণ্ডঘোষ (১৮ ঃ খণ্ডঘোষ) ঃ বর্ধমান শহর হ'তে বাসযোগে সরাসরি খণ্ডঘোষ থানার সদর কার্যালয়ে পেঁছান যায়। ৩২টি পাড়া নিয়ে গঠিত এই গ্রামটি মোগল আমলে খণ্ডঘোষ পরগণার সদর কার্যালয় ছিল। সুপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ স্যার রাসবিহারী ঘোষের পৈত্রিক বাসস্থানের জন্য গ্রামটি প্রভূত গৌরবের অধিকারী।

গ্রামটি যেমন বিরাট তেমনি বছরের অধিকাংশ সময় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজো, উৎসব ও মেলায় মুখরিত হ'য়ে থাকে। তন্মধ্যে বৈশাখী পূর্ণিমায় বুড়ো-শিবের গাজন, পৌষ মাসের অমাবস্যায় রক্ষাকালীর পূজো, মাঘ মাসের চতুর্দশীতে রটন্তী কালী পূজো, রাধাবল্লভজীর রাস, দোল ও ঝুলন উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। মদনগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন স্যার রাসবিহারী ঘোষের পরিবারে। মদনগোপালের পঞ্চম দোল ও রাস উপলক্ষে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামে অপর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব হ'ল কমললোচন নামক ধর্মঠাকুরের পূজো উপলক্ষে নবম দোল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বুড়োশিবের গাজন উৎসবটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সার্বজনীন।

খানহাটি (১০৯ ঃ গলসী) ঃ গলসীর দু' কিলোমিটার পশ্চিমে খানহাটি গ্রামের অবস্থিতি। খানহাটিতে দশহরা উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে। গ্রামটি হ'ল মুসলমান প্রধান এবং এখানে একটি প্রাচীন মসজিদ ও ঈদ্গাহ আছে।

খান্দরা (৩২ ঃ অণ্ডাল) ঃ অণ্ডাল হ'তে বাসে অথবা উখরা স্টেশন হ'তে খান্দরা

বা খাঁদড়া গ্রামে যাওয়া যায়। সম্ভবতঃ খন্দ জাতির বসবাস হ'তে খান্দরা গ্রাম নামটি এসেছে। এখানে একসময়ে সদ্গোপ সম্প্রদায়ের আধিপত্য ছিল। সরকার বংশের আদি পুরুষ গজদানী রামদাসের সময় হ'তে এই গ্রামের প্রসিদ্ধি। শোনা যায় এই বংশের কালিদাস গজদানী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুলেমান খান নাম গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ তাঁর অধিকৃত জমিদারী খানরাজ্য হ'তে খানরা অপভ্রংশে খান্দরা হয়েছে। এই বংশের অপর একটি শাখা—শাক্ত ধর্মাবলম্বী হ'য়ে মহিষমর্দিনী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দেবী বুড়িমা নামে প্রসিদ্ধা। কালক্রমে শাক্ত বংশ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হ'য়ে গৌরাঙ্গ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যুগলকিশোর সরকার ১৬৩৪ শকাব্দে প্রস্তর-নির্মিত রাধামাধবজীর পঞ্চরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে কয়েকটি শিবমন্দির আছে। তন্মধ্যে নীলকণ্ঠ শিবের মন্দিরটি সর্বপ্রাচীন। ভুবনেশ্বর শিবের প্রস্তরনির্মিত সপ্ত রথাকৃতি মন্দিরটি আজও অটুট আছে। রত্নেশ্বর শিবের মন্দিরটিও বহুকালের। গ্রামে কালীপুজার সমারোহও যথেষ্ট। শোনা যায়, বীরভূম জেলার কাশপেকন্যা নিবাসী কিশোরীমোহন দাস গোপালজীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই বংশের গোবর্ধন বক্সী আনুমানিক ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম দুর্গাপুজো প্রচলন করেন।

গিরিধারী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বক্সী পরিবারের দ্বারা। গ্রামের উৎসবগুলি প্রধানতঃ বৈষ্ণব পাল-পার্বণকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে খান্দরা অঞ্চলে মিলিটারি শিবিরটিতে প্রধানতঃ আমেরিকান সৈন্যরা থাকতেন। সৈনাধ্যক্ষ কর্নেল প্লেজ গ্রামবাসীদের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহারের জন্য প্রাচীন লোকেরা এখনও তাঁকে বিস্মৃত হয়নি। খান্দরা গ্রামের সঙ্গে রামপ্রসাদপুর, দক্ষিণখণ্ড, মধুসূদনপুর, পাণ্ডবেশ্বর, ধবনী, সরপী, ইছাপুর গ্রামের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জড়িত আছে।

খুদকুড়ি (৬৯ : খণ্ডঘোষ) : বর্ধমান শহরের দক্ষিণে দামোদরনদ পার হ'য়ে খণ্ডঘোষ থানার উত্তরাংশে অবস্থিত খুদকুড়ি গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামে জনৈক উগ্র-ক্ষত্রিয়ের বাড়ীতে একটি ধর্মশিলার নিত্যসেবা পুজো হ'য়ে থাকে। নিত্যসেবায় আতপ চাউলের পরিবর্তে এক সের সিদ্ধ চাউলের ডালি দেখে অনুমান করা যায় যে, সেবাইত নিত্য আহার্য বস্তু দেবতাকে নিবেদন করছেন। ধর্মের জাত উৎসবের সময় পাল্কি করে ধর্মশিলাকে ঘাটে নিয়ে আসা হয় এবং ভক্তেরা পুকুরের ঘাট হ'তে মন্দিরের দরজা পর্যন্ত মাটিতে গড়াতে গড়াতে আসেন। জাত উৎসবের ভক্তদের লোটা ভক্তা বলা হয়। লোটা শেষ হলে ফুল খেলা শুরু হয়। মন্দির প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে আগুন জেলে কাঠ পোড়ান হয়। অতঃপর জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি প্রত্যেক ভক্তের হাতের তালুর উপর তুলে দেওয়ার বিধি আছে। জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি নিয়ে ভক্তরা দুই হাত দিয়ে লোফালুফি করেন। মনে হয় যেন তাঁরা ফুল নিয়ে খেলা করছেন। ফুল খেলার পর ফুল চাপান শুরু হয়। গ্রামবাসীরা নিজেদের নামে একটি করে শ্বেতপদ্ম

দেবতার উদ্দেশ্যে পুরোহিতের হাতে তুলে দেন। তাঁদের ধারণা যদি ফুলটি চাপান মাত্রই পড়ে যায় তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। বাৎসরিক পূজার পরের দিন দুপুরে গ্রামের ৩টি ধর্মশিলাকে অন্য একটি পুকুরে স্নানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময়ে ভক্ত ব্যতীত অপর কেহ ধর্মশিলা স্পর্শ করতে পায় না। স্নানান্তে ধর্মশিলাগুলিকে স্ব স্ব মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার পর ভক্তরা উত্তরীয় খুলে নিয়ম ভঙ্গ করেন। অতঃপর সকলে একত্রে আহারাদি কার্য সমাপন করেন। অতীতে ধর্মপূজার অন্যতম অঙ্গ ছিল চড়ক অনুষ্ঠান। চড়ক হল আদিম সূর্যপূজার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। কিন্তু কোন এক সময়ে চড়কে এক ভক্তার মৃত্যু ঘটায় চড়ক উৎসবটি একালে বন্ধ হয়ে গেছে। ধর্ম-পূজার আচার-আচারণের বহিরঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব থাকলেও অনুষ্ঠানগুলি একেবারেই আদি অধিবাসীদের ধর্ম অনুষ্ঠান এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই।

গঙ্গাটিকুরি (৯৫ ঃ কেতুগ্রাম) ঃ কাটোয়া-বারহাওড়া রেলপথে গঙ্গাটিকুরি স্টেশনে নেমে গ্রামে যাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ রসসাহিত্যিক ও আইনজ্ঞ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈত্রিক বাসভূমি ছিল এই গ্রামে। ইন্দ্রনাথের সুযোগ্য বংশধর শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৩৬৮ সালে ইন্দ্রনাথের বাসগৃহে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল। সেদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ডক্টর কে. এল. শ্রীমালি, ডক্টর সুধীররঞ্জন দাস, ডক্টর নীহার-রঞ্জন রায়, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, ডক্টর প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ রায়চৌধুরী, অতুল্য ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো) ইত্যাদি অনেকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, সেদিনের সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে তৃপ্ত করেছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক।

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই গ্রামে অভয়াচরণ চতুষ্পাঠী নামে একটি টোল স্থাপিত হয়েছিল। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে গ্রামের বুড়োশিবতলায় সাড়ম্বরে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

গড় ঃ জেলা পরিক্রমাকালে ও বিভিন্ন সূত্র হ'তে বর্ধমান জেলায় বহু গড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই গড়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,—(১) তালিত গড় বা মহব্বৎ গড় (২) কোটশিমুল গড় (৩) শক্তিগড় (৪) রামচন্দ্রগড় (ভাটাকুল) (৫) অমরার গড় (৬) সেনপাহাড়ী গড় (৭) শ্যামারূপা গড় (৮) নরপাল গড় (কামারকিতা) (৯) সমুদ্রগড় (১০) পানাগড় (১১) রাজগড় (১২) গড় সোনাডাঙ্গা (১৩) চুরুলিয়া গড় (১৪) ডিহিসেরগড় বা ডিসেরগড় (১৫) কালনার গড় (১৬) গড় মুর্শিদপুর (কাটোয়া) ও (১৭) শাঁকাইয়ের গড়। এছাড়া 'আইন-ই-আকবরী'তে মঙ্গলকোটের দুর্গ ও রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থে বর্ধমান দুর্গের উল্লেখ আছে। উপরোক্ত গড়গুলির সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করলে আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা যেতে পারে।

গড় সোনাডাঙ্গা (৮৭ ঃ মন্তেশ্বর) ঃ কুসুমগ্রাম হ'তে বাস-রাস্তা ধরে গড় সোনাডাঙ্গায় যাওয়া যায়। জনশ্রুতি যে, এই স্থানে আদিশূরের আমলে একটি গড় ছিল এবং আদিশূরের ধনাগারটিও এখানে অবস্থিত ছিল বলে অনেকের বিশ্বাস।

ব্যাপক অনুসন্ধানের দ্বারা এই প্রাচীন গ্রামের পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

গড়ুই ঃ আসানসোল শহর হ'তে ৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে গড়ুই গ্রামে একটি প্রস্তরনির্মিত মন্দির রয়েছে। প্রস্তরনির্মিত এই শিখরদেউলটি বর্ধমান জেলার পুরাকীর্তির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মন্দিরের মধ্যে নারায়ণশিলা বিগ্রহ অবস্থিত আছে। নিত্যপূজা ব্যতীত ঝুলন ও দোলযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩১-৩২ খ্রীস্টাব্দে পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্ট (পৃষ্ঠা ৩৮) হ'তে জানা যায়—"The temple being the only one of the carved cornice type made in stone, great care were taken to give a faithful reconstruction of the original shape, and detailed drawing have been supplied for the guidanee of the P. W. Department." রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture' (page 95) গ্রন্থ হ'তে জানা যায় যে, গড়ুইয়ের বিষ্ণুমন্দিরে নাগছত্রধারী ও দ্বাদশ বাহু সমন্বিত একটি লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গন্তার (১৬৭ ঃ মেমারি) ঃ মেমারি স্টেশন হ'তে মন্তেশ্বরের বাস-রাস্তা ধরে গন্তার গ্রামে পৌঁছান যায়। প্রতি বৎসর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সীতানবমী তিথিতে চণ্ডীপূজা উপলক্ষে ৭ দিনের জন্যে একটি মেলা বসে। প্রাচীন চণ্ডীর দেউলটি টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত ও মনোমুগ্ধকর। স্থানীয় লোকের দাবী এই যে, গন্তার হ'ল একটি সতীপীঠ এবং এখানে সতীর কর্ণ পড়েছিল—সেকারণে পূর্বে গ্রামটির নাম ছিল কন্তার যা অপভ্রংশে একালে গন্তারে রূপান্তরিত হয়েছে ; কিন্তু কোন তন্ত্রশাস্ত্রে বা পীঠ-নির্ণয় গ্রন্থে কন্তার বা গন্তারের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

গলসী (৯৯ ঃ গলসী) ঃ বর্ধমান হ'তে বাসযোগে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে গলসী গ্রামে পৌঁছান যায়। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে গল-পাশী হ'তে গলসী গ্রামনামটি এসেছে, কিন্তু এই মতটি গ্রহণ করার পক্ষে প্রধান অন্তরায় হ'ল যে, গ্রামটি তাহলে অর্বাচীনকালের হ'তে হয়, কিন্তু গ্রামদেবতা গর্গেশ্বর ও ধর্মরাজের পূজাপদ্ধতি দেখে অনুমান করা যায় যে গ্রামটি অত্যন্ত প্রাচীন। ডক্টর সত্যনারায়ণ দাসের মতে গর এই জলবাচক শব্দটি কোন এক সময়ে গল-এ রূপান্তরিত হয়েছে। গ্রামের মধ্যস্থলে একটি আটচালা মন্দিরে গর্গেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। গাজনের সময় মন্দির প্রাঙ্গণে স্থানীয় অঞ্চলের বিভিন্ন শিবের নামে জয়ধ্বনি দেওয়ার রীতি হ'তে অনুমান করা যায় যে, আদিতে আশপাশ গ্রামের শিবপূজাগুলির মধ্যে গর্গেশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব কিঞ্চিৎ অধিক ছিল। গ্রামে একটি দালান মন্দিরে ধর্মরাজের শিলামূর্তি পূজিত হয়। উক্ত মন্দিরের মধ্যে অষ্টভুজা দুর্গামূর্তিটি জয়কালী ধ্যানে পূজিত হয়। শ্রাবণ মাসে যে কোন শনি অথবা মঙ্গলবারে ধর্মরাজের গাজন হয়। গাজনের সময় ধর্মরাজের শিলামূর্তিটি গ্রামস্থ মসজিদটির পাশে একটি বেদীর উপর সারাদিন

রাখা হয় এবং রাত্রে পুনরায় মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। চড়কের পূর্বদিন দাদুর ঘাটা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ধর্মরাজের পূজার মন্ত্র হল, 'ধ্যাং ধিং ধুং জোলার বুড়োস্যা ধর্মরাজায় নমঃ।' চৈত্র মাসে শিবের গাজন হয় না। শ্রাবণ মাসে ধর্মরাজ ও গর্গেশ্বরের গাজন একত্রে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সময়ে একটি মেলা বসে। ধর্মরাজের দালান মন্দিরটি কোন সময়ে নির্মিত হয়েছিল সে কথা জানা যায় না, কিন্তু মন্দিরটি ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম সংস্কার করা হয়েছিল। উক্ত সংস্কার লিপিটি মন্দিরে গাঁথা আছে। গ্রামে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দিরের মধ্যে দত্ত পরিবারের শিবের শিখরদেউল, মুখার্জী পরিবারের ২টি শিখরদেউল ও ৩টি আটচালা মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। গাঙ্গুলি পরিবারের শিখরদেউলটি ১৮১২ শকাব্দে নির্মিত হয়েছিল এবং এই মন্দিরটির শিল্পী হ'লেন ইন্দ্রনাথ সূত্রধর। এছাড়া গাঙ্গুলী পরিবারে নির্মিত শিবমন্দিরটি ১৭৭৬ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মন্দিরের টেরাকোটা অলংকরণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল শিব ও কালীর চিত্রটি। একটি দালানমন্দিরে শ্রীধর বিগ্রহের নিত্যপূজা হয়।

গ্রামকুলটি (১৪৬ ঃ কালনা) ঃ বৈঁচি রেলস্টেশন থেকে উত্তর দিকে বেহুলা নদী অতিক্রম করে গ্রামকুলটিতে বা কুলটিগ্রামে যাওয়া যায়। ১৭১৫ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরটি এই গ্রামের শীল পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া নন্দী পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আটচালা শিবমন্দিরটি ১৬৮২ শকাব্দে নির্মিত হয়েছিল সেকথা মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি হ'তে জানা যায়। এই গ্রামের গ্রামদেবী হ'লেন 'রক্ষমা' কালী। শিবের গাজন উৎসবটি বেশ জাঁকজমক সহকারে অনুষ্ঠিত হয়।

গুসকরা (১৫৮ ঃ আউসগ্রাম) ঃ বর্ধমান হতে সরাসরি রেলপথে গুসকরায় পেঁছান যায়। অতীতে গ্রামরূপে চিহ্নিত হ'লেও একালে শহরের মর্যাদা লাভ করেছে। শহরের উত্তরভাগে কুনুর ও দক্ষিণে ঘুসকরা নদী প্রবাহিত। মুকুন্দ-রামের চণ্ডীমঙ্গলে ঘুসকরা নদীর উল্লেখ আছে। অষ্ট্রিক ভাষায় "কুড়" শব্দের অর্থ হ'ল আবাসস্থল। মনে হয় গ্রাম পত্তনের সময় 'ঘুস' নদীর তীরে আবাসস্থলটির পত্তন হওয়ায় স্থাননামটি ঘুসকরা বা অপভ্রংশে গুসকরায় পরিণত হয়েছে। গ্রামটি একসময়ে আদিবাসী অধ্যুষিত পল্লী ছিল। চট্টগ্রাম হ'তে আগত চোঙদার পরিবার বর্ধমানের রাজার নিকট হ'তে পত্তনী বন্দোবস্তের ফলে গ্রামটি নূতন রূপ লাভ করেছে। নদীর তীরে রমনা নামক শ্মশানভুমিতে একটি তেঁতুলতলায় বেদীতে দেবী চণ্ডীর প্রতীকরূপে তিনটি প্রস্তরখণ্ড রক্ষিত আছে। চোঙদার পরিবারের বাস্তুদেবী হ'লেন দেবী রমনা। অনেকে মনে করেন তিনি কোন বৌদ্ধ দেবী। বিগত শতকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একসময়ে রমনা শ্মশানের নিকট আশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু কোন এক বিশেষ কারণে তিনি গুসকরায় আশ্রম স্থাপনের পরিবর্তে বোলপুরের কাছে ভুবনডাঙার চলে যান। এখানে দ্বাদশটি শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামের উত্তরভাগে মাঠের মধ্যে নবরত্ন শোভিত সোমেশ্বর শিব

মন্দির ১৩২১ সালে নির্মিত হয়েছিল। এই শিবমন্দিরের সম্মুখভাগে মন্দির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠকাল ক্ষোদিত আছে।

শ্রীশ্রীসোমেশ্বর শিবঃ স্থাপিত সন ১৩২১ সাল—তারিখ ২৪শে মাঘ।
"ভবান্যাঃ পদাব্জং স্মরন্তীমদশ্চ শকে ষট ত্রিনাগেদেন্দুমে
ভাস্করেবহ্নি তপস্তন্ত্বরাহে গতা স্বস্তিবদানী তদীয়াহম্ভুতার্থ পিতা
গুরোরাজয়া শ্রীমৎ সোমনাথেশ্বর স্থাপনার্থাং ধনেশোহন
স্মৃতের্বাঞ্জকং শান্তয়ে স্বাত্মনশ্চ শিবপ্রিতয়েহকারয়নাসিবংসৎ।"

কুনুর নদীর তীরে নির্জন প্রান্তরে সাধন ভজনের উপযুক্ত স্থানে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। মন্দিরের উত্তরভাগের প্রাঙ্গণে অজ্ঞাতনামা কোন এক সাধকের সমাধি আছে। কৃষি অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত হ'য়েও পরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য গুসকরায় একটি ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

গোতান (২০২ : রায়না) : বর্ধমান শহর থেকে দামুন্যার বাসে গোতান গ্রামে পেঁছান যায়। রম্বা নদীর বাম তীরে অবস্থিত গোতান গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুকুমার সেনের জন্মস্থান। গোতানের বিপরীত দিকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি মুকুন্দরাম দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রামে অতীতে একটি বিশাল প্রস্তরনির্মিত মন্দির ছিল, যার ধ্বংসাবশেষের কয়েকটি নিদর্শন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে; গোতানের ক্ষয়প্রাপ্ত দেউলপোতা ঢিবি হতে কিছু পুরাবস্তুর সন্ধান মিলেছিল বলে স্থানীয় লোকেরা দাবী করেন। বাস-স্ট্যাণ্ড-এ টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত অষ্টাদশ শতকের নির্মিত একটি মন্দির ধ্বংসের প্রতীক্ষায় আছে।

গোপালদাসপুর (১১৮ : কালনা) : বৈদ্যপুর হ'তে ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে গোপালদাসপুরের অবস্থিতি। প্রবাদ আছে যে, প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে কানু গোস্বামী নামক এক বৈষ্ণব সাধক এখানে রাখালরাজ বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। কানু গোস্বামী কাটোয়ার সন্নিকটবর্তী খট্টো গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং কোন এক শূদ্র ব্যক্তিকে দীক্ষা দেওয়ার অপরাধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক ভর্ৎসিত হওয়ায় গ্রাম ত্যাগ করেন। গ্রাম পরিত্যাগের পর গোপালদাসপুরের মাঠে দেওয়ান গোপীনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। দেওয়ানজি রামকানুকে কিছু নিষ্কর ভূমি দানপূর্বক গোপালদাসপুরে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করেন। এই গ্রামে গোপীনাথ ও রাখালরাজের দারু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রাখালরাজের অঙ্গরাগ হয়। নববর্ষের দিন রাখালরাজের গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষে বিগ্রহকে মন্দিরের বাইরে স্থাপন করা হয় এবং দর্শনার্থীরা দেবদর্শন করেন। এছাড়া জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব ও রামনবমীতে বিশেষ উৎসব হয়। কালীপূজার পরের দিন গোপার্বণ উপলক্ষে এখানে বহুকাল গোবর্ধন পূজা হয়ে আসছে।

গোপালপুর (২৬ : কেতুগ্রাম) : কাটোয়া হ'তে ছোট রেলপথে গোপালপুরে

পেঁছান যায়। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এই গ্রামের রাঘব চক্রবর্তীর কন্যা পদ্মাদেবীর সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। রাঘব চক্রবর্তী ও তাঁর পত্নী মাধবী দেবী স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে শ্রীনিবাস আচার্যের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেন।

গোপীকান্তপুর (৫৬ ঃ জামালপুর) ঃ মসাগ্রাম স্টেশন হতে বাসযোগে চকদীঘি পেঁছে, তথা হতে ৩ কিলোমিটার পূর্বে হাঁটাপথে গোপীকান্তপুর গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামের ½ কিলোমিটার দক্ষিণে দামোদরের একটি প্রাচীন খাতের ধারে বনের মধ্যে রয়েছে রঙ্কিণী দেবীর অধিষ্ঠানক্ষেত্র। দেবীর নিত্যপূজা ব্যতীত ফাল্গুন মাস হতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবারে বিশেষ পূজা হয় এবং ১লা বৈশাখ রঙ্কিণী দেবীর চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। (১৫২ পৃষ্ঠার রঙ্কিণীমহল্লা দ্রষ্টব্য)।

গোবর্ধনপুর (১২৪ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ সাঁওতা স্টেশন হ'তে ৩ কিলোমিটার পূর্বে এই গ্রামের অবস্থিতি। শিশুদের রোগ নিবারণের জন্য ভয়ে ভীত স্থানীয় অধিবাসীরা মাসীপিসীর মন্দিরে পূজা দেয় ও মানত শোধ করে। ৩০শে বৈশাখ এখানে যোগাদ্যা পূজা হয়। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর পূজার সঙ্গে বহুকাল ধরে গোবর্ধনপুরের সম্পর্ক থাকায় মহাপূজার দিন মাসীপিসীর ঝাঁপি নিয়ে গোবর্ধনপুরের পুরোহিত যোগাদ্যা বাটীতে উপস্থিত হন।

গোস্বামীখণ্ড (৪২ ঃ আউসগ্রাম) ঃ আউসগ্রাম থানার উত্তরাংশে অবস্থিত রামনগর বাস স্টপেজ হ'তে পায়ে হেঁটে গোস্বামীখণ্ডে আসা যায়। গোস্বামীখণ্ডের মাঠের মধ্যে মাকড়া পাথরে তৈরী এক বিশাল স্থাপত্য আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেকে এই স্থাপত্যটিকে প্রাচীন দেবালয় বলে সনাক্ত করেছেন। আনুমানিক খ্রীস্টীয় দশম শতকে এই দেবালয়টি নির্মিত হয়েছিল। এই প্রত্নক্ষেত্র উৎক্ষণনের সময় একটি কার্তিকের মূর্তি, বুদ্ধ মূর্তি ও শিরস্ত্রাণ পরিহিত মনুষ্যমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। (বিশেষ বিবরণ ১ম খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

গোহগ্রাম (৭০ ঃ গলসী) ঃ গলসী হ'তে বাসযোগে আদরাহাটি পার হয়ে সরাসরি গোহগ্রামে পেঁছান যায়। এই গ্রামটি যে প্রাচীন তার প্রমাণ মেলে মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসনে। মল্লসারুল তাম্রশাসনে উল্লেখিত গোধগ্রাম হল একালের গোহগ্রাম বা গোগাঁ। গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারের একটি দালানমন্দিরে রাধা-দামোদর নামক শালগ্রাম শিলা নিত্য পূজিত হন। এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটি সুউচ্চ শিখরদেউল আছে। মন্দিরের সম্মুখভাগে অতীব সুন্দর টেরাকোটা চিত্রাবলী শোভিত আছে এবং মন্দিরের শীর্ষদেশে স্থাপিত আছে একটি আমলক শিলা। প্রতিষ্ঠালিপি হ'তে জানা যায় যে, এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল হ'ল ১৭৯২ শকাব্দ। নিকটেই রাধা-দামোদরের দোলমঞ্চে দোলের সময় দামোদর শিলাটিকে স্থাপন করা হয়। চক্রবর্তী পরিবারের আরও ৪টি আটচালা শিবমন্দির রয়েছে তন্মধ্যে ২টির চূড়া ভেঙ্গে গেছে। ভগবতীতলায় একটি দালানমন্দিরে গ্রাম দেবী জগদ্ধাত্রী

অধিষ্ঠিতা আছেন। গোহগ্রামের প্রধান উৎসব হ'ল চৈত্র মাসে শিবের গাজন এবং রাম-নবমীতে ভগবতীর গাজন অনুষ্ঠিত হয়। দু'টি গাজনেই ভক্ত বা সন্ন্যাসীরা বাণ ফোঁড়ে এবং গাজন উপলক্ষে একটি মেলা হয়। গ্রামের মধ্যে বন্যাবুড়ীতলায় একটি বৃক্ষের নীচে ধর্মশিলা ও প্রচুর পোড়ামাটির ঘোড়া দেখা যায়। রবিবারে বিশেষ পূজো হয় এবং বাত রোগ হতে নিরাময়ের জন্য বহুলোক রবিবারে এখানে পূজো দিতে আসে।

গৌরডাঙ্গা (১৩১ ঃ কাটোয়া) ঃ কাটোয়া হ'তে সরাসরি বাসযোগে ব্রাহ্মণী নদীর সন্নিকটবর্তী এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামদেবী গৌরীচণ্ডীর নামানুসারে গ্রামের নাম হয়েছে গৌরডাঙ্গা। গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে স্থাপিত অর্ধভগ্ন প্রস্তর মূর্তিকে গৌরী চণ্ডীরূপে পূজা করা হয়। আশ্বিন মাসে দেবীর বিশেষ পূজা উপলক্ষে এখানে একটি মেলা বসে।

গৌরাঙ্গপুর (২৮ ঃ কাঁকসা) ঃ অতীতের সেনপাহাড়ী পরগণার অন্তর্গত ও একালের কাঁকসা থানার গৌরাঙ্গপুর গ্রামনামটি সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের নামানুসারে হয়েছে। পানাগড় হ'তে ইলামবাজারের বাস রাস্তা ধরে ১১ মাইল স্টপেজে নেমে কিছুটা পশ্চিমে হেঁটে গেলে এই স্থানে যাওয়া যায়। গৌরাঙ্গপুরের জঙ্গলের মধ্যে ইছাই ঘোষের সুউচ্চ দেউলটি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। দেউল হ'তে কিছুটা দূরে অজয় নদের দক্ষিণ ভাগে বর্ধমানের জমিদার রাজা চিত্রসেন রায় কর্তৃক সেনপাহাড়ী দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল। পার্শী অক্ষরে ক্ষোদিত চিত্রসেন রায়ের নামাঙ্কিত কয়েকটি কামান এই স্থান হ'তে নিয়ে গিয়ে বর্ধমানরাজ বাড়ীতে রক্ষিত ছিল। অঞ্চলটি একসময়ে গোপভূমের সদ্গোপ রাজাদের অধীনস্থ ছিল। সম্ভবতঃ গোপভূমের কোন প্রতিপত্তিশালী শাসক তাঁদের পূর্বপুরুষ হিসাবে ইছাই ঘোষকে স্মরণ করার নিমিত্ত তাঁর নামে দেউলটি নির্মাণ করেছিলেন।

ঘোষপাঁচঘে (১৭৫ ঃ মেমারি) ঃ মেমারি মন্তেশ্বর বাস-রাস্তা ধরে ঘোষপাঁচঘে গ্রামে পেঁছান যায়। মৌজাটির নাম হ'ল ঘোষ। সম্ভবতঃ ঘোষ মৌজায় ৫টি পাড়া বা ঘর নিয়ে গ্রাম পত্তন হ'য়েছিল, সেকারণে গ্রামনাম হয় ঘোষপাঁচঘে। গ্রামে রাধা-গোবিন্দ জীউর ইষ্ট নির্মিত মন্দির, একটি নাটমন্দির ও একটি রাসমঞ্চ আছে। শোনা যায় গোবিন্দ গোস্বামী নামক জনৈক বৈষ্ণব সাধক ভিক্ষালব্ধ অর্থের দ্বারা শ্রীমন্দির নির্মাণ ক'রে রাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে গোবিন্দ গোস্বামীর তিরোধান উৎসব পালিত হয়। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে ৯/১০ দিন ধরে অন্নপূর্ণার পূজা হয় এবং এই উপলক্ষে বহুকাল ধরে একটি মেলা বসে।

ঘোষহাট (২২ ঃ কাটোয়া) ঃ কাটোয়া শহরের সন্নিহিত ঘোষহাটে ঘোষেশ্বর নামক অনাদিলিঙ্গ শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। কথিত আছে যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক ঘোষেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজ্যপাট নিশ্চিহ্ন হওয়ায় পরবর্তীকালে এই শিবলিঙ্গের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই এবং কালক্রমে মাটি চাপা পড়ে যায়। মাটির ঢিবি খনন করার সময় শিবলিঙ্গটি আবিষ্কৃত হ'লে তাকে পুনঃ-

প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঘোষেশ্বর শিবমন্দিরটি আটচালা স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত।

ঘোড়াঘাট ঃ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান গ্রন্থে ঘোড়াঘাট নামক স্থানে উল্লেখ থাকলেও প্রকৃত স্থান নির্ণয় করা যায় না। বর্ধমান জেলায় অবস্থিত ঘোড়াঘাট গ্রামে শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন সরকার ঠাকুরের শিষ্য বনমালী কবিরাজের শ্রীপাট। 'শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয়' গ্রন্থ হ'তে জানা যায় যে, রামচন্দ্র নামক তাঁর একজন শিষ্য নিজের অজ্ঞাতসারে স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করেন। এই ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় রামচন্দ্রকে শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বাড়ীতে ৭ দিন যাবৎ উচ্ছিষ্ট পাতের আহার গ্রহণ করতে হয়। এরপর তিনি শ্রীরঘুনন্দনের প্রহার খাইয়া ঘোড়াঘাটে গমন করেন। রামচন্দ্রই হলেন পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বনমালী কবিরাজ।

চকদীঘি (৫৯ ঃ জামালপুর) ঃ মসাগ্রাম হ'তে তারকেশ্বরের পথে বাসযোগে চকদীঘি গ্রামে পৌঁছান যায়। এই গ্রামের খ্যাতির মূলে ছিল সিংহরায় পরিবারের বাসস্থান হিসাবে। শোনা যায়, প্রায় 800 বছর পূর্বে ভিখারী সিং নামক এক ব্যক্তি বুন্দেলখণ্ড হ'তে বাংলাদেশে এসেছিল। ভিখারী সিং-এর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ নল সিং-এর পৌত্র সারদাপ্রসাদ সিংহরায় একজন সংস্কৃতিবান ভূস্বামী ছিলেন। সারদা প্রসাদ রেশম, কয়লা ও নীলের ব্যবসার সঙ্গে সংগে জমিদারী হ'তে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিলেন। সারদাপ্রসাদের সংগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট সৌহার্দ ছিল। বিদ্যাসাগরের উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় সারদাপ্রসাদ ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে চকদীঘিতে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চকদীঘিতে অবস্থানকালে যে কক্ষটি ব্যবহার করতেন তা সযত্নে রক্ষিত আছে। রাজা মণিলাল সিংহরায় মহাশয়ের সংগেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট সৌহার্দ ছিল। তিনি বিদ্যাসাগরের একটি জীবনচরিত রচনা করেছিলেন। ললিতমোহন সিংহরায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীটি উঠে গেলেও জীর্ণ দশাগ্রস্ত গৃহটি আজও বর্তমান আছে। গ্রামের উল্লেখযোগ্য প্রত্নকীর্তিগুলির মধ্যে সমীরকুমার সিংহরায়ের গৃহের সন্নিকটে ৭টি আটচালা শিবমন্দির ও ১টি রেখদেউলে শিবলিংগ প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৬টি স্তম্ভের উপর নির্মিত দুর্গামণ্ডপটি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সিংহরায় পরিবারের অপর একটি তরফ গ্রামের একস্থানে ১২টি রেখদেউল ও ২টি পীড়াদেউল রয়েছে।

বৈদ্যনাথ সিংহরায়ের পরিবারের জোড়া শিবমন্দির ১২৭২ সালে নির্মিত হয়েছিল। এই শিবমন্দির দুটির সম্মুখভাগে টেরাকোটা অলংকরণগুলির মধ্যে মিথুন-চিত্রটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রামের উত্তর প্রান্তে মণিলাল সিংহরায়ের ভেরী বাড়ির দক্ষিণে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত একটি দালানমন্দিরে কালিকা দেবীর প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কালী মন্দিরের পাশে রয়েছে শিবের শিখরদেউল এবং তার দক্ষিণ ভাগে পরিত্যক্ত এক বাংলা মন্দিরটি ভোগমন্দির নামে কথিত আছে। মণিলাল সিংহরায়ের দুর্গাদালানে একালে দুর্গা পূজা হয় না। এই গ্রামে একটি দু' গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ আছে, যেটি উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে নির্মিত হয়েছিল

বলে মনে হয়। গ্রামের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্যস্থল হল ১৮৫৯-৬০ খ্রীস্টাব্দে সারদাপ্রসাদ সিংহরায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়টি। চকদীঘির বালিকা বিদ্যালয়টি উদ্বোধন করেছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বড় রাস্তার ধারে পীরতলায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পীরের কাছে মানত করেন। সিংহরায় পরিবারের সুসজ্জিত দরবার-হলে একটি গ্রন্থাগার আছে। এছাড়া এখানে বেশ কয়েকটি সুদৃশ্য অয়েল পেণ্টিং আছে যেগুলি রাশিয়া হ'তে আমদানী করা হয়েছিল।

চকব্রাহ্মণগড়িয়া (১৩২ ঃ পূর্বস্থলী) ঃ বঙ্গভাষায় 'চতুর্বেদ' প্রণেতা, 'পৃথিবীর ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা এবং সুপণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

চক্ষণজাদি (২ ঃ জামালপুর) ঃ পাল্লারোড স্টেশন হ'তে পশ্চিমমুখের রাস্তা ধরে দামোদর পার হ'য়ে এই বিচিত্র নামের গ্রামটিতে পৌঁছান যায়। এই গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। জনশ্রুতি যে, গ্রামস্থ বিত্তশালী কোন মুসলমান ভদ্রলোক তাঁর মৃত্যুকালে স্বীয় কন্যাকে মূল গ্রামের একাংশ দান করেন এবং এই দানকৃত মৌজাটি "চকখানজাদি" যা অপভ্রংশে চক্ষণ্জাদিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

চম্পাইনগরী (২০ ঃ বুদবুদ) ঃ বুদবুদ হ'তে দক্ষিণগামী বাস-রাস্তা ধরে দামোদরের উত্তর তীরে অবস্থিত চম্পাইনগরী গ্রামে যাওয়া যায়। চাঁদ সদাগর ও মনসাদেবীর দ্বন্দ্বের কাহিনীটি গড়ে উঠেছিল একালের কসবা চম্পাইনগরী গ্রামটিকে ঘিরে। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে আছে,—

"চম্পক নগরে বৈসে চাঁদ সদাগর।
মনসা সহিত বাদ করে নিরন্তর॥"

'আইন-ই-আকবরী'তে সরকার মাদারণ-এর অন্তর্গত চম্পানগরী পরগণার উল্লেখ পাওয়া যায়। অধিকাংশ মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের বাসস্থানরূপে চম্পাইনগরী বা চম্পানগরীর উল্লেখ আছে। গ্রামের মধ্যে ২টি উচ্চ ঢিবি আছে যার একটিকে বেহুলার বাসরঘর ও চাঁদ সদাগরের বাসগৃহের ধ্বংসাবশেষ বলে দেখান হয় এবং অপর ঢিবিটি স্থানীয় লোকের নিকট সাঁতালী পর্বত নামে পরিচিত। দুটি প্রাচীন শিবমন্দিরে সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। জনশ্রুতি এই যে, শিবলিঙ্গ দুটি চাঁদ সদাগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনেকের মতে চম্পাইনগরীর শিবলিঙ্গ কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বর মহাদেব অপেক্ষা আকৃতিতে বৃহৎ।

চম্পাহাটি (১৩৬ ঃ পূর্বস্থলী) ঃ নবদ্বীপ অথবা সমুদ্রগড় স্টেশনে নেমে চম্পাহাটিতে পৌঁছান যায়। এই স্থানের পূর্ব নাম ছিল চম্পকহট্ট। অনেকের মতে এখানে প্রচুর চম্পক পুষ্পের বৃক্ষ ছিল এবং মালীরা ঐ পুষ্প চয়ন করে হাটে বিক্রয় করত। এখানে দ্বিজ বাণীনাথের শ্রীপাট আছে। বাণীনাথ ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের ব্রজলীলার কামলেখা সখী (গৌড়গণোদ্দেশদীপিকা ২০৪)। চম্পাহাটিতে গৌর

গদাধর সেবা প্রতিষ্ঠা আছে। প্রাচীন নবদ্বীপ-এর মধ্যে চম্পাহাটির অবস্থিতি হ'ল কোল দ্বীপ নামক ভূখণ্ডে।

চাণ্ডুলী (১২৩ ঃ কাটোয়া) ঃ দাঁইহাট শহর হ'তে বাস ও হাঁটাপথে ব্রহ্মাণী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এই প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রামে পৌঁছান যায়। এই গ্রামে বার-মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে ; তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎসব হ'ল অগ্রহায়ণ মাসে অন্নপূর্ণার পূজো ও নবান্ন উৎসবটি। দশহরার দিন ব্রাহ্মণী নদীর তীরে ব্রাহ্মণী পূজো উপলক্ষে একটি মেলা বসে। গ্রামে উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির নিদর্শন হ'ল একটি বাসুদেব বিষ্ণুমূর্তি আছে। কোন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় এই প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তিটি উদ্ধার করে একটি মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ও নিত্য-সেবা পূজোর ব্যবস্থা আছে।

চানক (২৭ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ গুসকরার সন্নিকটবর্তী চানক গ্রামে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক রায়বাহাদুর রসময় মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। অতীতে চানকের চতুষ্পাঠী ও তন্ত্রসাধনার কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি ছিল।

চান্না (১৪৬ ঃ গলসী) ঃ খানা জংশন হ'তে ৬ কিলোমিটার উত্তরে কালীসাধক ও শাক্তসঙ্গীত গ্রন্থের রচনাকার সাধক কমলাকান্তের স্মৃতি বিজড়িত চান্না গ্রাম। কমলা-কান্তের পৈত্রিক বাসস্থান অম্বিকা কালনায় হ'লেও তিনি মাতুলালয়ে লালিতপালিত হয়েছিলেন। পূর্বে চান্না যেতে হ'লে কুখ্যাত ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা অতিক্রম করতে হ'ত। এখানে ডাকাতদের জন্য সাধারণ লোকের পক্ষে যাতায়াত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। একটি লোকপ্রচলিত ছড়াতে পাওয়া যায়—'যদি যাবি চান্না ঘরে উঠবে কান্না'। সাধক কমলাকান্ত একসময়ে ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গায় ডাকাতদের কবলে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সুললিত কণ্ঠে শ্যামামায়ের উদ্দেশ্যে গানে ডাকাতদের পাষাণ হৃদয় গলে যায়।

চান্নায় একটি মন্দিরে দেবী বিশালাক্ষির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বিশালাক্ষি-দেবী কমলাকান্তের প্রথম জীবনে আরাধ্যা দেবী ছিলেন। বিশালাক্ষির মূর্তি দেখে অনেকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী বলে মনে করেন ; কিন্তু দেবীর পূজায় পাঁঠা ও শুয়োর বলি হয়। বিশালাক্ষি মন্দিরের অনতিদূরে অগ্নিযুগের বিপ্লববাদের অন্যতম ব্যক্তি স্বামী নিরালম্বের আশ্রম আছে। ১৮৮৪ সালে ৫ই অগ্রহায়ণ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে জন্মগ্রহণ করেন যিনি উত্তরকালে স্বামী নিরালম্ব নামে খ্যাতি লাভ করেন। প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতার জন্য আলিপুর বোমার মামলায় তাঁকে জড়ানর চেষ্টা হ'লেও প্রমাণাভাবে তিনি অব্যাহতি লাভ করেন।

চালনা ঃ চালনা কোন স্থাননাম নয়। কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের পাশে নদীর দহটি চালনাদহ নামে খ্যাত। চালনাদহেই কল্যাণেশ্বরীর শঙ্খ পরিধানের কাহিনী গড়ে উঠেছে ও দেবীর শঙ্খ পরিধানের জায়গায় একটি মন্দির তৈরী হয়েছে।

চিত্তরঞ্জন ঃ আসানসোল থেকে রেলপথ অথবা মোটরে চিত্তরঞ্জনে যাওয়া যায়।

চিত্তরঞ্জন দেখে একই সঙ্গে মাইথন ও বর্ধমান জেলার নিয়ামতপুর ভ্রমণ করার সুবিধা আছে। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নামে চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানা ও শিল্পাঞ্চলের উদ্বোধন করেন তাঁর সহধর্মিণী বাসন্তীদেবী। ১১ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে একটি অসমতল ক্ষেত্রে শিল্প-নগরীটি গড়ে উঠেছে। এখানে ভারতে সর্বপ্রথম রেলইঞ্জিন কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ধাতু রাসায়নিক বিজ্ঞানাগার ও রূপনারায়ণপুরে হিন্দুস্থান কেবলস্ কারখানা প্রভৃতির সমাবেশে স্থানটি একটি আদর্শ শিল্পনগরীতে পরিণত হয়েছে।

চিচুরিয়া (৬৯ ঃ জামুরিয়া) ঃ জামুরিয়ার ৮ কিলোমিটার পূর্বে চিচুরিয়া গ্রামের অবস্থিতি। চিচুরিয়া গ্রামটি কালারায় ও বুড়োরায় নামক ধর্মঠাকুরের জন্য প্রসিদ্ধ। একটি ইটের মন্দিরে ধর্মরাজের শিলামূর্তি আছে। স্থানীয় ধীবরেরা হ'লেন দেয়াসী ও পণ্ডিত উপাধিধারী শুঁড়িরা হ'লেন পূজারী। বৈশাখী পূর্ণিমায় বিশেষ জাঁকজমক সহকারে ধর্মরাজের গাজন উৎসব হয়। পূর্ণিমার ৪ দিন পূর্বে বানেশ্বরকে মন্দির হ'তে বের করে ২ দিন অন্তর ভক্তাস্নান এবং পূজোর ২ দিন পূর্বে গ্রাম প্রদক্ষিণের পর সন্ধ্যার সময় পাদুকাজোড়াকে স্নান করান হয়।

অতঃপর গ্রামের লোকেরা ঐ পুকুর হ'তে কলসী পূর্ণ জল নিয়ে মন্দিরে আসেন। রাত্রি ১০টার পর কাঁটাখেলা, ফুলখেলা ও পাতাভরা উৎসবের পর ছড়া চাপান-উতোর হয়। পূর্ণিমার দিন বিশেষ পূজোর অঙ্গ হ'ল ছাগ বলিদান। চড়ক অনুষ্ঠানটি একালে বন্ধ হয়ে গেছে। রাত্রে ভক্তারা আগুনে ঝাঁপ ও বানেশ্বরের উপর গড়াগড়ি দেয়। যেসকল ব্যক্তি রোগ নিরাময় হ'তে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মানত করে থাকেন তাঁরা পুকুরপাড় হতে মন্দির পর্যন্ত দণ্ডী খাটেন। একটি নিমগাছের নীচে জেলেরা বলিদান সহ বুড়োরায়ের বিশেষ পূজো করে। ধর্মরাজের মন্দিরের সন্নিকটে একটি তেঁতুলতলায় শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে মনসা পূজো হয়; এছাড়া আষাঢ়ের প্রথমে দিগম্বরী মায়ের পূজো ও ফাল্গুন মাসে সাড়ম্বরে কালীপূজো হয়।

চুপী (৭৯ ঃ পূর্বস্থলী) ঃ পূর্বস্থলী রেলস্টেশনের উত্তরভাগে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। চুপী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং সেই হিসাবে তাঁর পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকেও চুপী গ্রামের অধিবাসী বলা যায়। অষ্টাদশ শতকে বর্ধমানের জমিদার রাজা তেজচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন চুপী গ্রামের রঞ্জকিশোর রায় ও তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায়। রঘুনাথের শাক্তগীত রচনা ও সুকণ্ঠের জন্য বিশেষ খ্যাতি ছিল। এই রায় পরিবার মহাশয় পরিবার নামে বিখ্যাত। রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত বিশাল অট্টালিকা ও মন্দিরগুলি অতীতের স্মারকচিহ্ন হয়ে আছে, যদিও এই মন্দির-গুলি ধ্বংসের পথে।

চুরুলিয়া (৬ ঃ জামুরিয়া) ঃ আসনসোল হতে ১১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে বরাবনি এবং তথা হতে ৩ কিলোমিটার দূরে চুরুলিয়ার অবস্থিতি। অজয় নদের দক্ষিণ ভাগে সেরগড় পরগণায় হিন্দু আমলে চুরুলিয়ায় একটি দুর্গ ছিল এবং এই দুর্গের

সঙ্গে নরোত্তম নামক একজন স্থানীয় নৃপতির নাম বিজড়িত আছে। স্থানীয় লোকের নিকট দুর্গটি নরোত্তমের দুর্গ নামে খ্যাত ছিল। কিন্তু কোন সময়ে দুর্গটি মুসলমানেরা অধিকার করে এবং আয়মাদারগণের আগমনের সময়কাল জানা যায় না। আয়মাদারগণ দুর্গের মধ্যেই মসজিদ ও বাড়ীঘর নির্মাণপূর্বক বসবাস শুরু করেন। ওল্ডহামের মতে নরোত্তম ছিলেন পঞ্চকোটের রাজবংশের কোন ব্যক্তি। একালে চুরুলিয়া প্রসিদ্ধির কারণ হল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থানরূপে এবং কবির জন্মদিবস উপলক্ষে প্রতি বৎসর ১১ই জ্যৈষ্ঠ হতে সপ্তাহকালব্যাপী সাহিত্যের আসর ও সংস্কৃতি মেলা বসে। রুক্ষ পাথুরে অঞ্চলের মানুষেরা পাথরের কাজে বেশ পারদর্শী এবং তদ্দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

চৈতন্যপুর (১১২ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ কৈচর বাস ষ্ট্যাণ্ড হ'তে ২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে রাস্তা ধরে এই গ্রামে পৌঁছান যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব রাঢ় পরিক্রমার সময় এই গ্রামে আসায় গ্রামের নাম হয়েছিল চৈতন্যপুর ; কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। এই গ্রামে একটি মন্দিরে শৈলেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর শিবরাত্রিতে বিশেষ উৎসব সহ একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় যাদুঘরের রক্ষিত আভিচারিক বিষ্ণু মূর্তিটি চৈতন্যপুর গ্রাম হ'তে সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই ধরনের মূর্তি অত্যন্ত বিরল। মূর্তিটি দেখে মনে হয়েছে বিষ্ণু তমোগুণে আচ্ছন্ন। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই ত্রিমূর্তির অপর দুই সঙ্গী ব্রহ্মা ও শিব তাঁকে ত্যাগ করেছেন। অনেকে মনে করেন পূজার পর এরূপ অশুভ মূর্তি সাধারণতঃ ধ্বংস করে দেওয়া হ'ত। এই ভীষণ রুক্ষ, মেজাজের মূর্তিটি সপ্তম শতকে নির্মিত বলে মনে করা হয়।

চোৎখণ্ড (২১৫ ঃ মেমারি) ঃ বাগিলা স্টেশনে নেমে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অতিক্রম করে ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে এগিয়ে গেলে চোৎখণ্ড গ্রামে পৌঁছান যায়। ভাদ্র মাসের পঞ্চমী তিথিতে মনসা পূজা উপলক্ষে বিশেষ উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মনসাদেবী এই গ্রামে জগৎগৌরী নামে পূজিতা। নিকটবর্তী গ্রাম হ'তে হাজার হাজার মানুষ জগৎগৌরীর মন্দিরে সমবেত হয় এবং মানত শোধের জন্য দ্বিসহস্রাধিক ছাগ বলি দেওয়া হয়। মনসা পূজা উপলক্ষে চেৎখণ্ডের ঝাঁপান গান এতদঞ্চলে বিশেষ আকর্ষণীয়। ফরাসী প্রকৃতিবিদ ভিক্তর জাকমে* ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে এখানে এসেছিলেন।

ছোট দিঘরি (১১ ঃ হীরাপুর) ঃ আসানসোল হ'তে বাস-রাস্তা ধরে সরাসরি এখানে পৌঁছান যায়। ছোট দিঘরিতে প্রস্তরনির্মিত ও সুন্দর কারুকার্যখচিত একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরটি অত্যন্ত প্রাচীন এবং এটি সীতারাম চোবে মহান্ত ও রাঘব চোবে মহান্ত কর্তৃক নির্মিত। মহান্ত পরিবারের কুলদেবতা রঘুনাথ নামক শালগ্রাম শিলা এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৩৭৫ সালে তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও মিনতি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক একটি শিবমন্দির ও একটি কালীমন্দির নির্মিত হয়েছে।

ছোট বৈনান (১৬৭ ঃ রায়না) ঃ বর্ধমান হতে আরামবাগ রোড ধরে অথবা

শ্যামসুন্দর হতে এই গ্রামে যাওয়া যায়। ছোট বৈনান গ্রামের বিশেষ প্রসিদ্ধি হ'ল কালিকাদেবীর ও দক্ষিণেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের জন্য। দুটি বিভিন্ন মন্দিরে এঁরা স্থাপিত আছেন। ছোট বৈনান ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে কালীমন্দিরগুলিকে ঘিরে কিছু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। রাজা গণেশের পুত্র যদু বা জালালুদ্দিনের আমলে বাদশাহী সড়কের ধারে কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তী-কালে ছত্রধর সিংহ নামক স্থানীয় ভূস্বামী উক্ত মসজিদগুলিকে ধ্বংস করে কয়েকটি কালীমন্দির নির্মাণ করেন। গ্রামস্থ বিশাল দীঘিটি ছত্র সিংহের প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করা হয়। দক্ষিণেশ্বর শিবের কাহিনী অন্যান্য স্থানে শিবলিঙ্গ আবির্ভাবের ন্যায়। ছোট বৈনান গ্রামে একটি প্রস্তরনির্মিত বিষ্ণুমূর্তিকে শাড়ী পরিয়ে গিরিঠাকরুণরূপে পূজা করা হয়। গ্রামস্থ রাম ভট্টাচার্যের গৃহে একটি ভগ্নপ্রায় সূর্যমূর্তি আছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে "বৈনান" শব্দটি অস্ট্রিক ভাষা হ'তে জাত, যদিও ডক্টর সুকুমার সেনের মতে এটি আর্য নাম।

ছোটরামচন্দ্রপুর (কাঁকসা) ঃ পানাগড় স্টেশন হ'তে ইলামবাজারের পথে বাস-যোগে এই গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামে একটি বিচিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয় যা গ্রামবাসীর নিকট "অষ্টমঙ্গলা" নামে খ্যাত। বৈশাখ মাসে দিদিঠাকরুণের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে। 'দিদিঠাকরুণ' পূজার ৮দিন পরে "অষ্টমঙ্গলা" উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের মধ্যে 'দিদিঠাকরুণ ও 'রাধাবল্লভজীউর' দুটি মন্দির আছে।

জগদানন্দপুর (৭৯ ঃ কাটোয়া) ঃ দাঁইহাট স্টেশন হ'তে রিক্সায় ২ কিলোমিটার দূরে জগদানন্দপুর গ্রামে পৌঁছান যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ জগদানন্দের নামের সঙ্গে এই গ্রাম প্রতিষ্ঠার যোগাযোগ আছে। জনশ্রুতি যে, রাধাগোবিন্দের সেবাইত গ্রামস্থ এক বৃদ্ধা গ্রামান্তর হ'তে প্রত্যাবর্তন করে রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ না দেখতে পেয়ে অপত্যস্নেহে রোদন করতে থাকেন। সেই সময়ে দৈববাণী হয়,—

> 'আমরা মানুষ নহি, আমাদের জন্য কাঁদিও না—
> আমাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে পূজার ব্যবস্থা কর।"

রাধাগোবিন্দজী একটি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্মিত মন্দিরের মধ্যে বিদ্যমান। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদুলাল ঘোষচৌধুরী এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর পুত্রকে লোকে "ব্রজবাসী কর্ত্তা" বলত। এই স্থানের সেবাপূজা বৃন্দাবনের গোবিন্দজীউর সেবার অনুরূপ। প্রাতে বাল্যভোগ, মধ্যাহ্নে অন্নভোগ, রাত্রে লুচিভোগ ও মঙ্গল-আরত্তির ব্যবস্থা আছে। এছাড়া বিশেষ তিথি উপলক্ষে উৎসব হয় ও ঐ সময়ে ভোগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

জরুর (১৫১ ঃ বর্ধমান) ঃ শক্তিগড় রেলস্টেশন হ'তে ৫ কিলোমিটার উত্তরে জরুর গ্রামের অবস্থিতি। প্রতি বৎসর ৩১শে বৈশাখ যোগাদ্যা পূজা উপলক্ষে গ্রামের সকল মানুষ যোগ দেয়। এছাড়া রক্ষাকালীর পূজা হয় চৈত্র মাসে। রায় পরিবারের

গৃহদেবতা রঘুনাথজীউ একটি আটচালা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরটি উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

জঙ্গলমহল ঃ মেদিনীপুর জেলার ৬টি পরগণা নিয়ে জঙ্গলমহল এলাকার অস্তিত্ব জানা গেলেও দুর্গাপুর মহকুমার জঙ্গলমহলের খবর অনেকের নিকট অজ্ঞাত। ফরিদপুর থানার একাংশ, কাঁকসা থানার উত্তরাংশ ও আউসগ্রাম থানার উত্তর-পশ্চিম অংশ নিয়ে গঠিত ছিল বর্ধমান জেলার জঙ্গলমহল। ঘন নিবিড় শাল অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল এই অঞ্চলটি। এছাড়া পলাশ, মহুয়া, অশ্বত্থ, পিয়ালী, হরিতকী, সেগুন, শিশু ইত্যাদি বৃক্ষ এই অরণ্যের শোভা বর্ধন করত। নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়ে ডাকাতের ভয়ে দিবাভাগেও যাতায়াত করা নিরাপদ ছিল না, কিন্তু দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গঠনের ফলে গভীর অরণ্য আজ বিলুপ্তির পথে, আর সেই সঙ্গে জঙ্গলমহল নামটিরও অবলুপ্তি ঘটেছে।

জাউলে ঃ কাটোয়া থানায় জাউলে গ্রামে জঙ্গলেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। হাম রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা জঙ্গলেশ্বরের ওষুধ নিয়ে রোগমুক্ত হন। শিবলিঙ্গটির উৎপত্তি সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে, গ্রামের পাশে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে হাম রোগাক্রান্ত কোন এক বালক রোগ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে জঙ্গলের মধ্যে মূর্চ্ছিত হয়ে যায়। কিন্তু দেবতা কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বালকটি ঔষধের অনুসন্ধান করতে করতে ঔষধ ও শিবলিঙ্গের সন্ধান লাভ করে পরে বালক ও তার পিতা শিবলিঙ্গটিকে স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা করে স্বপ্নাদেশ মত হাম রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ঔষধ দিতে আরম্ভ করে।

জাড়গ্রাম (৬১ ঃ জামালপুর) ঃ মসাগ্রাম হ'তে তারকেশ্বরের পথে বাসযোগে এই গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু। গ্রামের মধ্যে একটি ধ্বংসস্তূপ ও মজে যাওয়া খাতকে গড়বাড়ী বলে সনাক্ত করা হয়। শোনা যায় আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে গন্ধর্ব খান-এর বংশে গোপালচন্দ্র দেব নিয়োগীর আমল হ'তে এই গ্রামের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গোপালচন্দ্রের পৌত্র রত্নেশ্বর গ্রামে বহু দেবালয়, দোলমন্দির ও সানপুকুর নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করান। জাড়গ্রামে গ্রাম-দেবতা কালুরায় নামে খ্যাত ধর্মঠাকুরের উল্লেখ ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। একটি ইষ্টক নির্মিত মন্দিরে জোড়া অশ্বের উপর স্থাপিত সিংহাসনে চতুষ্কোণ ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। শোনা যায়, কালুরায় পূর্বে হুগলী জেলার দেখীড় গ্রামে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চৈত্র মাসে গাজনের সময় এখনও একদিনের জন্য ধর্মশিলাকে দেখীড় গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। একটি লোকপ্রচলিত ছড়া হ'তে উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন মিলবে,—

"জাড়গ্রামের কালুরায় দেখীড়তে বাড়ী।
জামাজোড়া খাসাঘোড়া উত্তম পাগড়ী॥"

ধর্মরাজ মন্দিরের সন্নিকটে আচার্যদের গৃহে পিতল নির্মিত শীতলা দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মহাসমারোহে মনসার পূজা

উপলক্ষে ঝাঁপান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ও রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গল কাব্য হ'তে জানা যায় যে, এই গ্রামটি একসময়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। রূপরামের ধর্মমঙ্গল ও বিশাললোচনী গীতে জাড়গ্রামের উল্লেখ আছে। (গাজন ১৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জামনা (১০৮ ঃ মন্তেশ্বর) ঃ মেমারি-পুটশুড়ী বাস-রাস্তায় ভাকরা স্টপেজে নেমে পাকা রাস্তা ধরে ১ কিলোমিটার এগিয়ে গেলে জামনা গ্রামে যাওয়া যায়। জামনা গ্রামে বহুকাল ধরে পিতল নির্মিত জয়দুর্গা মূর্তির নিত্যপূজা হয়। প্রতি বৎসর গুরু-পূর্ণিমায় জাঁকজমক সহকারে দেবীর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে মেলা বসে। কিছুকাল পূর্বে কোন অজ্ঞাত কারণে দেবীপূজা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু গ্রামস্থ নিতাই ঠাকুর নামক এক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পুনরায় দেবীপূজার প্রচলন করেন। জয়দুর্গা পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বাৎসরিক পূজার দিন গ্রামের বাইরে দেবীকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেই সময় ছাগ বলিদান সহ হাড়ীরা শূকর বলি দেয়। গ্রামের মধ্যে একটি মন্দিরে জয়কালী মাতার নিত্যপূজা হয়। রঘুনাথ শিবের প্রাচীন মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় পূজারী ব্রাহ্মণের গৃহে শিবের পূজা হয়। রঘুনাথ শিবের সেবাইত হলেন সেনগুপ্ত পরিবার এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে গাজন উৎসব পালিত হয়। দাশগুপ্ত পরিবারের গৃহদেবতা কেঁড়েমাতার পূজা হয় মহানবমীর দিনে। মল্লিক পরিবারের কুলদেবী চণ্ডীর প্রাচীন মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় পূজারীর গৃহে রেখে দেবীর নিত্য-পূজার ব্যবস্থা আছে। বৈদ্যবংশীয় রায়পরিবারে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরনির্মিত কৃষ্ণ ও পিতলের শ্রীরাধিকার দোল উৎসবের সময় মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং দোল উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

জামনা গ্রামটি একালে অখ্যাত হ'লেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে সুবোধচন্দ্র মল্লিক নামক একজন বিদ্যোৎসাহী অধিবাসী এই গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পল্লীগ্রামে শিক্ষাকে জনমুখী করে তোলার জন্য লক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ মল্লিকের জন্মস্থান ছিল জামনা গ্রামে। তাঁর পুত্রদের দানে এখানে বহুকাল পূর্বে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছিল।

জাপট (কালনা) ঃ কালনা শহরের সন্নিকটে স্বামী নিগমানন্দের সারস্বত আশ্রম ও আর একটু এগিয়ে গেলে ভবা পাগলার আশ্রম দর্শন করা যাবে। কলিকাতার মহা-নির্বাণ মঠের অধীনে জ্ঞানানন্দ মঠ নামে খ্যাত একটি শাখা জাপটে রয়েছে। ঊনবিংশ শতকে জাপট পল্লীতে প্রচুর ভুরো চিনি উৎপাদিত হত, সেকথা রেভারেণ্ড লঙের বিবরণী থেকে জানা যায়।

জামগড়া (২৩ ঃ ফরিদপুর) ঃ উখড়ার সন্নিকটে জামগড়া গ্রামে গোস্বামী পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশীধরচন্দ্রের প্রস্তরনির্মিত একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরে

বংশীধারীর কষ্টিপাথরের মূর্তিটি অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। এছাড়া এই মন্দিরের মধ্যে অন্যান্য দেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। দোলপূর্ণিমা ও জন্মাষ্টমীতে বংশীধারীর বিশেষ উৎসব পালিত হয়।

জামড়া (৬০ : কাটোয়া) : কাটোয়া-মালডাঙ্গা বাস রাস্তায় চন্দ্রপুরে নেমে কিছুটা পায়ে হেঁটে খড়ি নদীর তীরে জামড়া গ্রামে পৌঁছান যায়। এই গ্রামে একটি বৃক্ষতলে মাঘীপূর্ণিমায় ব্রহ্মার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মা পূজার প্রচলন এতদঞ্চলে না থাকলেও তিনি হলেন জামড়া গ্রামের গ্রামদেবতা।

জামালপুর (৪৬ : পূর্বস্থলী) : বিশেষ বিবরণ ১৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জামুরিয়া (২১ : জামুরিয়া) : আসানসোল হতে বাসযোগে জামুরিয়া থানার সদর কার্যালয় জামুরিয়াতে পৌঁছান যায়। গ্রামের মধ্যে একটি প্রাচীন মন্দিরে নীলকণ্ঠেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এই মন্দিরের মধ্যে আরও কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি ঠাঁই পেয়েছে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কিছুকাল পূর্বে চৈতালী বাবার একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

জালুইডাঙ্গা (১৮৩ : পূর্বস্থলী) : নবদ্বীপের দক্ষিণে ও সমুদ্রগড় রেল-স্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। ভাগীরথীর চড়ার উপর প্রথমে স্থানীয় জেলেরা বসতি স্থাপন করায় গ্রামের নাম হয়েছিল জেলেডাঙ্গা, যা অপভ্রংশে জালুইডাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে মেলায় বহু জনসমাগম হয়।

জাহ্নুনগর (৯১ : পূর্বস্থলী) : নবদ্বীপ হ'তে ৪ কিলোমিটার দূরে ভাণ্ডারটিকুরি রেলস্টেশনে নেমে হাঁটাপথে এই গ্রামে যাওয়া যায়। বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থ হ'তে জানা যায় যে, নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত জাহ্নুনগর একটি পবিত্র স্থান। অনেকে মনে করেন যে, জহ্নু মুনি এখানে তপস্যা করায় স্থানটি জাহ্নুনগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আবার নন্দলাল দে'র মতে জাহ্নুনগরে ভাগীরথী নদী উত্তরবাহিনী হ'য়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় জহ্নু অর্থাৎ বাঁকের সৃষ্টি করায় স্থানটি জাহ্নুনগর নামে পরিচিত হয়েছে। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই অঞ্চলকে জহ্নুদ্বীপ বলা হয়েছে। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসা পুজো হয়। জনশ্রুতি এই যে, চাঁদ সদাগর এই গ্রামে সর্বপ্রথম মনসার পূজা শুরু করেন ; কিন্তু একথার সমর্থনে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জোবা (২৬ : জামুরিয়া) : জামুরিয়া হ'তে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে জোবা গ্রামের অবস্থিতি। এখানকার উৎসবগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য হ'ল, আষাঢ় মাসের প্রথম শনিবারে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

জোগ্রাম (১১৪ : জামালপুর) : হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে জোগ্রাম স্টেশনে নেমে রিক্সা অথবা হাঁটাপথে জোগ্রামে যাওয়া যায়। সম্ভবতঃ জলেশ্বরনাথ নামক শিবের নাম হ'তে গ্রামনাম হয়েছে। আবার অনেকে গ্রামটিকে যোগগ্রাম রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু প্রমাণাভাবে এই মত গ্রহণ করা যায় না। গ্রামে প্রবেশের

মুখে একটি সুউচ্চ শিখরদেউল চোখে পড়বে। এই মন্দিরের মধ্যে জলেশ্বরনাথ শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছেন। জলেশ্বরনাথের মন্দিরটি অন্ততঃপক্ষে ২০০ বৎসরের প্রাচীন বলে মনে হয়। কিন্তু মন্দির চত্বরটি দেখে অনুমান করা যায় যে, বর্তমান মন্দিরটি কোন প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ন্যাংটা বাবা নামক কোন তান্ত্রিক সাধকের সমাজ আছে এবং এই স্থানটি তাঁর সাধন-ভজনের স্থান বলে কথিত আছে। শিবরাত্রিতে মন্দির সংলগ্ন মাঠে উৎসব ও মেলা উপলক্ষে প্রচুর জনসমাবেশ হ'য়ে থাকে।

এই গ্রামে দত্ত বংশোদ্ভূত সাগর দত্তের সুবৃহৎ একটি প্রাসাদোপম গৃহ ছিল—যা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় অন্ততঃপক্ষে ১৪/১৫টি শিবমন্দির আছে এবং মন্দিরগুলি অধিকাংশই অষ্টদশ / ঊনবিংশ শতকে নির্মিত। প্রায় প্রতিটি মন্দিরে টেরাকোটা অলঙ্করণ দেখা যায়। এছাড়া দক্ষিণ-পাড়ায় রঘুনাথ মন্দির, জোড়াশিবমন্দির ও কোদালে পাড়ায় রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে। বসু পরিবারে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দোলের সময় দোলমঞ্চে স্থাপন করে দোল উৎসব পালন করা হয়। মুক্তকেশীতলায় একটি পঞ্চমুণ্ডির আসনের উপর মুক্তকেশী কালিকার মৃন্ময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এছাড়া উত্তরপাড়ায় অধিষ্ঠিত নাপিত কালীর নিত্যসেবার ব্যবস্থা আছে। আশ্বিন মাসের পঞ্চমী তিথিতে মনসা দেবীর ঝাঁপান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের জেলেপাড়ার মসজিদটি মুসলমান অধিবাসীদের ধর্মস্থান এবং চাষাপাড়ায় রয়েছে বদর সাহেবের সমাধি। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বদর সাহেবের উদ্দেশ্যে মানসিক ও পুজো দেওয়ার রীতি আছে এবং স্তূপীকৃত মাটির ঘোড়াগুলিকে দেখে এগুলিকে মানসিকের অঙ্গ বলা যায়। সাধারণতঃ গরু দুধ না দিলে বা শিশুদের রোগ নিরাময়ের জন্য বদর সাহেবের কাছে মানত করা হয়।

জোগ্রামে বিদ্যাচর্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। প্রসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক কালানিধির টোল ছিল এখানে। গ্রামস্থ বিদ্যালয়টি ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঝামটপুর (৯৯ ঃ কেতুগ্রাম) ঃ কাটোয়া-বারহাওড়া রেলপথে বহরান স্টেশনে নেমে আড়াই কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত ঝামটপুর গ্রামে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও 'শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মস্থান। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে ঝামটপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভুর অনুরাগী ছিলেন। একদা কৃষ্ণদাস কবিরাজের গৃহে অহোরাত্র সঙ্কীর্তনের সময়ে তাঁর ভ্রাতা মীনকেতন রামদাস নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করায় কৃষ্ণদাস গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করেন। ঐদিন রাত্রে নিত্যানন্দ-প্রভু কৃষ্ণদাসকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বৃন্দাবনে যাওয়ার নির্দেশ দেন। বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামীর নির্দেশমত রঘুনাথদাস গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়নের পর তিনি গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর

রচিত সুপ্রসিদ্ধ তিনখানি গ্রন্থ হল,—

'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত,
কৃষ্ণকর্ণামৃত টীকা আর।
তিন অমৃতে ত্রিভুবন, ভাসাইলা সর্বজন,
আঁখি পাইল জন্ম-অন্ধ যার ॥'

প্রতি বৎসর ঝামটপুরে সাড়ম্বরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোভাব উৎসব পালিত হয়। আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশী তিথি হ'তে ত্রয়োদশী তিথি পর্যন্ত এই উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হ'তে বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি উপস্থিত হন এবং ৩ দিন ধরে ধর্ম আলোচনা ও কীর্তন গানে ঝামটপুর মুখরিত থাকে। গৌর-নিতাই বিগ্রহ, কবিরাজ গোস্বামীর কাষ্ঠ পাদুকা, গোঁসাইদাস বাবাজীর সমাজ, জগন্নাথ আখড়া প্রভৃতি ঝামটপুর শ্রীপাটের দর্শনীয় বস্তু। কৃষ্ণদাসের প্রতিষ্ঠিত মদনগোপাল বিগ্রহ পুঁটিয়ার রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মূল চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি বৃন্দাবনে রাধা-দামোদরবাড়ীতে রক্ষিত আছে; কিন্তু গোস্বামীর শিষ্য মুকুন্দ দাসের লিখিত অনুলিপি ঝামটপুরে রয়েছে। নরোত্তম ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে তাঁর 'প্রার্থনা' পদে উল্লেখ করেছেন,—

'কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যেহোঁ কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর গোবিন্দলীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥'

ঝামটপুরে বীরভদ্র প্রভুর শ্বশুর যদুনন্দন আচার্য, গঙ্গাদাস পণ্ডিত ও শ্যামাদাস কবিরাজের শ্রীপাট। যদুনন্দনের কন্যা নারায়ণী দেবী ছিলেন নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র প্রভুর সহধর্মিণী।

ঝিলি (৬২ ঃ **মঙ্গলকোট**) ঃ মঙ্গলকোটের পশ্চিমভাগে এই গ্রামের অবস্থিতি। মনে হয়, অজয় নদের কোন পরিত্যক্ত খাত বা ঝিলের পাশে গ্রাম পত্তন হওয়ায় গ্রামের নাম হয়েছিল ঝিলি। এই গ্রামে ঊনবিংশ শতকে ব্যাপকভাবে নীলের চাষ হ'ত। এখনও নীলকুঠির পরিত্যক্ত জীর্ণদশাগ্রস্ত গৃহগুলি দেখা যায়। বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাসমারোহে ধর্মরাজের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিলেরা (৩৬ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ গুসকরা হ'তে বাসযোগে অজয় নদের পশ্চিম তীরে ঝিলেরা গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামদেবতা ধূমক্ষেত্র অধিষ্ঠিত থাকায় সাধারণ লোকে গ্রামটিকে ধূমক্ষেত্র বলে থাকেন। ধূম্রবর্ণের গোলাকার বেলে পাথরের একটি শিলামূর্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে। একটি পঞ্চরত্ন মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহটি সেবা-পূজা লাভ করছে। ধূমক্ষেত্রের পূজার আচার ও ব্যবহৃত উপকরণগুলি শিবপূজার অনুরূপ। কিন্তু ধর্মপূজা হ'তে ধূমক্ষেত্রের পূজাপদ্ধতির পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সপ্তাহের অন্যান্য দিনে সাধারণভাবে নিত্যসেবা হ'লেও রবিবারের

পূজার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতি রবিবারে ধর্মক্ষেত্রের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং মানতকারীরা এই দিন তাঁদের মানত বা মানসিক পূজা দিয়ে থাকেন। রবিবারে দেবতার উদ্দেশ্যে "মুলুই" ভোগ হ'ল প্রধান অঙ্গ। পুরোহিত বস্ত্র দ্বারা নাসিকা আবৃত ক'রে দুধ ও আতপ চাল সহযোগে ভোগ রন্ধন করেন। ধর্মক্ষেত্রের পূজাপদ্ধতি দেখে মনে হয় এটি প্রচ্ছন্নভাবে সূর্য পূজার নামান্তর। প্রতি বৎসর পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে ৪ দিনের মেলায় প্রচুর জনসমাগম হয়। এই সময়ে বহু রুগ্ন ও অর্থী দেবস্থানে হাজির হয় মৃত্তিকা, পুষ্প ও ঔষধ গ্রহণের জন্য। মঙ্গলকোট অঞ্চলে বহু মানুষের কাছে ধর্মক্ষেত্র হ'লেন এক পবিত্র লৌকিক দেবতা। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ফলে গ্রামস্থ জনসাধারণের সহযোগিতায় সেবা পূজা চলে আসছে।

ডেঁয়ে মগরা (১৭৩ : মেমারি) : মেমারি হ'তে মন্তেশ্বর বাস-রাস্তায় ডেঁয়ে মগরা গ্রামে অবস্থিত। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশী আন্দোলনের সময় বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত একটি সভায় উল্লেখ করেছিলেন যে, তাঁদের পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান ছিল ডেঁয়ে মগরা গ্রামে।

ঢেকুর (কাঁকসা) : ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসন, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত ও ধর্মমঙ্গল কাব্যে ঢেক্করি বা ঢেকুর নামক স্থানের উল্লেখ আছে। ঈশ্বর ঘোষ (ইছাই ঘোষ ?) ও প্রতাপ সিংহ ছিলেন ঢেকুরগড়ের অধিপতি। স্থানটি অজয় নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, গৌরাঙ্গপুরের যে স্থানে ইছাই ঘোষের দেউল আছে, মনে সেটি হল প্রাচীন ঢেকুরগড়। আবার অনেকে করেন যে, মলানদীঘি হ'তে বনকাটির দিকে এগিয়ে গেলে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গপ্রাচীর, পুরাতন মন্দির ও দুর্গামূর্তি রক্ষিত আছে সেই স্থানটি হল ঢেকুরগড়। এই মতে শ্যামারুপার গড় হল ঢেকুরগড়। জনশ্রুতি যে, আজও মহাষ্টমীর দিন এখানে কামান দাগার আওয়াজ শোনা যায়।

তকিপুর (মঙ্গলকোট) : মঙ্গলকোট থানার বেলগ্রামের নিকট তকিপুরে অভিরাম গোস্বামীর শাখা বলরাম দাসের শ্রীপাট আছে। এই গ্রামে বলরাম দাস কর্তৃক গোপাল বিগ্রহের সেবা-প্রতিষ্ঠা আছে ও রামনবমীতে বিশেষ উৎসব পালিত হয়। নরহরি সরকার ঠাকুরের শাখায় গোপালদাস ঠাকুর শ্রীখণ্ড হ'তে তকিপুর গ্রামে এসে বসবাস করেন। প্রবাদ আছে যে, গোপালদাস ঠাকুরের কৃপায় এক ব্রহ্মদৈত্য মুক্তি লাভ করেছিল। তকিপুর গ্রামে প্রতি বৎসর অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে রামনবমীতে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

তকীপুর (১৭১ : আউসগ্রাম) : বর্ধমান-গুসকরা রেলপথে বনপাস রেলস্টেশনে নেমে উত্তর-পশ্চিম মুখে হাঁটাপথে এগিয়ে গেলে বেলগ্রাম বা বিল্বগ্রামে যাওয়া যায়। বিল্বগ্রামে বিল্বেশ্বরের বিখ্যাত শিবলিঙ্গ দেখে পার্শ্ববর্তী তকীপুর গ্রামে কালী পূজার সময় যাওয়াই শ্রেয়। গ্রামটি খুব বড় না হলেও কালীপূজার সময় সারা

অঞ্চলের মধ্যে একটি আকর্ষণীয় গ্রাম। প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে কালী পূজা হয় এবং তন্মধ্যে ১৫ ফুট উঁচু কালীমূর্তিটি দর্শনের জন্য বহু জনসমাবেশ হয় এবং পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

তাড়ৎগ্রাম ঃ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান গ্রন্থ প্রণেতার মতে তড়িৎগ্রাম হ'ল মাধব গুণাকরের জন্মভূমি এবং ইনি রাজা গজসিংহের সভাসদ ছিলেন। এই গ্রামের অবস্থিতি জানা যায় না।

তালিতগড় (বর্ধমান) ঃ বর্ধমান শহর হ'তে গলসীর পথে নবাবহাটে নেমে কিছুটা দক্ষিণে এগিয়ে গেলে তালিতগড়ে পৌঁছান যায়। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে বর্গী হাঙ্গামার সময় মারাঠাদের আক্রমণ হ'তে বর্ধমান শহরকে রক্ষা করার জন্য রাজা চিত্রসেন রায় ৩ কিলোমিটার পরিধি বিশিষ্ট একটি গড় নির্মাণ করেন। এই গড়টি তালিতগড় নামে পরিচিত। বর্তমানে গড়ের সীমানার সামান্য অংশ দেখা যায়।

তুলসাডাঙ্গা (৭৯ ঃ ভাতাড়) ঃ বলগনা স্টেশন হ'তে ১ কিলোমিটার পূর্বে তুলসী-ডাঙ্গা অবস্থিত। এই গ্রামে চক্রবর্তী পরিবারে একটি মাটির ঘরে হনুমানজীউর অষ্টধাতু নির্মিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কাশিমবাজার রাজ-এস্টেটের অন্তর্গত এই গ্রামে রাজাদের আনুকূল্যে হনুমান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তোড়কোনা (১০৪ ঃ খণ্ডঘোষ) ঃ বর্ধমান শহর হ'তে কৈয়র হ'য়ে এই গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামে নাটমন্দির সহ একটি শিখরদেউলের মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এছাড়া পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর ও মনসার পূজা হয়ে থাকে। শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা ও বৈশাখ মাসে ধর্মের গাজন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলায় নানা সম্প্রদায়ের লোক জড়ো হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে তোড়কোনা গ্রামে মাতুলালয়ে স্যার রাসবিহারী ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন।

দক্ষিণডিহি (৬৯ ঃ কেতুগ্রাম) ঃ কাটোয়া আমদপুর ছোট রেলপথে পাঁচুন্দি স্টেশন হ'তে অট্টহাস রোড ধরে দক্ষিণডিহি গ্রামে যাওয়া যায়। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে রটন্তী চতুর্দশী তিথিতে অট্টহাস দেবীর পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। দেবীর কোন মূর্তি নেই—পূজা হয় ঘটে ও যন্ত্রে। জনশ্রুতি আছে যে, এই গ্রামের পূর্বনাম ছিল খুলারামপুর। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে গ্রামটি জনশূন্য হ'য়ে যায় এবং পরবর্তীকালে পুনরায় জনবসতি শুরু হ'লে দক্ষিণডিহি নামে পরিচিতি লাভ করে। অতীতে অট্টহাস দেবীর একটি প্রাচীন মন্দির ছিল এবং পুরাতন মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ৭০/৭৫ বৎসর পূর্বে বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়েছে।

দধিয়া (৪৮ ঃ কেতুগ্রাম) ঃ কাটোয়া হ'তে সরাসরি বাসযোগে অথবা জ্ঞানদাস কাঁদড়া স্টেশনে নেমে দক্ষিণ দিকের হাঁটা পথে বর্ধমান জেলার সর্ববৃহৎ মেলা ও বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মিলনস্থল দধিয়া বৈরাগ্যতলায় যাওয়া যায়। প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও হিংস্র জন্তু সমাকুল স্থানে নানুর থানার পাকুড়-

হাঁস নিবাসী গোপালদাস বাবাজী এখানে রঘুনাথজীউর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। গোপালদাস বাবাজী নানা তীর্থ পর্যটন করে তাঁর প্রধান শিষ্য ঠাকুর দাসকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। রঘুনাথ বিগ্রহের সেবাকার্য ও পূজো সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ও অর্থ সংস্থাপনের জন্য বর্ধমানের রাজা ত্রিলোকচাঁদ প্রচুর ভুসম্পত্তি দান করেন। স্বর্গীয় শক্তিপদ চৌধুরীর রচিত গোপাল দাস মাহাত্ম্য হ'তে জানা যায়,—

'এক মহা মহোৎসব করে আয়োজন ॥
শুভ মাঘ মাসে তিথি মাকরী সপ্তমী
সেই দিনে মহাযজ্ঞ দিবস যামিনী ॥'

প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার পরে সপ্তমী তিথিতে রঘুনাথজীউর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। এই মহোৎসব উপলক্ষে অন্নদান মহোৎসবটি আজও চ'লে আসছে। এই উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলায় লক্ষাধিক লোক বিভিন্ন অঞ্চল হ'তে সমবেত হয় এবং মেলাটি ১ মাস ধরে চলে। এছাড়া গোপালদাস বাবাজীর মঠে শিব, দুর্গা, কালী, মনসা, রাধাকৃষ্ণ ও ১০৮ শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে।

দরিয়াপুর (১৬২ আউসগ্রাম) ঃ গুসকরার সন্নিকটে দরিয়াপুর গ্রামের অবস্থিতি। অতীতে এই গ্রামে ডোকরা কামার ও মাল উপজাতীয়দের বসবাস ছিল ; তাই উপজাতীয় শিল্পচেতনা এখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে এবং আজও সেই ধারা বর্তমান আছে। উপজাতীয় শিল্পীগোষ্ঠী কাঁসা, পিতল, গালিয়ে তাদের নিজস্ব শিল্পনৈপুণ্যের দ্বারা ডোকরা শিল্পকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। শিল্পীদের কাঁচা মাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের নানা সমস্যা আছে। বাঁকুড়া জেলার কেঁশিয়াকোন গ্রামের পরেই দরিয়াপুরের ডোকরা শিল্পের প্রসিদ্ধি আছে।

দামড়া (৪০ আসানসোল) ঃ আসানসোল হ'তে ৫ কিলোমিটার দূরে দামোদর নদের উত্তর তীরে দামড়া গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামের মধ্যে একটি ইস্টক নির্মিত মন্দিরে ধর্মরাজ বিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। এই সুন্দর মন্দিরটি কাশীপুরের রাজারা নির্মাণ করেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এতদঞ্চল কাশিমবাজার রাজ এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ধর্মরাজের দেবোত্তর সম্পত্তিও কাশিমবাজারের জমিদারীর মধ্যে ন্যস্ত হয়। মন্দিরের মধ্যে সিংহাসনের উপর ৩টি ধর্মশিলা স্থাপিত আছে। এই শিলা খণ্ডগুলি বাঁকুড়ারায়, বুড়োরায় ও কালুরায় নামে প্রসিদ্ধ। মন্দির প্রাঙ্গণে সিন্দুর লিপ্ত ২টি প্রস্তর খণ্ডকে ষষ্ঠীদেবী বলে পুজো করা হয়। ধর্মরাজের নিত্য পূজার দেয়াসী হলেন স্থানীয় কলু পরিবারের লোকেরা। বৈশাখী পূর্ণিমায় বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে বাৎসরিক পূজো অনুষ্ঠিত হয়। বাৎসরিক পূজার বিশেষত্ব হ'ল ভক্তা কামান ও পাঁঠা বলিদান। ভক্তরা ধর্মের গাজনের সময় ব্রাহ্মণের মর্যাদা লাভ করেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মশিলাগুলিকে উন্মুক্ত মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বেদীর উপর রাখা হয়। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ধর্মঠাকুরের সিংহাসনকে "বারাম" ব'লে

উল্লেখ করেছেন। ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্মমঙ্গলে আছে,—

"আশীর্বাদ করি আমি বসিয়া বারামে।"

ডঃ ভট্টাচার্য দামড়ায় ধর্মঠাকুরের স্নান উৎসবটির মধ্যে আদিম সমাজের ধর্ম-বোধের পরিচয় লক্ষ্য করেছেন। ধর্মঠাকুর হ'লেন সূর্যের প্রতীক। "আদিম সমাজে সূর্যই উৎপাদন শক্তির মূল কেন্দ্র বলে বিবেচিত হয়। এই উৎপাদন অর্থে পৃথিবীর শস্যোৎপাদন যেমন বোঝায়, নারীর সন্তানোৎপাদন তেমনই বুঝায়। পৃথিবী এবং নারী উভয়েই সূর্যের শক্তি দ্বারাই একজন শস্যোৎপাদন ও আর একজন সন্তানোৎপাদন করে থাকে বলে বিশ্বাস। দামড়ায় ধর্মঠাকুরকে যখন ধামাৎকন্নী (পুরোহিতের সহকারী দেয়াসী) ঝুড়িতে বসিয়ে ধর্মশিলাগুলিকে পুকুরের দিকে নিয়ে যায় সেই সময়ে বন্ধ্যা নারীগণ জলে নেমে পড়ে। তাদের বিশ্বাস এই যে, স্নানের জল তাদের গায়ে লাগলে তারা বন্ধ্যাত্ব হ'তে মুক্তি পাবে।

দামুন্যা / দামিন্যা (২০০ ঃ রায়না) ঃ বিশেষ বিবরণ ১৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দামোদরপুর (২০ ঃ জামুরিয়া) ঃ জামুরিয়া হতে ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে দামোদরপুর গ্রামের অবস্থিত। এখানে আদিবাসী গোষ্ঠীর 'ছাতারপরব' অনুষ্ঠানটিতে নিকটবর্তী অঞ্চলের সমস্ত সাঁওতাল গোষ্ঠীর লোকেরা উপস্থিত হয়। প্রতি বৎসর ভাদ্র সংক্রান্তি ও ১লা আশ্বিন তারিখে 'ছাতাপূজা' ও 'ছাতাতোলা' উৎসব উপলক্ষে বিশাল জনসমাবেশ হয়। বাঁশের তৈরী দু'টি ছাতা রঙিন কাগজ ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে প্রায় ৪০ ফুট লম্বা দু'টি নূতন বাঁশের আগায় বাঁধা হয়। ছাতা পরবের দিন দু'টি শাল খুঁটি পুঁতে দড়ি বেঁধে কপিকলের সাহায্যে ছাতাসহ বাঁশ দু'টিকে উপরে তোলা হয়। পূজার সামগ্রির মধ্যে একটি ছাগ, লালমোরগ, লাল শালু কাপড়, কোড়া কাপড়, মেটে সিঁদুর, দুধ, চিড়া, গাঁজা, কল্কে, মদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পূজা অন্তে বলিদান হয়। ছাতা তোলার পর নারী ও পুরুষেরা মিলে মাদল বাজিয়ে নৃত্যগীতে মুখরিত করে রাখে সারা অঞ্চল। তৃতীয় দিনে ছাতা নামানোর পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

দ্বাদশভূম ঃ অধ্যাপক হেনরি ব্লকম্যান-এর মতে পাল আমলে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনে আঞ্চলিক শাসন কর্তাদের "ভূম"-এর অধিপতিদের ভৌমিক রাজা নামে আখ্যা দেওয়া হ'ত। বিভিন্ন সূত্র হ'তে বারটি ভূম বা ক্ষুদ্র জনপদের নাম জানা যায়। যথা,—(১) বীরভূম (২) সেনভূম (৩) শিখরভূম (৪) গোপভূম (৫) ব্রাহ্মণভূম (৬) মানভূম (৭) বরাভূম (৮) ধলভূম (৯) সিংভূম (১০) তুণভূম (১১) মালভূম ও (১২) ভঞ্জভূম। উপরোক্ত ক্ষুদ্র জনপদগুলির মধ্যে সেনভূম, গোপভূম, শিখরভূম (আংশিক) অঞ্চল একালের বর্ধমান জেলার মধ্যে অবস্থিত।

দাঁইহাট (৯০ ঃ কাটোয়া) ঃ কাটোয়া হ্তে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ভাগীরথীর তীরে একটি প্রাচীন শহর। সম্ভবতঃ দেওয়ানের হাট হ'তে স্থানটি অপভ্রংশে দাঁইহাট নামে রূপান্তরিত হয়েছে। দাঁইহাট, ভাউসিং ও বেড়া (আংশিক)

মৌজা নিয়ে দাঁইহাট পৌরসভা গঠিত হয়েছে। অতীতে ইন্দ্রাণী পরগণণার অন্তর্গত ইন্দ্রাণী নগরীর অন্তর্ভুক্ত ছিল একালের দাঁইহাট শহর। তার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি কাশীরাম দাসের নামে প্রচলিত একটি উক্তিতে,—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥"

দ্বাদশ তীর্থের অধিকাংশ বিলুপ্ত অথবা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ভাগীরথীর প্রবাহ পথ পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন জনবসতির বহু নিদর্শনও লুপ্ত হয়ে গেছে; কিন্তু ঘোষহাটে ঘোষেশ্বর, পাতাইহাটে পাতাইচণ্ডী, একাইহাটে একাইচণ্ডী ও বিকিহাটের সন্নিকটে ইন্দ্রেশ্বর শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ইন্দ্রাণীর অতীত গৌরবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ইন্দ্রেশ্বর ঘাট হ'তে কিছু দূরে অবস্থিত একটি মসজিদ ও একটি মাজার সম্ভবতঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত ইন্দ্রেশ্বর শিবমন্দিরের উপাদান নিয়ে গঠিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বদিন শ্রীচৈতন্যদেব ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট এসেছিলেন।

ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে ইন্দ্র দ্বাদশীর দিন পুণ্যস্নানের জন্য জনসমাবেশ হয়। ঘাটের নিকট সিদ্ধেশ্বরী তলায় রামানন্দের শ্রীপাট ছিল। সিদ্ধেশ্বরী 'মন্দিরের' উত্তরভাগে একটি পঞ্চমুণ্ডির সামনে রামানন্দ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে কেশেগড়ে নামক পুষ্করিণীর পাড়ে কবি কাশীরামদাসের বাসস্থান বলে দাবী করা হয়; কিন্তু এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দাঁইহাটের পশ্চিম অংশটিকে এখনও দেওয়ানগঞ্জ বলা হয়। মনে হয় বর্ধমানের রাজার দেওয়ান মানিকচাঁদের নামে দেওয়ানহাট বা দাঁইহাটে একটি ঘাট নির্মিত হয়েছিল। মানিকচাঁদের ঘাটের দক্ষিণে বদর শাহের মাজারটি ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের উপাদান নিয়ে গঠিত হয়েছিল তার প্রমাণ মিলবে মাজারের সম্মুখভাগের গাঁথুনিতে দেবদেবীর মূর্তি ক্ষোদিত, ব্যবহৃত প্রস্তরখণ্ডে। শোনা যায়, মানিকচাঁদ বদর শাহ আউলিয়াকে এই জমিটি দান করেছিলেন। দাঁইহাটের পূর্ব অংশে অবস্থিত ভাউসিং পল্লীটি ভূগুসিংহ নামক কোন ব্যক্তির নামে চিহ্নিত হয়েছে (বিশদ বিবরণ ইন্দ্রাণী, ৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

ভাউসিং পল্লীতে টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত কয়েকটি প্রাচীন শিবমন্দির ছিল। তন্মধ্যে একটির অস্তিত্ব এখনও বর্তমান। তীর্থমঙ্গল কাব্য হ'তে জানা যায় যে, এই স্থানেই বর্ধমানের রাজার নির্মিত একটি ঘাট ছিল যা "বুড়োরানীর ঘাট" নামে প্রসিদ্ধ। বুড়োরানীর ঘাটের পাশে রাজাদের সমাজবাড়ী আছে। এই সমাজবাড়ীতে আবুরায় হ'তে চিত্রসেন পর্যন্ত সকলের সমাজ রক্ষিত আছে। সমাজবাড়ীর পশ্চিমে কীর্তিচাঁদ ও তিলোকচাঁদের আমলের ৩টি মন্দির আছে। এই চত্বরের মধ্যে রাজাদের নির্মিত ঘাট ও বিশাল প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন রয়েছে। কবি গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ ও অন্যান্য সমসাময়িক বিবরণ হ'তে জান যায় যে, প্রাসাদ সংলগ্ন ঘাটে ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিত দুর্গোৎসব করেছিলেন এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর

অষ্টমী তিথি অন্তে নবমীর ভোর রাত্রে নবাব আলীবর্দী কর্তৃক মারাঠা সৈন্যগণ এই স্থানেই বিধ্বস্ত হয়ে পূজা অসমাপ্ত রেখে পঞ্চকোটের দিকে পলায়ন করেন।

দাঁইহাটের বাজার হ'তে পশ্চিম দিকে বনের মধ্যে ২/৩টি প্রাচীন মন্দির দেখা যায়। আরও পশ্চিমে বিকিহাটের দিকে এগিয়ে গেলে হনুমানের লাঠি নামে খ্যাত একটি প্রস্তরখণ্ড রয়েছে। পাইকপাড়ায় জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গলশাহ ফকিরের মাজারটি এখনও হিন্দু মুসলমানের কাছে আকর্ষণীয়। দাঁইহাট মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত বেড়া নামক পল্লী হ'তে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ কিছু প্রত্নবস্তু কাটোয়া মহকুমার লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

প্রতি বৎসর মহাসমারোহে এখানে রাসযাত্রা উৎসব পালিত হয়। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের পর দাঁইহাটের রাস উৎসবে প্রচুর জনসমাবেশ হয়। এখানকার রাসের মিছিলে থাকা সাজিয়ে শহরের রাস্তাগুলি প্রদক্ষিণ করা হয়। কাঠ ও বাঁশ নির্মিত থাকাগুলিকে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি সহ রাসলীলার পুতুলগুলিকে নানাভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার রীতি আছে।

দ্বারনড়া ঃ গলসী থানার অন্তর্গত লোয়া গ্রামের পার্শ্বে অবস্থিত দ্বারনড়ী গ্রাম। প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে কার্তিক দাস নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গ্রামে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। দুর্গামণ্ডপের কাছে রয়েছে দেবী সিংহবাহিনী এবং ইনি সার্বজনীন। শিবের মন্দিরটি টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত এবং বেশ পুরাতন বলে মনে হয়। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন জাঁকজমক সহকারে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বহুকাল পূর্বে নূতন সাহেব নামক এক ব্যক্তি এই গ্রামে দেহত্যাগ করেন। প্রতি বৎসর নূতন সাহেব পীরের উদ্দেশ্যে মাঘ মাসে শ্রদ্ধা জানান হয় এবং এই উপলক্ষে সাত দিন ধরে মেলা হয়।

দিসেরগড় (৩৯ ঃ কুলটি) ঃ আসানসোল অথবা বরাকর হ'তে সরাসরি দিসের-গড়ে পৌঁছান যায়। সরকার মান্দারনের অন্তর্গত সেরগড় পরগণার উল্লেখ আইন-ই-আকবরীতে আছে এবং এই পরগণার সদর কার্যালয় ছিল ডিহি-সেরগড়-এ। বৃটিশ আমলে ডিহি-সেরগড় অপভ্রংশে বা উচ্চারণ বিভ্রাটে দিসেরগড় বা ডিসেরগড়ে রূপান্তরিত হয়েছে। অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে হিন্দু আমলে এতদঞ্চল শিখরভূমের অন্তর্গত ছিল। পুরুলিয়ার রাজা নরোত্তম একসময়ে ডিসেরগড়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের জমিদার রাজা চিত্রসেন রায় দিসেরগড়ের দুর্গটি অধিকার করেন। একালে এই শহরটিকে কেন্দ্র ক'রে একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে ও ভারতীয় খনি সংস্থার সদর কার্যালয়টিও এখানে অবস্থিত। এখানে একটি মন্দিরে ছিন্নমস্তা দেবীর নিত্যপূজা হয়। পীরের স্থানে চৈত্র মাসে উরস উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলে সমবেত হয়। নিকটবর্তী চুনাগাড়ি গ্রামে একটি কালীমন্দির ও একটি মহাবীর মন্দির আছে।

দীর্ঘপাড়া (১৫৬ ঃ পূর্বস্থলী) ঃ নাদনঘাট হ'তে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে দীর্ঘপাড়া গ্রামের অবস্থিতি। কোন সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় বিষয়ের সম্পর্কের কথা জানা না গেলেও ঠগী দমন সময়কালে এই গ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা মনে পড়ে। গ্রামস্থ চন্দ্রশেখর রায় ঠগী দমনের নেতা কর্ণেল শ্লীম্যানের অধস্তন কর্মচারী ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র রাজগোপাল রায় সারাজীবন চাকুরীসূত্রে বিদেশে থাকলেও এই গ্রামে একটি হাসপাতাল নির্মাণ ও নাদনঘাট পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা করার জন্য তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দান করে গেছেন।

দুর্গা (৩৮ ঃ কাটোয়া) ঃ দাঁইহাট হ'তে বাসযোগে করজগ্রামে নেমে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে এগিয়ে গেলে 'বাংলার ইতিহাস' রচনার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ের জন্মস্থান দুর্গা গ্রামে যাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, কালীপ্রসন্নের দুই কৃতী ছাত্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইতিহাস চর্চায় উদ্বুদ্ধ হ'ন। দুর্গা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে মহাসমারোহে পঞ্চাননের পূজা ও একটি মেলা হয়।

দুর্গাপুর ঃ বিশেষ বিবরণ ১৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দেনুড় (৬৬ ঃ মন্তেশ্বর) ঃ মন্তেশ্বর অথবা পুটশুড়ি হ'তে খড়্গেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত দেনুড় গ্রামে বৃন্দাবন দাসের শ্রীপাটে যাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবীর পুত্র এবং তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। নিত্যানন্দের আদেশে চৈতন্য চরিতের 'ব্যাস বৃন্দাবন দাস' এখানে শ্রীপাট স্থাপন করেন এবং এই শ্রীপাট্টে অবস্থানকালে তিনি 'চৈতন্য ভাগবত' রচনা করেন। দেনুড় শ্রীপাটে বৃন্দাবনের লিখিত 'চৈতন্য ভাগবতের' পুঁথি রক্ষিত আছে। নারায়ণী দেবীও শেষ বয়সে পুত্রের সঙ্গে এখানে বসবাস করতেন। উদ্ধবদাস ও অভিরাম দাস বৃন্দাবন-এর শ্রীপাটে অবাস্থনকালে 'পাট পর্যটন' ও 'পাট পরিক্রম' রচনা করেন। শ্রীপাটে গদাধর পণ্ডিতের সংকলিত ভাগবতের দশম স্কন্দের একখানি পুঁথি আছে।

শোনা যায় নিত্যানন্দ প্রভুও এই গ্রামে এসেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর জন্মস্থান ছিল দেনুড় গ্রামে। এই গ্রামে ভারতী-গড়ে নামক পুষ্করিণীর পাড়ে কেশব ভারতীর ভজনস্থান ছিল। যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করে তিনি শৃঙ্গেরী মঠে অদ্বৈত মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতুর বালগোপাল মূর্তি দেনুড়ে সেবাপূজা লাভ করছেন। কেশব ভারতীর রচিত 'ক্রমদীপিকা' গ্রন্থের পুঁথি এসিয়াটিক সোসাটির সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বর্ধমান জেলার খাটুন্দি গ্রামে কিছুকাল বসবাস করেন; অতঃপর তিনি কাটোয়ার শ্রীপাট স্থাপন করেন। এই গ্রামে বৃন্দাবন ঠাকুরের আদেশে তাঁর শিষ্য রামহরি দাস নিতাই-গৌরের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন এবং শচীদাস নামক

একজন শিষ্যকে রাধাকান্ত বিগ্রহের সেবা দান করেন। দেনুড় গ্রামের উত্তরে দীনেশ্বর নামক এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মনে হয় দীনেশ্বর শিবের নামানুসারে গ্রামের নাম হয়েছিল দেনুড়। গ্রামটিতে বৈষ্ণব ভাবধারা সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত থাকলেও শাক্তধর্মের প্রাবল্য অতি সুস্পষ্ট। কবিওয়ালা বেণীমাধব দীক্ষিত, কবি সত্যকিঙ্কর কুণ্ডু, সুসাহিত্যিক অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী, ভোলানাথ ব্রহ্মচারী, প্রসিদ্ধ অভিনেতা অক্ষয় কালী কোঙার দেনুড় গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। দেনুড়েশ্বর শিবমন্দির ও অপর একটি শিবমন্দির হল গ্রামের প্রাচীন পুরাকীর্তির নিদর্শন। উভয় মন্দিরের গাত্রে প্রচুর টেরাকোটা অলঙ্করণ আছে।

দেবকুণ্ড (৮ ঃ কাটোয়া) ঃ শ্রীখণ্ড হ'তে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে দেবকুণ্ড গ্রামের অবস্থিতি। কিছুকাল পূর্বে গ্রামের একটি ঢিবি খুঁড়ে বহু দেব-দেবীর মূর্তি ও ভাস্কর্য ক্ষোদিত প্রস্তর ফলক পাওয়া গেছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়মে কিছু মূর্তি রক্ষিত আছে। অনুমান করা যায় যে, দেবকুণ্ড গ্রামে প্রস্তর শিল্পীদের বসবাস ছিল অথবা কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরে এই বিগ্রহগুলি রক্ষিত ছিল।

দেবীপুর (১৯৩ ঃ মেমারি) ঃ দেবীপুর স্টেশন হ'তে ৩ কিলোমিটার উত্তরে এই গ্রামের অবস্থিতি। এখানে সিংহ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দনের সুউচ্চ মন্দিরটি টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত আছে। মন্দিরটি প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ। নরোত্তম সিংহ ১২৪৭ সালে এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি হ'ল নিম্নরূপ,—

আরবন্ধায়বলী	প্রতিষ্ঠাবলী
শকাব্দ ১৭৬২ শক	শকাব্দ ১৭৬৬ শক
সন ১২৪৭ সাল	সন ১২৫১ সাল
তারিখ ১৫ই বৈশাখ	তারিখ ১৩ই আষাঢ়

গ্রামের মধ্যে তাম্বুলি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিবের মন্দির উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। গ্রাম প্রবেশের পথে পাশাপাশি একই ভিত্তিবেদীর উপর ৩টি মন্দির আছে। তন্মধ্যে প্রান্তভাগের দু'টি আটচালা শিবমন্দির ও মধ্যস্থলে মঞ্চাকৃতি মন্দির-টিতে কালিকাদেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি হ'ল "শ্রীশ্রীশিব শকাব্দ ১৭৫৮ শক"। এছাড়া চাটুজ্যে পরিবারের আরাধ্য দেবতা বুড়োশিব একটি আটচালা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেবীপুরের আদর্শ হাইস্কুলটি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে এই গ্রামে চণ্ডীলাল সিংহ নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একসময়ে কলিকাতার শেরিফ ছিলেন।

দেরিয়াটোন (১৯৪ ঃ কালনা) ঃ কালনা রেলস্টেশন হ'তে অতি সহজে দেরিয়াটোন গ্রামে যাওয়া যায়। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ও বিপ্লবী ভূপেন্দ্র দত্তের পৈত্রিক বাসস্থান ছিল দেরিয়াটোন গ্রামে।

দেয়াসিন (১০২ ঃ কাটোয়া) ঃ সিঙ্গি হ'তে হাঁটাপথে দেয়াসিন গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামে দেয়াসিন চণ্ডী দেবীর প্রস্তর নির্মিত মূর্তিটি ১২ মাস পূজিত হয়। দেবীমূর্তিটি মহিষমর্দিনী মূর্তির অনুরূপ। প্রতি বৎসর মাঘী পঞ্চমীর পরের অষ্টমী তিথিতে দেয়াসিন চণ্ডীর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

দোনা (৬৪ ঃ কাটোয়া) ঃ কাটোয়া হ'তে বাসে মেঝিয়ারী গিয়ে সেখান থেকে পশ্চিম মুখে হাঁটা রাস্তা ধরে দোনা গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামে ভট্টাচার্য পরিবারে অষ্টধাতু নির্মিত মহিষমর্দিনী মূর্তি নিত্য পূজিতা হন। অতীতে ভট্টাচার্য পরিবারের কয়েকজন ব্যক্তি তন্ত্রসাধনার জন্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন। দশহরা উপলক্ষে পূজা ও বলিদান সহ বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ধবনী (৪৩ ঃ দুর্গাপুর) ঃ দুর্গাপুর হ'তে মলানদিঘী স্টপেজে নেমে পায়ে হেঁটে ধবনী গ্রামে পৌঁছান যায়। বাংলা ১২৪৮ সালে ৪ঠা মাঘ সাধক কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ধবনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কণ্ঠ মশায় স্বীয় রচনা দক্ষতা ও সুকণ্ঠের জন্য কৃষ্ণযাত্রাকে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। কবি নীলকণ্ঠের তিরোভাব হয়েছিল বাংলা ১৩১৮ সালের ২০শে শ্রাবণ ঝুলনযাত্রার দিন। কবির তিরোধান উৎসব উপলক্ষে এক দিনের জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মৃতি মন্দিরের পাশে একটি মেলা বসে। গ্রামনাম সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে, এই গ্রামটি "ধববৃক্ষ"-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। আবার অনেকে অনুমান করেন যে, "ধোয়াবুনী" অর্থাৎ রেশম শিল্পের খ্যাতির জন্য গ্রামের নাম "ধোয়াবুনী" হ'তে ধবনীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

ধাত্রীগ্রাম (৮৭ ঃ কালনা) ঃ নবদ্বীপ-ব্যাণ্ডেল রেলপথে কালনার পরবর্তী ধাত্রীগ্রাম স্টেশনে নেমে এই গ্রামে যাওয়া যায় ; গ্রাম-নাম প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন যে, বল্লাল সেনের তাম্রশাসনে উল্লিখিত "ধার্যগ্রাম" হ'তে সম্ভবতঃ ধাইগাঁ বা অপভ্রংশে ধাত্রীগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। অতীতে ভাগীরথী তীর বরাবর ওয়াডেল রোড দিয়ে কালনার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। নিত্যানন্দ প্রভু এই গ্রামের রুদ্র নামক একজন ব্রাহ্মণ জমিদারকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি প্রথম জীবনে বৈষ্ণব বিদ্বেষী শাক্ত ধর্মালম্বী হলেও পরবর্তীকালে স্বগৃহে বিষ্ণু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ধাত্রীগ্রামের সন্নিহিত ভবানীপুর গ্রামে রাজা তেজচন্দ্রের গুরুবাড়ী ছিল এবং এই গুরুবংশ আজও ঐ গ্রামের বাসিন্দা। গ্রামের পার্শ্বে একটি জঙ্গলের মধ্যে টেরাকোটা অলংকরণে শোভিত ৩টি মন্দির আছে। ১টি পোড়ামাটির টালির উপর ক্ষোদিত লিপিতে মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। লিপিটি হ'ল,—

"১৬৭৩ শকাব্দে ভদ্রেশ্বর পদাম্বুজ ইদম্
শ্রীমৎ সুভদ্রমাদস্য শিলামীজে।"

এই গ্রামে রামসুন্দর তর্কচুড়ামণি, সত্যব্রত সামশ্রমী ও সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থানরূপে বিখ্যাত। আনুমানিক চারশ বছর পূর্বে নদীয়া জেলার ব্রহ্মশাসন গ্রাম হতে রামচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি ধাত্রীগ্রামে

এসে বসবাস স্থাপন করেন। রামচন্দ্রের পুত্রের নাম ছিল চন্দ্রপতি ; তাই এই বংশটি "চন্দ্রপতি" বংশ নামে পরিচিত। চন্দ্রপতি ধাত্রীগ্রামে দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেছিলেন ; কিন্তু তাঁর বংশধরগণ পূজা চালাতে অক্ষম হওয়ায় উইল সম্পাদনের দ্বারা সার্বজনীন পূজায় পরিণত করেন। সেকারণে দেবী দুর্গা এই গ্রামে, "সাজার মা" নামে পরিচিত। ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দে সাজার মায়ের বিরাট পূজামণ্ডপ নির্মিত হয়েছে। অতীতে বিদ্যাচর্চার যথেষ্ট প্রসার ছিল। এখানে স্মৃতি, ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বহু ছাত্র আসতেন এবং তাঁরা গুরুগৃহে বসবাস করতেন। বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ধাত্রীগ্রামের তাঁতিদের দক্ষতা ও খ্যাতি আছে। উন্নত মানের কাপড়ের নক্সা ও বোনার কৌশল সত্যই অপূর্ব !

ধান্যখেড়ুর (১২৯ : মন্তেশ্বর) : মাঝের গ্রাম হ'তে ২ কিলোমিটার হাঁটা পথে অথবা মালম্বা স্টপেজে নেমে ধান্যখেড়ুর গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামে ভট্টাচার্য পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কালিকাদেবী অত্যন্ত জাগ্রত। দেবীর বার মাস নিত্যপূজা হয়। এতদঞ্চলের লোকবিশ্বাস এই যে, দেবীর কৃপায় বাত রোগের নিরাময় হয়। বাতরোগে আক্রান্ত বহু ব্যক্তি ঔষধের নিমিত্ত দেবীর স্থানে প্রতিদিন সমবেত হন। কালীপূজার সময়ে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ধামাস (৩৯ : রায়না) : শক্তিগড় রেলস্টেশন হ'তে বড়শুলের নিকট দামোদর পার হ'য়ে ৬ কিলোমিটার হাঁটা পথে দক্ষিণ মুখে এগিয়ে গেলে ধামাস গ্রামে যাওয়া যায়। "ধামাস" শব্দটি সম্ভবতঃ 'ধর্মস্থান' হ'তে এসেছে, তাই এখানে বুড়োশিব, রক্ষাকালী, যোগাদ্যা, মনসা, পঞ্চানন্দ, রটন্তী কালী, ব্রহ্মা, শিব, ওলাইচণ্ডী, মেঘরাজ ধর্মঠাকুর ও শ্মশান কালীর পূজায় বিশেষ সমারোহ দেখা যায়। ধর্মের গাজনের সময় একটি গরুর গাড়ীকে ময়ূরপঙ্খীর মত সাজিয়ে শোভাযাত্রা বার করা হয়। ধামাসে রামাই পণ্ডিতের শিষ্য রামচন্দ্রের শ্রীপাট। রামচন্দ্র বাগনাপাড়ার রামাই পণ্ডিতের নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হ'ন এবং গুরুর আদেশে স্বগ্রামে প্রত্যাগমনপূর্বক শ্রীপাট স্থাপন করেন।

নন্দী (১৯ : জামুরিয়া) : জামুরিয়া হ'তে ৩ কিলোমিটার দূরে নন্দী গ্রামের অবস্থিতি। প্রাচীন রেকর্ডে গ্রামটি রাজপুর নন্দী নামে উল্লিখিত। এখানে একটি প্রস্তর নির্মিত মন্দিরে জমিদার বাড়ীর গৃহদেবতা দামোদরচন্দ্র অধিষ্ঠিত আছেন। উক্ত মন্দিরের সন্নিকটে আরও ২টি শিব মন্দির আছে, তম্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দিরটি জীর্ণদশাগ্রস্ত।

নন্দীগ্রাম (৭২ : কাটোয়া) : দাঁইহাট অথবা কাটোয়া হ'তে সরাসরি বাসযোগে এই গ্রামে পৌঁছান যায়। এই গ্রামের অধিকারী পরিবারে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং দোলযাত্রার সময় বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের দক্ষিণভাগে একটি পুষ্করিণীর তীরে একটি ভগ্ন প্রস্তর খণ্ডকে নন্দেশ্বরী রূপে পূজা করা হয়। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে দেবীর বাৎসরিক পূজা ও ফাল্গুন মাসে

চতুর্দশী তিথিতে মহোৎসব পালিত হয়। সামন্ত পরিবারের কুলদেবতা 'বিশ্বনাথ' শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে বিশেষ আকর্ষণ হ'ল অহোরাত্রব্যাপী বিভিন্ন দলের 'বোলান' গান।

ন'পাড়া (১৪৯ : পূর্বস্থলী) : পূর্বস্থলী থানার অধীনস্থ ন'পাড়া গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী কালিকা দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। পূর্বে নদেনঘাটের নিকট শাহাজাদপুর গ্রামে দেবী অধিষ্ঠিতা ছিলেন। জনশ্রুতি এই যে স্বপ্নাদেশের ফলে কোন একসময়ে তদানীন্তন ন'পাড়ার জমিদার দেবীকে ন'পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত করে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাআড়ম্বরে দেবীর বাৎসরিক পূজা হয় এবং এই উপলক্ষে একটি মেলা বসে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি বলরামের বংশধর শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে ন'পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সুসাহিত্যিক ও বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হিসাবে শ্রীশচন্দ্রের প্রসিদ্ধি ছিল।

ন'পাড়া (৫৬ : খণ্ডঘোষ) : বর্ধমান হ'তে সরাসরি ন'পাড়া গ্রামে পৌঁছান যায়। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে ও আশ্বিন মাসের মহানবমীতে গ্রাম-দেবী যোগাদ্যার বিশেষ পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। অতীতে বর্ধমানরাজ এস্টেটের ব্যয়ে দেবী পূজার বন্দোবস্ত হ'ত।

নবগ্রাম (৯৩ : কেতুগ্রাম) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে উল্লিখিত অজয় নদের উত্তর তীরে কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে রাধাকান্ত মন্দির, শিবমন্দির ও জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। চৈত্র মাসের চড়ক উপলক্ষে একটি মেলা বসে। স্থানীয় লোকের দাবী এই যে, মেলাটি ৩০০ বছর ধরে চলে আসছে।

নবগ্রাম (মঙ্গলকোট) : বিশেষ বিবরণ ১৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নবদ্বীপ : নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, ৯টি দ্বীপ বা ভূখণ্ড নিয়ে নব-দ্বীপ পরিমণ্ডল গঠিত হয়েছিল। যদিও একালে নব-দ্বীপ অর্থে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি নবদ্বীপকে বোঝায়। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লিখিত ৯টি দ্বীপ হ'ল—(১) অন্তরদ্বীপ (প্রাচীন মায়াপুর ও ভাড়ুইডাঙ্গা) (২) সীমান্তদ্বীপ (৩) গোদ্রুম দ্বীপ (৪) মধ্যদ্বীপ (৫) কোলদ্বীপ (৬) ঋতুদ্বীপ (৭) মোদ্রুমদ্বীপ (৮) জহ্নুদ্বীপ ও (৯) রুদ্রদ্বীপ। কিন্তু নরহরি যেভাবে নামকরণ করেছেন তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। প্রাচীন পুরাণের অনুকরণে নবদ্বীপ পরিমণ্ডলকে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভৌগোলিক বিভাগকে নবদ্বীপের মধ্যে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। উপরোক্ত দ্বীপগুলির মধ্যে শেষ ৫টি দ্বীপের অবস্থিতি হ'ল বর্ধমান জেলায়। বর্ধমান জেলায় অবস্থিত নব-দ্বীপ খণ্ডের মধ্যে বিদ্যানগরে বাসুদেব সার্বভৌম ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। মামগাছিতে শারঙ্গ প্রভু, নারায়ণী দেবী ও বৃন্দাবন দাস বসবাস করতেন।

নবাবহাট (১৬ : বর্ধমান) : বর্ধমান রেলস্টেশন হ'তে ৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে নবাবহাটের অবস্থিতি। পশ্চিমবঙ্গে ১০৯টি শিবমন্দির শোভিত শিবক্ষেত্রের

সংখ্যা মাত্র দু'টি। তন্মধ্যে প্রথমটি বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে নবাবহাটে ও দ্বিতীয়টি কালনা শহরে অবস্থিত। নবাবহাট অঞ্চল একসময়ে জনবসতিপূর্ণ এলাকা ছিল ; কিন্তু বিগত শতকে বর্ধমান জ্বরের প্রকোপে স্থানটি জনবসতিশূন্য হয়। মন্দির সংলগ্ন প্রান্তরের পূর্বভাগে পুষ্করিণীর উঁচু বাঁধ ও বাঁধানো ঘাট প্রাচীন লোকালয়ের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বর্ধমানের জমিদার রাজা ত্রিলোকচাঁদের পত্নী ও মহারাজা তেজচন্দ্রের জননী বিষণ-কুমারী দেবী এই শিবক্ষেত্র নির্মাণ করেছিলেন। এই শিবমন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠার পিছনে সম্ভবতঃ দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের অনুপ্রেরণা ছিল। লোকমুখে ১০৮টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা প্রচারিত হ'লেও প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের সংখ্যা ১০৯টি। এ-সম্পর্কে শাস্ত্রীয় বিধান এই যে, জপমালায় যেরূপ ১০৮টি বীজ গ্রথিত থাকে এবং অপর ১টি বীজ মেরুস্বরূপ দৃষ্ট হয়, এই মন্দিররাজিও সেই কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শিব-ক্ষেত্রের পশ্চিম ভাগের প্রবেশ পথের উপর প্রতিষ্ঠিত শিলালিপি হ'তে মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়,—

"শকে শূন্য শশাঙ্ক শৈল কুমিতে নির্মায় রাধাহরি প্রীত্যৈ
পুণ্যবতী নবাধিকশতং শ্রীমন্দিরানি স্বয়ম্।
ধীর শ্রীযুত তেজচন্দ্র ধরণী-ধৌরেয় চুড়ামনে
মাতা তৎসবিধে বিধায় সুসরস্তীরে সমস্থাপয়তু।"

মন্দিরের শিলালিপি হ'তে জানা যায় যে, ১৭১০ শকাব্দে বা ১৭৮৮-৮৯ খ্রীস্টাব্দে এই মন্দিররাজি নির্মিত হয়েছিল। একটি সুপ্রশস্ত আয়তক্ষেত্রের চারিদিকে আটচালা স্থাপত্যরীতিতে ১০৮টি মন্দির আছে। মন্দিরগুলির সম্মুখে উন্মুক্ত টানা বারান্দা ও তার নিম্নভাগে বাঁধান রাস্তা আছে। প্রতিটি মন্দিরের আয়তন ১০ ফুট × ১০ ফুট ও উচ্চতা প্রায় ১৫ ; ফুট, কিন্তু কোন টেরাকোটা অলঙ্করণ নেই এবং সব মন্দিরগুলিই একই রীতিতে নির্মিত। মন্দির চত্বরের পূর্বভাগে অপেক্ষাকৃত বড় মন্দিরটি অবস্থিত। প্রতি বৎসর শিবচতুর্দশীতে উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান শহর ব্যতীত পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হ'তে প্রচুর জনসমাগম হয়ে থাকে।

নরসিংহপুর (মৌজা-মৌগ্রাম ১০২ ঃ কেতুগ্রাম) ঃ মৌগ্রামের সন্নিহিত দক্ষিণে ও বাবলা নদীর পশ্চিমতীরে নরসিংহপুর গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামটি পৌরাণিক নামে চিহ্নিত হলেও এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রধান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হল মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা। গ্রামের মধ্যে যে মসজিদটি রয়েছে সেটি বেশ পুরাতন। মসজিদটি এক সময়ে সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত ছিল ; কিন্তু বর্তমানে স্থানে স্থানে টেরাকোটা অলঙ্করণগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। মসজিদটি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে পবিত্র জ্ঞান করে এবং মসজিদ প্রাঙ্গণের মাটি নিয়ে এসে ঘরে রেখে দেওয়া হয়। মসজিদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে মাঘ মাসে একটি মেলা বসে।

নলহাটী (৮৫ ঃ কাটোয়া) ঃ জগদানন্দপুরের উত্তর ও দাঁইহাট স্টেশনের দক্ষিণে

অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। অতীতে জনবসতিহীন অরণ্যসঙ্কুল এই গ্রামের সাধকপ্রবর দুর্গারাম ভট্টাচার্য কালিকাদেবীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে দক্ষিণাকালিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কাশ্যপ গোত্রীয় দুর্গারাম ভট্টাচার্যের বংশধরগণ এখনও এই গ্রামে বসবাস করছেন। বর্তমান শতকের প্রথমভাগে কৃতবিদ্য ও সিদ্ধপুরুষ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

দুর্গারামের প্রতিষ্ঠিত কালিকাদেবীর এই অঞ্চলে 'বড়ঠাকরুণ' নামে পরিচিত। প্রতি বৎসর কালী পূজার সময় গ্রামস্থ সকলের নিকট হ'তে দেবী পূজার নিমিত্ত মুড়ি, মুড়কি ও পাটালী সংগ্রহ করা হয়। লোকেরা একে 'এয়োজাত' বলে এবং 'এয়োজাত' যোগাড়ের জন্য গ্রামবাসীরা সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটায়। 'বড়ঠাকরুণে'র দধি দুগ্ধ মিশ্রিত চিঁড়া প্রসাদ শূদ্রবাহিত হ'য়ে ব্রাহ্মণের গৃহে প্রেরিত হলেও তাঁরা ঐ প্রসাদ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না। কালী পূজায় ছাগ, মেষ ও মহিষ বলিদান হয় এবং বিগ্রহের পশ্চাৎদিকে শূকর বলিদান হয়। দুপুরে ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর 'পোষলার' ন্যায় অন্নভোগ বিতরণ করা হয়। দেবী পূজায় দোকানের মিষ্টান্ন দেওয়া একেবারেই নিষেধ।

নসীপুর (৮৬ঃ কাটোয়া)ঃ দাঁইহাট শহরের দক্ষিণে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। নসীপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিছু জনপ্রবাদ আছে। শোনা যায় নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মতান্তরে গঙ্গাগোবিন্দ সপ্তপরিখা খনন করে এই গ্রামটির পত্তন করেছিলেন। নিত্যানন্দ পূর্বে গৌড়ে বসবাস করতেন। তাঁর যুবতী কন্যার অসামান্য রূপ দর্শনে সুলতান ঐ কন্যাকে বিবাহ করতে চান। জাতিনাশের ভয়ে উপায়ান্তর না দেখে তিনি সপরিবারে দাঁইহাটে পালিয়ে আসেন এবং দাঁইহাটের সন্নিকটে পরিখাবেষ্টিত গড়বাড়ী তৈরী ক'রে বাস শুরু করেন। সুলতান জঙ্গলিশাহ ও ইসলাম খাঁকে তাঁর অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রেরণ করেন; কিন্তু ঐ সৈনিকদ্বয় অর্থের দ্বারা বশীভূত হয়ে নসীপুরে বসবাস করতে থাকেন। নিত্যানন্দের বংশধর ছিলেন ভবানন্দ রায় ও রামমোহন রায়। ভবানন্দ সন্নিকটবর্তী ঘোড়ানাশ গ্রামে বসবাস করেন। তাঁর সময়ে ঘোড়ানাশের প্রসিদ্ধির জন্য একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল। যথা,—

'রাজার সুখে রাজ্যে বাস।
তার সাক্ষী ঘোড়ানাশ'॥'

এই গ্রামে নন্দকিশোর বিদ্যালঙ্কার একাধারে ছিলেন বৈষ্ণব এবং অপরপক্ষে তিনি তন্ত্রসাধনা করতেন। দাঁইহাটে তিনি বিশালাক্ষীর বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন; আবার জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও রামসীতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ধমানের জমিদার ত্রিলোকচাঁদ রায় দেবসেবার নিমিত্ত বহু ভূসম্পত্তি দান করেন।

নাচন (৭৯ঃ ফরিদপুর)ঃ দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের মধ্যে নাচন গ্রামে ২৪ পরগণা জেলার নোয়াপাড়া নিবাসী দ্বারিকানাথ মণ্ডল কাশিমবাজারের কান্ত নন্দীর সহযোগিতায় জমিদারী ক্রয় করে নাচন গ্রামে বসবাস শুরু করেন। দ্বারিকানাথের

জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীনচন্দ্রের সময়ে এই বংশের শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাঁর আমলে জমিদারবাড়ী, দুর্গামণ্ডপ, শিবমন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

নাড়ুগ্রাম (১৪ : রায়না) : বর্ধমান হ'তে বাসে সরাসরি নাড়ুগ্রামে যাওয়া যায়। অনেকের মতে, গ্রামদেবতা নাড়েশ্বর শিবের নাম হ'তে গ্রামনাম হয়েছে। শিবের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রবাদ আছে গ্রামের পাশে একটি জঙ্গলের মধ্যে শিবলিঙ্গটি মাটি চাপা অবস্থায় ছিল এবং কোন গোয়ালা কর্তৃক শিবলিঙ্গটি আবিষ্কৃত হয়। নাড়েশ্বর শিবের গাজন উৎসবটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এই গাজনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ময়ূরপঙ্খী গান ও ফুলের সাজ।

নাদনঘাট (১৬৬ : পূর্বস্থলী) : নবদ্বীপ অথবা কালনা হ'তে বাসে এই গ্রামে পৌঁছান যায়। নাদনঘাটের বিশেষ প্রসিদ্ধি হ'ল ধান ও চালের ক্রয় বিক্রয়ের গঞ্জের জন্য। অতীতে যে সময়ে রাস্তাঘাট অপ্রতুল ছিল সেই সময়ে খড়িনদীর পথে নৌকা-যোগে বর্ধমান জেলার পূর্বাঞ্চলে ধান, চাল ও পাট নাদনঘাট গঞ্জে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে আসা হত এবং নদীপথেই কলিকাতা ও বাংলার অন্যান্য স্থলে চালান যেত।

নারিকেলডাঙ্গা (১৩০ : কালনা) : বৈঁচি রেলস্টেশনে নেমে বৈদ্যপুর অতিক্রম করে বেহুলা নদীর তীরে অবস্থিত নারিকেলডাঙ্গায় যাওয়া যায়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গলে' নারিকেলডাঙ্গার উল্লেখ আছে। গ্রামদেবী জগৎগৌরীর পূজার জন্য গ্রামের প্রসিদ্ধি। কষ্টিপাথরে নির্মিত বিগ্রহটি ভাস্কর্যের একটি সুন্দর নিদর্শন। দেবী সিংহপৃষ্ঠে স্থাপিত পদ্মের উপর উপবিষ্টা এবং তাঁর বাম হাঁটু মোড়া ও ডান পা ঝোলানো। মূর্তিটি দেখে প্রচলিত মনসা মূর্তি বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে আরও উল্লেখ করা যায় যে, তাঁর বাম ক্রোড়ে একটি শিশু ও মাথার উপর রয়েছে নাগছত্র। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল তাঁর পদতলে একটি ছিন্নমুণ্ড পতিত রয়েছে। অনেকের মতে মূর্তিটি জগৎগৌরী, দুর্গা ও মনসার মিশ্র রূপ। জনশ্রুতি এই যে, মুর্শিদকুলি খাঁর সমসাময়িক ও এতদঞ্চলের ভূস্বামী কিঙ্করমাধব সেন গ্রামের ঝাঁপানতলার পাশে শ্মশানের মধ্যে শ্মশানকালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। জগৎগৌরীকে ঘিরে প্রায় সারা বছর ধরে পূজা ও অনুষ্ঠান হয়। তবে দশহরার পরের পঞ্চমী তিথিতে সমস্ত নারিকেলডাঙ্গাবাসীরা মেলা, উৎসব ও ঝাঁপান উপলক্ষে মেতে ওঠে। ঝাঁপানের পূর্বদিন দেবীর বেশ পরিবর্তন ও অধিবাসকে 'সয়লা' পরব বলে। ঝাঁপানের দিন গ্রাম প্রদক্ষিণের পর সারা দিন ধরে পূজা ও বলিদান হয়। হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। পরের দিন হুগলী জেলার বৈঁচি গ্রামে শোভাযাত্রা সহকারে দেবীকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেও ঝাঁপান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

নাসিগ্রাম (৮৯ : ভাতাড়) : বর্ধমান অথবা ভাতাড় থেকে সরাসরি বাসযোগে নাসিগ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামনামের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে ডক্টর সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন "নূতন বসতি বা নব-আবাসিক হ'তে গ্রামনামটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।"

আবার অনেকের মতে নিকটবর্তী কয়েকটি প্রাচীন গ্রাম ধ্বংস হওয়ার পর নূতন গ্রামের পত্তন হয়েছে। এই গ্রামে বহু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছিল যা বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। গ্রামটিতে কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাই বসবাস করে—তাই হিন্দু দেবদেবীর মন্দির-থান প্রভৃতি চোখে পড়বে। বিভিন্ন মন্দিরে গোপীনাথ (বড় ও ছোট), রাধামাধব, শ্রীগৌরাঙ্গদেব, বুড়ো শিব, ন্যাড়া মা, জয়কালী, রক্ষাকালী, বুদ্ধরাল (সম্ভবতঃ বুড়োলাল নামক ধর্মঠাকুর), ফকির রায়, মাইতো রায়, শিব, কালী, তারা মা, সিংহবাহিনী প্রভৃতি রয়েছেন। এখানে বাৎসরিক উৎসবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল নবান্ন, লক্ষ্মীপুজো, দশহরা ও মনসা পুজো। বড় গোপীনাথের প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস হওয়ায় একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। একটি উঁচু ঢিবির উপর নির্মিত সুউচ্চ শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটির গঠনরীতি হল রথাকৃতি এবং প্রায় ৩০/৩২ টি ধাপ অতিক্রম করলে মন্দিরের শীর্ষদেশে পৌঁছান যায়। বুড়ো শিব হলেন নাসিগ্রামের গ্রাম দেবতা। চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। যে মৃত্তিকার স্তূপটির উপর শিবমন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল সেটি অনেকে বৌদ্ধ স্তূপ বলে মনে করেন। বুদ্ধরাল ঠাকুরকে কেহ বলেন ধর্মরাজ আবার অনেকের মতে ইনি সূর্যদেব। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মের গাজন উপলক্ষে জামালপুরের বুড়োরাজের উদ্দেশে ছাগ বলি হয়। অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে ডাকাতে কালী বা ভয়কালী দেবীর পুজো হয় সাড়ম্বরে।

নাসিগ্রামে কাশীনাথ সার্বভৌম নামক এক পণ্ডিত ও সাধক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাশীনাথের কুলদেবী ছিলেন দক্ষিণাকালী বা ন্যাড়া কালী। কাশীনাথ এখানেই তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। নাসিগ্রামের সুসন্তান অধ্যাপক অমিয়কুমার ভট্টাচার্য কাশীনাথের স্বহস্তে লেখা কিছু পুঁথিপত্র উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর সত্যনারায়ণ পাঁচালীর রচনাকাল ১৭৪০ শকাব্দ। এই পুঁথিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। তিনি যে, সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'চৌর-পঞ্চাশিকা'র অনুবাদ হ'তে। সম্ভবতঃ তিনি ঊনবিংশ শতকের প্রথমপাদে জীবিত ছিলেন।

নিগন (১১৭ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ বর্ধমান-কাটোয়া রেলপথ ও বাসে নিগন গ্রামে পৌঁছান যায়। মনে হয় গ্রামদেবতা নিগনেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের সঙ্গে গ্রামনামের সম্পর্ক আছে। নিগনেশ্বরের উৎপত্তি সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে, যেস্থানে মন্দিরটি অবস্থিত তথায় ঘন জঙ্গল ছিল এবং ঐ জঙ্গলের মধ্যে গৃহপালিত পশুর বিচরণক্ষেত্র ছিল। গ্রামস্থ কোন গোয়ালার গরু দুধ না দেওয়ায় গোয়ালার মনে সন্দেহ দেখা দেয়; সেকারণে গরুর মালিক ও রাখাল গোপনে বনমধ্যে গিয়ে দেখে যে, একটি ঢিপির উপর গাভীটি দাঁড়িয়ে আছে স্বাভাবিকভাবে দুগ্ধ ক্ষরিত হচ্ছে। ঐ স্থানের মাটি খুঁড়ে প্রাচীন শিবলিঙ্গটি আবিষ্কৃত হয়। চৈত্র মাসে মহাসমারোহে শিবের গাজন

অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, নিগনেশ্বরের প্রসাদ নিয়ে ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার পুজা হয়।

নিত্যানন্দপুর (৭২ : ভাতাড়) : বলগনা চটি হ'তে এক কিলোমিটার পশ্চিমে নিত্যানন্দপুরের অবস্থিতি। নিত্যানন্দপুরের প্রসিদ্ধি শুরু হয়েছিল গোস্বামী বংশের বসবাসের পর হতে। নিত্যানন্দ প্রভুর জ্যেষ্ঠ পৌত্র গোপীজনবল্লভ এই গ্রামে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীকালে গোস্বামী বংশের একটি শাখা ফরিদপুর থানার ইছাপুর গ্রামে চলে যায়; কিন্তু গোস্বামী বংশের মূল ধারাটি নিত্যানন্দপুরেই থেকে যায়। গোস্বামী পরিবারে মদনগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। গ্রামের মধ্যে টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত একটি প্রাচীন মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে ও আজও তার সেবাপুজা হচ্ছে।

নিশিরাগড় (২০০ : মেমারী) : দেবীপুর রেলস্টেশন হ'তে ২½ কিলোমিটার উত্তর দিকে এগিয়ে গেলে নিশিড়গড়ে পৌঁছান যায়। গ্রামে কোন গড়ের চিহ্ন না থাকলেও একটি প্রাচীন অট্টালিকা ও সংলগ্ন পুষ্করিণীর তীরে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষটি দেখে অনুমান করা যায় যে, একসময়ে এটি একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। একটি পরিত্যক্ত টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত প্রাচীন শিবমন্দির ও তার পাশে অপর একটি শিব-মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাম্বুলীদের জোড়া শিবমন্দির দু'টিও টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত। এছাড়া একটি সাধারণ আটচালা শিবমন্দিরও রয়েছে। একটি দালান মন্দিরের মধ্যে ঘোষাল মা অর্থাৎ ঘোষাল পরিবারের পুজিত মহিষমর্দিনী বিগ্রহ রয়েছে। প্রবাদ আছে যে, "ঘোষাল মা" এই গ্রামে প্রায় ৫০০ বছর ধরে সেবাপুজা পেয়ে আসছেন; কিন্তু দালান মন্দিরটি অতি সম্প্রতিকালে অর্থাৎ ১৩৬৬ সালে নির্মিত হয়েছে। অন্যান্য বিবরণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য বিষয় হ'ল, কবি বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার শেষ জীবনে এই গ্রামে বসবাস করতেন। আজও ভট্টাচার্য পরিবারের লোকেরা তাঁদের পূর্বপুরুষ বানেশ্বরের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ভট্টাচার্য পরিবারের দুর্গাপুজাটি বহুকাল ধরে চলে আসছে। গ্রামের একপাশে মোকাম সাহেব পীরের আস্তানায় হিন্দু মুসলমান উভয়েই শ্রদ্ধা জানায়।

নিঃশঙ্ক (১২৭ : মেমারী) : মেমারী হ'তে ৭ কিলোমিটার উত্তরে আমাদপুর রোডের ধারে নিঃশঙ্ক গ্রামের অবস্থিতি। নরহরি অবধূত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের বিগ্রহ গ্রামস্থ একটি আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে নরহরি স্বামীর আবির্ভাব তিথিতে হরিনাম সঙ্কীর্তন সহ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

নূতনগ্রাম (১২৫ : কাটোয়া) : অগ্রদ্বীপ রেলস্টেশনের সন্নিকটে নূতন গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র হলেও লোকশিল্পের আলোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রামের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। কাঠের তৈরী পেঁচা নূতন গ্রামের ভাস্কর্যের অনবদ্য অবদান। এখানকার ভাস্করেরা কাঠ খোদাই করে বিভিন্ন আকৃতির পেঁচা, পুতুল, ও রথ নির্মাণ করে থাকেন। নূতন গ্রামের ভাস্করেরা পূর্বে দাঁইহাটের অধিবাসী

ছিল। বাংলার লোকশিল্পের প্রদর্শনীশালায় নূতন গ্রামের ভাস্করদের কাষ্ঠ নির্মিত শিল্পসামগ্রী সগৌরবে স্থান লাভ করেছে।

নেপাকুলি (১৬৯ ঃ কালনা)ঃ কালনা শহর হ'তে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে নেপাকুলি গ্রামের অবস্থিতি। এখানে একটি মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রস্তরনির্মিত কমলা ও বিমলা দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। দশহরা ও আষাঢ় নবমীতে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের সদ্গোপেরা দেবীর প্রধান সেবাইত। কমলা ও বিমলা পূজার সঙ্গে ঝাঁপানের সম্পর্ক থাকায় এই পূজাকে মনসা পূজার নামান্তর বলে মনে করা যায়।

নৈহাটি (১১৭ ঃ কেতুগ্রাম)ঃ উদ্ধারণপুরের উত্তরাংশে অবস্থিত নৈহাটি গ্রামের প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ হল রূপ ও সনাতন গোস্বামীর পৈত্রিক বাসস্থানের জন্য। সনাতনের প্রপিতামহ পদ্মনাভ কর্ণাটক হ'তে শিখরভূম রাজ্যে বসবাসের নিমিত্ত আসেন। পরবর্তীকালে তিনি গঙ্গার তীরে বসবাসের জন্য নবহট্টে গমন করেন। জ্ঞাতি বিরোধের ফলে সনাতনের পিতা কুমারদেব নবহট্ট পরিত্যাগপূর্বক বাকলাচন্দ্রদ্বীপে গমন করেন। সেকালে নৈহাটির প্রাচীন নাম ছিল নবহট্ট। সনাতন গোস্বামীর শিক্ষাগুরু ও সেযুগে বঙ্গদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সর্বানন্দ সিদ্ধান্ত বাচস্পতির বাসস্থান ছিল নৈহাটিতে।

গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে জনপ্রবাদ এই যে, নই রাজা নামক একজন ভূমধ্যকারীর বাসস্থান রূপে স্থানটি নবহট্ট বা নৈহাটিতে পরিণত হয়েছে। নৈহাটি গ্রামের বিশেষ প্রসিদ্ধি হ'ল কালরুদ্রদেবের মন্দির ও সেবাপূজার জন্য। কালরুদ্রদেবের উৎপত্তি সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে, তিনি অতীতে কান্দিতে ছিলেন এবং চৈত্র মাসে জল সন্ন্যাসের দিন কান্দির ভক্তদের হস্তচ্যুত হ'য়ে গঙ্গায় পতিত হন। পরে কোন এক সময়ে জেলেদের জালে এই বিগ্রহ জল হ'তে উঠেছিল। এখনও গাজনে হোমের রাত্রে ও জল সন্ন্যাসের দিন যে ঘাটে রুদ্রদেব ছিলেন সেই শ্মশান ঘাটের দক্ষিণে তাঁকে দু' দিন রাখা হয়। দু' দিন এই স্থানে অবস্থানের পর পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। শোনা যায় কালরুদ্রদেবের প্রাচীন মন্দির ছিল প্রস্তর নির্মিত এবং প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের ভিত্তির উপর বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়েছে। কালরুদ্রদেবের প্রস্তর ক্ষোদিত মূর্তিটি ভাস্কর্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। পদ্মাসনে একটি শবের উপর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় কালরুদ্র দণ্ডায়মান। শবাসনা শ্যামার ন্যায় রুদ্রদেবের বামপদ অগ্রে ন্যস্ত। তিনি চতুর্ভুজ, দক্ষিণ করে নরমুণ্ড ও খট্টাঙ্গ, বাম করে ত্রিশূল, পরিধানে বাঘছাল, কর্ণে কুণ্ডল ও স্কন্ধদেশ হ'তে যজ্ঞোপবীত লম্ববান। শবের দুই পার্শ্বে ২টি যোগমগ্ন মূর্তি রয়েছে এবং কালরুদ্রদেবের স্কন্ধদেশের কাছে ২টি অপ্সরা মূর্তি অর্ধশায়িতা অবস্থায় শূন্যে অবস্থিত। বিগ্রহের প্রতিমার ন্যায় তাঁর ধ্যানটিও ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই মন্দিরের মধ্যেই রাম, সীতা ও হনুমানের মূর্তি আছে। গ্রামের পশ্চিমে প্রায় পরিত্যক্ত নদীখাতের উপর "মাসীর

সেতু" নামক একটি সেতু রয়েছে ; যেটি মোগল আমলে নির্মিত বলে অনেকে অনুমান করেন।

পঞ্চধাম ঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট বঙ্গদেশের পাঁচটি প্রসিদ্ধ স্থান পুণ্যস্থান বা তীর্থস্থান রূপে গণ্য হয়। শ্রীপাট পর্যটন গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—

"নবদ্বীপ ধামে প্রভুর জন্ম হয়।
কাটোয়া প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয় ॥
একচক্রা জন্মভুমি, খড়দহে বাস।
শ্রীনিত্যানন্দের দুই ধাম জানিবা নির্যাস ॥
শ্রীঅদ্বৈতধাম শান্তিপুরে হয়।
এই পঞ্চধাম সবে জানিহ নিশ্চয় ॥"

পাঁচটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থস্থানের মধ্যে ২টি নদীয়া জেলায়, ১টি বর্ধমান জেলায়, ১টি বীরভূম জেলায় ও অপরটি উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত।

পঞ্চাননতলা (১) (মৌজা মুলগ্রাম ৭৪ ঃ কাটোয়া) ঃ দাঁইহাট স্টেশন হ'তে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণে বাস-রাস্তার ধারে একটি বেদী বাঁধান বৃক্ষতলে পঞ্চাননের পূজো হয়। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ পঞ্চাননের বাৎসরিক পুজো উপলক্ষে বিশেষ উৎসব, বলিদান ও একটি মেলা বসে। পুজোর প্রথম অধিকারী হ'লেন মুলগ্রামের ভট্টাচার্য ও সদ্গোপ পরিবারের লোকেরা ; এরপর অন্যান্যদের পুজো ও বলিদান হয়।

পঞ্চাননতলা (২) ঃ কাটোয়া হ'তে বাসযোগে ফড়ে নদীর তীরে গাঁফুলিয়া মৌজায় পৌঁছান যায়। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ পঞ্চাননের বাৎসরিক পুজো ও উৎসব উপলক্ষে এখানে একটি মেলা বসে। ফড়ে নদীর তীরে অবস্থিত ব'লে মেলার স্থানটিকে ফড়ে পঞ্চাননতলার মেলা বলা হয়। পঞ্চানন হলেন এতদঞ্চলের আঞ্চলিক দেবতা। রামকৃষ্ণপুর, করজগ্রাম, দুর্গা, গোঁড়া, গোপালপুর, বাঁধমুড়া, রাধাকৃষ্ণপুর, বিজয়-নগর, আলমপুর, বনগ্রাম ও গাঁফুলিয়ার লোকেরা পঞ্চাননের পুজোয় যোগ দেয়।

পর্বতপুর (২৬ ঃ জামালপুর) ঃ জৌগ্রাম স্টেশন হ'তে ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে পর্বতপুরের অবস্থিতি। পর্বতপুর গ্রামে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে নানা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তম্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল, ১৬ই ফাল্গুন তারিখে কানা দামোদরের তীরস্থ শ্মশানকালীর বাৎসরিক পুজো হয় এবং এই সময়ে একটি মেলা বসে। জামালপুর থানার আরও কয়েকটি গ্রামের ন্যায় পর্বতপুরেও এক দিনের মধ্যে মূর্তি তৈরী করে পুজো করার প্রথা আছে। এই গ্রামে একটি মন্দিরে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্যামসুন্দরের মূর্তিটি কোষ্ঠীপাথরের ও শ্রীরাধিকার মূর্তিটি অষ্টধাতুর নির্মিত। শ্যামসুন্দরের দোল অনুষ্ঠিত হয় রামনবমীতে। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে মনসা পুজো উপলক্ষে গ্রামের ধর্মতলায় ঝাঁপানের মেলা বসে। গ্রামদেবতা ধর্মরাজ এখানে কালাচাঁদ নামে খ্যাত ও একটি বড় আকারের প্রস্তরখণ্ড হ'ল কালাচাঁদের প্রতীক। এছাড়া জগদ্ধাত্রী শীতলা ও সিদ্ধেশ্বরী কালীর

পূজা হয় বৎসরের বিভিন্ন সময়ে। সম্প্রতিকালে পর্বতপুরে 'আনন্দ আশ্রম' নামে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এই গ্রামে কোন উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মন্দির নাই। পাল আমলে তৈরী কয়েকটি দেব-দেবীর মূর্তি দালান মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন।

পলাশপুলি (৮১ : পূর্বস্থলী) : ভাগীরথী নদীর দক্ষিণে পলাশপুলি গ্রামে লৌকিক গ্রামাদেবী শীতলা মাতার পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পলাশী (১০৫ : বর্ধমান) : বর্ধমান কুসুমগ্রাম বাস-রাস্তায় পলাশী স্টপেজ-এ নেমে গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি পলাশী বা সোনাপলাশী নামে পরিচিত। সোনা-পলাশী গ্রামে ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে কথাসাহিত্যিক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজা রামমোহন রায়ের দ্বিতীয়া পত্নীর পিত্রালয় ছিল এই গ্রামে। সবাক চলচ্চিত্রের যুগে বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা নবদ্বীপ হালাদারের জন্মস্থান ছিল পলাশী গ্রামে। পলাশী গ্রামে বুড়ো শিবের মন্দিরের সম্মুখভাগ টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত এবং এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল হ'ল ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দ। এছাড়া অপর একটি আটচালা মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয় এবং পার্শ্ববর্তী কুড়মুন গ্রামের বুড়ো শিবের গাজনের সঙ্গে বহুকাল ধরে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মরাজের গাজন। এছাড়া ফাল্গুন মাসে মহাসমারোহে রক্ষাকালী দেবীর বাৎসরিক পূজা হয়।

পহ্লানপুর (১৭২ : রায়না) : বর্ধমান হ'তে বাসযোগে সরাসরি রায়না থানার সর্বদক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পহ্লানপুর গ্রামে পৌঁছান যায়। অনেকের মতে, পীর পহ্লানের নামানুসারে গ্রামের নাম হয়েছে পহ্লানপুর। পহ্লানু পীরের দরগায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শ্রদ্ধা জানায়। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে পহ্লান পীরের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে পীরতলা সংলগ্ন মাঠে মেলা বসে। হিন্দু দেব-দেবীদের মধ্যে পঞ্চানন্দ, শীতলা, মনসা, ধর্মরাজ ও কালিকা দেবী এই গ্রামের অধিবাসীদের আরাধ্য দেবতা।

পাটুলী (১৭ : পূর্বস্থলী) : নবদ্বীপ কাটোয়া রেলপথে পাটুলী স্টেশনে নেমে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত পাটুলীতে পৌছান যায়। মধ্যযুগে ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য পাটুলীর বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার জমিদার বংশ আদিতে পাটুলী নিবাসী ছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের সময় পাটুলীর জমিদার রাঘব দত্ত পাটুলী হ'তে বাঁশবেড়িয়ায় গমন করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নথিপত্র হ'তে জানা যায় যে, রবার্ট ক্লাইভ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ যাত্রার পূর্বে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জুন পাটুলীতে শিবির স্থাপন করেছিলেন।

ভাগীরথী নদীর প্রবাহপথ এই স্থানে উত্তর বাহিনী হওয়ায় পৌষসংক্রান্তি ও ১লা মাঘ "উত্তর বাহিনীর পূজা" উপলক্ষে বহু লোক পুণ্য স্নানের নিমিত্ত আসে ও

একটি মেলা বসে। গ্রামের মধ্যে কয়েকটি দেবমন্দিরও আছে। দোলযাত্রার দিন দোল মন্দিরে ও বারদোলের পর কৃষ্ণদেব ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে বিশেষ উৎসব পালিত হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরটিও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। অতীতে ভাগীরথীর তীরে রাজবাড়ী ও নীলকুঠির বিশেষ জৌলুস ছিল, যা একালে প্রায় ধ্বংসের পথে। দেবীসিদ্ধেশ্বরী এখানে একটি মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা আছেন। রাজনারায়ণ বসুর ভ্রমণকাহিনী হ'তে জানা যায় যে, কোন এক সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাগীরথী নদীপথে নৌকাযোগে যাত্রার সময়ে সপরিবারে এখানে অবস্থান করেছিলেন।

পাড়াল : প্রসিদ্ধ পদকর্তা শশিশেখর মতান্তরে চন্দ্রশেখরের শ্রীপাট হ'ল পাড়াল গ্রামে। ইনি শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু পাড়াল গ্রামের সঠিক অবস্থিতি একালে নির্দেশ করা যায় না।

পাণ্ডবেশ্বর (মৌজা বৈদ্যনাথপুর ৫ : অণ্ডাল) : দুর্গাপুর বা অণ্ডাল হ'তে বাস ও ট্রেনপথে পাণ্ডবেশ্বরে পৌঁছান যায়। পঞ্চপাণ্ডবের স্মৃতি বিজড়িত পাণ্ডবেশ্বরে ৬টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে এবং নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মোহান্তগণ কর্তৃক মন্দিরগুলি পরিচালিত হয়। শোনা যায় অষ্টাদশ শতকে ঘনশ্যাম নামক একজন সিদ্ধপুরুষ এখানে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় ধারায় সাধন-ভজন করতেন। পাণ্ডবেশ্বরের শিবমন্দিরে একটি ভৈরব ও হনুমানের প্রস্তর মূর্তি পূজিত হচ্ছে।

পাণ্ডুক (৫২ : আউসগ্রাম) : গুসকরা অথবা ভেদিয়া হ'তে পাণ্ডুক গ্রামে যাওয়া যায়। জনশ্রুতি এই যে, এখানে পাণ্ডুদাস নামক একজন রাজার গড়বাড়ী ছিল সেকারণে স্থানটি পাণ্ডুক নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মহোৎসব উপলক্ষে ৫ দিন ব্যাপী মেলা ও হরিনাম সঙ্কীর্তন হয়। আউসগ্রাম থানায় অবস্থিত একটি অখ্যাত গ্রামরূপে গণ্য হ'লেও পাণ্ডুক গ্রামের খ্যাতি ও গুরুত্ব সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রাম সংলগ্ন একটি উচ্চ ঢিবি খনন করে খ্রীস্টপূর্ব ১২০০ অব্দের তাম্র-প্রস্তর ও তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শন এই স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্ন ক্ষেত্রটি পাণ্ডু রাজার ঢিবি নামে খ্যাত (বিশেষ বিবরণ ১ম খণ্ড, ১২৬-৩৬ দ্রষ্টব্য)।

পাতাইহাট (৮৮ : কাটোয়া) : কাটোয়া শহরের ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে আকাইহাটের সন্নিকটে পাতাইহাট নামক প্রাচীন গ্রামটির অবস্থিতি। অতীতে এই অঞ্চলের পাশ দিয়ে ভাগীরথী নদী প্রবাহিত হ'ত। উক্ত স্থানে একটি পুষ্করিণী খননকালে গঙ্গার ধারে বাঁধান ঘাটের সন্ধান মিলেছে। কবি গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' পাতাইহাটের উল্লেখ আছে। এখানকার শিবমন্দিরটি বেশ প্রাচীন বলে মনে হয়।

পাতাগ্রাম : মন্তেশ্বর থানার অধীনস্থ পাতাগ্রামে যেতে হ'লে দেনুরের পথে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। দেনুরের সন্নিকটবর্তী পাতাগ্রামের অবস্থিতি এবং এখানে অভিরাম ঠাকুরের শিষ্য বিদুর ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট আছে। বিদুর ব্রহ্মচারীর প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ

বিগ্রহ আজও পূজিত হচ্ছে। কার্তিক মাসের শুক্লানবমী ও দশমী তিথিতে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পাতিলপাড়া (১৪২ ঃ কালনা) ঃ বৈঁচি স্টেশন হ'তে বৈদ্যপুরের পথে পাতিল-পাড়া গ্রামে যাওয়া যায়। কল্লোল যুগের কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জন্মভূমি রূপে এই গ্রামটি গৌরবান্বিত। এছাড়া কবি কালিকিঙ্কর সেনগুপ্তের বাল্যকাল কেটেছিল এখানে। পাতিলপাড়ার হরগৌরী মন্দিরটি বহু প্রাচীন। সন্নিকটবর্তী গ্রামগুলির ন্যায় এখানেও শ্রাবণ মাসে জগৎগৌরী নামক মনসা দেবীর ঝাঁপান উৎসবটি মহাসমারোহে পালিত হয়। গ্রামের অন্যান্য উৎসবের মধ্যে দোলযাত্রা ও রক্ষাকালীর পূজা উল্লেখযোগ্য।

পাতুন (৪৬ ঃ মন্তেশ্বর) ঃ মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুরের সন্নিকটবর্তী একটি প্রাচীন গ্রাম। গ্রামনাম সম্পর্কে জনশ্রুতি এইরূপ যে, প্রসিদ্ধ দার্শনিক মহর্ষি পতঞ্জল বহুতীর্থ পরিভ্রমণ করে এই গ্রামে আগমনপূর্বক পতঞ্জলিশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলের আগমন এবং শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। পাত্রেশ্বর শিবের প্রাচীন মন্দিরটি গ্রামের পাশে একটি পুকুরের পাড়ে নির্মিত হয়েছিল। প্রতি বৎসর শিবরাত্রিতে পাত্রেশ্বর শিবের পূজা ধুমধাম সহকারে হয়ে থাকে। অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য যাদবেন্দু পণ্ডিতের শ্রীপাটরূপে পাতুনের প্রসিদ্ধি। এই শ্রীপাটে গোপীনাথ জীউর সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর কার্তিক শুক্লানবমী ও দশমীতে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামদেবতা ধর্মরাজের দেয়াসী হ'ল বাগ্র ক্ষত্রিয়রা। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে বিনয় ঘোষ পাতুন গ্রাম দর্শনের পর মন্তব্য করেছিলেন যে, এই গ্রামে শত শত প্রস্তর নির্মিত মূর্তি পাত্রেশ্বর মন্দিরের ভিতরে বাইরে স্তূপাকার করে জড়ো করা আছে। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি, লোকেশ্বর বিষ্ণু, সূর্য গণেশ ও ধর্মরাজের কূর্মমূর্তি। তাঁর মতে অতীতে এই গ্রামে ভাস্করদের বাস ছিল ; তাই ভাস্করদের লুপ্ত কীর্তির সামান্য নিদর্শন পাতুন গ্রামের মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে।

পানাগড় (৮৫ ঃ কাঁকসা) ঃ বর্ধমান হ'তে বাস অথবা রেলযোগে সরাসরি পানাগড়ে পৌঁছান যায়। একালের পানাগড়ের কোন গ্রামীণ সত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে একটি বিমানক্ষেত্র ও প্রতিরক্ষা শিবির তৈরী করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আরও ৩/৪টি গ্রামকে উচ্ছেদ করে সৈন্যবাহিনীর শিবির ও খাদ্যভাণ্ডার সংরক্ষণের স্থান হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এই স্থানে রামাই পণ্ডিতের শিষ্য হরিদাস শ্রীপাট স্থাপন করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, গুরুর আদেশে হরিদাস অর্ধতিলক ধারণ করতেন।

পারুলিয়া (৮৫ ঃ পূর্বস্থলী) ঃ পূর্বস্থলী রেলস্টেশনের সন্নিহিত দক্ষিণে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। পারুলিয়া গ্রামের জনবসতি দেখে গ্রামটিকে নূতন গ্রাম মনে হলেও অতীতে গ্রামটি সমৃদ্ধশালী ছিল। জনহীন ও জঙ্গলময় স্থানের

মধ্যে ২টি পুরাতন রাস্তা ছিল যা একে অপরকে সমকোণে ছেদ করেছিল। জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষটি দেখে এটি কোন প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। জনশ্রুতি আছে যে, পূর্বে চন্দ্রকেতু নামে একজন রাজা এখানে রাজত্ব করতেন এবং কোন ব্রাহ্মণের অভিশাপে তাঁর রাজ্য ধ্বংস হয়। গ্রামের শিবতলায় একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে। শিবলিঙ্গটি সারা বছর জলে ডুবিয়ে রাখা হয়, কেবলমাত্র বাৎসরিক উৎসবের সময় জল থেকে শিবলিঙ্গটি তোলা হ'ত। মূর্তিটির গায়ে নাকি চ.কে. অক্ষর ক্ষোদিত ছিল যার অর্থ করলে চন্দ্রকেতু ধরা যায়, কিন্তু মূর্তিটি অপহৃত হয়েছে। ধ্বংসাবশেষের নিকট রাক্ষসী পোতার ঢিবি ও একটি দীঘি আছে।

এই গ্রাম সম্পর্কে আরও শোনা যায় যে, মধ্যযুগে মুসলমানেরা এই অঞ্চল অধিকার করার পর জোরপূর্বক স্পর্শদোষ ঘটিয়ে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে। এই কার্যটি পীর আলী নামক সেনাপতি দ্বারা হওয়ায় গ্রামটি পীরাল্লা নামে রূপান্তরিত হয়। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ পীরাল্লা গ্রামের উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, জোঁড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল পীরাল্লা গ্রামে এবং সমাজচ্যুত হয়ে তাঁরা যশোহরে চলে যান (রবিজীবনী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩)। ১৯৪৭ সালের পর পূর্ববঙ্গ হ'তে আগত বহু নিরাশ্রয় ব্যক্তি এখানে অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং নোয়াখালি দাঙ্গার পর তথাকার জমিদার অশ্বিনীকুমার সাহা মৌজাটি ক্রয় করে নূতন গ্রাম পত্তন করেন। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে বাসুদেব সার্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতির পূর্ব নিবাস ছিল পারুলিয়ায়।

পার্লাসিট-ভৈটা (৩৯, ৪০ ঃ মেমারী) ঃ বিশেষ বিবরণ ১৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পালার (৬৩ ঃ ভাতাড়) ঃ ভাতাড় হ'তে বনপাস যাওয়ার পথে ২ কিলোমিটার পশ্চিমে পালার গ্রামের অবস্থিতি। আবার বাদশাহী রোড ধরে সরাসরি বর্ধমান হ'তে এখানে আসা যায়। অতীতে এই স্থানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাবল্য ছিল। কেঁদুলির মেলার অনুকরণে প্রতি বৎসর মকর সপ্তমী তিথিতে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ও একটি মেলা বসে। গ্রামের মধ্যে ১টি চালামন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্যান্য স্থানে শিবলিঙ্গের আবির্ভাবের ন্যায় পালারের শিবলিঙ্গ সম্পর্কে অনুরূপ একটি কাহিনী গড়ে উঠেছে। বারোয়ারি তলায় জাঁকজমক সহকারে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নবমীর দিন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে গ্রামের সকল লোক অংশ গ্রহণ করে থাকে।

পাল্লা ঃ জামালপুর থানার অধীনস্থ পাল্লারোড স্টেশনে নেমে এই গ্রামে যাওয়া যায়। সন্নিকটবর্তী দামোদর নদের চড়াভূমিতে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ পুণ্যস্নান উপলক্ষে মেলা বসে। স্নানার্থীরা লক্ষ্মী-নারায়ণ ও অনন্তশয়নে নারায়ণ মূর্তিকে পূজো দিয়ে ঘরে ফেরে। দিনান্তে বিগ্রহদ্বয়কে দামোদরের জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। কিছুকাল পূর্বেও পাল্লা গ্রামের বিপরীত তীরে জামদাহে অনুরূপ একটি মেলা বসত—কিন্তু একালে পরিত্যক্ত হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ধর্মরাজের গাজন উপলক্ষে

অনুষ্ঠিত উৎসবে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকেরা অংশগ্রহণ করে থাকে। অনেকে অনুমান করেন যে, হয়ত আদিতে উৎসবটি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কোন পরব উপলক্ষে শুরু হয়েছিল; কিন্তু কোন কারণে এটি বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায় হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং অতীত স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সাঁওতালেরা এখনও হাজির হয়।

পালিগ্রাম (২১ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ গুসকরা হ'তে বাসে সরাসরি পালিগ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যস্থলে একটি মন্দিরে ৬টি ধর্মশিলা পূজিত হয়। ডক্টর অমলেন্দু মিত্রের মতে ৪টি হ'ল কুর্ম, ১টি নারায়ণ ও ১টি শ্রীমতি শিলা। গ্রামস্থ সদগোপেরা হ'লেন দেয়াসী ও ঘোষাল পরিবারের লোকেরা হলেন ধর্মরাজের পূজারী। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণিমার পূর্বদিন গ্রাম প্রদক্ষিণ অনুষ্ঠানকে নাবড়াডাঙ্গা বলে ; ঐ দিন প্রত্যেক বাড়ীতে বানেশ্বর ও ঘোড়ার পূজা হয়। বৈকালে রথে চড়িয়ে অজয় নদে মুক্তস্নান হয় এবং সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর সিদ্ধেশ্বরী দেবীর সম্মুখে বানফোঁড়া হয়। পূজার দিন মন্দিরের বাইরে ধর্মশিলা-গুলিকে একটি বেদীর উপরে স্থাপন করার পর ধর্মমঙ্গলের নবখণ্ডের একটি পালা-গান গাওয়া হয়। এই সময়ে জিভ-বান ফোঁড়ার প্রথা আছে। গ্রামের বাইরে পশ্চিম পাড়ায় আদিরাক্ষ ধর্মঠাকুরের কাছে ভাঁড়াল নাচ, ছাগ বলিদান ও হোম হয়। তৃতীয় দিনে ২টি মইপুতে হেঁটমুণ্ড অবস্থায় ঝুলে ধুনা পোড়ানর বিধি আছে। চতুর্থ দিন সারাদিন উপবাসের পর রাত্রে কানে তুলো গুঁজে অন্ধকার ঘরের মধ্যে হবিষ্যান্ন ও দুধ মিষ্টি ভক্তরা আহার করে। গ্রামের ব্রাহ্মণ বাড়ীতে আশ্বিন মাসে কিরীটেশ্বরী ও ভাদ্র মাসে খাঁদাকালীর পূজা হয়। এছাড়া জাঁকজমক সহকারে আশ্বিন মাসে পঞ্চাননের পূজা হয়।

পালিশগ্রাম (৮১ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ কৈচরের নিকটবর্তী মঙ্গলকোট থানার অধীনস্থ একটি গ্রাম। এই গ্রামে পালিশক্ষেত্র শিব অধিষ্ঠিত আছেন। সম্ভবতঃ শিবের নামানুসারে গ্রামনাম হয়েছে। মাঘী পূর্ণিমায় মুসাফির পীরের উরস উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

পাহাড়পুর ঃ নবদ্বীপের সন্নিকটবর্তী পাহাড়পুর বা পাড়পুর গ্রামে পুরন্দর পণ্ডিত ও শঙ্কর পণ্ডিত শ্রীপাট স্থাপন করেছিলেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে উল্লেখ আছে,—"বাম ভিতে নবদ্বীপ ডাইনে পাড়পুর।

পাঁইটা (১৫৯ ঃ রায়না) ঃ বর্ধমান আরামবাগ বাস-রাস্তায় বুলচন্দ্রপুর স্টপেজে নেমে পাইটা গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামস্থ একটি প্রাচীন মন্দিরে দেবী কালিকা অধিষ্ঠিতা ছিলেন। ঐ মন্দির ধ্বংস হওয়ায় নূতন মন্দির নির্মিত হয়েছে। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে সাড়ম্বরে দেবীর বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে মেলায় বহু জনসমাবেশ হয়। মণ্ডল পরিবারের স্বরূপনারায়ণ নামক ধর্মশিলা ও রজক পণ্ডিতের বাড়ীতে বাঁকুড়া রায়, ক্ষুদি রায়, যাত্রাসিদ্ধি ও কালু

রায় নামক ধর্মশিলা নিত্য পূজিত হন। অম্বিকাচরণ গুপ্তের মতে পাঁইটা গ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর শ্বশুরালয় ছিল।

পাঁচড়া (মৌজা রূপপুর ৬৫ ঃ জামালপুর) ঃ মসাগ্রাম রেল স্টেশন হ'তে পশ্চিম-মুখে ৩ কিলোমিটার দূরে পাঁচড়া গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামটি আদিতে পঞ্চাঢ্য নামে পরিচিত ছিল বলে স্থানীয় লোকেরা দাবী করেন। আবার পঞ্চ-আড়া (পাড়া) হ'তে পাঁচড়ায় রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পাঁচড়া গ্রামে একটি দালান মন্দিরে কূর্মরূপী ধর্মরাজ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। পণ্ডিত উপাধিধারী ব্যক্তিরা ধর্মরাজের সেবাইত। বৈশাখ মাসে ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উপলক্ষে বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবার ঘট স্থাপন অনুষ্ঠানের পর দ্বিতীয় মঙ্গলবারের ধর্মরাজের নিশান তোলা হয়। অতঃপর বুধ, বৃহস্পতি, শুক্রবারে ধর্মরাজ ও লীলাবতীর বিবাহ উপলক্ষে সারা গ্রামে উৎসবের ছোঁয়া লাগে। গাজনের ৩ দিন ফুল মেলা উৎসব হয়। গ্রামের দু' পাড়ার মধ্যে ফুলের সাজ প্রদর্শনের সময় প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং এইভাবেই সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। চতুর্থ দিন জাঁকজমক সহকারে পূজো, পাটভাঙ্গা ও বহু ছাগ বলিদান হয়। গাজন উপলক্ষে ৪ দিনের জন্য একটি মেলা বসে। একটি বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত দেবী মূর্তি বিশালাক্ষী নামে পূজিতা হ'ন। ধর্মরাজ মন্দিরের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ত্রিমূর্তি ও শীতলা মায়ের প্রস্তর নির্মিত মূর্তি আছে। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের একটি মন্দিরের মধ্যে কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ ও অষ্টধাতুর রাধিকামূর্তি পূজিত হয়। একই মন্দিরে নিম কাঠের বলরাম ও রেবতী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে, কিন্তু মন্দিরটি বলরামের মন্দির নামে খ্যাত। অতীতে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বলরামের দোল উৎসব ও মাঘী পূর্ণিমায় মহোৎসব হ'ত। কিছু-কাল হ'ল মহোৎসব অনুষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, আশ্বিন মাসে মহাষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার সময় জোরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে বলরামের আরতি করা হয়—মনে হয় শাক্তদের পূজা ও বলিদানের শব্দ যাতে বৈষ্ণবদের বিগ্রহের কানে না পেঁছায় তার জন্য এইরূপ আরতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গ্রামের উত্তর প্রান্তে মাঠের মা নামে সিদ্ধেশ্বরী কালিকার মৃন্ময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি ১২ বৎসর অন্তর দেবীর নবকলেবর হয়। সিদ্ধেশ্বরীর পূজা হয় দিনে মাত্র একবার। সন্ধ্যারতি ও শীতল দেওয়া হয় সমাদ্দার পরিবারের বাড়ীর ভিতর। একটি পঞ্চমুণ্ডির আসনে দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। শোনা যায়, জনৈকা সাধিকা মাঠের মাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতি বৎসর ১৩ই চৈত্র দেবীর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ দেয়। গ্রামে উল্লেখযোগ্য দেবদেউলের মধ্যে ধর্মরাজের দালান মন্দির ও তার পাশে একটি নাটমন্দির আছে। দে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি শিবমন্দির ও শ্রীধর বিগ্রহের দালান মন্দির আছে। উক্ত মন্দির চত্বরের প্রবেশ পথটি এক বাংলা রীতিতে নির্মিত হয়েছে। মজুমদার পরিবারের শিবমন্দিরটি রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁর বংশধরেরা নির্মাণ করেছিল। এই শিবমন্দিরের একটি বৃহৎ ও ১৬টি

ক্ষুদ্র চূড়া আছে। বড়বাড়ির ভট্টাচার্য পরিবারে অষ্টকোণাকৃতি জোড়া শিবমন্দিরে ২টি বৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ভট্টাচার্য পরিবারের পঞ্চরত্ন মন্দিরে শিবলিঙ্গ নিত্য পূজিত হ'ন।

পাঁজোয়া (৬৫ ঃ কাটোয়া) ঃ দাঁইহাট হ'তে সরাসরি এই গ্রামে পেঁছান যায়। প্রতি বৎসর দশহরার পরের পঞ্চমী তিথিতে মনসা দেবীর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

পিলসোঁয়া (৪৬ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ মঙ্গলকোটের ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে কুনুর নদীর উত্তর তীরে পিলসোঁয়া গ্রামের অবস্থিতি। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে আউলচাঁদ নামক জনৈক সাধুর তিরোধান উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে এবং এই উৎসবটি বহুকাল ধরে চলে আসছে।

পিলা ঃ পূর্বস্থলী থানার অধীনস্থ পিলা গ্রামে মাতুলালয়ে পাঁচালী-গীতিকার দাশু রায় শেষ-জীবন অতিবাহিত করেন। জনশ্রুতি এই যে, কালিকানন্দ নামক জনৈক তান্ত্রিক সাধক তাঁর উপাস্য দেবী কালিকাকে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। কালিকানন্দের তিরোধানের পর দেবী বনমধ্যেই ছিলেন এবং সেবাপূজার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিছুকাল পরে গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দেবীকে উদ্ধার করেন এবং সেবাকার্যে নিযুক্ত হ'ন ; কিন্তু বর্তমানে ঐ মূর্তির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। একটি বটবৃক্ষের মূলদেশে দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা হয়।

পুটশুড়ি (৬৪ ঃ মন্তেশ্বর) ঃ মন্তেশ্বর হ'তে বাসযোগে পুটশুড়ি গ্রামে পেঁছান যায়, আবার কুসুমগ্রাম হ'তেও এখানে যাওয়া যায়। গ্রামটি বৃন্দাবন দাসের স্মৃতি বিজড়িত দেনুড় গ্রামের সন্নিকটবর্তী হওয়ায় স্থানীয় লোকে দেনুড়-পুটশুড়ি বলে। গ্রামটি অতি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু। গ্রামের মধ্যে একটি মাটির ঘরে জমিদার অশোক গুঁই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গজকালিকার প্রস্তরমূর্তির নিত্যপূজা হয়। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে দেবীর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে বহুকাল ধরে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী রায় পরিবারের গোপীনাথ বিগ্রহও রাধারাণীর মূর্তি একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমায় মহাসমারোহে গোপী-নাথের দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে এই গ্রামে ব্রহ্মা বা অগ্নিদেবতার পূজা হয় এবং একই দিনে গ্রহদেবতার উদ্দেশ্যে গ্রহ পূজা বা গড় পূজা বহুকাল ধরে চলে আসছে। পুটশুড়ি গ্রামে বাবাঠাকুর অধিষ্ঠিত আছেন। প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবারে শিশুদের মঙ্গল কামনা করে দূর-দূরান্ত থেকে বাবাঠাকুরের কাছে লোকেরা মানত শোধ ও পুজো দিতে আসে। আষাঢ় মাসে শুক্লানবমী তিথিতে বাবাঠাকুরের বাৎসরিক পূজা হয়। এখানে বহুকাল ধরে মনসা ও ধর্মরাজের পূজা অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে। পুটশুড়ি গ্রামে গোপীনাথ মন্দিরের কাছে গোপালদাস বাবাজী নামক এক বৈষ্ণব মোহান্তের সমাধি আছে। গোপালদাস সম্ভবতঃ চৈতন্যচরিতা-মৃতে বর্ণিত কীর্তনীয়া দলের একজন নর্তক ছিলেন। পুটশুড়ি গ্রামে শিবের জোড়া

শিখরদেউলটির সম্মুখভাগ সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত। এই গ্রামের যোগাদ্যাতলায় ৩১শে বৈশাখ সাড়ম্বরে যোগাদ্যা পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

পুতুণ্ডা (১৫৪ : বর্ধমান) : শক্তিগড় স্টেশন থেকে ২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে পুতুণ্ডা গ্রামের অবস্থিতি। সম্ভবতঃ রাঢ়ীয় পাতিতুণ্ড ব্রাহ্মণগণের বসবাসের জন্য গ্রামনাম হয়েছে পুতুণ্ডা। পুতুণ্ডা গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির নিদর্শন হ'ল স্বর্গীয় ক্ষেত্রনাথ চৌধুরীর পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত সুউচ্চ আটচালা মন্দির এবং এই মন্দিরে দামোদর শিলা অধিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি হ'তে জানা যায় যে, ১৬৭১ শকাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের গর্ভগৃহের সম্মুখ ভাগের দেওয়ালে ও বাইরের বারান্দার দেওয়াল অপূর্ব টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত আছে। একটি লিপি হ'তে জানা যায় যে, এই মন্দিরটির সংস্কার সাধন করা হয়েছিল। সংস্কারের লিপিটি হ'ল,—

"ভক্ত পদ রজঃ প্রার্থী
শ্রীক্ষেত্রনাথ চৌধুরী পিতা
৺বিনোদবিহারী চৌধুরী কর্তৃক
শ্রীমন্দির সংস্কৃত। ১৩৪২ সাল।"

দামোদর মন্দিরের পূর্বভাগে ক্ষেত্রনাথ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত ওঁঙ্কারনাথ মন্দিরে পাথরের রাধাকৃষ্ণ মূর্তির নিত্যসেবা হয়। উক্ত মন্দিরদ্বয়ের অনতিদূরে ক্ষেত্রনাথ চৌধুরীর পূর্বপুরুষ কোন একসময়ে রামেশ্বর শিবের আটচালা মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। গ্রামের প্রবেশ পথে একটি চারচালা মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। অতীতের এই শিবলিঙ্গটি ভৈটা গ্রামে ছিল; চৈত্র মাসের শিবের গাজন উপলক্ষে একটি ছোট মেলা বসে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, উপরোক্ত বিগ্রহগুলির পুরোহিত হলেন চক্রবর্তী পরিবারের লোকেরা। গ্রামের মধ্যে একটি দালান মন্দিরে গোপীনাথ বিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। গোপীনাথের দোল উৎসব হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরে চতুর্থী তিথিতে। দোলের সময় দোলমঞ্চে বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। নিমকাঠের তৈরী শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণী বহুকাল ধরে পুতুণ্ডা গ্রামে সেবাপূজা পাচ্ছেন। গোপীনাথের ভোগ ব্যবস্থারও বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিবর্তন হওয়ার প্রথা আছে। ১৩৯৭ সালে এই গ্রামে সুনীলকুমার চৌধুরী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বন্ধু পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দালান মন্দিরে শ্রীধর ও লক্ষ্মীমাতা অধিষ্ঠিত আছেন। হাজরা পরিবারে একটি দালান মন্দিরে রঘুনাথজী বিগ্রহ নিত্যসেবা পূজা পাচ্ছেন। পূর্বে রাম-নবমীতে চার দিন ধরে মেলা হ'ত, যা একালে বন্ধ হয়ে গেছে। রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শিবের পীড়াদেউলটির স্থাপত্য অত্যন্ত সুন্দর। এই শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা-লিপি হ'ল,—

"শক ১৭৯২
অস্য শিবালয়স্য প্রতিষ্ঠাত্রী

শ্রীমতী আনন্দময়ী দাসী
প্রণেতা ঈশ্বরচন্দ্র মিস্ত্রী।"

মুসলমান পাড়ায় টিনদ্বারা আচ্ছাদিত একটি মসজিদ আছে। মসজিদ সংলগ্ন স্থানে একটি মাটির ঘরে বড়কা পীরের সমাধিতে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পোড়া মাটির ঘোড়া মানত করে। গ্রামের উত্তরভাগে ঘড়ুই বাড়ীতে জোড়া বেদীর উপর দু'টি বিগ্রহের একটিকে রক্ষাকালী ও অপরটিতে দিদিঠাকুরণের ধ্যানে পুজা করা হয়। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের মঙ্গলবারে দেবীদের উদ্দেশ্য পুজা ও বলিদান হয় এবং ২দিন ধরে একটি মেলা বসে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, রক্ষাকালীর মূর্তিটি হ'ল একটি লালঘোড়া ও দিদিঠাকরুণের প্রতীক হ'ল একটি সাদা ঘোড়া। লাল ও সাদা ঘোড়াকে রক্ষাকালী ও দিদিঠাকরুণের প্রতীকরূপে পুজা করা হয়। সম্ভবতঃ এটি হ'ল প্রাচীন ধর্মপুজার রূপান্তর।

পুঁইনি (৫৩ ঃ কাটোয়া) ঃ কাটোয়া থানার দক্ষিণাংশে পুঁইনি গ্রামের অবস্থিতি। পুইন শব্দের অর্থ পাতাল, তাই এই গ্রামে পাতালেশ্বর শিব অধিষ্ঠান করছেন। একটি সুউচ্চ মন্দিরে পাতালেশ্বর শিবের নিত্যসেবা পুজা হয়। আনুমানিক প্রায় ২০০ বৎসর ধরে শিবরাত্রিতে এক সপ্তাহ ব্যাপী মেলা ও বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কাটোয়া হ'তে বাসে কড়ুইয়ে নেমে দক্ষিণমুখে হেঁটে এই গ্রামে যাওয়া যায়।

পূবার (৫১ ঃ আউসগ্রাম) ঃ পাণ্ডু রাজার ঢিবির পূর্বভাগে পুবার গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির নিদর্শন হ'ল হিজরা ১৩৪২ অব্দে (১৯২৩ খৃস্টাব্দে) নির্মিত একটি দোতলা মসজিদ এবং মসজিদটিতে কোন গম্বুজ নাই; কিন্তু মসজিদের প্রবেশ পথটি অতি সুন্দরভাবে নির্মিত হয়েছে।

পূর্বস্থলী (৮০ ঃ পূর্বস্থলী) ঃ কাটোয়া-নবদ্বীপ রেলপথে পূর্বস্থলী রেল স্টেশনে নেমে থানার সদর কার্যালয় পূর্বস্থলীতে যাওয়া যায়। এই গ্রামের প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে। অনেকে অনুমান করেন যে, অতীতে এই স্থানের নাম ছিল পূর্বধূলি বা পূর্বধূল্যা। ভাগীরথীর ভাঙ্গনের ফলে পূর্বস্থলীর বহু প্রাচীন নিদর্শন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বহুপূর্বে এখানে একটি ব্যবসাবাণিজ্যের গঞ্জ ছিল। নদীপথে কলিকাতা ও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ এবং নিকটবর্তী নবদ্বীপের অবস্থিতির জন্য গঞ্জে প্রচুর মাল ক্রয়-বিক্রয় হ'ত। 'সেকালের দারোগা-কাহিনী' গ্রন্থ হ'তে জানা যায় যে, এই স্থানে জলদস্যুদের আড্ডা ছিল। একডালা, পরাণপুর, চুপি, কাঁকশিয়ালী, মেড়তলা প্রভৃতি গ্রামের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের কথাও জানা যায়। নৌকাযাত্রীরা কাঁকশিয়ালীর বাজারে রন্ধন ভোজনের সামগ্রী ক্রয় করে এখানেই বিশ্রাম নিত।

শোনা যায় প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে গোবিন্দ চক্রবর্তী নামক জনৈক ব্যক্তি এখানে বুড়োমার মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে এই বংশের রূপরাম চক্রবর্তী ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বাদশাহের নিকট জমিদারীর ফরমান লাভ

করেন। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে প্রমথনাথ রায় বুড়োমার নূতন মন্দির নির্মাণকার্য শুরু করেন, কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যু হওয়ায় তদীয় পত্নী কল্যাণময়ী দেবীর চেষ্টায় মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। বুড়োমার কোন মূর্তি নেই, তবে তিনি কালিকার ধ্যানেই পূজিতা হন। এই মন্দিরের মধ্যেই হরগৌরীর নিত্যপূজা হয়। ভট্টাচার্য পরিবারের কুলদেবতা কৃষ্ণদেব অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা বলে প্রসিদ্ধ। থানার কাছে একটি নূতন কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; যার অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করেছিলেন কল্যাণময়ী দেবী। ১২১৭ সালে পলাশপুলি গ্রামের বাসিন্দা মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শীতলা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে একটি মেলার প্রবর্তন করেছিলেন। রেলস্টেশনের সন্নিকটে সত্যনারায়ণ ট্রাস্টের উদ্যোগে একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে শ্বেত পাথরের লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

পূর্বস্থলীতে অতীতে কোন বারওয়ারী দুর্গাপূজা ছিল না। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দ হ'তে একটি বারওয়ারী দুর্গাপূজার প্রচলন হয়েছে। গ্রামের মধ্যে রামসত্যনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরে সতীমার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

গ্রামে বিভিন্ন পূজা উপলক্ষে মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চড়কের সময় হরগৌরীতলায় হরগৌরী বিগ্রহকে নিয়ে আসা হয়। চড়ক উৎসবের মেলাটি বহুকাল ধরে চলে আসছে। নবদ্বীপের রাস ও কাটোয়ার কার্তিক পূজোর অনুকরণে কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি গড়ে পূজা হয় এবং পরের দিন বিরাট বিরাট মূর্তিগুলিকে গরুর গাড়ীর চাকার উপর বসিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হয়। নিকটবর্তী চুপি, কাষ্ঠশালী ও পলাশপুলি গ্রামে কার্তিক সংক্রান্তির পূজা হয়। অতীতে পূর্বস্থলীতে সংস্কৃত পঠনপাঠনের জন্য কয়েকটি টোল ছিল এবং বহু খ্যাত-নামা পণ্ডিত এই টোলে অধ্যাপনা করতেন।

পোষলা (৭৬ ঃ ভাতাড়) ঃ বর্ধমান জেলায় শিব, ধর্মঠাকুর ও দেবী চণ্ডীর সঙ্গে লৌকিক দেবী মনসা বহুকাল ধরে পূজা পেয়ে আসছেন। মনসামঙ্গলে বর্ণিত চাঁদ সদাগরের বাসস্থান চম্পাই নগরীর অবস্থিতি হ'লে পানাগড়ের কিছুটা দক্ষিণে একালের কসবা চম্পাইনগরীতে। মনসা দেবী ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন গ্রামে অধিষ্ঠিতা আছেন। কোথাও তিনি বিষহরি আবার কর্কটনাগ, নন্দনাগ ও জগৎগৌরী-রূপে তিনি পূজিতা, কিন্তু পোষলা গ্রামে মনসা দেবী ঝঙ্কেশ্বরী বা ঝাঁকলাই নামে সেবাপূজা পেয়ে আসছেন।

বলগনা বাস স্ট্যাণ্ড হ'তে হাঁটাপথে উত্তর দিকে ৩ কিলোমিটার এগিয়ে গেলে পোষলা গ্রামে পৌঁছান যায়। গ্রামের খ্যাতির মূলে দেবী ঝঙ্কেশ্বরীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের জন্য। এখানে আকারে বৃহৎ ও অত্যন্ত বলশালী ঝাঁকলাই নামক এক শ্রেণীর সর্পের সাক্ষাৎ মেলে। এই সর্পকুল মানুষের সঙ্গে একসাথে অবস্থান করে কিন্তু কামড়ায় না। তাছাড়া এখানে কোন বিষধর সর্প দেখা যায় না। আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথিতে একটি গাছতলায় সাড়ম্বরে ঝাঁকলাই-এর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বাৎসরিক

পূজা উপলক্ষে বিশেষ উৎসব ও মেলা বসে। মেলার সময় নানা স্থান হ'তে ঝাঁপানের দল আসে। ঝাঁপান হ'ল মনসার স্তবগান। ঝাঁপানে অংশগ্রহণকারীরা গলায় সাপ জড়িয়ে নেচে নেচে গান করতে করতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। অতীতে এই গ্রামে একটি অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত ছিল, যা একালে প্রায় তিরোহিত হয়েছে। প্রথাটি হ'ল এই যে, ঝাঁকলাই পূজার সময় গ্রামের বধূগণকে গ্রাম থেকে অন্যত্র যেতে হ'ত এবং বিবাহিতা কন্যাদের বাৎসরিক পূজার সময় পিত্রালয়ে উপস্থিত হওয়ার বাধ্য-বাধকতা ছিল। পূজার নৈবেদ্য বা উপাদানের মধ্যে দুধ, কলা, চিঁড়ে ও সন্দেশের সঙ্গে একটুকরো উচ্ছে দেওয়া হয়। প্রসাদ মুখে দেওয়ার পূর্বে সর্বাগ্রে উচ্ছের টুকরোটি খাওয়াই হ'ল রীতি। বাৎসরিক পূজার সময় শাক ও কলাইয়ের ডাল আহার করা নিষিদ্ধ। ঝাঁকলাই সর্পকুল সম্পর্কে জীববিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন বলে জানা গেছে। পোষলা ব্যতীত মসুরি, পলসোনা, ছোট পোষলা, নিগন প্রভৃতি গ্রামে ঝাঁকলাই-এর পূজা হয় এবং শোনা যায় যে এই সকল গ্রামে বিষধর সর্পের উপদ্রব নাই।

প্রতাপপুর (৪০ ঃ ফরিদপুর) ঃ দুর্গাপুর শিল্পনগরী হ'তে ৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রতাপপুরের অবস্থিতি। আবার জয়দেব-কেন্দুবিল্ব হ'তে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অজয় পার হ'য়ে প্রতাপপুরে আসা যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' ঢেক্করীরাজ প্রতাপ সিংহের উল্লেখ আছে। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে প্রতাপ সিংহের নামানুসারে সেনভুম পরগণায় প্রতাপপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এখানে কোন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। প্রতাপপুরের ২ কিলোমিটার দক্ষিণে পাড়ুলে গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে "রানীপোতার ডাঙ্গা" নামক একটি স্থান আছে এবং এই স্থানে ৬০ ফুট × ৪৫ ফুট আয়তনবিশিষ্ট একটি প্রাচীন গৃহের ভিত দেখা যায় যা স্থানীয় লোকের মতে কোন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে এই ধ্বংসস্তূপ হ'তে কৃষ্ণ প্রস্তরে ক্ষোদিত তারা ও জাঙ্গুলী নামক বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবীর মূর্তি ও একটি মিথুন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। মনে হয় এক সময়ে এখানে বৌদ্ধ প্রভাবও ছিল। গ্রামের উত্তরভাগে প্রবাহিত কুনুর নদীর তীরে অবস্থিত শ্মশানটি 'সতীঘাটা' নামে পরিচিত।

প্যারীগঞ্জ ঃ প্রাচীন অম্বিকা নগরীর মধ্যে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ পল্লী এবং এই স্থানে নকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট অবস্থিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে যে, নকুল ব্রহ্মচারীর মধ্যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হ'ত। নকুলের শ্রীপাটে গোপাল বিগ্রহ ও তাঁর শিষ্যধারায় সন্তদাস বাবাজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিতাই-গৌর বিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। সন্তদাস বাবাজীর সমাধিও এখানে আছে।

ফকিরপুর (২৫ ঃ বর্ধমান) ঃ বর্ধমান শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত একটি পল্লী। এই পল্লীর পূর্বে তেজগঞ্জ রোড ও পশ্চিমে আজীরবাগান অবস্থিত। পীরবহরামের সমাধি লিপিতে (২য় লিপি) মাদ্দ-ই-মাস হিসাবে ফকিরপুর মৌজা

সম্রাট জাহাঙ্গীর ১০১৬ হিজরাতে দান করেছিলেন।

ফরিদপুর ঃ অতীতে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ফরিদপুর থানার সদর কার্যালয় ছিল ফরিদপুর গ্রামে, কিন্তু বর্তমানে ফরিদপুর গ্রামটি দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ্রামটি দুর্গাপুর থানার অধীনস্থ হয়েছে। অপরপক্ষে থানা এলাকার সদর কার্যালয় লাউদহ গ্রামে অবস্থিত হ'লেও পূর্বতন ফরিদপুর থানা নামটি বহাল আছে।

বণ্ডুল (১১৩ ঃ বর্ধমান) ঃ কামারকিতা গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হলেও সাধকপ্রবর শ্যামাচরণ রায়, দ্বিজপদ রায়, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় নামক চারজন সাধকের যোগসাধনার স্থানের জন্য বণ্ডুল গ্রামের প্রসিদ্ধি। তন্মধ্যে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস বা গন্ধবাবা নামে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। অলৌকিক যোগসাধনায় আকৃষ্ট হ'য়ে বহু জ্ঞানী গুণী ও মুমুক্ষু ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কাশী, কলিকাতা, ঝালদা ও বর্ধমানে বিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রম আছে।

বড়কয়রাপুর (জোৎসাদি-১০৯ ঃ রায়না) ঃ বর্ধমান শহর হ'তে আরামবাগের পথে এগিয়ে গেলে বড় কয়রাপুর গ্রামে পৌঁছান যায়। প্রবাদ আছে যে, কয়রা খাঁ নামক জনৈক আউলিয়ার নামে গ্রামটির নামকরণ করা হয়েছে কয়রাপুর। গ্রামস্থ একটি পুরাতন মন্দিরে শিবলিঙ্গ ও অপর একটি মন্দিরে মনসা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা ও চড়ক উৎসবটি মহাসমারোহে পালিত হয়, তবে চড়কের মেলাটি সম্প্রতিকালে আরম্ভ হয়েছে।

বড়বিল্বগ্রাম (১৬৮ ঃ আউসগ্রাম) ঃ সাহেবগঞ্জ লুপ-লাইনে বনপাস স্টেশনে নেমে ২ কিলোমিটার পশ্চিমে এগিয়ে গেলে বিল্বগ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামদেবতা বিল্বেশ্বর শিবের নামানুসারে গ্রামের নাম হয়েছে বিল্বগ্রাম। বিল্বেশ্বরের নিত্যপূজা ব্যতীত মহাধুমধামের সঙ্গে গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিল্বেশ্বরের মন্দিরটিও বেশ পুরাতন।

বড়বেলুন (৯৩ ঃ ভাতাড়) ঃ বর্ধমান হ'তে বাসযোগে সরাসরি বড়বেলুন গ্রামে পৌঁছান যায়। এই গ্রামের বহির্ভাগে বানেশ্বরডাঙ্গায় খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ বৎসর পূর্বের তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে। তাছাড়া বানেশ্বর শিবমন্দিরের ভিত্তিস্তূপটি পাল-সেন আমলের বলে অনেকে অনুমান করেন। বিশেষ বিবরণ (১ম খণ্ড, ১৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বড় বেলুন গ্রামে অনন্তপুরী গোস্বামীর শ্রীপাট অবস্থিত। অধিকারী পরিবারের রাধাগোপীনাথ জীউর বিগ্রহ অনন্তপুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নিত্যসেবাপূজা ব্যতীত দোল, রাস, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শোনা যায়, নিকটবর্তী ভাটাকুল গ্রামের জমিদার রামচন্দ্র রায় বলপূর্বক গোপীনাথ বিগ্রহ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোন অলৌকিক কারণে বিগ্রহ স্থানান্তরিত করতে অসমর্থ

হওয়ায় প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন। শিবাই পণ্ডিত নামক একজন বৈষ্ণব মোহান্তের শ্রীপাট ছিল বলে জানা যায়।

কার্তিক মাসে কালীপূজায় বিশেষ উৎসব উপলক্ষে প্রচুর জনসমাবেশ হয়। বড়বেলুনের বড় কালীর প্রসিদ্ধি সারা বর্ধমান জেলার মানুষের নিকট জ্ঞাত। কালীপূজার পর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন মহাসমারোহে বিসর্জন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৪ হাত উঁচু কালীমূর্তিটিকে চাকাওয়ালা গাড়ীতে করে গ্রাম প্রদক্ষিণের পর বিসর্জন দেওয়া হয়। কালীপূজা উপলক্ষে একটি মেলাও বসে এবং পূজার সময় ৩ দিন ধরে অসংখ্য ছাগ বলি হয়।

বড়র (জামালপুর): বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনে মশাগ্রাম স্টেশনে নেমে বড়র গ্রামে যাওয়া যায়। প্রতি বৎসর ৫ই মাঘ গিয়াসুদ্দিন আহমদ পীরের দরগায় উরস উৎসব উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক যোগ দেয়। পীরের মেলাটিও বহুকাল ধরে চলে আসছে। 'ভুবনমোহিনীর প্রতিভা'র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'বিনোদিনী' পত্রিকায় তিনি শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী ছদ্মনামে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন।

বনকাটি (৩৭ : কাঁকসা): পানাগড় হ'তে ইলামবাজারের পথে ১১ মাইল স্টপেজে নেমে পশ্চিম দিকে হাঁটাপথে এগিয়ে গেলে এই গ্রামে পেঁছান হায়। গ্রামটির প্রকৃত নাম হ'ল বনকাটি অযোধ্যা। বর্তমান শতকের ষাটের দশকে এই গ্রামে বহু প্রস্তর আয়ুধ ও ফসিল উডের নিদর্শন মিলেছে। বনকাটি গ্রামে কয়েকটি পুরাতন মন্দির আছে। তন্মধ্যে ১১৫৫ সালে নির্মিত গোপেশ্বর শিবমন্দির এবং ১৭০৪ শকাব্দে নির্মিত পঞ্চরত্ন শিবমন্দির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, তবে বনকাটির উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বস্তু হ'ল পিতলের রথটি। এই রথটি পঞ্চরত্ন মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত এবং উচ্চমানের চিত্রাঙ্কন ক্ষোদিত এই রথটি দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে রথের সময় জনসমাবেশ হয়। প্রসিদ্ধ গালা ব্যবসায়ী ও স্থানীয় জমিদার রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গ্রামের অধিকাংশ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

বড়শুল (১৬৩ : বর্ধমান): বর্ধমান অথবা শক্তিগড় হ'তে বাসযোগে সরাসরি এই গ্রামে পৌঁছান যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' বড়শূলের হরিদত্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকের মতে বড় রসুল পীরের অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের জন্য গ্রামনাম হয়েছে বড়শূল। কিন্তু গ্রামটি দামোদর নদের সন্নিকটে একটি চড়ার উপর পত্তন হওয়ায় দামোদরের বৃহৎ বা বড় শূলির উপর গ্রাম পত্তনের ফলে বড়শূল নামকরণের সার্থকতা রয়েছে। বড়শূল গ্রামে একটি দালানমন্দিরে ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। দশহরার ৪ দিন পূর্বে ধর্মরাজের গাজন উৎসব শুরু হয়। গাজনের সন্ন্যাসীরা ধর্মরাজ শিলাটিকে পাল্কির মধ্যে স্থাপনপূর্বক ৪ দিন ধরে বিভিন্ন গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এবং দশহরার দিন পাটভাঙা, কাঁটাভাঙা, শূকর ও ছাগ বলিদান-অন্তে গাজনের সমাপ্তি ঘটে। চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি

বৎসর চৈত্র মাসের দ্বিতীয় শনিবারে দামোদরের বাঁধের কাছে শ্মশান কালীর পুজোয় বহু জনসমাবেশ হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের রাধাকৃষ্ণের দোল উৎসবটি এককালে বিশেষ উৎসবের মধ্যে পরিগণিত হ'ত। জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজোয় প্রচলিত মহিষমর্দিনী মূর্তির পরিবর্তে হরগৌরীর মূর্তি নির্মাণ করে পুজো করা হয়। জমিদার বাড়ির সংলগ্ন একটি আটচালা শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এছাড়া রাজরাজেশ্বর' বিগ্রহ ও একটি দোলমঞ্চ রয়েছে। গ্রামের পশ্চিম-উত্তর ভাগে এক বিশাল পুষ্করিণীর তীরে মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতাব কর্তৃক জোড়া শিবমন্দির নির্মিত হয়েছিল। গ্রামের পশ্চিম ভাগে রয়েছে বড় পীরতলা। এখানে বড় রসুলের উদ্দেশ্যে মাটির ঘোড়া মানত করা হয়। পীরতলার পাশে একটি ঝোপের মধ্যে উচ্চ ঢিবি রয়েছে যেখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নানা আকৃতির পুরাতন ইটের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রামের পশ্চিম ভাগে একসময়ে উন্নয়নী টাউনশিপ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। বড়শূলে রয়েছে সমবায় শিক্ষা কেন্দ্র যার দ্বারা বিভিন্ন জেলার সমবায় কর্মিগণ নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন।

১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ফরাসী প্রকৃতিবিজ্ঞানী ভিক্টর জাকমঁ এই গ্রামে এসেছিলেন। গ্রাম সম্পর্কে জাকমঁ মন্তব্য করেছেন—গ্রামটি খুব বড় এবং অনেক বড় বড় বাড়ীর ইটের ধ্বংসস্তূপও চোখে পড়ে। গ্রামটি এক সময়ে বর্ধিষ্ণু ছিল। তিনি গ্রামের মধ্যে একটি হিন্দু মন্দির দেখেছিলেন। ঐ মন্দিরটিকে তিনি প্রথমে মিনার ভেবেছিলেন। মন্দিরের অলঙ্করণের কথাও তাঁর বিবরণে উল্লিখিত আছে।

বননবগ্রাম (৪০ : আউসগ্রাম) : গুসকরা হতে সরাসরি বাসযোগে বননবগ্রামে পৌঁছান যায়। সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী ও কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বননবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন এবং ঐ সালেই তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ওয়ারিশপুর গ্রামের অন্যতম কৃতি সন্তান হলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সৈয়াদ আব্দুল হালিম। তাঁর রচিত দুই খণ্ডে 'ইসলামের ইতিহাস' (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) নামক গবেষণাধর্মী গ্রন্থখানি বিদ্যোৎজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি নিজ ব্যয়ে এই গবেষণামূলক গ্রন্থখানি বর্ধমান হতে প্রকাশ করেন। কিন্তু লেখকের প্রচার বিমুখতার জন্য বর্ধমানের মানুষ এই অমূল্য গ্রন্থের সন্ধান জানে না। সৈয়াদ আব্দুল হালিম সাহেবের চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল নিজ ব্যয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করে বিনামূল্যে বহু গ্রন্থ বিতরণ করেছেন, যা এ যুগে দুর্লভ।

বননবগ্রাম ও ওয়ারিশপুর হল পাশাপাশি দুটি গ্রাম। এখানে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি প্রাচীন ও বৃহৎ মসজিদ আছে! গ্রামের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে ইমামবাড়ার প্রসিদ্ধি আছে এবং বর্ধমান জেলার মধ্যে একমাত্র ইমামবাড়া। ইমামবাড়ার সম্মুখভাগে অবস্থিত নহবতখানাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

আদি রায় নামক ধর্মঠাকুরের সিংহাসনের নীচে বহু শিলা মূর্তি আছে। গ্রামস্থ একজন বাগদী সম্প্রদায়ের ব্যক্তি হুজুরের বাগানে একটি প্রস্তরনির্মিত কালিকা-দেবীর মূর্তি আবিষ্কার করে স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা করেন। অধিকারী পরিবারে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের প্রাচীন পুঁথি ও বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে তাঁর কোন পূর্বপুরুষের রচিত রামায়ণের পুঁথি রক্ষিত আছে।

বলাগড় (৮৪ : রায়না) : বোড়ো বলরাম হ'তে এক কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে বলাগড় গ্রামের অবস্থিতি। দামোদরের দেবখাল নামে একটি লুপ্ত খাতের বলাগড়ের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে অস্তিত্ব পাওয়া যায়। গ্রামের পূর্ব ভাগে একটি পুষ্করিণীর উত্তর তীরে পাতলা ইটের তৈরী ১০ ফুট × ১০ ফুট আয়তনের একটি চারচালা শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি প্রায় ১৫ ফুট উচ্চ এবং কোন টেরাকোটা অলঙ্করণ নেই। আর একটু এগিয়ে গেলে একটি সুউচ্চ শিবমন্দির দেখা যাবে। এই মন্দিরটির আয়তন ১৮ ফুট × ২০ ফুট এবং উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট। এই শিবমন্দিরটি পীড়াদেউল রীতিতে নির্মিত হয়েছে। মন্দিরের টেরাকোটা অলঙ্করণগুলি ক্রমশঃ অস্বচ্ছ হ'য়ে আসছে এবং মন্দিরের উপরিভাগে কয়েকস্থান জীর্ণদশাগ্রস্ত হওয়ায় গঠন সৌষ্ঠবও নষ্ট হয়ে গেছে। এই মন্দিরের কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই। কিন্তু এটি বোড়োগ্রামের বলরাম মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে হয়।

বলিগ্রাম : অম্বিকা-কালনার অন্তর্গত একটি প্রাচীন পল্লী। এখানে গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্যের শ্রীপাট। হৃদয়চৈতন্য শ্যামানন্দের দীক্ষাগুরু ছিলেন। তাঁর বংশধরগণ এই শ্রীপাট পরিচালনা করে আসছেন।

বসন্তপুর (৫৪ : জামালপুর) : মসাগ্রাম হ'তে বাসযোগে জামালপুরে নেমে ৪ কিলোমিটার পূর্বমুখে হাঁটাপথে এগিয়ে গেলে বসন্তপুর গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামস্থ একটি মন্দিরের মধ্যে রক্ষাকালী দেবীর পাষাণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে দেবীর বাৎসরিক বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মনসা, সিংহবাহিনী, চণ্ডী, শিব প্রভৃতির নিত্যপূজা স্ব স্ব মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

বসুধা (৩৫ : কাঁকসা) : পানাগড় হ'তে বাস-রাস্তা ধরে বসুধা গ্রামে পৌঁছান যায়। বসুধা গ্রামে একটি একটি পুরাতন মন্দিরে গ্রাম-দেবী রূপাই চণ্ডী প্রতিষ্ঠিত আছেন। বিচিত্র ব্যাপার এই যে, প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে রূপাই চণ্ডী দেবীর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সময়ে একটি মেলা বসে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ধর্মমঙ্গলের কবি নরসিংহ বসুর পৈত্রিক বাসস্থান ছিল বসুধা গ্রামে। পরবর্তীকালে এই বসু পরিবার দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের শাঁখারি গ্রামে বসবাসের নিমিত্ত চলে যান।

বহড়া (১ : পূর্বস্থলী) : অগ্রদ্বীপ রেলস্টেশনের দু' কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব বহড়া গ্রমের অবস্থিতি। সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র "বাঙ্গাল গেজেট"-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের নামের সঙ্গে গ্রামটিও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

শ্রীরামপুরের মিশনারি জন ক্লার্ক মার্শম্যান কর্তৃক বাংলা ভাষায় সাপ্তাহিক, "সমাচার দর্পণ" পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মে তারিখে এবং উক্ত ঘটনার ৯ দিন পূর্বে অর্থাৎ, ১৪ই মে তারিখে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বহড়া গ্রাম "বাঙ্গাল গেজেট" প্রকাশ করেন। অনেকে বহড়া গ্রামকে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের নিকট দেখানর চেষ্টা করেছেন কিন্তু এই তথ্য ভুল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ পাঁচালীকার ও গায়ক দাশু রায়ের পাঁচালীর প্রথম সংস্করণ বহড়ার প্রেসে মুদ্রিত হয়েছিল।

বহরান (৯৮ ঃ কেতুগ্রাম) ঃ কাটোয়া বারহাওড়া রেলপথে বহরান স্টেশনে নেমে হাঁটাপথে এগিয়ে গেলে গ্রামে পৌঁছান যায়। এই গ্রামের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে রাজা আদিশূর কর্তৃক আনীত উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের সম্পর্কের কথা "ঘটক-কুল-নির্ণয়" গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এখানে রামদাস সরস্বতী নামক একজন পণ্ডিত ব্যক্তির বাস্তুভিটা ছিল, যা একালে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বহরান গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। গ্রামের শিব মন্দির দুটিও বেশ প্রাচীন।

বাইগণকোলা (১২১ ঃ কেতুগ্রাম) ঃ কাটোয়ার এক কিলোমিটার পশ্চিমে অজয় তীরসংলগ্ন বৈষ্ণব শ্রীপাট বাইগণকোলা বা বেগুনকোলার অবস্থিতি। এখানে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ও শ্যালক রামচরণ চক্রবর্তীর শিষ্য রামশরণ, চট্টরাজের শ্রীপাট আছে। "অনুরাগ বল্লভী"র রচয়িতা মনোহর দাস স্বীয় গুরু রামশরণের গৃহে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। অতীতে এখানে ফটিকেশ্বর শিবের সেবাপূজা হ'ত, যা চরকি গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। শোনা যায় যে, স্ফটিক পাথরে নির্মিত শিবলিঙ্গটি রামশরণের জননী কোন এক সাধুর নিকট পেয়েছিলেন। অনেকের মতে মনোহর দাসের জন্মস্থান ছিল বাইগণকোলা গ্রামে।

বাকতা (১১২ ঃ গলসী) ঃ গোহগ্রামের সন্নিহিত পূর্বে বাকতা গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামটির অস্তিত্ব মেলে ষষ্ঠ শতকে সম্পাদিত রাজস্ব বিষয়ক দলিল হ'তে। মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসনে উল্লিখিত বক্কত্তক হ'ল একালের বাকতা। বাকতা গ্রামে ২টি পৃথক মন্দিরে গঙ্গাধর শিব ও কাশীনাথ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। গাজনের সময় গ্রামস্থ কন্যাশায়র নামক দীঘির তীরে উভয় শিব-লিঙ্গের মিলন হয়।

বাঘনাপাড়া (বিশেষ বিবরণ ১৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাদুলিয়া (৭৯ ঃ খণ্ডঘোষ) ঃ বর্ধমান আরামবাগ বাস-রাস্তায় সেহারা বাজারে নেমে বাদুলিয়া গ্রামে যাওয়া যায়। এখানে শিবমন্দির, ধর্মরাজ মন্দির ও রাধা-গোবিন্দের আটচালা বিশিষ্ট মন্দির আছে। প্রতি বৎসর শিবের গাজন, রক্ষমাতা ঠাকুরাণীর বাৎসরিক পূজা এবং রাধা-গোবিন্দজীর উৎসব উপলক্ষে হরিনাম সঙ্কীর্তন ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত ক্ষেত্রপালের পূজাটি বহুকাল

ধরে চলে আসছে।

বাবলাডিহি (৬৮ : মঙ্গলকোট) : কাটোয়া-বর্ধমান বাস-রাস্তায় নিগন স্টপেজে নেমে পুনরায় পশ্চিমদিকের রাস্তা ধরে বাবলাডিহি বা শঙ্করপুর গ্রামে পৌঁছান যায়। গ্রামনামটি সম্ভবতঃ বাবলা বৃক্ষ হ'তে এসেছে। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের প্রথম পঞ্চমীতে সাড়ম্বরে মনসা পূজা হয় এবং ঐ মাসের নবমী তিথিতে বাবলক্ষ্মী দেবীর বাৎসরিক পূজা হয়। চৈত্র মাসের গাজন উৎসবটিও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। গ্রামের ২টি বিষ্ণুমন্দিরের মধ্যে একটি প্রাচীন ও টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত।

শঙ্করপুর বা বাবালডিহি গ্রামের খ্যাতির উৎস হ'ল এখানে প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাংটাশ্বর' নামক বিগ্রহের জন্য। শিবরূপে ন্যাংটাশ্বরের নিত্যপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং শিব-রাত্রিতে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে। কিন্তু 'ন্যাংটাশ্বর' বিগ্রহ কোন হিন্দু দেবতা নন। জৈনদের ত্রয়োদশ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ শঙ্করপুরে 'ন্যাংটাশ্বরে' রূপায়িত হয়েছেন। কৃষ্ণপ্রস্তরে ক্ষোদিত তিন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট ও পদতলে মৃগলাঞ্ছন যুক্ত দিগম্বর তীর্থঙ্কর মূর্তিটি সদানন্দ নামক একজন ব্রাহ্মণ মঙ্গলকোটের একটি পুকুরে পেয়েছিলেন। মূর্তিটির গঠনবৈচিত্র্য দেখে পাল আমলে নির্মিত বলে অনুমান করা হয়। জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ বর্ধমানের মাটিতে শিবের ধ্যানে পূজা পেয়ে আসছেন। প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হওয়ায় সাঁওতা নিবাসী জমিদার স্বর্গীয় রাধাবল্লভ কোঙার নিজ ব্যয়ে দেবগৃহ নির্মাণ করে দেন।

বামুনাড়া : (বিশেষ বিবরণ ৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

বার্ণপুর : আসানসোল শহর হ'তে বাসযোগে বার্ণপুর শিল্প এলাকায় পৌঁছান যায়। বার্ণপুর শহরটিকে দু' ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—বার্ণপুর শিল্প শহর ও বহির্বার্ণপুর। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় স্থাপিত লৌহ ইস্পাত কারখানাটি বার্ণপুরের বিশেষ সম্পদ। এই কারখানাটি জাতীয়করণ করা হলেও পুনরায় কারখানার উন্নতিকল্পে নবীকরণের প্রচেষ্টা চলছে। বার্ণপুরে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করে, তাই এখানে বিভিন্ন দেব-দেবীর বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল শিবমন্দির, মহাবীর মন্দির, বিশ্বকর্মা মন্দির, রাধাকৃষ্ণ মন্দির, রাম-সীতার মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বারাসত (১৮৪ : আউসগ্রাম) : অউসগ্রাম থানার অন্তর্গত পাণ্ডু রাজার ঢিবির সন্নিকটে রাজারপোতাডাঙ্গা নামে একটি উচ্চভূমি আছে, তার দক্ষিণে বারাসত গ্রামের অবস্থিতি। এই গ্রামে একটি ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ সন্নিকটবর্তী পাণ্ডু রাজার ঢিবির কৃষ্টির সঙ্গে বারাসতের যোগাযোগ ছিল। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ রায়ের একটি নিবন্ধ হ'তে জানা যায় যে, বারাসতের ডাঙ্গায় একটি স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছিল। মুদ্রাটির উপর ক্ষোদিত মূর্তি ও লিপি সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন মুদ্রার সম্মুখভাগে রাজমূর্তি ও পশ্চাৎভাগে লক্ষ্মী দেবীর মূর্তি ক্ষোদিত আছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আরও মন্তব্য করেছেন যে,

গুপ্তাক্ষরে ক্ষোদিত লিপিটি হ'ল "নরেন্দ্রগুপ্ত"। অনেকে অনুমান করেন যে, অত্র স্থানে একটি প্রাসাদ অথবা সুবৃহৎ মন্দির ছিল, যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

বারুল (৪৩ ঃ জামুরিয়া) ঃ জামুরিয়ার ৩ কিলোমিটার উত্তরে বারুল গ্রামের অবস্থিতি। বর্ধমান জেলার লৌহ শিল্পে ব্যবহৃত আকরিক লোহার প্রয়োজন মেটান হ'ত বারুলের খনি হ'তে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথম ভাগে কুলটি ও বার্ণপুর কারখানার জন্য বারুলের খনি হ'তে আকরিক লোহা সংগৃহীত হ'ত, কিন্তু বর্তমানে খনিটি পরিত্যক্ত হয়েছে।

বালিজুড়ি (১৬ ঃ ফরিদপুর) ঃ দুর্গাপুর হ'তে বাসযোগে ভারত-রাশিয়ার সহযোগিতায় নির্মিত 'ঝাঁঝরা প্রজেক্ট' কয়লাখনির সংলগ্ন বালিজুড়ি গ্রামের অবস্থিতি। এই গ্রামে রামকান্ত মুখোপাধ্যায় বর্ধমানরাজের নিকট হ'তে বালিজুড়ির সংলগ্ন এলাকার জমিদারী লাভ করেন। শোনা যায়, রামকান্ত তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কানাই-লালের একজোড়া সোনার বালা বিক্রি করে সেই অর্থের বিনিময়ে জমিদারী লাভ করেছিলেন বলে গ্রামের নাম হয় বালিজুড়ি। রামকান্ত যেদিন বর্ধমানে জমিদারীর ফরমান পেয়েছিলেন সেই দিন তাঁর স্ত্রী গ্রামের বাড়ীতে কোন এক সাধকের নিকট দুটি শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হ'ন। গৃহে ফিরে রামকান্ত শালগ্রাম শিলা দু'টিকে প্রতিষ্ঠা করেন। রামকান্তের পিতা শিশুরাম ও পিতৃব্য কবিরাম তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধি লাভ করে-ছিলেন। গ্রামস্থ একটি বিল্ববৃক্ষের নীচে পঞ্চমুণ্ডির আসন ও তার তলায় মহাশঙ্খের মালা প্রতিষ্ঠিত আছে। এইখানে শিশুরামের 'খ্যাপাকালী' ও নবীনরামের 'নবীনা কালী' প্রতিষ্ঠিতা আছেন। রামকান্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এলোকেশীর মন্দির, দুর্গা-মন্দির, বিষ্ণুমন্দির, পঞ্চশিব মন্দির আজও বিদ্যমান। জমিদার বাড়ীর দৌহিত্র বংশীয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার 'বাঁড়ুজ্যে কালী' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শোনা যায়, রামকান্তের দেহত্যাগের পর মহাযোগীরাজ শঙ্করাচার্য পুরী গোস্বামী নামক এক সাধক গ্রামস্থ শ্মশানকে তাঁর সাধনক্ষেত্ররূপে গড়ে তোলেন। এই শ্মশানেই তিনি কালীমন্দির ও বিল্বমঙ্গল মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। যোগীরাজের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও কৃপায় বহু ব্যক্তি দুরারোগ্য ব্যাধি হ'তে মুক্তিলাভ করেছিল। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় হ'ল এই সিদ্ধ সাধক তাঁর ইহলোক ত্যাগের পূর্বে গ্রামবাসীদের শুনিয়েছিলেন—"আমি রামকান্ত মুখোপাধ্যায়"। দেহত্যাগের পর কালীমন্দিরের পাশে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয় এবং ঐখানে একটি সমাধি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। কালী মন্দিরের কিছু দূরে তেঁতুলতলায় আছে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির। গ্রামে এক-সময়ে বহু সিদ্ধ সাধকের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং মনে হয় সেই কারণে কালী পূজার এত অধিক সমারোহ। পুরী গোস্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র কালীসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। শোনা যায়, ইনিও 'ক্ষ্যাপাকালী'র মন্দিরে সিদ্ধিলাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি 'অন্নপূর্ণা মা'র মূর্তি' প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে অন্নপূর্ণা আশ্রম, কালীমাতার মন্দির, দুর্গামন্দির,

গোপালমন্দির ও শিবমন্দির আছে, যথায় নিত্যপূজা ও বিশেষ পূজাগুলি আজও অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি প্রাচীন মনসা মন্দির ও একটি শিব-মন্দির গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তু। শিবমন্দিরটির গায়ে টেরাকোটা অলঙ্করণ সজ্জিত আছে। এছাড়া ত্রৈলোক্যতারণ শিব মন্দিরটিও বহুকাল পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। বর্ধমানের গ্রামগুলের মধ্যে এই গ্রামটি লোকসংস্কৃতির কয়েকটি বিশেষ ধারাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। সাধক কবিরাম ও রামকান্তকে গ্রামের লোক আজও বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে,—

"তুমি কবিরাম তুমি রামকান্ত
সবই তোমাদের খেলা।
তুমি মা জননী, তুমি মা সারদা
বুঝিতে পারিনা লীলা॥"

বাঁদরা (১৬ ঃ কাটোয়া) ঃ কাটোয়া শহরের সন্নিকটে বাঁদরা গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামনাম হ'তে মনের মধ্যে তাচ্ছিল্যের ভাব এলেও অতীতে গ্রামটি অজয়ের তীরে অবস্থিত ছিল। গ্রামের পাশে একটি লুপ্ত নদীখাত রয়েছে। তাই মনে হয় অজয়ের তীরবর্তী নদী-বন্দর অপভ্রংশে বাঁদরায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে গ্রামদেবতা কালুরায়ের বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে বহুকাল ধরে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

বাঁধমুড়া (৩৯ ঃ কাটোয়া) ঃ দাঁইহাট স্টেশন হতে করজগ্রামের পথে বাঁধমুড়ায় যাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ পাঁচালীকার দাশরথি রায় (দাশু রায়) ১২১২ সালের মাঘ মাসে বাঁধমুড়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সাড়ম্বরে পঞ্চাননের পূজা হয়।

বিদ্যানগর (১৪০ ঃ পূর্বস্থলী) ঃ জাহ্নুনগর হ'তে ২ কিলোমিটার দূরে বিদ্যানগর গ্রামের অবস্থিতি। বিদ্যানগরে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে শ্রীচৈতন্যদেব ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছিলেন। এখানে মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব সার্বভৌমের আদি নিবাস ছিল। শোনা যায়, সার্বভৌমের শ্রীপাট ছিল এই স্থানে এবং ঐ শ্রীপাটে নিতাই-গৌর বিগ্রহের সেবা-প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামের নিকটবর্তী ভীষ্মদেবের টিলা ও রাক্ষসীপোতার ঢিবিকে নিয়ে অনেক লোককথা গড়ে উঠেছে। রাক্ষসীপোতায় রাজা চন্দ্র সিংহের রাজবাড়ী ছিল বলে শোনা যায়। এই স্থানে প্রাপ্ত একটি রৌপ্য-মুদ্রার একদিকে শ্রীশ্রীচন্দ্রকান্ত সিংহ নরেন্দ্রস্য ও অপরদিকে শক ১২৪৩ লিখিত ছিল, কিন্তু এই মুদ্রার কোন সন্ধান জানা যায় না।

বিল্বেশ্বর (৭৫ ঃ কেতুগ্রাম) ঃ কাটোয়া হ'তে সরাসরি বাসযোগে গ্রামে পৌঁছান যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে গ্রামটি বেলেড়া নামে উল্লিখিত আছে। গ্রামস্থ একটি বিল্ববৃক্ষের নীচে অনাদিমূর্তি শিব বিগ্রহ প্রাপ্ত হওয়ার পরে তাঁকে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার পর বিল্বনাথ শিব বিগ্রহের নামে গ্রামনাম হয়েছে, বিল্বেশ্বর।

'তন্ত্রচূড়মণি' ও 'শিবচরিত'-এ উল্লেখ আছে যে, বিল্লেশ বা বিল্বনাথ হ'লেন অট্টহাসের ফুল্লরা দেবীর ভৈরব। বিল্বনাথের সেবাপূজো, পায়সান্ন ভোগ ও দিবারাত্র ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাবার ব্যবস্থা করেছিলেন গ্রামের নারায়ণ হাজরা নামক এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁর পুত্র রামকেশব বিল্বনাথের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। প্রাচীন মন্দির বিনষ্ট হওয়ায় নূতন মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতি বৎসর শিবরাত্রিতে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে প্রচুর জনসমাগম হয় ও একটি মেলা বসে।

বীরভানপুর (দুর্গাপুর) ঃ দুর্গাপুর স্টেশনের দক্ষিণে দামোদর নদের উত্তরে বীরভানপুর গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামটি অত্যন্ত প্রাচীন, সেকারণে বহু পুরাকীর্তির নিদর্শনও মিলেছে বীরভানপুর গ্রামে। এই গ্রামে একটি প্রাচীন কুর্মমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং প্রস্তরনির্মিত একটি রেখদেউলের অস্তিত্ব আজও দেখা যায়। গ্রামের মধ্যস্থলে শিব মন্দিরের পাশে বহু প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। পূর্বোক্ত কুর্মমূর্তিটি ব্যতীত অপর একটি মূর্তির পাদপীঠে ৭টি অশ্বের মূর্তি ক্ষোদিত ছিল। কিন্তু বীরভানপুরে আবিষ্কৃত প্রাচীন প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হওয়ায় এই স্থানের প্রাচীনত্ব কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে যায়। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে ও ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রী বি. বি. লালের নেতৃত্বে বীরভানপুর প্রত্নক্ষেত্রের উৎখনন কার্য শুরু হ'লে ক্ষুদ্রাশ্মীয় সংস্কৃতির আদিপর্বের ইতিহাস উন্মোচিত হয়। শ্রী লালের মতে খ্রীস্টপূর্ব ৪ হাজার বৎসর পূর্বে ক্ষুদ্রাশ্মীয় সংস্কৃতির পাশুশিকারী মানবগোষ্ঠী এই স্থানে বসবাস করত। (বিশেষ বিবরণ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৩-২৬)।

বুদবুদ (১১ ঃ বুদবুদ) ঃ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত বুদবুদ হ'ল বুদবুদ থানার সদর কার্যালয়। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের এক সরকারি রিপোর্টে জানা যায় যে, ঐ সময়ে বুদবুদ ছিল একটি মহকুমা সদর এবং এই মহকুমার অন্তর্গত বুদবুদ, আউসগ্রাম ও বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানাও ছিল। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের রিপোর্টে দেখা যায় যে, বুদবুদ থানা ও মহকুমার অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। পুনরায় ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে গলসী থানার ৩৫খানি মৌজা ও আউসগ্রাম থানার ২৬টি মৌজা নিয়ে নূতন বুদবুদ থানা গঠিত হয়েছে। বুদবুদে একটি ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়ে উঠছে এবং বহুকাল ধরে এখানে ধর্মরাজের পুজো প্রচলিত আছে।

বেড়া (২৭ ঃ কাটোয়া) ঃ দাঁইহাট রেলস্টেশনের সন্নিকটবর্তী বেড়াগ্রামে রামানন্দের শ্রীপাট-এর খ্যাতি থাকলেও একালে তার কোন অস্তিত্ব নেই। কথিত আছে যে, বেড়া গ্রামের শতঞ্জীব ভট্টাচার্য স্বীয় পত্নীর বাক্যে দুঃখিত অন্তরে গৃহত্যাগ করে ক্ষীরগ্রামে যোগাগ্যার মন্দিরে এসে উপস্থিত হন। শতঞ্জীবের কাতর প্রার্থনায় দেবী যোগাদ্যা তাঁকে স্বস্থানে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন। শতঞ্জীব বেড়ায় পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সিদ্ধপুরুষ রামানন্দ নামে বিখ্যাত হ'ন। সেই পঞ্চমুণ্ডীর আসনে রামানন্দ দেশাচার বহির্ভূত কালীপুজোর প্রবর্তন করেন। শাস্ত্রীয় নির্দেশ হ'ল এই যে, দেবীকে অমাবস্যায় আরাধনা করে

পরদিন বিসর্জন দিতে হয় ; কিন্তু রামানন্দের একদিনের জন্য দেবীপূজা মনোমত না হওয়ায় দু' দিন পূজা করে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন বিসর্জন দিতেন। ভাতাড় থানার বড়বেলুন গ্রামে বড় কালীর পূজায় অনুরূপ পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে। রামানন্দ মায়ের পায়ে পরমানন্দ লাভ করেছিলেন, সেকথা-তাঁর রচিত বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীতে ব্যক্ত হয়ে আছে,—"তারা রণ মাঝে দিগম্বরি নাচ গো মা"।

বেড়ুগ্রাম (৩২ ঃ জামালপুর) ঃ বর্ধমান শহর হ'তে বাসযোগে সেহাড়াবাজার পৌঁছানর পর মুলকাটি-আরামবাগ রাস্তা ধরে সগরাইয়ে নেমে কাঁচা রাস্তা ধরে বেড়ুগ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামে নাটমন্দির সহ একটি পুরাতন শিবমন্দির আছে এবং মন্দিরের মধ্যে ৩ ফুট উচ্চ মৃত্যুঞ্জয় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন ; এছাড়া সতীমায়ের মন্দির, পঞ্চানন্দ, শীতলাপূজা ও মনসা পূজা বৎসরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। তবে গ্রামের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎসব হ'ল বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব, যা বহুকাল ধরে চলে আসছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, গ্রামটি অত্যন্ত প্রাচীন এবং কবি মুকুন্দমিশ্র তাঁর 'বাসুলীমঙ্গল' কাব্যের বেউড় গ্রামের উল্লেখ করেছেন যার বর্তমান পরিচিতি হ'ল একালের বেড়ুগ্রাম।

বেতালবন ঃ বর্ধমান হ'তে বাসে লোয়া পর্যন্ত গিয়ে হাঁটাপথে গলসী থানার অন্তর্গত বেতালবন গ্রামে যাওয়া যায়। বেতালেশ্বর শিবের নাম হ'তে গ্রামের নাম হয়েছে। গ্রামের ভূস্বামী শান্তিরামের নামানুসারে শান্তিশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছে। এই গ্রামে শ্বশুর ও জামাতার গৃহে অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসবের মধ্যে অত্যন্ত রেষারেষি আছে। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত রামদাস বাউলের বাসস্থান হ'ল এই গ্রামে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, সমালোচক ও সম্পাদক সজনীকান্ত দাস বেতালবনে তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

বেনালী (৩১ ঃ জামুরিয়া) ঃ কবি জয়দেবের স্মৃতি বিজড়িত কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি মেলার অনুকরণে বাউল এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহামিলনের স্থান হল বেনালী গ্রাম। গ্রামের একটি বটবৃক্ষকে কেন্দ্র ক'রে বেনালীতে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ৫ই হ'তে ১০ই তারিখ পর্যন্ত ৬ দিনের জন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কীর্তন হ'ল এই মেলার আকর্ষণীয় বস্তু। মেলাতে বাউল ও বৈষ্ণবগণ দলে দলে যোগদান করেন।

বেলগ্রাম (১২২ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ শ্রীখণ্ড হ'তে ৫ কিলোমিটার পশ্চিমে বেলগ্রামে সুবুদ্ধি মিশ্রের শ্রীপাট আছে। ইনি ব্রজের 'গুণচুড়া' সখী নামে খ্যাত। এখানে নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গা দেবীর বংশের একাংশ এই গ্রামে বসবাস শুরু করেন। বেলগ্রামে নিত্যানন্দ প্রভুর পরিকরগণ কর্তৃক বলরামজীউর সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে। চৈত্র মাসের বারুণী তিথিতে এখানে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বেলরুই (৪৯ ঃ কুলটি) ঃ নিয়ামতপুরের সন্নিহিত পূর্বে বেলরুই গ্রামের

অবস্থিতি। বাংলা ১৩৭৮ সালে সীতারামদাস ওঁঙ্কারনাথের আশ্রম এবং আশ্রমের রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ সহ অন্যান্য দেবদেবীর সেবা-প্রতিষ্ঠার পর হ'তে বেলরুই গ্রামের খ্যাতির কথা জানা যায়। দেবদেবীদের নিত্যপূজা ব্যতীত সারা বছর ধরে অখণ্ড তারকব্রহ্ম নামকীর্তন হয়।

বেলাড় (১৪৯ ঃ রায়না) ঃ বর্ধমান হ'তে বুলচন্দ্রপুর স্টপেজে নেমে ৩ কিলোমিটার দূরে মুণ্ডেশ্বরী কাঁদড় খালের ধারে বেলাড় গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামের মধ্যস্থলে দাঁ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। মন্দিরগাত্রে কোন টেরাকোটা অলঙ্করণ নেই। বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবার অথবা শনিবারে বোঁয়াইচণ্ডী ও ওলাইচণ্ডী দেবীর পূজো হয়। একই দিনে পঞ্চাননের পূজো হয় এই গ্রামে। মাঠের মধ্যে ওলাইচণ্ডীতলায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গ্রামের জনসাধারণ সমবেত হয়ে চিঁড়া মহোৎসবে যোগদান করেন। চৈত্র মাসে শিবের গাজনটিও বহুকাল ধরে চলে আসছে।

বেলারী (১৭৭ ঃ আউসগ্রাম) ঃ বনপাস স্টেশনে নেমে ২ কিলোমিটার হাঁটা-পথ ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলে বেলারী গ্রামে পেঁছান যায়। এই গ্রামের শিব মন্দিরটি বেশ প্রাচীন এবং মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিব হ'লেন বেলারীর গ্রামদেবতা। প্রতি বৎসর শিবরাত্রিতে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে।

বেলুন (১০৭ ঃ বর্ধমান) ঃ বর্ধমান শহর হ'তে নাদনঘাটের পথে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে খড়ি নদীর তীরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। আবার কুড়মুন গ্রাম হয়ে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র হলেও এখানে অতীতের বহু স্মৃতিচিহ্ন রয়ে গেছে। এখানে পণ্ডিত ব্যক্তিগণেরও বসবাস ছিল, তার প্রমাণ-স্বরূপ দেখা যায়, গ্রামের প্রাচীন টোলের অবস্থিতি। এখানে বেশ কয়েকটি ভগ্ন ও জীর্ণদশাগ্রস্ত শিবমন্দির আছে, যা গ্রামের অতীত সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দেবী মনসা হ'লেন এখানকার প্রধান গ্রামদেবতা। মনসার পুরাতন মন্দিরটি ধ্বংস-প্রাপ্ত হওয়ায় একটি নূতন মন্দির নির্মিত হয়েছে। কলেরা, বসন্ত, মহামারীর হাত হ'তে অব্যাহতি লাভের জন্য চৈত্র মাসে মহাসমারোহে বহুকাল ধরে 'দিদি ঠাকরুণের' পূজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। গ্রামে কয়েকটি শিবলিঙ্গের নিত্যপূজা হলেও 'গাজুনে শিব' নামে পরিচিত শিবলিঙ্গটি নিয়ে চৈত্র মাসে গাজনের সময় গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। অতি ক্ষুদ্রাকার শিবলিঙ্গটির জ্যোতির্ময় রূপ দেখে এটিকে 'নীলাদ্রিভুষণ' শিবলিঙ্গ বলে অনুমান করা হয়। এছাড়া গ্রামে ১২ মাসে ১৩ পার্বণ লেগেই আছে। কোন একসময়ে এই গ্রামে শিবাই পণ্ডিতের শ্রীপাট ছিল বলে শোনা যায়, কিন্তু বর্তমানে এর কোন হদিস নেই।

বৈকুণ্ঠপুর (৯১ ঃ বর্ধমান) ঃ বর্ধমান-কালনা রোডে বর্ধমান শহর হ'তে ১৩ কিলোমিটার দূরে গঞ্জ বৈকুণ্ঠপুর-এ নেমে দক্ষিণ মুখে এক কিলোমিটার হাঁটা পথে এগিয়ে গেলে গ্রামে পেঁছান যায়। অতীতের সুপ্রশস্ত ভল্লুকা নদীর তীরে বৈকুণ্ঠপুর

গ্রাম ও গঞ্জ গড়ে উঠেছিল। বর্ধমান রাজবংশের আদিপুরুষ সঙ্গম রায় লাহোর হ'তে এসে এই গ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বসবাস শুরু করেন। সঙ্গম রায়ের সুযোগ্য বংশধর কীর্তিচাঁদ রায় ভল্লুকা নদীর দক্ষিণ তীরে গোপেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিবমন্দিরটি পীড়া-দেউলরীতিতে নির্মিত এবং কোন টেরাকোটা অলঙ্করণ নাই। মন্দিরের সম্মুখভাগে ক্ষোদিত প্রতিষ্ঠালিপি হ'তে জানা যায় যে, শিবমন্দিরটি ১৬৫৪ শকাব্দে বা ১৭৩২ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের শিলালিপি হল নিম্নরূপ ঃ

"শ্রীশ্রীরামঃ শকাব্দা ১৬৫৪
শাকে পয়োধি শরষট কুমিতে হরায়
নির্মাপিতং সকল ভুপতিনাং কৃতেন।
বেশ্মষ্টকাময় মিদং দ্বিজ ধর্ম্ম গোপ্তা
শান্ত্রা সতাং নিখিল-কীর্ত্তি সুধাকরেন ॥"

মন্দিরে গ্রথিত অপর একটি শিলালিপি হতে জানা যায় যে, মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাবের আমলে গোপেশ্বর শিবমন্দিরের সংস্কার করা হয়েছিল। সংস্কারের সময়কালের একটি শিলালিপি দেখা যায় ঃ

'শিবাক্ষী নেত্র রামাব্জ প্রমাণে বঙ্গ-হায়নে।
নৃপতি শ্রীবিজয়চন্দ্র মহতাব ভ্রাতৃ বর্ম্মণা ॥
কালেন মহতাজীর্ণঃ শ্লোকো' শম-ফলকাশ্রয়ঃ।
শ্রীমদ্‌গোপেশ্বর প্রিতৈঃ সংস্কৃত্য পুনরঙ্কিতঃ ॥'

গোপেশ্বর শিবমন্দির অতিক্রম করলেই একটি জঙ্গলের মধ্যে ৫টি শিবমন্দির দেখা যাবে। স্থানীয় লোকে এই স্থানটিকে রাজবাড়ী বলে। রাজবাড়ীর চত্বরের মধ্যে একটি বৃহদাকার আটচালা শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরের সম্মুখভাগ টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত। প্রবেশ পথের উপর প্রতিষ্ঠিত লিপি হ'তে জানা যায় যে, কীর্তিচন্দ্র রায় এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রতিষ্ঠালিপি হল,—

"শ্রীশ্রীকীর্তিশ্বর মহাদেব।
পরলোকগত রায় কীর্তিচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ॥"

উপরোক্ত মন্দিরটি ব্যতীত চত্বরের চার কোণে চারটি আটচালা মন্দিরে শিবলিঙ্গ রয়েছে, যেগুলি বৃহদাকৃতি শিবলিঙ্গটির সমসাময়িককালের বলে মনে হয়। গ্রামের শেষ প্রান্তে প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের শিখরদেউল শিবমন্দিরটি পুরাতন হ'লেও কোন টেরাকোটা অঙ্ককরণ নেই। গ্রামের মধ্যস্থলে একটি মাটির ঘরে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রতি বৎসর ৩১শে বৈশাখ ও ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে মহোৎসব এবং ১৬ই বৈশাখ তারিখে রক্ষাকালীমাতার বাৎসরিক পূজা হয়। এছাড়া শিবের গাজন, জয়দুর্গার বাৎসরিক পূজা, মনসা ও পঞ্চাননের পূজা বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বৈদ্যপুর (১২৮ : কালনা) : বৈঁচি রেলস্টেশন থেকে কালনার পথে বাসযোগে বেহুলা নদীর তীরে অবস্থিত বৈদ্যপুর গ্রামে পেঁছান যায়। বৈদ্য জাতির বসবাসের জন্য গ্রামনাম হ'লেও বর্তমানে একঘরও বৈদ্য নেই। বৈদ্য বংশীয় রাজা কিংকর-মাধব সেনের সঙ্গে এই গ্রামের সম্পর্ক জড়িত আছে। কিংকরমাধব সেন ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁয়ের সমসাময়িক জমিদার। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গলে' বৈদ্যপুর গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। রেভারেণ্ড লঙের বিবরণে বৈদ্যপুরে এক জোড়া রথের বর্ণনা আছে।

বৈদ্যপুর গ্রামে কয়েকটি মন্দির ও গ্রাম্য উৎসব প্রাচীনত্বের দাবী রাখে। এখানকার উল্লেখযোগ্য মন্দির হ'ল বৃন্দাবনচন্দ্রের নবরত্ন মন্দির। এই মন্দিরটি শিশুরাম নন্দী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মন্দিরে স্থাপিত প্রতিষ্ঠালিপিটি হল,—

"৺শিশুরাম নন্দী পুত্রানাং ভাগারহানাদ
দুর্ল্লভরাম নন্দী। গঙ্গাদাস নন্দিনা পরিবারেন
কৃতো দেবালয় অস্যাম শ্রীনিত্যানন্দাম স্ত্রী শ্রীরাম
চন্দ্রাম স্ত্রী শন ১২৫২ শাল।

বাস স্ট্যাণ্ড হ'তে মীরহাটের দিকে এগিয়ে গেলে অপর একটি নবরত্ন শিবমন্দির ও তার পাশে আটচালা শিবমন্দির চোখে পড়বে। নবরত্ন শিবমন্দিরটি ১৭২৪ শকাব্দে মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে জয়দেব নন্দী কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং জগন্নাথ নামক কোন ব্যক্তি এই মন্দিরের স্থপতি ছিলেন। এখানে একটি জীর্ণ দশাগ্রস্ত পঞ্চরত্ন মন্দির রয়েছে। মন্দিরটির স্থাপত্য ও টেরাকোটা অলঙ্করণ দেখে এটিকে প্রাচীন মন্দির বলে মনে করা যায়। কুণ্ডপুকুরের পাড়ে জোড়া আটচালা শিবমন্দির আছে। তন্মধ্যে একটিতে প্রচুর টেরাকোটা অলঙ্করণ দেখা যায়। এই শিবমন্দির ২টি ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল ব'লে জানা যায়। এছাড়া নন্দী পরিবারের জোড়া শিবমন্দির, কৃষ্ণমন্দির, শিবমন্দির (১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে) বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১২২২ বঙ্গাব্দে শিশুরাম নন্দীর পত্নী দ্রৌপদী দেবী এক সাধুর নিকট রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হ'ন। কষ্টিপাথরে নির্মিত বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ ও পিতলের শ্রীরাধিকা মূর্তি বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। রাসের সময় রাসমঞ্চের উপর রাধাকৃষ্ণের ছন্দে বড়াইবুড়ীর মৃন্ময়ী মূর্তি স্থাপন করা হয়। পঞ্চম দোলে বৃন্দাবনচন্দ্র ও রাজ-রাজেশ্বরের দোল উৎসব হয়। বৈদ্যপুরের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল ১২০৪ সালে নির্মিত ২টি কাঠের রথের জন্য। নানাবিধ কারুকার্য শোভিত ১৩ চূড়ায় রথ ২টি দূর-দূরান্তর হ'তে লোকে দেখতে আসত। তন্মধ্যে ছোট রথটি নষ্ট হয়ে গেছে।

বৈরাগ্যতলা (মৌজা-কাশিয়াড়া—৩৩ : মঙ্গলকোট) : মঙ্গলকোট হ'তে আট কিলোমিটার পশ্চিমে বৈরাগ্যতলার অবস্থিতি। বৈরাগ্যচাঁদ নামক এক ধর্মপ্রাণ সাধুর তিরোধান উৎসব উপলক্ষে মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার পর একটি মেলা বসে। স্থানীয় লোকের দাবী এই যে, মেলাটি প্রায় ৪০০ বৎসরের প্রাচীন। বৈরাগ্যচাঁদের সমাধিটিও

গ্রামের মধ্যে আছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা এবং মনসা দেবীর পূজা হয়।

বৈঁচি (মৌজা-এলগ্রাম ৫৫ ঃ কাটোয়া) ঃ কাটোয়া-মন্তেশ্বর বাস-রাস্তা ধরে এই গ্রামে যাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্যের জন্য অতীতে গ্রামের নাম ছিল গোবিন্দপুর। সম্ভবতঃ বোঁয়াইচণ্ডী দেবীর অধিষ্ঠানক্ষেত্ররূপে গ্রামটি বৈঁচিতে পরিণত হয়েছে। এল·গ্রাম মৌজার আদি নাম ছিল বেলগ্রাম, কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেদের বেলপাতা উচ্চারণে আপত্তি থাকায় কোন এক সময়ে বেলগ্রামের পরিবর্তে এল·গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই গ্রামে ঘোষাল বাড়ীতে দেবী মনসা-চণ্ডীর নিত্যপূজা হয়। দশহরার সময়ে জাঁকজমক সহকারে বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। গ্রামের মধ্যে কাদম্বিনী নামে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। চর্মরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা কাদম্বিনী বা কাদামুনির জল ব্যবহার করে উপকার হয় বলে শোনা যায়। মনসা-চণ্ডীর মূর্তিটি এই পুষ্করিণীতে পাওয়া গিয়েছিল। সন্নিকটবর্তী সর গ্রামে ঝঙ্কেশ্বরী নামে অপর এক মনসা দেবীর অধিষ্ঠানক্ষেত্র আছে। ভট্টাচার্য পরিবারে প্রতিষ্ঠিত আছেন কষ্টিপাথরের রাধাগোবিন্দ মূর্তি। ফাল্গুন মাসে সাড়ম্বরে দোল উৎসব পালিত হয়।

বোড়োবলরাম ঃ বিশেষ বিবরণ ১৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বোহার (৯৬ ঃ মেমারি) ঃ সাতগাছিয়ার পূর্বভাগে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। অতীতে বোহারের মাদ্রাসার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এই মাদ্রাসার অমূল্য গ্রন্থরাজি ও হস্তলিখিত পুঁথিসমূহ জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করা হয়েছে ও তথায় রক্ষিত রয়েছে। মাদ্রাসার সন্নিকটে হিজরা ১১৮৭ অব্দে (১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে) একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মসজিদের প্রতিষ্ঠালিপি হল,—

> 'বিসমিল্লা হের রহমানের রহিম
> সৈয়াদে আলী নেসবেসেদরে দীন
> করদে মরবৎ চুহারিমে খোদা কফতে
> গরুষ আর্জাত তারিখে আঁওকক্তে
> নামাজ আস্ত দে মাস জেদেব খাঁ
> ১১৮৭ হিজরা'

বোঁয়াই (৩৫ ঃ খণ্ডঘোষ) ঃ বর্ধমান শহর হ'তে সরাসরি বাসযোগে বোঁয়াই গ্রামে পোঁছান যায়। গ্রামদেবী বোঁয়াই চণ্ডীর নামানুসারে গ্রামনাম হয়েছে। প্রবাদ আছে যে, বুদ্ধিমন্ত খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে কুলে গ্রামে রায়কা-দীঘির অগ্নি কোণে শ্যাওড়া গাছের নীচে বোঁয়াইচণ্ডী দেবীর শিলামূর্তি আবিষ্কার করেন এবং শিলামূর্তিটি গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। বোঁয়াইচণ্ডী বিশেষ জাগ্রত দেবী এবং বুদ্ধিমন্ত খাঁর বংশধরগণ দেবীর প্রধান সেবাইত। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর সময় ও মহানবমীতে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে। একটি ইস্টক নির্মিত দালান

মন্দিরে চণ্ডী ও নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরটি বর্ধমানের রাজাদের আনুকুল্যে নির্মিত হয়েছিল এবং তাঁরা দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেছিলেন। এছাড়া বৎসরের বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রহ্মপুর (৪৩ : কাটোয়া) : কাটোয়া-বনকাবাসি বাস-রাস্তা ধরে এই গ্রামে যাওয়া যায়। অতীতে গ্রামনাম ব্রহ্মপুর হলেও একালে বরমপুরে পরিণত হয়েছে। গ্রামটি যে অতি প্রাচীন তার দু'-একটি নিদর্শন মেলে। গ্রামের মধ্যস্থলে মৃত্তিকাগর্ভে সুদীর্ঘ একটি ইস্টক নির্মিত প্রাচীরের সন্ধান পাওয়া যায়। বহুকাল পূর্বে সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরতা চিহ্ন ক্ষোদিত একটি সুবর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। পূর্বপাড়ায় একটি পুষ্করিণীর অভ্যন্তরে দু'টি কূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। গ্রামের যোগাদ্যাতলায় অষ্টবাহু সমন্বিত একটি দেবীর উর্ধাংশকে যোগাদ্যা দেবী জ্ঞানে পূজা করা হয়। বুদ্ধ পূর্ণিমায় সাড়ম্বরে ধর্মরাজের বাৎসরিক পূজা ও ৩০শে বৈশাখ যোগাদ্যা দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের শেষ তারিখে মনসা দেবীর পূজা হয় ঘটে ও যন্ত্রে। এছাড়া নবম দোল উৎসব ও শাকম্বরীর পূজা হয়ে থাকে।

ব্রহ্মাণীতলা (মৌজা-জাহুগর ৯১ : পূর্বস্থলী) : নবদ্বীপের ৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে জাহ্নগর ও মাউগাছি এবং এই গ্রামদ্বয়ের উত্তরে ভাগীরথী নদীর দক্ষিণ তীরে ব্রহ্মণীতলার অবস্থিতি। ব্রহ্মণী দেবীর অবস্থান ক্ষেত্ররূপে স্থানটি ব্রহ্মণীতলা নামে চিহ্নিত। এই স্থানে কালী গোস্বামী নামক একজন সিদ্ধপুরুষ রামবট নামে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে বসবাস করতেন। প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ব্রহ্মণী-দেবীর বাৎসরিক পূজা ও ঝাঁপান উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

ব্রাহ্মণীতলার পূজা ও মেলার প্রসিদ্ধি বহুকালের। ভোলানাথ চন্দের 'Travels of a Hindu' (Vol. I, p. 44-45) নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, "*Brahmanitala*, in John-nugger, is a spot where human sacrifices were formerly offered to an image of Doorga and where a great mela is now annually held in July." 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় ব্রহ্মণীতলা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। "ব্রহ্মণীপূজা।—চান্দ সওদাগরের ইতিহাস অনেকে জ্ঞাত আছেন সেই চান্দ সওদাগরের স্থাপিত ব্রহ্মাণী পূজা প্রতি বৎসর নবদ্বীপের পশ্চিম মোং জান-নগর গ্রামে হইয়া থাকে তাহাতে অনুমান লক্ষ লোক জমা হয় ঐ দিনে সে প্রদেশের সকল ভদ্রলোক ও আর সকল ইতর লোকেরাও পূজা দেয় বলিদান অনেক হয় এবং তদ্দেশীয় অধ্যাপকেরা আপন২ ছাত্র সঙ্গে করিয়া সেখানে যান ও অধ্যাপকে২ ও ছাত্রে২ বিচার হইয়া জয় পরাজয় নিশ্চিত হয়। সংপ্রতি সে পূজা আগামি রবিবারে হইবেক।" [১৪ই আগষ্ট ১৮১৯। ৩১ শ্রাবণ ১২২৬]

ব্রহ্মাণী পূজা সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিবরণ হল, "গুপ্ত পূজা।—সম্প্রতি ২৯ কার্তিক ১৩ নবেম্বর শনিবার রাত্রি যোগে ব্রহ্মাণী তলায় অত্যাশ্চর্য রূপ পূজা হইয়াছে তাহার

বিবরণ এই অষ্টোত্তর শত ছাগ ও দ্বাদশ মহিষ বলিদান ও চেলীর শাড়ী ও সূতার শাড়ী বিশ পঁচিশখান ও প্রধান নৈবেদ্য আটখান তাহার প্রত্যেক নৈবেদ্যে অনুমান দুই ২ মোন আতপ তণ্ডুল ও তদুপযুক্ত উপকরণাদি। এই২ সকল সামগ্রী দিয়া গুপ্ত রূপে পূজা করিয়া গিয়াছে কিন্তু সে রাত্রিতে কেহই তাহার অনুসন্ধান পায় নাই পরদিনে প্রাতঃকালে তন্নিকটস্থ গ্রামের লোকেরা গিয়া দেখিল যে সেই ২ নৈবেদ্য ও শাড়ী ও অষ্টোত্তর শত ছাগ মুণ্ড ও দ্বাদশ মহিষ মুণ্ড ইত্যাদি অবিকৃত আছে এবং ছাগ ও মহিষের শরীর নাই কেবল বেদির উপরে মুণ্ড মাত্র এবং হাড়ি না পুতিয়া এই সকল বৃহৎ মহিষাদি বলিদান করিয়াছে। এই আশ্চর্য যে এত বৃহৎ কর্ম এক রাত্রিতে নিষ্পন্ন করিয়াছে ইহা কেহ জানিতে পারে নাই। এবং ভাগ্যবান লোক ব্যতিরেকে এমত পূজা দিতে অন্যে পারে না এবং সে ভাগ্যবান ব্যক্তি কি নিমিত্ত অপ্রকাশ রূপে এমত মহাপূজা করিয়াছেন তাহার কারণ জানা যায় নাই। কিন্তু এই বিষয় মোং পূর্বস্থলীর দারোগা এই মাত্র সন্ধান করিল যে সেই শনিবার অধিক রাত্রির সময়ে এক ব্যক্তি এক মুদীর দোকান হইতে লণ্টন জালাইয়া লইয়া গিয়াছিল আর কিছু কেহ কহিতে পারিল না।" [২৭ নবেম্বর ১৮১৯। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬]

ভরতপুর (২ ঃ বুদবুদ)ঃ পানাগড় রেলস্টেশন হ'তে কিলোমিটার দক্ষিণে ভরতপুর গ্রামের অবস্থিতি। এই গ্রামটি অত্যন্ত প্রাচীন, আবিষ্কৃত বৌদ্ধস্তূপ হ'তে এই কথার সমর্থন মেলে। ভরতপুরের গ্রামদেবতা হলেন ধর্মরাজ। ধর্মরাজের মন্দিরের মধ্যে একই সঙ্গে গণেশ, সূর্য, শিব, দুর্গা, ছিন্নমস্তা, ভৈরব ক্ষেত্রপাল ও বাণলিঙ্গ শিবের প্রস্তরমূর্তি অথবা শিলা নিত্য পূজিত হয়। বুদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন উপলক্ষে একটি মেলা বসে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্ন মানচিত্রে ভরতপুর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। রাঢ় অঞ্চলে কেবলমাত্র ভরতপুরেই বৌদ্ধ স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথিতে "তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তূপ"-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ধর্মপালদেবের আমলে "ধর্মরাজিক স্তূপ" রাঢে নির্মিত হয়েছিল। তাই সঙ্গত কারণে অনুমান করা যায় যে, ভরতপুরের "তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তূপ" অথবা "ধর্মরাজিক স্তূপ" নির্মিত হয়েছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপের মধ্যে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বজ্রাসনে উপবিষ্ট সর্বসাকুল্যে মোট ১১টি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। স্তূপের নিম্নভাগে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে। অঙ্গার চতুর্দশ (C-14) পরীক্ষান্তে জানা গেছে যে, সর্বনিম্ন স্তরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শনাবলী খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি কোন সময় কালের। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পুরাতত্ত্ব বিভাগের সহ-অধিকর্তা সুশান্ত মুখোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করায় এই উৎখনন কার্যের সামগ্রিক রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয় নাই। (বিশেষ বিবরণ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৩-৪৫ দ্রষ্টব্য)।

ভাটাকুল (৮২ ঃ ভাতাড়) ঃ বলগনা স্টেশন হ'তে ৩ কিলোমিটার পূর্বে ভাটাকুল গ্রামের অবস্থিতি। সম্ভবতঃ ভট্টকুলাচার্যগণের বসবাস হ'তে গ্রামনামটি

এসেছে। জনশ্রুতি আছে যে, এখানে রামচন্দ্র নামক কোন ভূস্বামীর একটি গড় ছিল, সেকারণে এই গ্রামটিকে রামচন্দ্রের গড়ও বলা হ'ত। গ্রামে শঙ্খিনী মাতা নামক মনসা ও দিদিঠাকরুণের (চণ্ডী) পূজা হয়। ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে কাশিমবাজারের দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ভাণ্ডারটিকুরী (৮৭ : পূর্বস্থলী) : নবদ্বীপের পরবর্তী রেলস্টেশন ভাণ্ডারটিকুরীতে নেমে পায়ে হেঁটে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলে গ্রামে পৌঁছান যায়। এখানে 'কপিলাশ্রম' নামে একটি প্রাচীন মঠ আছে। একটি বিরাট এলাকার মধ্যে আশ্রম মন্দির, বাগান, কুঞ্জ ও আশ্রমিকদের বসবাসের গৃহ নির্মিত হয়েছে। মঠের যজ্ঞাগ্নি কখনও একেবারে নির্বাপিত হয় না। গঙ্গার তীরে স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের মন্ত্রশিষ্য প্রেমানন্দ সরস্বতী "শঙ্কর মঠ" নামক একটি সারস্বত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রেমানন্দ সরস্বতী ৮২ বৎসর বয়সে ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে এইস্থানে দেহত্যাগ করেন। প্রতি ১২ বৎসর অন্তর ভারতে মোট ১২টি সারস্বত আশ্রমের মধ্যে এক এক স্থানে বিশেষ উৎসব পালিত হয়। এর মধ্যে ভাণ্ডারটিকুরীর নামও নির্দিষ্ট হয়ে আছে। স্টেশন সংলগ্ন স্থানে গাছপূজা এবং মনসা পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

ভাতছালা (১২৯ : পূর্বস্থলী) : ভাণ্ডারটিকুরী হ'তে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণে ভাতছালা বা ভাতশালা গ্রামের অবস্থিতি। নবদ্বীপ হ'তেও এই গ্রামে যাওয়া যায়। যাত্রাগানের অন্যতম পরিচালক, অভিনেতা, রচনাকার ও সুরকার মতিলাল রায় ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে ভাটছালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমান শহরে ভাটছালা নামক একটি স্বতন্ত্র পল্লীনাম পাওয়া গেলেও মতিলাল রায়ের জন্মস্থান ছিল পূর্বস্থলী থানায়।

ভাতুরিয়া (১১১ : পূর্বস্থলী) : পূর্বস্থলী হ'তে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে ভাতুরিয়া গ্রামের অবস্থিতি। হাঁটা-পথ ব্যতীত এখানে যাওয়ার কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। 'আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ভাতুরিয়া গ্রামে রাজা আদিশূরের অতিথিশালা ছিল। ভাতুরিয়া যে একটি প্রাচীন গ্রাম সেকথা গ্রামের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধ্বংসাবশের হ'তে প্রমাণিত হয়। হুগলী জেলার শ্রীরামপুর-আখনা পল্লী হ'তে ভবানীশঙ্কর ঘোষ পত্তনি লাভ করে এখানে বসবাস শুরু করেন। গ্রামের মধ্যে টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত ও টালি ইটে নির্মিত একটি জীর্ণদশাগ্রস্ত চারচালা প্রাচীন শিবমন্দির রয়েছে। গ্রামের মধ্যস্থলে একটি মন্দিরে সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠিত আছেন। পূর্বে দেবীর পাষাণ মূর্তি ছিল, কিন্তু ঐ মূর্তি ভগ্ন হওয়ায় বর্তমানে মাটির তৈরী মূর্তিটি পূজিত হচ্ছে। ঘোষ পরিবারের দুর্গা মণ্ডপটিও বেশ পুরাতন। গ্রামে প্রবেশের মুখে ধ্বংসপ্রাপ্ত নীলকুঠির চেম্বার দুটির আজও অস্তিত্ব রয়েছে।

ভালকী (১০১ : আউসগ্রাম) : গুসকরা অথবা মানকর হ'তে বাসযোগে সুয়াতার স্টপেজে নেমে দু' কিলোমিটার হাঁটা-পথে উত্তর দিকে এগিয়ে গেলে ভাল্কি গ্রামে পৌঁছান যায়। গোপভূম রাজবংশের অন্যতম শাসন কার্যালয় ছিল ভাল্কিতে।

অনেকের মতে ভল্লুপাদ নামক সদ্গোপ রাজার নামানুসারে গ্রামনাম হয়েছে ভাল্কি। আবার অনেকে অনুমান করেন যে, এই স্থানের আদিম অধিবাসীদের টোটেম ছিল ভল্লুক, তাই স্থাননাম হয়েছে ভাল্কি। গ্রামটি প্রাচীন হ'লেও সদ্গোপ রাজাদের আমলের কোন পুরাকীর্তির নিদর্শন দেখা যায় না। এই গ্রামে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে নির্মিত কয়েকটি মন্দির আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল উদয়নারায়ণ ধর্মরাজের মন্দির। এই মন্দিরের মধ্যে ধর্মরাজের ২টি কূর্মমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামের মধ্যস্থলে টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত ও পাতলা ইটে নির্মিত একটি দালান মন্দিরে চতুর্ভুজা দুর্গা, চামুণ্ডা ও খেলারাম নামক ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছেন। একটি শিখর দেউলে আরাধিত হচ্ছেন মহাদেব। গ্রামস্থ কর্মকার পরিবার বীরভূম জেলার পাথরকুচি গ্রাম হতে ভাল্কিতে এসে সাতপুরুষ ধরে বসবাস করছে। কর্মকার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দুর্গামন্দিরটির বৈশিষ্ট্য হ'ল টেরাকোটা অলঙ্করণের পরিবর্তে রঙয়ের ব্যবহার এবং এই রঙ দীর্ঘস্থায়ী। ১২০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত শিবের শিখর-দেউলটি দর্শনীয় বস্তু। এছাড়া বনমালীশ্বর ও শ্রীধরেশ্বর প্রতিষ্ঠিত আছেন ২টি শিখরদেউলে। গ্রামের ভাটপাড়ায় ভাট পরিবার কর্তৃক নির্মিত আটচালা শিবমন্দিরটি টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ভাট পরিবার বর্ধমান রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিল। উদয়নারায়ণ ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

ভিটা (৬৩ঃ বর্ধমান)ঃ বর্ধমান-কুসুমগ্রাম রাস্তায় বাসযোগে ভিটা গ্রামে পৌঁছান যায়। এই গ্রামের পূর্ব-নাম ছিল বাসুদেবপুর। নাম পরিবর্তন সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে, ভিটা মৌজাটি বর্ধমান মহারাজের খাস তালুকের অধীনস্থ ছিল। রাজবাড়ীর সন্নিকটস্থিত কাপড় চক, লাট-বাসুদেবপুরের শামিল ছিল। রাজাদের ভিটার সম্পর্কযুক্ত হয়ে লাট-বাসুদেবপুরের অবস্থিতির জন্য স্থানটি ভিটা (বাড়ী) নামে পরিচিত ছিল। সেই কারণে বাসুদেবপুর মৌজাটিও ভিটা নামে পরিগণিত হয়।

ভিটা গ্রামে ভুবনেশ্বর শিব, পঞ্চানন, মনসা, ওলাইচণ্ডী, যোগাদ্যা ও বাস্তুদেবী প্রভৃতি গ্রাম্য দেব-দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। শিবের গাজন উপলক্ষে বহুকাল ধরে মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

ভিরিঙ্গিঃ দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্ট অঞ্চলের মধ্যে বেনাচিতি পল্লীর দক্ষিণে ভিরিঙ্গি অবস্থিত। এই স্থানের একটি পুষ্করিণী হ'তে সেন আমলের একটি বিষ্ণু-মূর্তির উর্ধ্বাংশ আবিষ্কৃত হয়েছিল। দুর্গাপুর শিল্পনগরীর মধ্যে অবস্থিত হ'য়েও স্থানটি স্টীল অথরিটি এলাকার বহির্ভূত।

ভুরকুণ্ডা (৪৮ঃ মন্তেশ্বর)ঃ মন্তেশ্বর হ'তে ৮ কিলোমিটার দূরে ভুরকুণ্ডা গ্রামের অবস্থিতি। এই গ্রামে মজুমদার পরিবারে অষ্টধাতুর সিংহবাহিনী মূর্তি নিত্য পূজিত হয়। আশ্বিন মাসে দেবীর বাৎসরিক মহাপূজো অত্যন্ত আড়ম্বর সহকারে পালিত হয়। সিংহবাহিনী দেবী সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে, প্রায় ৭০ বৎসর

অবস্থিতি। বাংলা ১৩৭৮ সালে সীতারামদাস ওঁঙ্কারনাথের আশ্রম এবং আশ্রমের রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ সহ অন্যান্য দেবদেবীর সেবা-প্রতিষ্ঠার পর হ'তে বেলরুই গ্রামের খ্যাতির কথা জানা যায়। দেবদেবীদের নিত্যপূজা ব্যতীত সারা বছর ধরে অখণ্ড তারকব্রহ্ম নামকীর্তন হয়।

বেলাড় (১৪৯ : রায়না) : বর্ধমান হ'তে বুলচন্দ্রপুর স্টপেজে নেমে ৩ কিলোমিটার দূরে মুণ্ডেশ্বরী কাঁদড় খালের ধারে বেলাড় গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামের মধ্যস্থলে দাঁ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। মন্দিরগাত্রে কোন টেরাকোটা অলঙ্করণ নেই। বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবার অথবা শনিবারে বোঁয়াইচণ্ডী ও ওলাইচণ্ডী দেবীর পূজা হয়। একই দিনে পঞ্চাননের পূজা হয় এই গ্রামে। মাঠের মধ্যে ওলাইচণ্ডীতলায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গ্রামের জনসাধারণ সমবেত হয়ে চিঁড়া মহোৎসবে যোগদান করেন। চৈত্র মাসে শিবের গাজনটিও বহুকাল ধরে চলে আসছে।

বেলারী (১৭৭ : আউসগ্রাম) : বনপাস স্টেশনে নেমে ২ কিলোমিটার হাঁটা-পথ ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলে বেলারী গ্রামে পৌঁছান যায়। এই গ্রামের শিব মন্দিরটি বেশ প্রাচীন এবং মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিব হ'লেন বেলারীর গ্রামদেবতা। প্রতি বৎসর শিবরাত্রিতে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে।

বেলুন (১০৭ : বর্ধমান) : বর্ধমান শহর হ'তে নাদনঘাটের পথে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে খড়ি নদীর তীরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। আবার কুড়মুন গ্রাম হয়ে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র হলেও এখানে অতীতের বহু স্মৃতিচিহ্ন রয়ে গেছে। এখানে পণ্ডিত ব্যক্তিগণেরও বসবাস ছিল, তার প্রমাণ-স্বরূপ দেখা যায়, গ্রামের প্রাচীন টোলের অবস্থিতি। এখানে বেশ কয়েকটি ভগ্ন ও জীর্ণদশাগ্রস্ত শিবমন্দির আছে, যা গ্রামের অতীত সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দেবী মনসা হ'লেন এখানকার প্রধান গ্রামদেবতা। মনসার পুরাতন মন্দিরটি ধ্বংস-প্রাপ্ত হওয়ায় একটি নূতন মন্দির নির্মিত হয়েছে। কলেরা, বসন্ত, মহামারীর হাত হ'তে অব্যাহতি লাভের জন্য চৈত্র মাসে মহাসমারোহে বহুকাল ধরে 'দিদি ঠাকরুণের' পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। গ্রামে কয়েকটি শিবলিঙ্গের নিত্যপূজা হলেও 'গাজুনে শিব' নামে পরিচিত শিবলিঙ্গটি নিয়ে চৈত্র মাসে গাজনের সময় গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। অতি ক্ষুদ্রাকায় শিবলিঙ্গটির জ্যোতির্ময় রূপ দেখে এটিকে 'নীলাদ্রিভূষণ' শিবলিঙ্গ বলে অনুমান করা হয়। এছাড়া গ্রামে ১২ মাসে ১৩ পার্বণ লেগেই আছে। কোন একসময়ে এই গ্রামে শিবাই পণ্ডিতের শ্রীপাট ছিল বলে শোনা যায়, কিন্তু বর্ত্তমানে এর কোন হদিস নেই।

বৈকুণ্ঠপুর (৯১ : বর্ধমান) : বর্ধমান-কালনা রোডে বর্ধমান শহর হ'তে ১৩ কিলোমিটার দূরে গঞ্জ বৈকণ্ঠপুর-এ নেমে দক্ষিণ মুখে এক কিলোমিটার হাঁটা পথে এগিয়ে গেলে গ্রামে পৌঁছান যায়। অতীতের সুপ্রশস্ত ভল্লুকা নদীর তীরে বৈকুণ্ঠপুর

অলঙ্করণ অত্যন্ত সুন্দর। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসা দেবীর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে ঝাঁপান অনুষ্ঠান হ'ল এই গ্রামের প্রধান উৎসব।

মন্তেশ্বর (৪১ ঃ মন্তেশ্বর) ঃ মেমারি, বর্ধমান, কাটোয়া ও কালনা হ'তে সরাসরি মন্তেশ্বর থানার সদর কার্যালয় মন্তেশ্বর গ্রামে পৌঁছান যায়। খড়ি নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত মন্তেশ্বর হ'ল একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামদেবতা মন্তেশ্বর শিবের নামানুসারে গ্রামের নাম হয়েছে মন্তেশ্বর। গ্রামে ধর্মরাজ পূজা ও চামুণ্ডা পূজার বিশেষত্ব হ'ল এই যে, এই পূজা দু'টির কর্তৃত্ব নিম্নবর্ণের লোকেদের হাতেই ছিল ; পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের মানুষেরা ব্রাহ্মণদের সহায়তায় আধিপত্য বিস্তার লাভে সমর্থ হয়। গ্রামে ২টি ধর্মঠাকুরের ১টির সেবাইত হ'লেন পরামাণিক বা নাপিতেরা এবং অপরটির সেবাইত হ'লেন ব্যগ্র ক্ষত্রিয় বা বাগ্দীরা। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মের গাজনের সময় মদের কলস মাথায় নিয়ে যখন ধর্মরাজকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হয় সেসময় ধর্মরাজের পূজার আদি রূপটি দেখা যায়,—

"মদ্যের পুষ্করিণী দিব মাংসের জাঙ্গাল"

মদ্যভাণ্ড মাথায় নিয়ে ভাঁড়াল নাচের দৃশ্যটি লোকসংস্কৃতির আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অর্থবহ। ধর্মপূজায় বলিদান হ'ল পূজার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। 'মাংসের জাঙ্গাল' উল্লেখ হ'তে এ কথাটির অর্থ বেশ পরিস্ফুট হয়। মন্তেশ্বরের গ্রামদেবী চামুণ্ডার বাৎসরিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখী শুক্লা অষ্টমীতে। চামুণ্ডা পূজাকে গ্রামের সার্বজনীন গ্রামীণ উৎসবও বলা যায়। দেবীর পূজায় অব্রাহ্মণ জাতির বিশেষ অধিকার আছে, তদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, চামুণ্ডা দেবী অতীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আওতার বাইরে ছিলেন। দেবীর পূজা শুরু হওয়ার পূর্বে প্রথমে হয় ঘাট পূজা এবং অষ্টমীর দিন খাঁয়ের পুকুর হতে দেবী মূর্তি তোলা হয় এবং বলিদান সহ পূজা-অর্চনা করা হয়। নবমীর দিন ধীবর ও ব্যগ্র ক্ষত্রিয়রা দেবীকে কাঁধে করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। গ্রাম প্রদক্ষিণের পর একটি মাটির বেদীতে বিগ্রহ স্থাপন করে পূজা ও বলিদান হয়। দশমীর দিন চামুণ্ডা দেবীকে পুনরায় নিজ মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। স্নানপর্বটি হ'ল ধর্মরাজ ও শিবের গাজনের অনুরূপ এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে কোন বিগ্রহকে নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণের কোন ব্যবস্থা নেই। হয়ত দেবী অতীতে আদিম অধিবাসীদের আরাধিতা ছিলেন।

চামুণ্ডা দেবীর সেবাপূজার জন্য বর্ধমানের রাজারা কিছু ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা পূজা সম্পর্কে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছিলেন যে,— "ধীবর ও ব্যগ্র ক্ষত্রিয়দের বিশেষ অধিকারের অর্থ হ'ল, তাঁরা হ'লেন দেবীর আদি ও অকৃত্রিম পূজারী। ব্যাপকভাবে বলিদান প্রথার মধ্যেও আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়।" গ্রামের মধ্যে একটি মন্দিরে সিদ্ধেশ্বরী দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন।

ময়দা (জামালপুর) ঃ জৌগ্রাম স্টেশন হ'তে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে ময়দা বা মৈদা গ্রামের অবস্থিতি। ঐ গ্রামে প্রতি বৎসর ১৬ই চৈত্র তারিখে শ্মশানকালীর পূজা

হয়। পূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল ১৬ই তারিখের অপরাহ্নে প্রতিমা তৈরী করে ঐ দিনই পূজা হয়। প্রতিমা তৈরীর মাটির সঙ্গে মদ মিশিয়ে ঐ মণ্ডপ দিয়ে একমেটে, দুমেটে, রঙ ও চক্ষুদান পর্ব সাঙ্গ করে গ্রামের প্রান্তে শ্মশানে সারারাত ধরে পূজো, বলিদান ও হোম সমাপনান্তে পরদিন অতি প্রত্যূষে দেবীকে বিসর্জন দেওয়া হয়। শ্মশানকালীর পূজো উপলক্ষে এক দিনের জন্য মেলা বসে।

মল্লসারুল (৭৬ ঃ গলসী) ঃ গলসী হ'তে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে মল্লসারুল গ্রামের অবস্থিতি। এই গ্রামে মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধীনস্থ রাজা বিজয় সেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাম্রশাসনখানি ৬ষ্ঠ শতকে গোপচন্দ্রের ৩৩ রাজ্যাঙ্কের সম্পাদিত হয়েছিল। এই তাম্রশাসন হ'তে ৬ষ্ঠ শতকে বর্ধমানভুক্তির অস্তিত্বের কথা ঘোষিত হচ্ছে এবং সন্নিকটবর্তী আরও ৯খানি প্রাচীন গ্রামের কথা ক্ষোদিত আছে। গ্রামদেবতা মল্লেশ্বর শিব বহুকাল ধরে আরাধিত হয়ে আসছেন।

মলনদীঘি (৪৮ ঃ কাঁকসা) ঃ দুর্গাপুর হতে বাসযোগে সরাসরি, মলনদীঘিতে পেঁছান যায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ব্যতীত সেনপাহাড়ী, শ্যামারূপার গড়, ইছাই ঘোষের দেউল প্রভৃতি স্থান দর্শনের ইচ্ছা থাকলে রাত্রিবাসের জন্য পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয় হ'ল ইনস্পেকশন বাংলোটি। বর্ধমান জেলা পরিষদ হ'তে পত্রালাপের মাধ্যমে রাত্রিবাসের জন্য অগ্রিম অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

মল্লিকপুর (১১১ ঃ গলসী) ঃ গলসী হ'তে ১০ কিলোমিটার বাস-রাস্তায় গোহগ্রামে পেঁছান যায় এবং আরও ১.৫ কিলোমিটার দামোদরের বাঁধ ধরে হাঁটাপথে মল্লিকপুরে পেঁছান যায়। গ্রামের দক্ষিণভাগে প্রবেশ করার সময় মাদার-সাহেব পীরের স্থান দেখা যায়। এখানে পোড়ামাটির হাতি মানত করা হয়। গ্রামের অপর প্রান্তে পাঠানবেড়ায় একটি পীরের স্থান আছে। গুমড়া-গোড়ে নামক স্থানটি মুসলমানদের নিকট পবিত্র। কার্তিক মাসে সিদ্ধেশ্বরী কালীর পূজো ও উৎসব হয় জাঁকজমক সহকারে। শিবের গাজনের সময় একটি মেলা হয়। গাজনের পরের দিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখ শিবের ভোজ উপলক্ষে সারা গ্রামের লোক একত্রে বসে আহার করে। গ্রামের কিছুটা দক্ষিণে পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষে ৪।৫টি গ্রাম মিলে 'গড়ম্বার' মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মল্লিকপুর গ্রামে পুরাকীর্তির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল চক্রবর্তী পরিবারের দুর্গামণ্ডপ। এরূপ সুউচ্চ, সুদৃশ্য ও বিশাল আয়তন বিশিষ্ট দুর্গামণ্ডপ বড় একটা দেখা যায় না। এছাড়া কাশীনাথ শিবের আটচালা মন্দির, শ্রীধরের দালানমন্দির ও চৌধুরীদের জোড়াশিবের শিখরদেউল পুরাকীর্তির অন্যতম নিদর্শন। চৌধুরীপাড়ার একস্থানে সাতটি শিখরদেউল নির্মিত হয়েছিল তন্মধ্যে তিনটি ধ্বংস হয়ে গেছে। মল্লিকপুরে কোন মেলা হয় না ; তবে চার পাঁচটি গ্রাম নিয়ে পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে গরম্বার মেলাটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

মসজিদপুর (১২৭ ঃ রায়না) ঃ বর্ধমান হ'তে বাসে উচালনে নেমে তিন কিলোমিটার পূর্বে এগিয়ে গেলে মসজিদপুর গ্রামে যাওয়া যায়। জনশ্রুতি এরূপ যে,

বহুকাল পূর্বে শাহ সুফী আলাউদ্দীন নামে একজন ব্যক্তি গ্রামের শ্বেতগঙ্গা নামক দীঘির তীরে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্বেতগঙ্গার পশ্চিমে দেওড়া গ্রাম এবং উত্তর-পূর্বকোণে মসজিদপুর গ্রাম অবস্থিত। অনেকের মতে এখানে একটি বিশাল দেবগৃহ ছিল। দেবগৃহের অবস্থিতির জন্য স্থানটি দেবগৃহ-দেবহরা হতে অপভ্রংশে দেওড়া হয়েছে। শোনা যায় দেবগৃহ ধ্বংস করে ঐ স্থানে মসজিদ নির্মিত হওয়ায় গ্রামটি মসজিদপুরে রূপান্তরিত হয়েছে। মসজিদটির গঠনবৈচিত্র্যের সঙ্গে হিন্দু মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন বিদ্যমান। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শ্বেতাগঙ্গার পাড়ে বারুণী উৎসব উপলক্ষে প্রচুর জনসমাগম হয় ও একটি মেলা বসে।

মসাগ্রাম (১৩ঃ জামালপুর)ঃ কর্ড লাইনে মসাগ্রাম স্টেশনে নেমে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে এগিয়ে গেলে গ্রামে পৌঁছান যায়। গ্রামবাসীদের মতে মহাশয় অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বসবাসের জন্য মহাশয় গ্রাম হ'তে অপভ্রংশে মসাগ্রামে পরিণত হয়েছে। শোনা যায়, মুর্শিদাবাদের দেওয়ান ভায়ারাম চৌধুরী গ্রাম পত্তন করেন। এই গ্রামের পশ্চিমভাগে একটি দালান মন্দিরে বনরায় নামক ধর্মঠাকুর অধিষ্ঠিত আছেন। বনরায়ের গাজন হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম মঙ্গলবার ধর্মঠাকুরের ঘট বসে। অতঃপর ১২ দিন পরে মূল গাজন শুরু হয়। ধর্মঠাকুরের দেয়াসী হলেন ধীবর গোষ্ঠীর পণ্ডিত উপাধিধারী ব্যক্তি। ধর্মের গাজনের রাত্রে রঙ-বেরঙের ফুলের থাকা তৈরী করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ বের হয়। ফুলের থাকার সঙ্গে গুলঞ্চ ফুলের ব্যবহার অত্যন্ত আবশ্যিক বলে মনে হয়। এই গ্রামে বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবারে কালীপূজা উপলক্ষে কালীমূর্তিটি রায়নার সভাকরগণ মূর্তি তৈরী করে পূজার দিন সন্ধ্যাবেলায় মসাগ্রামে নিয়ে আসেন। রাত্রে সাড়ম্বরে পূজা ও বলিদান পর্ব সমাধা হয়। পরদিন সকালে পূজার পর সভাকরেরা দেবীকে বিসর্জন দিয়ে রায়নায় ফিরে যান। গ্রামের মুসলমান পাড়ায় এক বিরাট ইদ্গাহ আছে যথায় বছরের বিভিন্ন সময়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা ঈদের নামাজ পড়ে। গ্রামে উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির নিদর্শনগুলির মধ্যে গ্রামে প্রবেশের মুখে একস্থানে একটি আটচালা ও দু'টি রেখদেউলে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। চৌধুরী পাড়ায় প্রাণেশ্বর-তলায় এক সময়ে দ্বাদশটি শিবমন্দির নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে মাত্র ৫টি অবশিষ্ট আছে। নবশাখ পাড়ায় একই স্থানে ৭টি শিবের মন্দির দেখা যায়। গ্রামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর উত্তরভাগে ৫টি মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে ১টি চারচালা, ১টি আটচালা, ২টি অষ্টকোণাকৃতি আটচালা ও একটি পঞ্চরত্ন মন্দির রয়েছে। পঞ্চরত্ন মন্দিরটির সম্মুখভাগের টেরাকোটা অলঙ্করণ সজ্জিত আছে। এই পঞ্চরত্ন মন্দিরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বৃষমূর্তি স্থাপিত আছে।

মহুরা (১১০ঃ গলসী)ঃ মল্লিকপুরের পার্শ্ববর্তী মহুরা গ্রামে মাঠের মধ্যে সতীডাঙ্গা নামক একটি স্থান আছে। সতীডাঙ্গায় বহুকাল পূর্বে পুরুলিয়া জেলার মুন্সেফডাঙ্গা হ'তে সর্বেশ্বর বাবাজী নামক এক সাধক এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠ করেন।

সর্বেশ্বর একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। শোনা যায়, সর্বেশ্বর ভক্তদের সন্দেহ দূর করার জন্য শীতকালে আমশোল ভোজন করিয়েছিলেন। মহুরা গ্রামে কোন মহিলাকে সহমৃতা হ'তে দেখে সর্বেশ্বর বাবাজীর হৃদয় ব্যথিত হয় এবং এইটিই ছিল মহুরা গ্রামের শেষ সতীদাহ। আশ্রমের মধ্যে সর্বেশ্বর বাবাজী ও সতী মায়ের সমাধি আছে। বর্তমান আশ্রমিক দেবীপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট হ'তে এসকল তথ্য পাওয়া গেছে।

মহিন্দর (১০৪ ঃ জামালপুর) ঃ জৌগ্রাম স্টেশন হ'তে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে পাশাপাশি অবস্থিত আছে শীতলপুর ও মহিন্দর নামে দু'টি গ্রাম। মহিন্দর গ্রামে উল্লেখযোগ্য উৎসব হল প্রতি বৎসর ১৬ই চৈত্র তারিখে শ্মশানকালীর পূজা উপলক্ষে। শ্মশানকালীর পূজায় পৌরোহিত্য করেন রায়নার সভাকর বংশের লোকেরা। পূজার বিশেষ বৈচিত্র্য হল একদিনের মধ্যে বিগ্রহ নির্মাণ করে, রাত্রে পূজা-অন্তে পরদিবস সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সীমানার বাইরে দেবীকে নিরঞ্জন করা হয়। গ্রামের বারোয়ারীতলায় মূর্তি নির্মাণ করে কোন বিশেষ তালের বাজনা বাজিয়ে দেবীকে শীতলপুরের শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। ভট্টাচার্য বংশের লোকেরা দেবীর পূজারী এবং বর্তমান পূজারী বসন ভট্টাচার্য মহাশয় নারীবেশ ধারণপূর্বক বিশেষ পদ্ধতিতে দেবীর পূজা করেন। পূজা উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। গ্রামের মধ্যস্থলে জোড়ামন্দিরে দু'টি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির দু'টি ঊনবিংশ শতকে নির্মিত বলে অনুমান করা হয়।

মহৎপুর (৯০ ঃ পূর্বস্থলী) ঃ পূর্বস্থলীর ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। অনেকের মতে এই গ্রামের নাম ছিল মাধাইপুর। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে দ্বাদশ তরঙ্গে বর্ণিত আছে যে, এখানে নিতাই-গৌর সেবা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন মন্দির ধ্বংস হওয়ায় একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে।

মহীপতিপুর ঃ যশোহর-খুলনার ইতিহাসে (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩২) উল্লিখিত আছে যে, ভুষণার জমিদার উদয়নারায়ণ রায় বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত মহীপতিপুর গ্রামে দয়াময়ী দেবীকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ সীতারাম রায় এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু একালে এই নামে কোন গ্রামের অস্তিত্ব পাওয়া না গেলেও পূর্বস্থলী থানার অধীনস্থ মহৎপুর নামে একটি গ্রাম আছে। সম্ভবতঃ এটি ছিল রাজা সীতারাম রায়ের মাতুলালয়।

মাজিগ্রাম (৯১ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ কাটোয়া অথবা বর্ধমান হ'তে সরাসরি মাজিগ্রামে পৌঁছান যায়। অনেকে মনে করেন যে, মাঝি গোষ্ঠীর প্রাধান্য হেতু অতীতে গ্রামের নাম ছিল মাঝিগ্রাম যা অপভ্রংশে মাজিগ্রামে পরিণত হয়েছে। এই গ্রামের বিশেষ প্রসিদ্ধি হ'ল মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত দেবী শাকম্ভরীর অধিষ্ঠানক্ষেত্র রূপে। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে শুক্লা নবমী তিথিতে দেবীর বিশেষ পূজা হয়। এই দিন দেবীকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হয়। মদন চতুর্দশীর দিন শাকম্ভরীর বিবাহ উৎসব উপলক্ষে গ্রামদেবতা দেউলেশ্বর শিব ও দেবীকে নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করান

হয়। এই বিবাহ উৎসবটি দেখে অনুমান করা যায় যে, এখানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি খুব সহজে প্রবেশাধিকার পায় নাই। প্রাচীন স্মৃতিটুকু বজায় রাখার জন্য পাত্র ও কন্যা পক্ষের বিবাদের কিছু মহড়া চলে, তারপর বিয়ের আসরে পাত্রপক্ষ গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলে বলতে থাকে—'কালো মেয়ের সঙ্গে এই পাত্রের বিবাহ দেওয়া যাবে না।'

কন্যাপক্ষও সমধিক গণ্ডগোল তুলে চিৎকার করতে থাকে—'বুড়ো বরের সঙ্গে তারা মেয়ের বিয়ে দেবে না'—এইভাবে কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর সমস্ত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীগণ এক সঙ্গে চিৎকার করতে থাকে,—

"কালো কনে বুড়ো বর।
বিয়ে হল না চল ঘর॥"

পূজার বহিরঙ্গে পৌরাণিক আচার-আচরণের ছাপ থাকলেও দেবী পূজায় উগ্রক্ষত্রিয় ও বাগ্দী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দেখে মনে হয় ইনি ছিলেন মাজিগ্রামের লৌকিক দেবী। হরপ্পায় প্রাপ্ত একটি শীলমোহরে দেখা যায়, দেবীর গর্ভদেশ হ'তে একটি লতা নির্গত হচ্ছে। শীলমোহরের দৃশ্য ও চণ্ডীতে শাকম্ভরীর পূজা প্রচারের ক্ষেত্রে প্রাক্-আর্যযুগের মানুষেরা আহার্য বস্তুর জন্য এই দেবীর পূজা প্রচলন শুরু করে-ছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা মূর্তিটি পূজিত হলেও আনুষাঙ্গিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আর্য-অনার্য সংঘাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিবাহ উৎসব পণ্ড হ'লে শিব দেউলেশ্বর মন্দিরে ও দেবী বটব্যালদের গৃহে গমন করেন। গ্রামের শাকম্ভরী বিগ্রহ অধিষ্ঠিত থাকায় দুর্গাপূজার সময় মৃন্ময়ী মূর্তি গড়া হয় না। পূজা হয় নবপত্রিকায়, ঘটে ও যন্ত্রে। দেউলেশ্বর শিবের গাজন উৎসবটিও বহুকাল ধরে চলে আসছে। মাজিগ্রামে ভারতবর্ষের বিখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গণপতি পাঁজা ও ধনপতি পাঁজার জন্মস্থানরূপে প্রসিদ্ধ।

মাড়ো (৯ঃ বুদবুদ)ঃ মানকর রেলস্টেশন হতে দক্ষিণমুখী রাস্তায় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে গিয়ে পশ্চিম দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলে মাড়ো গ্রামে পৌঁছান যায়। অতীতে বিদ্যাচর্চার জন্য মাড়ো গ্রামের প্রসিদ্ধি ছিল। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। অ্যাডামস সাহেবের রিপোর্টে জানা যায় যে, তিনি সংস্কৃত ভাষায় ৩৫খানি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় ২ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর সুবিখ্যাত বাংলা গ্রন্থের নাম 'রামরসায়ন'। এই গ্রামের বিভিন্ন মন্দিরে গৌরবিগ্রহ, চণ্ডী ও খড়্গেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে। পৌষ-সংক্রান্তিতে সাত দিন ধরে খড়্গেশ্বরীর পূজায় অনুষ্ঠিত মেলায় জনসমাগম হয়।

মাড়ো গ্রামের প্রসিদ্ধির মূলে আছে গোস্বামী বংশের এক শাখার বসবাসের স্থান রূপে। নিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র গোপীজনবল্লভ নিত্যানন্দপুরে (থানা—ভাতাড়) বসবাস শুরু করেন এবং ঐ বংশের একটি শাখা এখনও তথায় বসবাস করছেন। গোপীজনবল্লভের পৌত্র কিছুকাল পুরীতে বসবাস করার পর বর্ধমান জেলার ইছাপুর গ্রামে (থানা—ফরিদপুর) বসবাসের নিমিত্ত আসেন। রামেশ্বরের পুত্র নৃসিংহদেব

ইছাপুর ত্যাগ করে মাড়ো গ্রামে বাস করেন। রঘুনন্দন গোস্বামী হলেন নিত্যানন্দ প্রভুর অধস্তন দশম পুরুষ। ১১৯৩ সালে বর্ধমান জেলাস্থিত মাড়ো গ্রামে রঘুনন্দনের জন্ম হয়। ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি এই 'রামরসায়ন' রচনা করেন। গ্রন্থকার আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে 'রামরসায়নে'র উত্তরকাণ্ডের শেষভাগে লিখেছেন ঃ—

"দেখিয়া কলির রীতি, শিখাইতে কৃষ্ণপ্রীতি,
কৃপাময় প্রভু বলরাম।
অবতার করি লোকে, নিস্তারিলা সব লোকে,
ধরি নিজে নিত্যানন্দ নাম।
বীরভদ্র তাঁর সুত, তার পুত্র গুণযুত,
গোপীজনবল্লভ বিদ্বান্।
তাঁর পুত্র গুণধাম, শ্রীরাম গোবিন্দ নাম,
তাঁর পুত্র বিশ্বম্ভরাখ্যান।
রামেশ্বর তাঁর সুত, নৃসিংহ তাহার পুত,
তাঁর পুত্র বলদেব নাম।
তিন পুত্র হল তাঁর, সর্ব্ব গুণ ভাণ্ডাগার,
জগৎ মাঝারে অনুপাম।
শ্রীলালমোহন আর, শ্রীবংশীমোহন তাঁর,
কনিষ্ঠ শ্রীকিশোরীমোহন।
শ্রীমধ্যম প্রভু তায়, কৃপা করি সোম রায়,
করয়াছেন মন্ত্র সমর্পণ॥
কনিষ্ঠ সৎগুণধাম, ভুবন বিখ্যাত নাম,
বেদ শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত।
অদ্বিতীয় ভাগবতে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-মতে,
করিলা যে গ্রন্থ সুবিদিত॥
সেই প্রভু মোর পিতা, ঊষা নাম মোর মাতা,
বিমাতা শ্রীমতী মধুমতী।
মোর জ্যেষ্ঠ তিন জন, বিশ্বরূপ সঙ্কর্ষণ,
শ্রীমধুসূদন মহামতি॥
চারি ভ্রাতা বৈমাত্রেয়, শ্রীরাম মোহন প্রিয়,
নারায়ণ গোবিন্দ আখ্যান।
সকলের কনীয়ান, বীরচন্দ্র অভিধান,
তিন ভগ্নী সদ্গুণ নিধান॥
সহোদর ভগ্নীপতি, দীপচন্দ্র মহামতি,
চট্টরাজ বংশ অগ্রগণ্য।

শ্রীরাম গোবিন্দ প্রাজ্ঞ, শ্রীদোলগোবিন্দ বিজ্ঞ,
বৈমাত্রেয় ভগ্নীপতি ধন্য ॥
পিতা রাশি অনুসারে, আর এক নাম মোরে,
ভাগবত বলিয়া অর্পিলা
কৃপাকণা প্রকাশিয়া নানা শাস্ত্র পড়াইয়া,
যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মাইলা।
বর্দ্ধমান সন্নিধান, গ্রাম 'মাড়ো' অভিধান,
তাহাতেই আমার নিবাস
সন্তোষিত বন্ধুজন, এই গ্রন্থ বিরচন,
করিলাম পাইয়া প্রয়াস।"

মানকর (৩৭ ঃ বুদবুদ) ঃ বর্ধমান হ'তে বাস অথবা রেলপথে মানকরে যাওয়া যায়। বর্ধমান জেলার সাংস্কৃতিক মানচিত্রে মানকর হ'ল একটি প্রসিদ্ধ স্থান। অতীতে গোপভুমের রাজধানী অমরারগড়ের সন্নিকটবর্তী মানকর গ্রাম বিদ্যাচর্চা ও ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। কনৌজ হ'তে আগত ব্রাহ্মণেরা এখানে বসবাসের পর হ'তে মানকরের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এখানকার টোলে ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের বহু সুপণ্ডিত অধ্যাপনা করতেন। মানকরের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বর্ধমান রাজবাড়ীর যোগসূত্র অত্যন্ত প্রবল ছিল। ভক্তলাল গোস্বামী, কীর্তিচন্দ্র ও তাঁর পুত্র চিত্রসেন রায়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন। এছাড়া মধুসূদন গোস্বামী, শ্যামসুন্দর গোস্বামী ও হিতলাল মিশ্র ছিলেন বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে মানকরের গৌরব। হিতলাল মিশ্রের গৃহে অসংখ্য পুঁথি সংগৃহীত ছিল। মানকর গ্রামনাম সম্পর্কে যে প্রবাদ আছে, তা হ'ল মানই যার কর তার নাম মানকর। মনে হয়, এই উক্তিটি ভক্তলাল গোস্বামীর উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'মধ্যযুগের বাঙ্গালা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক রঘুনাথ শিরোমণি কোটা-মানকর গ্রামে এক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতি শৈশবে পিতৃহীন হ'য়ে রঘুনাথ শিরোমণি বিদ্যাশিক্ষা জন্য নবদ্বীপের এক আত্মীয়ের নিকট চলে আসেন। মানকরে কয়েকটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে, তন্মধ্যে মানিকেশ্বর, মল্লিকেশ্বর ও বুড়ো শিবের মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির নিদর্শন। বাংলা ১১৩৫ সালে ভক্তলাল গোস্বামী রাধাবল্লভ জীউর নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তন্ত্রসাধনায় একসময়ে মানকরের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। অমরারগড় হ'তে মানকর প্রবেশের মুখে একটি এক বাংলা মন্দির দেখা যাবে। এই মন্দিরে প্রস্তরনির্মিত আনন্দময়ী কালী পাথরের শ্বেতপদ্মের উপর স্থাপিত আছেন। উক্ত মন্দিরের কাছে অপর একটি মন্দিরে হংসেশ্বর শিব বিরাজিত। আনন্দময়ী কালীর প্রাচীন মন্দির ধ্বংস হওয়ায় মহারাজ কুমার অভয়চাঁদ মহতাব (মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) নূতন মন্দির নির্মাণ করে দেন।

এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে আছে,—

"পাষাণময়ী কালীমাতার মন্দির মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত অভয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর কর্তৃক পুনর্নির্মাণ সন ১৩৪৮ সাল।"

উক্ত মন্দির প্রাঙ্গণে কোন সাধক ও সাধিকার সমাধি আছে।

গ্রামটি যেরূপ বৃহৎ তেমনি বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে রথযাত্রা, ভাদু পরব, লক্ষ্মী পূজা, দুর্গা পূজা, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, কার্তিক পূজা, অন্নপূর্ণা পূজা, সরস্বতী পূজা ও বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আছে। ভাদ্র মাসে ভাদু উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয় এবং পৌষ মাসে তুসু পরব উপলক্ষে মেয়েরা খড়ি নদীতে 'তসল্লা' ভাসিয়ে পুণ্য স্নান করে। তুসু পরব উপলক্ষে যে মেলাটি হয় তা 'খড়ির মেলা' নামে পরিচিত। একটি প্রাচীন ছড়া হ'তে মানকরের ৩টি বংশের সমৃদ্ধির কথা জানা যায়,—

"পাল, ভট্টাচার্য, খাঁ / তিন নিয়ে মানকর গাঁ।"

মানকরের তাঁতিরা একসময়ে তসরের চেলি প্রস্তুত করত। বাঙলা ও বাঙলার বাইরে এই চেলির খুব কদর ছিল। মানকরের অতীত সমৃদ্ধির সামান্য অংশ আজ টি'কে আছে।

মাথরুন (৯৩ ঃ মঙ্গলকোট) কৈচর গ্রামের দু' কিলোমিটার উত্তরে মাথরুনের অবস্থিতি। বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও দানবীর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পৈত্রিক বাসস্থান হ'ল মাথরুন গ্রামে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি পিতা নবীনচন্দ্রের নামে এখানে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার অস্তিত্ব আজও আছে।

মামগাছি ঃ পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত মামগাছি বা মাউগাছি যেতে হ'লে ভাণ্ডারটিকুরী স্টেশন হ'তে ১০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত এই স্থানটি "মোদদ্রুম" দ্বীপ নামে পরিচিত। এখানে বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট ও তাঁর সেবিত রাধামদন ও গোপালদেবের সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে। এই শ্রীপাটে একটি প্রাচীন বকুল বৃক্ষ আছে যা বিশ্রামতলা নামে পরিচিত। বাসুদেব দত্তের শ্রীপাটের অনতিদূরে শারঙ্গ মুরারি প্রভুর শ্রীপাটে 'রাধাগোপীনাথ" বিগ্রহের সেবা আছে। এছাড়া মালিনী দেবীর শ্রীপাটে নিতাই-গৌর, রাধাকৃষ্ণ, বলরাম, জগন্নাথ ও গোপাল সহ ৫টি শিলা সেবিত হচ্ছে। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী ও তাঁর পুত্র বৃন্দাবন দাস বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের আশ্রয়ে বসবাস করতেন। বৃন্দাবন দাস বাসুদেব দত্তের তত্ত্বাবধানে থেকে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। "প্রেমবিলাস" হতে জানা যায়,—

"পঞ্চম বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস।
মাতা সহ মামগাছি করিলা নিবাস॥
বাসুদেব দত্ত প্রভুর কৃপার ভাজন।
মাতা সহ বৃন্দাবনে করেন ভরণপোষণ॥"

মাহাতো (৩৩ ঃ ভাতাড়) ঃ গুসকরা রেলস্টেশন হ'তে ১২ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। অতীতে এখানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। গদাধর পণ্ডিতের শাখা ভুবানন্দের বংশে গোস্বামী উপাধিধারী বৈষ্ণব ভক্তগণ এই গ্রামে বসবাস করেন। শোনা যায়, তাঁরা কোন এক সময়ে অভিরামপুর গ্রাম হ'তে এখানে এসেছিলেন। গোস্বামীদের গৃহে গোবিন্দদেবের সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে। এছাড়া রাধাকৃষ্ণ, পঞ্চানন্দ ও মনসা দেবীর পূজা হয়। বৈশাখ মাসের ভদ্রকালীর পূজা ও মাঘ মাসে গোবিন্দদেবের বিশেষ পূজো উপলক্ষে মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মার্জাপুর (৬৬ ঃ বর্ধমান) ঃ বর্ধমান কুসুমগ্রাম বাস রাস্তায় দেওয়ানদিঘি পার হ'য়ে মীর্জাপুর গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের একটি দালান মন্দিরে 'জয়দুর্গা' দেবীর প্রস্তরময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে ও নিত্য পূজা হয়। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জয়দুর্গার বাৎসরিক পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় রথযাত্রার ১৫ দিন পর এবং এই পূজা উপলক্ষে বহুকাল ধরে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

মূলগ্রাম (২৫ ঃ মন্তেশ্বর) ঃ মন্তেশ্বরের সন্নিকটে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামের সঙ্গে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের বসবাসের সম্পর্ক ছিল সেকথা রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় উল্লেখ আছে। এই গ্রামে লক্ষ্মীনারায়ণের আটচালা মন্দিরটি প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন। মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি হ'তে জানা যায় যে, ১৬৯২ খ্রীস্টাব্দে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে শতাধিক বৎসর ধরে বৈশাখ মাসে ৪ দিন ব্যাপী মহোৎসব উপলক্ষে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

মুলটি (১২৭ ঃ কাটোয়া) ঃ কাটোয়া বা দাঁইহাট হ'তে বাসে ওকড়সা স্টপেজে নেমে এক কিলোমিটার এগিয়ে মুলটী কৃষ্ণনগর গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের একাংশ হ'ল মুলটী ও অপরাংশ সাগরপুর নামে পরিচিত। প্রতি বৎসর অম্বুবাচীতে একটি বৃক্ষতলে সাড়ম্বরে দেবীর পূজা হয় ও একটি মেলা বসে। অম্বুবাচী পূজায় হাঁস, মোরগ, ছাগ, মেষ ও শূকর বলিদান হয়। গ্রামে ২টি মসজিদের মধ্যে ১টি মীরে পাড়ায় ও অপরটি সাগরপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মেজডিহি ঃ দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের মধ্যে এই গ্রামটি অবস্থিত, যার বর্তমানে কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই। ইস্পাত কারখানা স্থাপনের ফলে মেজডিহির অধিবাসীদের গোপাল মাঠে পুনর্বাসন করা হয়েছে। মেজডিহি গ্রাম পত্তনের সঙ্গে নদীয়া জেলা হ'তে আগত নয়নসুখ মুখোপাধ্যায়ের নাম জড়িত। বিশিষ্ট প্রবীণ শ্রমিক নেতা লাবণ্য ঘটক এই বংশের সন্তান। নয়নসুখের পুত্র ফকিরচাঁদ বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামের অধিবাসী ও অদ্ভুত রামায়ণ গ্রন্থের রচয়িতা, কবি জগদ্রাম রায়ের প্রভাবে এখানে সর্বপ্রথম দুর্গাপুজো প্রচলন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, এখানে দুর্গাপূজায় প্রতিমা নির্মিত হয় না, পূজা হয় নবপত্রিকায়। জগৎগৌরী নামে মনসা দেবীর পূজা বহুকাল ধরে চলে আসছে।

মীর্জাপুর (৭৬ ঃ রায়না) ঃ সেহারাবাজার হ'তে মীর্জাপুর গ্রামে যাওয়া যায়। অনেকের মতে মীর আলি নামক এক মোগল সৈনাধ্যক্ষের নামানুসারে গ্রামনাম হয়েছে মীর্জাপুর। গড় মান্দারনের ২০ কিলোমিটার উত্তরে বাদশাহী সড়কের ধারে অবস্থিত এই গ্রামে মোগল আমলে একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি ছিল বলে শোনা যায়। এখানে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ লক্ষিত হয়। জনৈক পীরের উরস উৎসব উপলক্ষে বহুকাল ধরে একটি মেলা চলে আসছে।

মেড়তলা (৩০ ঃ পূর্বস্থলী) ঃ নবদ্বীপ হতে কাটোয়া যাবার পথে পূর্বস্থলীর পরে মেড়তলা হল্ট স্টেশনে নেমে উত্তরমুখে হাঁটা-পথ ধরে ভাগীরথীর তীরে মেড়তলা গ্রামে পেঁছান যায়। গ্রামটি প্রাচীন হলেও এই গ্রামের প্রসিদ্ধি শুরু হয় রাজশাহী জেলার গুড়নই নিবাসী রাজারাম ঠাকুরের আগমনের ফলে। রাজারাম কোন সিদ্ধ সাধকের নিকট সাধন মার্গের গূঢ় রহস্য অবগত হন এবং তাঁর নিকট হতে 'গোপাল' ও 'যাদুয়া' মূর্তি লাভ করে মেড়তলায় প্রতিষ্ঠা করেন। রাজারামের বংশধরগণ মেড়-তলার ভট্টাচার্য বংশ নামে প্রসিদ্ধ। এই বংশের রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার বর্ধমানের রাজার নিকট হতে মেড়তলা গ্রামের জমিদারী ও ঝাউডাঙ্গা হতে মাথাপুর পর্যন্ত জলকরের বন্দোবস্ত লাভ করেন। জলকর বন্দোবস্তের জন্য তাঁরা 'জলকর ঠাকুর' নামে খ্যাত ছিলেন। কালীশঙ্করের সময়ে (রাজা চিত্রসেনের সমসাময়িক) যাদুয়ার মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং কালীপূজার সময়ে মহাসমারোহে পূজা ও ছাগ, মেষ, মহিষ ইত্যাদি বলি হত, যা আজও চলে আসছে।

গ্রামস্থ একটি সুউচ্চ ঢিবি হতে যে শিবলিঙ্গটি আবিষ্কৃত হয়েছিল সেটি বুড়োশিব নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রামের রায়চৌধুরী পরিবার শিবের মন্দির নির্মাণ করেন। দুরারোগ্য ব্যাধি হতে মুক্তিলাভের আশায় শিবের নিকট 'ধন্না' দিতে বহু লোক মেড়তলায় আসে। চৈত্র মাসের গাজন উৎসব উপলক্ষে এখানে একটি বিরাট মেলা বসে। গাজনের প্রধান অঙ্গ হল কাঁটাভাংগা ও ফুলখেলা পর্ব। চৈত্রসংক্রান্তির ৪ দিন পূর্বে সন্ন্যাসীরা গংগাস্নান করে বৈঁচী, কুল, কণ্টিকারি প্রভৃতি কাঁটাগাছ সংগ্রহ করে গংগার জলে ডুবিয়ে রাখে এবং পুনরায় ভোর রাত্রে গংগাস্নান করে কাঁটাগাছগুলি বক্ষে ধারণ পূর্বক মাটিতে গড়াতে গড়াতে বুড়োশিবের মন্দিরে উপস্থিত হয়। ঐ দিন অধিক রাত্রে প্রচুর কাঠ জড়ো করে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং ভক্তরা গংগাস্নানান্তে জলন্ত অংগার হাতে নিয়ে লোফালুফি খেলা করে দর্শকদের স্তম্ভিত করে। এই অনুষ্ঠানটির নাম ফুলখেলা। এই দিন আতস বাজী পোড়ানো ও ফুলখেলা হল এখানকার গাজনের বৈশিষ্ট্য। বুড়োশিব অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা। তাই বহু লোক দুরারোগ্য ব্যাধি হতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য মানত করেন।

মেড়তলায় একসময়ে বহু কবি ও গায়কের আবির্ভাব হয়েছিল। ভট্টাচার্য পরিবারের দৌহিত্র বংশে জন্মেছিলেন পাহাড়ী সান্যাল, যিনি বাংলা সিনেমাজগতে

প্রবাদ-পুরুষ ছিলেন। এখানকার তন্তুবায় ও সূত্রধর গোষ্ঠীর প্রসিদ্ধি ছিল নিজ নিজ গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পকর্মের জন্য।

মেদগাছি (৩৪ ঃ কালনা) ঃ সমুদ্রগড় অথবা ধাত্রীগ্রাম রেলস্টেশন হ'তে বাসে মেদগাছি গ্রামে পেঁছান যায়। বৈষ্ণব-তীর্থ পরিক্রমায় মেদগাছির উল্লেখ আছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ধর্মরাজের জাত উৎসব উপলক্ষে ৩০০ বছর ধরে মেলা অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে। সন্নিকটবর্তী মানিকহার গ্রামে মোদক পরিবারে আরাধিত ধর্মরাজের শিলামূর্তি একটি মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মেলাটি মেদগাছি-মানিকহারের মেলা নামে পরিচিত।

মেমারি (১৫২ ঃ মেমারি) ঃ বর্ধমান জেলার যে কোন স্থান হ'তে মেমারি থানার সদর কার্যালয় মেমারিতে পেঁছান যায়। গ্রামাঞ্চলের মধ্যে মেমারি স্থানটি নোটিফায়েড এরিয়াভুক্ত শহরে পরিণত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য মেমারির গঞ্জের প্রসিদ্ধি আছে। মেমারি নামকরণ নিয়ে কয়েকটি মত প্রচলিত আছে। অত্র স্থানের দত্ত পরিবারের লোকেরা মনে করেন যে, বহু উচ্চ বাড়ী (মেঘযুক্ত মারি) নির্মিত হয়েছিল বলে স্থানের নাম হয়েছিল মেমারি। আবার রেভিনিউ সার্ভের মানচিত্রে নলহি পরগণার অন্তর্গত লাট মহবতপুর মৌজার নাম হ'তে মহবতপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মামুড়ি বৃক্ষের উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ বৃক্ষনাম হ'তে গাঙ্গুর নদীর তীরে মেমারি গ্রামের পত্তন হয়েছিল। অতীতে মেমারি থানার সদর কার্যালয় ছিল সাতগাছিয়া গ্রামে এবং সেসময়ে মেমারিতে একটি পুলিশ চৌকি ছিল। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে থানা কার্যালয় মেমারিতে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে থানার গৃহ নির্মিত হয়েছিল। এখানে প্রাচীন পুরাকীর্তির নিদর্শন না পাওয়া গেলেও সোমেশ্বরতলায় আটচালা শিবমন্দিরে সোমেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং ঐ মন্দিরের সম্মুখভাগে কষ্টি-পাথরের একটি নন্দী বৃষ স্থাপিত আছে। সোমেশ্বর শিবমন্দিরের উত্তরে একটি মন্দিরে সিংহবাহিনী দেবীর নিত্যপূজো হয় এবং জগদ্ধাত্রী পুজোয় বিশেষ পুজো ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সিংহবাহিনীর দালান মন্দিরটি ১৩২২ সালের ২রা অগ্রহায়ণ নির্মিত হয়েছিল। শীতলা মন্দিরটির স্থাপনকাল হ'ল ১৩২৫ সাল এবং মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শীতলা দেবীর বাৎসরিক পুজো অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মালগুদাম পাড়ায় আষাঢ় মাসে মনসা দেবীর ঝাঁপান উৎসব হয়। সর্পছত্র শোভিত, প্রস্তরনির্মিত দেবী মূর্তিটি অত্যন্ত সুন্দর। দত্ত পাড়ায় একটি দালান মন্দিরে শ্রীধর বিগ্রহ নিত্য সেবাপুজো পাচ্ছেন। আটপুকুর পাড়ায় গৌরাঙ্গ মন্দিরে প্রতি পূর্ণিমায় বিশেষ পুজো ও ভোগ আরতির ব্যবস্থা আছে। তালপাতা পাড়ায় মল্লিক পরিবারের মসজিদটি বেশ পুরাতন।

মোগলমারী (৫৯ ঃ রায়না) ঃ বর্ধমান হ'তে আরামবাগের পথে সরাসরি বাস-যোগে মোগলমারী গ্রামে পেঁছান যায়। 'মারী' শব্দের অর্থ হ'ল পথ এবং প্রাচীন

বাদশাহী সড়কের ধারে এই স্থানের অবস্থিতি ছিল। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ খাঁয়ের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় মুনিম খাঁ ও রাজা টোডরমল এখানে শিবির স্থাপন করেছিলেন। ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্মমঙ্গলে' এই স্থানের উল্লেখ আছে।

মোবারকগঞ্জ (৮০ : কাঁকসা) : রাজবাঁধ স্টেশন হ'তে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে মোবারকগঞ্জে যাওয়া যায়। এখানে ৩টি শিলামূর্তিকে চণ্ডীর ধ্যানে পূজা করা হয়। প্রতি বৎসর দোলযাত্রা উপলক্ষে দামোদরের তীরে বহুকাল ধরে একটি মেলা চলে আসছে। জনশ্রুতি যে, এই গ্রামের পূর্ব নাম ছিল শুভরাজপুর। বাংলা ১২৩১ সালের বন্যায় গ্রামটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় এবং পরে নূতন গ্রাম পত্তনের সময় মোবারকগঞ্জ নামকরণ করা হয়েছিল।

মোস্থলী (৭৮ : কাটোয়া) : দাঁইহাট স্টেশন হ'তে ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে মোস্থলী বা মুস্থলী গ্রামের অবস্থিতি। এই গ্রামে চৈতন্যভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাসের শিষ্য সনাতন দাসের শ্রীপাট আছে এবং এই শ্রীপাটে তাঁর সমাজ আছে। গ্রামনাম সম্পর্কে জানা যায় যে, মুস্থুল শব্দের অর্থ ঘোল বা দধি—তাহলে সঙ্গত কারণে অনুমান করা যায় যে, অতীতে গোপ জাতির বসবাসের জন্য গ্রামনাম হয়েছে মোস্থলী।

মৌখিরা (১ : আউসগ্রাম) : পানাগড় হ'তে ইলামবাজারের পথে অজয় নদের দক্ষিণ তীরে নেমে পূর্বমুখে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে মৌখিরা গ্রামে পৌঁছান যায়। মৌখিরার বিশেষ প্রসিদ্ধি শুরু হয়েছিল সদ্গোপ জমিদার পরমানন্দ রায়ের আমলে। গ্রামের সমস্ত মন্দির সদ্গোপ জমিদারেরা নির্মাণ করেছিলেন। এত অধিক সংখ্যক মন্দির কোন একটি বিশেষ গ্রামে বিরল। এখানে সর্বসাকুল্যে ২০টির অধিক মন্দির আছে। তম্মধ্যে এখনও ১২টি মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। অধিকাংশ মন্দিরই টেরাকোটা অলঙ্করণে সুসজ্জিত। একই স্থানে ৪টি রেখদেউল রয়েছে। জমিদার পরমানন্দ রায় ১৭৬১ শকাব্দে প্রাসাদতুল্য বিশাল দুর্গামণ্ডপ নির্মাণ করে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা প্রচলন করেন। দুর্গামণ্ডপের সংলগ্ন জোড়া শিবমন্দিরের টেরাকোটা অলঙ্করণ শিল্প-রসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। পরমানন্দের পুত্র কৈলাস রায় সুবিশাল জলাশয়, চাঁদনি ও তার পাশে প্রাসাদতুল্য রাধাবল্লভজীউর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু পারিবারিক কলহের জন্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। রাধাবল্লভের মূর্তিটি কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়কে দান করা হয় এবং ধবণী গ্রামে আজও রাধাবল্লভজীর সেবাপূজা চলে আসছে।

যাগেশ্বরডিহি (১১১ : মঙ্গলকোট) : বর্ধমান কাটোয়া বাস-রাস্তায় যাগেশ্বর-ডিহি স্টপেজে নেমে বাঁদিকে তাকালে একটি হ্রদাকৃতি সুবৃহৎ পুষ্করিণী দেখা যাবে, যেটি বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদ রায় কর্তৃক খনিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পুষ্করিণী খননের জন্য 'কীর্তিচাঁদ রাজার গীতের' সঙ্গে যাগেশ্বর দীঘির নাম স্মরণীয় হ'য়ে আছে। "বর্ধমান রাজবংশানুচরিত নামক" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মুর্শিদাবাদ

যাওয়ার পথে অনুচরবৃন্দসহ কীর্তিচাঁদ এই স্থানে অবস্থানের সময় জল পিপাসায় কাতর হ'ন, তাই পরবর্তীকালে জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য এই সুবৃহৎ পুষ্করিণীটি খনন করান। গ্রামের মধ্যে যজ্ঞেশ্বর শিবের মন্দিরটি বহুকালের। গ্রামদেবতার নাম হ'তে গ্রামের নাম হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শিবরাত্রিতে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে এখানে একটি মেলা বসে।

যাজিগ্রাম (১৭ ঃ কাটোয়া) ঃ কাটোয়া শহর হ'তে দু' কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীনিবাস আচার্যের প্রতিষ্ঠিত শ্রীপাট যাজিগ্রামে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গদেশে এমন কোন বৈষ্ণব সাধক বা মহান্ত ছিলেন না যিনি সেখানে পদার্পণ করেননি। শ্রীনিবাস আচার্যের পৈত্রিক বাসস্থান ছিল নদীয়া জেলার চাকুন্দি গ্রামে। যাজিগ্রামে ছিল তাঁর মাতুলালয় ও পরবর্তীকালে শ্বশুরালয়। নরহরি সরকার ঠাকুরের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনবৃত্তান্ত শুনে শ্রীনিবাস তাঁকে দর্শনের জন্য শ্রীক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ; কিন্তু পথিমধ্যে মহাপ্রভুর তিরোভাবের কথা শুনে শ্রীখণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে নরহরি সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হ'য়ে যাজিগ্রামে বিবাহ করে বসবাস শুরু করেন। কিছুকাল এখানে বসবাসের পর তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবনে তাঁর সঙ্গে শ্যামানন্দ ও নরোত্তমের সখ্যতা জন্মে। প্রচুর গ্রন্থাদিসহ বৃন্দাবন হ'তে প্রত্যাবর্তনের পথে বিষ্ণুপুরের সন্নিকটে উক্ত গ্রন্থাদি চুরি যায়। গ্রন্থ চুরির সূত্র ধরে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং বীর হাম্বির শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বীর হাম্বির ও জাহ্নবা দেবী যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের নিকট এসেছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্যের সাধনস্থলের নিকট শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভুর দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া ঐ একই মন্দিরে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ ও কষ্টি-পাথরের গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং শোনা যায়, এই মন্দির ও 'জলঢালা' নামক পুষ্করিণীটি বীর হাম্বির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'জলঢালা' পুকুরের নামকরণ প্রসঙ্গে জানা যায়, মহোৎসবের সময় জাহ্নবা দেবী এই পুকুরে জল ঢেলেছিলেন। বীর হাম্বিরের মন্দির ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় ১৩২৪ বঙ্গাব্দে কাশিমবাজারের মহারাজা নূতন মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই মন্দিরের অবস্থাও জীর্ণ হ'য়ে এসেছে। মন্দিরের পাশে তমালতলায় ছিল শ্রীনিবাস আচার্যের ভজনস্থল। ভজন কুটিরের মধ্যে একটি পাথরের উপর শ্রীচৈতন্যদেবের চরণচিহ্ন ক্ষোদিত আছে। এর পাশে অবস্থিত বেদিটির নাম হ'ল 'মিলনস্থলী', যথায় গোবিন্দদাস কবিরাজের অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ আচার্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁর পুত্র গতিগোবিন্দ এই গ্রামে মদনগোপাল বিগ্রহ ও একটি শালগ্রাম শিলার সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। যাজিগ্রামে সিন্ধ-বকুল বৃক্ষের নীচে বীরভদ্র গোস্বামী ও নরোত্তম ঠাকুরের আসন ছিল। কার্তিক মাসের গোষ্ঠঅষ্টমী তিথিতে শ্রীনিবাস আচার্যের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে অন্ন -মহোৎসব ও নামকীর্তনাদি হ'য়ে থাকে। এই বৈষ্ণব শ্রীপাটে চৈত্র মাসে শিবের

গাজন উৎসবটিও লক্ষণীয় বস্তু।

রঘুনাথবাটি (সালানপুর) ঃ আসানসোল হ'তে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে এথোরা যাওয়ার পথে রঘুনাথবাটির অবস্থিতি। শোনা যায়, কাশীপুরের রাজারা গ্রামদেবতা রাধাশ্যামের মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। রাধাশ্যাম বিগ্রহ অত্র স্থানে রঘুনাথ নামে প্রসিদ্ধি এবং বিগ্রহের নামানুসারে গ্রামনাম হয়েছে রঘুনাথবাটি। রাধাশ্যাম বিগ্রহের নিত্যপূজা ব্যতীত বৎসরের কয়েকটি বিশেষ তিথিতে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাতলা পোড়া ইটের তৈরী মন্দিরটি মধ্যযুগের মন্দির ভাস্কর্যের একটি অন্যতম নিদর্শন।

রসুই (বিল্বেশ্বর রসুই ৭৫ ঃ কেতুগ্রাম) ঃ কাটোয়া শহর হ'তে সরাসরি কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত রসুই গ্রামে পৌঁছান যায়। গ্রামের শিবগড়ে নামক পুষ্করিণী হ'তে দেড় ফুট উচ্চ একটি শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং শিবলিঙ্গটিকে সাধারণ কোন পাথর মনে করে বাটনা বাটার কাজে ব্যবহার করা হ'লে বাটনার রঙ লাল হয়ে যায়। এ বৃত্তান্ত গ্রামস্থ জমিদারের কর্ণগোচর হ'লে তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করে শিবলিঙ্গটিকে প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে জমিদার বংশ লোপ পাওয়ায় গ্রামস্থ একজন নাপিত দেবসেবার ভার গ্রহণ করে। ১৬৭৩ শকাব্দ বা ১১৫৮ সালে দ্বিজ কাশীশ্বর রচিত রসুই গ্রামের জমিদার বংশের ইতিহাস আছে। চৈত্র মাসে মহাসমারোহে দনুজেশ্বর শিবের গাজন হয় এবং গাজনের প্রধান আকর্ষণ হল বোলান গান। বিগ্রহের সেবাপূজার জন্যে বর্ধমানের মহারাজা কিছু ভূসম্পত্তি দান করে-ছিলেন। রসুই-এর রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের গৃহে শ্রীপঞ্চমীতে যে সরস্বতী পূজা হয় তা নানুরের বাসুলী পূজার অনুরূপ। রসুই ব্যতীত সরস্বতী পূজায় কোথায়ও চণ্ডীপাঠ হয় না। গ্রাম সম্পর্কে চৈতন্যভাগবতের উক্তি হল,—

"রস ওই রসোই বলেন বারবার।
সেই হেতু রসোই নাম জগতে প্রচার।।"

এই গ্রাম সম্পর্কে কাশীশ্বর উল্লেখ করেছেন,—

"রসোই এর দনুজেশ্বর, বিল্লনাথ।
বিশ্ব পূজে ত্রিবিক্রম নারায়ণ সাথ।"

রাইগ্রাম (৯৩ ঃ মন্তেশ্বর) ঃ মন্তেশ্বর হতে পাকা-রাস্তা ধরে রাইগ্রামে পৌঁছান যায়। এই গ্রামটি অতি প্রাচীন। বহুকাল পূর্বে এই স্থানে বিষ্ণুর বরাহ অবতারের একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। রাইগ্রামে প্রস্তরনির্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে অনেকে অনুমান করেন যে, উক্ত মন্দিরটি বরাহদেবের জন্য নির্মিত হয়েছিল। এখানে গোরাচাঁদ পীরের মাজার আছে। উক্ত মাজারের সমাধিলিপি হ'তে এই তথ্য জানা যায়। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে গোরাচাঁদ পীরের উরস উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

রক্ষিতপুর (৪২ ঃ কাঁকসা) ঃ দুর্গাপুর হ'তে পাকা রাস্তা ধরে রক্ষিতপুর গ্রামে

পেঁছান যায়। মনে হয়, অতীতে আঢ়া গ্রামের সঙ্গে রক্ষিতপুরের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। গ্রামে একটি পুরাতন শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। বৈশাখ মাসে ধর্মরাজের গাজন উপলক্ষে একটি মেলা বসে। এছাড়া এখানে বার মাসে তের পার্বণ লেগে আছে।

রাজকুসুম (২২ঃ কাঁকসা)ঃ রাজবাঁধ স্টেশন হ'তে কাঁচা-রাস্তা ধরে রাজকুসুম গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামে জীর্ণ দশাগ্রস্ত তিনটি শিবমন্দির আছে। মনসা ও ধর্মরাজের পূজো সাড়ম্বরে পালিত হয়। প্রায় ২০০ বছর ধরে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ৭ দিন ব্যাপী মহোৎসবের মেলা চলে আসছে।

রাতুদ্বাপ (পূর্বস্থলী)ঃ 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে স্থানটি ঋতুদ্বীপ নামে উল্লিখিত। রাতুপুর বা রাহুতপুর ও বিদ্যানগর নিয়ে ঋতুদ্বীপের বিস্তৃতি। বৈষ্ণব গ্রন্থ অনুসারে ষড় ঋতু কর্তৃক অত্র স্থানে গৌর আরাধনা করা হ'য়ে থাকে বলে স্থানটি ঋতুদ্বীপ নামে আখ্যা পেয়েছে।

রাধাকৃষ্ণপুর (২৯ঃ কাটোয়া)ঃ দাঁইহাট স্টেশনের সন্নিকটে রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামের অবস্থিতি। এখানে খাদিম বিবি নামক জনৈক ধর্মপ্রাণ মহিলার সমাধি আছে, যা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই মান্য করেন। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে খাদিম বিবির তিরোধান উৎসব পালিত হয় সমাধি সংলগ্ন মাঠে এবং এই উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

রাণীগঞ্জ (২৪ঃ রাণীগঞ্জ)ঃ দামোদর নদের উত্তর তীরে অবস্থিত শিল্পাঞ্চলের মধ্যে একটি সমৃদ্ধশালী স্থান। রাণীগঞ্জ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার কয়লাখনি হ্তে উৎকৃষ্টমানের কয়লা উত্তোলন করা হয় এবং এই কারণেই রাণীগঞ্জে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। মাটির বাসনপত্র, টালির কারখানা, তেলকল ছাড়াও এখানে বহু ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। রাণীগঞ্জের কয়লা কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে পরিবহণের নিমিত্ত ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হাওড়া হতে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়েছিল। আসানসোল শহর পত্তনের পূর্বে রাণীগঞ্জ ছিল বর্ধমান জেলার পশ্চিম অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য মহকুমার সদর কার্যালয়। এই মহকুমার সদর কার্যালয়ের ফৌজদারী আদালত ছিল মঙ্গলপুরে এবং মুন্সেফ আদালত ছিল উখড়ায়। ঊনবিংশ শতকে খ্রীস্টান মিশনারিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ওয়েস্ট লিয়ন মেথডিস্ট মিশনের অধীনে অনাথ বালক-বালিকাদের আবাসস্থল ও তাদের জন্য একটি বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। রাণীগঞ্জের গীর্জাটিও ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে নির্মিত হয়েছিল। এখানে সত্যনারায়ণ মন্দিরে সত্যনারায়ণ বিগ্রহ ও সীতারাম মন্দিরে রাম, সীতা ও মহাবীর প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী পর্যটক ভিক্টর জ'কমো এখানে এসেছিলেন এবং এই শহর সম্পর্কে তিনি একটি সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

রাণীবন্দ (২৮ঃ কালনা)ঃ ধাত্রীগ্রাম রেলস্টেশন হ'তে পাকা-রাস্তা ধরে

রাণীবন্দ গ্রামে পেঁছান যায়। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে চণ্ডীর দেউল আছে। অতীতে জঙ্গলের মধ্যে জনৈক তান্ত্রিকসাধক পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপনপূর্বক দেবীকে জাগ্রত করেন। প্রস্তরনির্মিত প্রাচীন দেবীমূর্তি অপহৃত হওয়ায় ক্ষুদ্রাকার একটি পিতল নির্মিত চতুর্ভুজা দেবীমূর্তিকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই দেবী আরখাই চণ্ডী নামে খ্যাত। শোনা যায়, দেবীর নিকট অতীতে নরবলি হ'ত। আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে দেবীর বিশেষ পুজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। অষ্টমীর দিন অনুষ্ঠিত হয় সয়লা পরব।

রামবাটী (১২১ : রায়না) : রায়নগর স্টেশনের (বি. ডি. আর.) অনতিদূরে রামবাটী গ্রামের অবস্থিতি। অনেকের মতে, এখানে রামসীতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হওয়ার জন্য গ্রামনাম হয়েছে রামবাটী। একটি আটচালা মন্দিরে দেবী সিদ্ধেশ্বরী এবং অপর একটি মন্দিরে রামচন্দ্রের প্রস্তর মূর্তি ও সীতাদেবীর পিতলের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর ১৬ই মাঘ সিদ্ধেশ্বরী কালিকার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

রায়রামচন্দ্রপুর (মৌজা রামচন্দ্রপুর ৮০ : ভাতাড়) : গুসকরা স্টেশনের ৪ কিলোমিটার পূর্বে রায়রামচন্দ্রপুর গ্রামের অবস্থিতি। এই গ্রামের একটি পুকুর পাড়ে দক্ষিণ দুয়ারী মন্দিরে কটারায়, ময়নারায়, মেঘরায় ও পোড়ারায় নামে ৪টি কুর্মাকৃতি ধর্মশিলা আছে। এই ধর্মশিলাগুলির পূজারী ব্রাহ্মণ হলেও তাঁদের দেয়াসী হলেন মুচিরা। বৈশাখী পূর্ণিমায় ৩ দিন ধরে গাজন উৎসব হয়, কিন্তু গাজনের পুজো শুরু হয় অক্ষয় তৃতীয়া থেকে। বিগ্রহের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে পৌষসংক্রান্তির দিন মুচিরা পুজো করে। কিম্বদন্তী এই যে, কয়েকটি মুচি পরিবারের ছেলে মাটি খুঁড়তে গিয়ে প্রবালের মত একটি শিলাখণ্ড পেয়েছিল এবং ছেলেরা ঐ মূল্যবান পাথরটির পরিবর্তে ময়রার দোকানে মিষ্টান্ন প্রার্থনা করে, কিন্তু দাঁড়িতে চাপানর পর দেখা গেল ঐ পাথরের ওজন ময়রার সমস্ত মিষ্টান্নের ওজন অপেক্ষা অধিক। ময়রা ভীত হয়ে গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিদের কাছে ঘটনাটি ব্যক্ত করেন। ঐ দিন ভোর রাত্রে অশ্বারূঢ় এক দেবমূর্তি সকলকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে বলেন যে, 'অভিনব বলিদানে তুষ্ট করে আমাকে প্রতিষ্ঠা কর'। এরপর রায়রামচন্দ্রপুরে অভিনব বলিদান প্রথা চালু হয়েছে।

একটি লম্বা খুঁটায় পর পর ৯টি ছাগ রেখে এক কোপে বলিদান কার্য করা হয়, অতঃপর এক কোপে ৫টি, ৩টি, ২টি ও ১টি এইভাবে বলিদান কার্য চলে। পূর্ব রাত্রে একটা বড় কাঠের ঘোড়ার পিঠে দু'জন ব্রাহ্মণ রূপার সিংহাসনে বিগ্রহ নিয়ে বসেন এবং গ্রামবাসীরা ঘোড়াটি টানতে টানতে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণের পর ভোর রাত্রে বিগ্রহকে মুক্তস্নান করিয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। পূর্ণিমার দিন সকাল থেকে শুরু হয় 'ভাঁড়ার' নাচ। মধ্যাহ্নের পর পূর্বকথিত প্রথায় বলিদান শুরু হয়। এই বলিদান দর্শনের জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রাম হতে হাজার হাজার লোক হাজির হয়।

পূজোর পরদিন নবখণ্ড অর্থাৎ ধর্মমঙ্গলের পশ্চিম উদয় পালা গান হয়। ১লা বৈশাখ গ্রামস্থ একটি বটবৃক্ষতলে মহাকাল ভৈরবের পূজোয় রক্তপান ও তাণ্ডব নৃত্য হ'ল উল্লেখযোগ্য উৎসবের অঙ্গ। মহানবমীর দিন ঐ স্থানেই ভদ্রকালী দেবীর পূজা হয়।

রায়না (১০৪ ঃ রায়না) ঃ বর্ধমান হ'তে বাসযোগে সরাসরি রায়না গ্রামে পেঁছান যায়। অতীতে রায়না থানার সদর কার্যালয় এই গ্রামে অবস্থিত ছিল ; কিন্তু বর্তমানে শ্যামসুন্দরে থানার কার্যালয় উঠে এসেছে। রায়না গ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে দলপত রায় ও গজপত রায়ের নাম জড়িয়ে কিম্বদন্তী প্রচলিত থাকলেও তাঁদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শোনা যায়, গ্রামের পাশে রায়খাত নামক দীঘিটি তাঁরা খনন করেছিলেন। এছাড়া ঘোড়ামারা দীঘি ও রায়নার গড় সম্ভবতঃ তাঁরাই নির্মাণ করেছিলেন। ডাকবাংলোর কাছে পুরন্দর খাঁ কর্তৃক পানা নামে একটি দীঘি প্রতিষ্ঠা করার কথা জানা যায়। স্থানীয় লোকের দাবী এই যে, থানা-ডাঙ্গার কাছে পুরাতন সমরশাহী পরগণার কার্যালয় ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শাকনাড়ায় প্রেমচন্দ্র ন্যায়রত্নের নিকট যাতায়াত করার সময় রায়নার মঙ্গলাচরণ ঘোষের আতিথ্য গ্রহণ করতেন এবং বিদ্যাসাগর এখানে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেছিলেন। রায়না গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয়টি বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বসুর (বেড়ুগ্রাম) প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে।

গ্রামটি অত্যন্ত প্রাচীন তার প্রমাণস্বরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরনির্মিত দেব-দেবীর মূর্তিগুলি দেখলে বোঝা যায়। দেবীমূর্তির একটি মুখমণ্ডল পূজিত হচ্ছে শীতল রায় নামক ধর্মঠাকুররূপে। হাটতলায় একটি দালান মন্দিরে সম্ভবতঃ বৈশ্রবণ মূর্তিটি ছিল কোন বৌদ্ধ দেবতার। পার্শ্ববর্তী রায়নগরের রুইদাস পাড়ায় একটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে। প্রতি বৎসর ১৫ই ফাল্গুন শ্মশানকালীর পূজো উপলক্ষে একদিনের জন্য মেলা বসে। গ্রামস্থ সোম পরিবার এসেছেন ক্ষীর-গ্রাম হতে এবং তাঁরা প্রতি বৎসর ২৯শে বৈশাখ যোগাদ্যা পূজো করেন। বৈশাখ মাসে ৩দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় অষ্টপ্রহর। গ্রামে ৪টি শিখর দেউলে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এছাড়া একটি আটচালা মন্দিরে শ্রীধর বিগ্রহ আছেন। এই মন্দিরটি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল এবং এর টেরাকোটা অলঙ্করণ অত্যন্ত উচ্চমানের।

রায়ান (৬৮ ঃ বর্ধমান) ঃ বর্ধমান হ'তে দু' কিলোমিটার দূরে বাসযোগে সরাসরি রায়ান গ্রামে পেঁছান যায়। এই গ্রামে শিবস্থান নামক পুকুরের পাড়ে দক্ষিণেশ্বর শিবের একটি প্রাচীন নবরত্ন মন্দির আছে। মন্দিরটি প্রায় ২৫০ বছরের প্রাচীন এবং সম্মুখভাগে টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত ছিল। দক্ষিণেশ্বর শিব অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা। গ্রামের অধিবাসীগণের বিশেষ বৈচিত্র্য হল এখানে গোয়ালা ও মুসলমান বসবাস করে না। চৈত্র মাসে মহাসমারোহে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

আষাঢ় নবমীতে বাস্তুদেবতা বসন্তচণ্ডীর শিলামূর্তি আছে এবং বাৎসরিক পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় ও একটি মেলা বসে। শিবরাত্রির মেলাটি ৬০।৭০ বৎসর পূর্বেই বন্ধ হয়ে গেছে। দক্ষিণেশ্বর শিবের ১০০ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও এই জীর্ণ মন্দিরটির সংস্কারের কোন ব্যবস্থা নেই। যাত্রাগানের বহু পালা-গ্রন্থের রচয়িতা ও ব্রজেন দে-র মানসশিষ্য ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর জন্ম হয়েছিল রায়ান গ্রামে। "জরাসন্ধ" নাটক রচনা করে বিংশ শতকে ত্রিশের দশকে, ইনি রাজরোষে পতিত হন এবং এই নাটকটি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গ্রামে তাঁর কোন স্মৃতিচিহ্ন নেই। "ময়ূরপংখী" গানের রচনাকার চারণকবি বিপিন বাইতি এখানে জন্মেছিলেন। সম্প্রতিকালে পশ্চিম পাড়ায় হিতলাল নন্দী কর্তৃক একটি ধর্মরাজের মন্দির নির্মিত হয়েছে।

রূপনারায়ণপুর : চিত্তরঞ্জনের সন্নিকটে অবস্থিত একটি শিল্পপ্রধান ও স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে হিন্দুস্থান কেবলস্ ফ্যাক্টরী স্থাপিত হওয়ায় পূর্ব ভারতের অর্থনীতিতে এই স্থানের যথেষ্ট গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কারখানার নাম অনুসারে শহরটি "হিন্দুস্থান কেবলস্ টাউনশিপ" নামে পরিচিত।

লাউদহ (২১ : ফরিদপুর) : ফরিদপুর থানার সদর কার্যালয় ফরিদপুর গ্রামটি দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে থানার সদর কার্যালয়টি লাউদহ গ্রামে স্থাপিত হয়েছে। পূর্বে মোট ৯২টি মৌজা এই থানার অধীনস্থ ছিল, এক্ষনে ৪২টি মৌজা দুর্গাপুর নোটিফায়েড অথরিটির অঞ্চলভুক্ত হওয়ায় একালের ফরিদপুর থানার মৌজা সংখ্যা হল ৫০টি।

লোয়া (৫৬ : গলসী) : বর্ধমান হ'তে সরাসরি বাসে লোয়া গ্রামে পৌঁছান যায়। এই গ্রামের একটি মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির ও রাসমঞ্চটি ঊনবিংশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। রাস উৎসব উপলক্ষে ৭ দিন ধরে অনুষ্ঠিত মেলায় প্রচুর জনসমাগম হয়। গ্রামের শিবমন্দির দু'টিও বেশ পুরাতন।

শঙ্করপুর (১৬৫ : মেমারি) : মেমারি মন্তেশ্বর বাস-রাস্তায় শঙ্করপুরের বটতলায় নেমে গ্রামে যাওয়া যায়। শঙ্করপুরে আষাঢ় মাসে শুক্লা দশমী তিথিতে দশহরা পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। এই গ্রামে অন্যান্য উৎসবগুলির মধ্যে চৈত্র মাসের শিবের গাজন উল্লেখযোগ্য। অতীতে চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণা পূজা হত, বর্তমানে এই পূজাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একটি পঞ্চমুণ্ডীর আসনের উপর রক্ষাকালী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের শনিবারে দেবীর বিশেষ পূজা হয়। অতি সম্প্রতিকালে এই স্থানে একটি দালান মন্দির নির্মিত হয়েছে। শঙ্করপুর গ্রামটি কলিকাতার বাগবাজারের চৌধুরী পরিবারের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল এবং এই গ্রামের রাজস্ব স্বত্ব রাধা-মদনমোহন দেবোত্তর এস্টেটে জমা পড়ত। উক্ত দেবোত্তরের আয় হ'তে ১০০ বছর পূর্বে দু'টি শিবমন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল যথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শক্তিগড় (১৫৫ : বর্ধমান) : বর্ধমান হ'তে ১০ কিলোমিটার দূরে শক্তিগড় রেলস্টেশনে নেমে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী রাস্তা ধরে গ্রামে যাওয়া যায়। শক্তিগড় গ্রামের প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু হল শক্তিগড়ের 'ল্যাংচা'। প্রসিদ্ধ গীতাভিনয়ের রচনাকার ধনকৃষ্ণ সেনের পৈত্রিক বাসভূমি ছিল শক্তিগড়ে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর পাশাপাশি দুটি মন্দির, একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী রয়েছে। এই মন্দির চত্বরটি বর্ধমানের রাজাদের তৈরী। বামভাগের একবাংলা মন্দিরে কালিকাদেবীর প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কালীমন্দিরের বিপরীত দিকে রয়েছে রাধাবল্লভের পঞ্চরত্ন মন্দির। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর একটি দালান মন্দিরে সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠিত আছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ মঙ্গলবারে দেবীর বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

মূল শক্তিগড় গ্রামটি ১৩৫০ সালের বন্যায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে দামোদরের পলি সরিয়ে নূতন করে গ্রাম পত্তন হয়। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ হলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের। পীরতলা পাড়ায় একটি দালান মসজিদ আছে। বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে এই গ্রাম যথেষ্ট অগ্রসর। এখানে একটি পাকা মণ্ডও আছে। গ্রামের প্রবেশপথের উপর 'হজরৎ বনো পীরের' আস্তানাটি ১৩৮০ সালে পুনর্নির্মিত হয়েছে।

শাকনাড়া (১১৭ : রায়না) : রায়না হ'তে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণে শাকনাড়া গ্রামের অবস্থিতি। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অলংকারশাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জননী কুড়নী দেবী একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সংসার নির্বাহের জন্য গ্রামে একটি টোল স্থাপন করেছিলেন এবং নিজেই অধ্যাপনা করতেন।

শাঁকাই (১২২ : কেতুগ্রাম) : অজয় নদের উত্তর তীরে অর্থাৎ কাটোয়ার বিপরীত দিকে শাঁকাই-এর অবস্থিতি। এই স্থানের নামোৎপত্তির সম্পর্ক প্রবাদ আছে যে, গঙ্গাদেবী কোন শাঁখারির নিকট শঙ্খ পরিধান করেছিলেন, আবার অনেকে মন্তব্য করেন যে, শাঁকাইচণ্ডী ও শঙ্খেশ্বর মহাদেবের অধিষ্ঠান ক্ষেত্ররূপে স্থানটি শাঁকাই-এ পরিণত হয়েছে। শাঁকাই গ্রামের পূর্বে ভাগীরথী নদী ও দক্ষিণে অজয় নদ প্রবাহিত। নদী প্রবাহের পার্শ্বে সুপ্রশস্ত উচ্চ ভূখণ্ডে এতদঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য ও রাজধানী মুর্শিদাবাদকে রক্ষাকল্পে অগ্রবর্তী ঘাঁটিরূপে মুর্শিদকুলি খাঁ এই স্থানে গড় বা দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জুন অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের ৬ দিন পূর্বে কর্ণেল ক্লাইভ এই দুর্গ অধিকার করে বিপুল খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার অধিকার করেন। প্রায় ১০ হাজার লোকের এক বছরের জন্য সঞ্চিত খাদ্য ইংরেজদের হস্তগত হয়। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধের সময় কর্ণেল কুটে দুর্গটি অধিকার করে ধ্বংস করেন এবং ১৪টি কামান নিয়ে কলিকাতায় ফিরে আসেন। ঊনবিংশ শতকে এডিস নামক এক নীলকর সাহেব এখানে নীলকুঠি স্থাপন করেন। কিছুকাল আগেও কুঠিপাড়ায় নীলকুঠির হৌস ও অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ দেখা যেত।

১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে অজয়ের বন্যায় দুর্গটির শেষ চিহ্নসমূহ বিনষ্ট হ'য়ে যায়। শোনা যায়, হোসেন শাহের কোন এক বিবির সমাধি ছিল এখানে, কিন্তু তার কোন পরিচয় মেলে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ পাঁচালীকার দাশু রায় প্রথম জীবনে এডিসের নীলকুঠিতে চাকুরী করতেন।

শাঁকারী (৭০ ঃ খণ্ডঘোষ) ঃ খণ্ডঘোষ থানার উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত শাঁকারী একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ধর্মমঙ্গলের কবি নরসিংহ বসু তাঁর পৈত্রিক বাসস্থান বসুধা গ্রাম ত্যাগ করে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে কৃষ্ণপুরের সন্নিকটে শাঁকারী গ্রামে বসবাস করেন। এই গ্রামে তিনটি প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে মজুমদার পরিবারের পঞ্চরত্ন বিশিষ্ট গোবিন্দ জীউর মন্দিরটি ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। সিংহবাহিনী মন্দিরের নির্মাণকাল হ'ল ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দ এবং দক্ষিণপাড়ার টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত শিবমন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল হ'ল ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দ। শাঁখারীর বাসুদেব মূর্তির ভাস্কর্য ও শিল্পনৈপুণ্য মূর্তিশিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মহেন্দ্রলাল দত্ত একসময়ে এই মূর্তিটি দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন।

শিখরভূম ঃ সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে সর্বপ্রথম শিখরভূমের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামচরিতের টীকায় শিখরভূমের অধিপতি রুদ্রশিখর ও রাজধানী তৈলকম্পের উল্লেখ আছে। অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে—'Sikharbhum or Shergarh the mahall to which Raniganj belongs', প্রাচীন দ্বাদশভূমের মধ্যে শিখরভূমের প্রসিদ্ধি ছিল। শ্রীজীব গোস্বামীর লঘু বৈষ্ণবতোষণী গ্রন্থশেষে শিখরভূমের উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে শিখরভূমের বিস্তৃতি ছিল একালের আসানসোল মহকুমা ও পঞ্চকোট জনপদ নিয়ে। শিখরভূমের মধ্যে প্রসিদ্ধ দেবস্থান বরাকর ও কল্যাণেশ্বরী বিদ্যমান। শিখরভূমের অধিপতি হরিনারায়ণ বরাকরের ১নং ও ২নং মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি গোকুল কবিরাজ ও মাধব সঙ্গীতের রচয়িতা পরশুরাম রায় শিখরভূমের অধিবাসী ছিলেন।

শ্যামডি (৬০ ঃ সালানপুর) ঃ সীতারামপুর স্টেশন হ'তে বাসযোগে শামডি পেঁছান যায়। অতঃপর পায়ে হেঁটে মুড়াইচণ্ডী বা মুক্তাইচণ্ডী পাহাড়ে যাওয়া যাবে। মুড়াইচণ্ডী শব্দটি সম্ভবতঃ আদিতে মুড়া বা মুণ্ডা জাতির বাসস্থান বা তাদের কোন দেবীস্থান ছিল বলে মনে হয় এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে স্থাননামের রূপান্তর ঘটেছে। এখানে শিব, কালিকা ও শীতলা দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং মাঘী পূর্ণিমায় ৪ দিন ধরে উৎসব হয়। শ্যামডির সুউচ্চ শিখর দেউলটি বহু দূর থেকে দর্শনার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শিবলুন (৯৩ ঃ কেতুগ্রাম) ঃ কাটোয়ার পরবর্তী রেলস্টেশন শিবলুন হল্টে নেমে গ্রামে পেঁছান যায়। গ্রামটির প্রাচীনতা সম্পর্কে কোন প্রামাণিক তথ্য জানা যায় না। গ্রামের কয়েকটি শিবমন্দির রয়েছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে এগুলির প্রাচীনতা বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকলেও মন্দিরগুলির গঠনবৈচিত্র্য ও ইটের

ব্যবহার দেখে অনুমান করা যায় যে, মন্দিরগুলি মোটামুটিভাবে ২০০ বছরের প্রাচীন। গ্রামে পূজা ও উৎসবগুলির মধ্যে আকর্ষণীয় হ'ল ভাদ্র সংক্রান্তিতে মনসা পূজা উপলক্ষে ঝাঁপান গান, কার্তিক মাসে জগদ্ধাত্রী পূজা ও চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব যা উত্তর রাঢ়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বৈশাখ মাসে রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন উৎসব উপলক্ষে নগর সঙ্কীর্তন হয়।

শিলামপুর (৯০ ঃ কাঁকসা) ঃ পানাগড়ের অনতিদূরে শিলামপুরের অবস্থিতি। চাকলা বর্ধমানের অন্তর্গত শিলামপুর পরগণার সদর কার্যালয়রূপে অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ হ'তে শিলামপুরের পরিচয় জানা যায়। এখানে বরাখাঁ ও তাঁর একান্ত সুহৃৎ জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণের পাশাপাশি সমাধি আছে। প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে দুই বন্ধুর তিরোধান উৎসব উপলক্ষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ উভয়ের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে আসেন। গাজন উৎসব উপলক্ষে বহুকাল ধরে শিবের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। অনেকের মতে, বরাখাঁ বা বঙ্গবারাখাঁ ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের আমলে কোটশিমুল দুর্গের অধিপতি।

শীতলগ্রাম (১১৫ ঃ মঙ্গলকোট) ঃ কৈচর স্টেশন বা বাস স্টপেজে নেমে উত্তর-পূর্ব মুখে অগ্রসর হ'লে নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট শীতলগ্রামে যাওয়া যায়। অনেকের মতে, এই গ্রামের পূর্বনাম ছিল সিন্ধল গ্রাম, কিন্তু এ সম্পর্কে কোন প্রাচীন প্রমাণ মেলে না। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে চট্টগ্রামবাসী ধনঞ্জয় পণ্ডিত প্রেমধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছিলেন এবং একটি শ্রীপাট স্থাপন করেন। ধনঞ্জয় পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যদেবকে সর্বস্ব দান করে কেবলমাত্র জলপানের ভাণ্ডটি রেখেছিলেন। দেবকীনন্দনকৃত 'বৈষ্ণব বন্দনায়' আছে,—

'বিলাসী বৈরাগী বন্দো পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥'

আবার 'পাটনির্ণয়' গ্রন্থ হ'তে জানা যায়,—

সাঁচড়া, পাঁচড়া, করন্দা, শীতলগ্রাম।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সেবা অনেক বিধান॥

শীতলগ্রাম ব্যতীত তিনি সাঁচড়া, পাঁচড়া ও করন্দা গ্রামে শ্রীপাট স্থাপন করেছিলেন। শীতলগ্রামে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি আছে। প্রতি বৎসর ১৪ই মাঘ তাঁর তিরোধান তিথিতে বিশেষ উৎসব, মেলা ও অন্নমহোৎসব হয়। গ্রামের মধ্যস্থলে গ্রামদেবী সিদ্ধেশ্বরী প্রতিষ্ঠিতা আছেন ও তাঁর নিত্য সেবাপূজা হয়।

শুশুনি (২৪ ঃ মন্তেশ্বর) ঃ মন্তেশ্বর থেকে মালডাঙায় নেমে দু' কিলোমিটার দক্ষিণে এগিয়ে গেলে শুশুনি গ্রামে যাওয়া যায়। দেবী তারা বা তারাক্ষ্যামার অধিষ্ঠানের জন্য গ্রামটি তারাক্ষ্যাতলা বা অপভ্রংশে তারিক্ষ্যেতলা নামে পরিচিত। তারাক্ষ্যা অত্যন্ত জাগ্রত দেবী এবং দেবীর স্নানজল চক্ষুতে লেপন করলে সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের নিরাময় হয় বলে লোকবিশ্বাস আছে। চক্ষুরোগের নিরাময়ের জন্য

আর্ত মানুষেরা দলে দলে নৈবেদ্যের ডালি সাজিয়ে দেবীর নিকট উপস্থিত হয়। কষ্টিপাথরে ক্ষোদিত ত্রিনয়নী ও চতুর্ভুজা দেবী মূর্তিটি মহাপদ্মের পাপড়ির উপর উপবিষ্টা। দক্ষিণ চরণ ঈষৎ মুড়ে সিংহপৃষ্ঠের উপর ন্যস্ত এবং বাম চরণটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর রক্ষিত আছে। দেবী বাম ভাগে উর্ধ্ববাহু দ্বারা মহাদেবকে বেষ্টন করে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন পূর্বক স্তন পান করাচ্ছেন এবং নিম্নের হস্তটি ঈষৎ উর্ধ্বে উত্থিত। দক্ষিণ ভাগের উর্ধ্ব বাহুটি নিম্নে প্রসারিত এবং নিম্ন বাহুতে গদা ধারণপূর্বক ঈষৎ উর্ধ্বে উত্থিত আছে। দেবীর কটিদেশ রক্তবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হলেও উর্ধ্বাংশ উম্মুক্ত। তাঁর দুই পার্শ্বে জয়া ও বিজয়ার দণ্ডায়মান মূর্তি দেখা যায়। পিছনের চালচিত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্তি ক্ষোদিত আছে। সমগ্র মূর্তিটি প্রায় ৭ ফুট উচ্চ। অনেকে এই সুন্দর দেবী মূর্তিটিকে পাল যুগের শিল্পকলার নিদর্শন বলে অনুমান করেন। গ্রামস্থ একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় এই মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

জনশ্রুতি আছে যে, কালাপাহাড়ের ভয়ে মূর্তিটিকে জলে ডুবিয়ে রাখা হয় এবং কালক্রমে দেবীর কাহিনী ও সেবাপূজার কথা লোকশ্রুতির অন্তরালে চলে যায়। নিত্যপূজা ব্যতীত জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা চতুর্দশী (চম্পক চতুর্দশী) তিথিতে বাৎসরিক মহাপূজা উপলক্ষে মেলা ও উৎসব পালিত হয়। মহাপূজার দিন দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা ও বলিদান হয়, কিন্তু শূদ্র ও মহিলারা এই মূর্তি স্পর্শ করতে পারে না। তারাক্ষ্যা মন্দিরের মধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্টা চতুর্ভুজা ও ত্রিনয়নী অপর একটি প্রস্তরনির্মিত দেবীমূর্তি বিরাজিত আছে। দেবীর দুই পার্শ্বে দুটি হস্তী শুঁড় দিয়ে তাঁকে জল সিঞ্চন করছে। এই কমলেকামিনী মূর্তিটি গজলক্ষ্মী নামে পূজিত হয়। শুশুনি গ্রামে টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত একটি শিবমন্দির আছে। বর্ধমানের রাজারা দেবীর সেবাপূজার জন্য ভূসম্পত্তির বন্দোবস্ত করলেও একালে দেবসেবার পরিবর্তে ঐগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

শুঁড়েকালনা (৪৩ ঃ জামালপুর) ঃ জামালপুর থানার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত শুঁড়েকালনা গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। এই গ্রামে মদনগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। ভাদ্র মাসে মদনগোপালের 'নৌকাবিলাস' উৎসব উপলক্ষে বহুকাল ধরে 'নৌকাবিলাস' মেলাটি চলে আসছে। মদনগোপালজীউর মন্দিরে মদনগোপাল, রাধিকা ও ললিতা সখীর দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামের মধ্যে মদনগোপাল জীউর মন্দির ব্যতীত, রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ ও কয়েকটি শিবমন্দির আছে। শুঁড়েকালনার পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত দামোদরের একটি মজা খাতকে 'মদনগোপালের দহ' বলে উল্লেখ করা হয়। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ঐ দহে কালনাগিণীর আবাসস্থল ছিল বলে গ্রামটি কালনা নামে পরিচিতি লাভ করেছিল, কিন্তু কালনা নামক অপর একটি প্রসিদ্ধ স্থান এই জেলায় অবস্থিত হওয়ায় সম্ভবতঃ আলোচ্য গ্রামটি শুঁড়েকালনাতে রূপান্তরিত হয়েছে।

শূরনগর ঃ মন্তেশ্বর থানার সুউরা গ্রামটিকে অনেকে আদিশূরের রাজধানী শূর নগররূপে সনাক্ত করতে চেয়েছেন। সুউরা গ্রামে আদিশূরের রাজপ্রাসাদের ভিত্তিচিহ্ন, প্রাসাদের মধ্যে কয়েকটি কূপ ও একটি হনুমান বিগ্রহের ভগ্নাংশকে আদিশূরের কীর্তি বলে দাবী করা হয়। গ্রাম হ'তে কিছুটা দূরে অবস্থিত একটি ধ্বংসস্তূপকে আদিশূরের কীর্তি বলে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু প্রাচীন প্রমাণের অভাবে এই সকল ইতিকথাকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণপুর (৩৬ ঃ জামালপুর) ঃ সেলিমাবাদের নিকট দামোদর পার হয়ে ৪ কিলোমিটার হাঁটাপথে দক্ষিণমুখে এগিয়ে গেলে শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে পেঁছান যায়। এখানে প্রস্তরনির্মিত রাধারমণ ও পিতলের শ্রীরাধিকার মূর্তি একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামের ঝাঁপানতলায় শ্রাবণ মাসে মনসাদেবীর পূজা হয় এবং ফাল্গুন মাসে রাধারমণের পঞ্চমদোল উপলক্ষে একটি মেলা হয়।

শ্রীখণ্ড ঃ বিশেষ বিবরণ ১৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীধরপুর (১০৪ ঃ মেমারি ঃ) মেমারি হ'তে বাসে কমলপুর স্টপেজে নেমে পূর্বমুখে ৩ কিলোমিটার হাঁটাপথে শ্রীধরপুর গ্রামে পেঁছান যায়। শ্রীধরপুরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, একটি গ্রামের মধ্যে ৪০টি ধর্মশিলা পূজিত হয়, তম্মধ্যে ২টি কূর্মমূর্তি। ধর্মরাজের পুরাতন মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। সরকার পরিবারের আটচালা শিবমন্দির ও মুখোপাধ্যায় পরিবারের জোড়া শিবমন্দির গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির নিদর্শন।

শ্রীপুর (৩৫ ঃ কেতুগ্রাম) ঃ কাটোয়া-আমদপুর রেলপথে রামজীবনপুর স্টেশনে নেমে দু' কিলোমিটার উত্তরে এগিয়ে গেলে শ্রীপুর গ্রামে যাওয়া যায়। কিম্বদন্তী আছে যে, ৪০০-৫০০ বছর পূর্বে শ্রীপুর একটি সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল গ্রাম ছিল। গ্রামের সন্নিকটে বাননাগরার মাঠে বান নামে এক ভুস্বামীর নগর-পত্তন করেছিলেন। বাননাগরার জঙ্গলে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হওয়ায় অনুমান করা যায় যে, স্থানটি বেশ প্রাচীন। অনেকে মনে করেন, ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটি ভৈরব অথবা ধর্মরাজের মন্দির ছিল। উক্ত ধ্বংসস্তূপের সন্নিকটে রাণী ভবানী ২টি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, যার একটিতে শিব ও অপরটিতে কালিকাদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মরাজের পূজা। শিবের গাজন উপলক্ষে ২৭শে চৈত্র বোলান গান হয় এবং চৈত্রসংক্রান্তির দিন অনেকে সঙ সেজে নৃত্য করতে করতে গ্রাম পরিক্রমা করেন। গাজন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলাটি বহুকাল ধরে চলে আসছে।

শ্রীপুর (৩০ ঃ ভাতাড়) ঃ বলগনা হ'তে গুসকরার পথে বাসযোগে শ্রীপুর গ্রামে পেঁছান যায়। বাংলার ইতিহাসের বহু অনাবিষ্কৃত তথ্য আজও ইতিহাসের নিরিখে, যাচাই করা হয় নাই। আবার তথ্য আবিষ্কৃত হ'লেও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বা পুরাতত্ত্ববিদগণের কোন আগ্রহ দেখা যায় না। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে শ্রীপুরে বহু

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হলেও এগুলি কোন মর্যাদা প্রাপ্তি বা স্বীকৃতি লাভে বঞ্চিত ছিল। আবিষ্কৃত প্রত্নসামগ্রী ও কয়েকটি ভাস্কর্যের নিদর্শন হ'তে অনুমান করা যায় যে, অন্ততঃপক্ষে পাল আমলে এটি একটি সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায় কয়েকটি নিদর্শন রক্ষিত আছে।

শ্রীবাটী (১২৬ ঃ কাটোয়া) ঃ কাটোয়া হ'তে সিঙ্গির পথে বাসযোগে সরাসরি এই গ্রামে যাওয়া যায়। ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত এই গ্রামটি একসময়ে ঐতিহ্যপূর্ণ ছিল। শ্রী অর্থাৎ সম্পদ যেখানে—তাই লক্ষ্মীর আবাসস্থলরূপে গ্রামনাম হয়েছে শ্রীবাটী। শ্রীবাটীর প্রাচীন ইতিকথা হ'তে জানা যায় যে, গুজরাত হ'তে আগত একটি বণিক পরিবার কিছুকাল সপ্তগ্রামে অবস্থান করেন। সপ্তগ্রামের পতনের পর তাঁরা কাটোয়া থানার কৈথন গ্রামে অবস্থানরত সময়ে বর্গী হাঙ্গামার সময় স্থান ত্যাগ করেন। এই বংশের শোভারাম চন্দ শ্রীবাটী গ্রামে বাসগৃহ নির্মাণপূর্বক বসবাস শুরু করেন। অতীতে ভক্তি খাঁ রোডের সঙ্গে ইন্দ্রাণীসহ শ্রীবাটী সমুদ্রগড়ের যোগাযোগ ছিল।

শ্রীবাটীর চন্দ বংশীয়গণ ব্যবসাবাণিজ্য ও লেখাপড়ায় অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই গ্রামের খ্যাতির অন্যতম কারণ হ'ল, পাশাপাশি তিনটি টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত ভোলানাথ, চন্দ্রেশ্বর ও শঙ্কর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্যে। এছাড়া আরও ৩টি শিবমন্দির আছে যেগুলিতে বিগ্রহ নাই। একটি দোতলা দালান মন্দিরে রঘুনাথ শিলা প্রতিষ্ঠিত আছেন, যার নির্মাণকাল হল বাংলা ১১১২ সাল। রঘুনাথ বিগ্রহ হলেন চন্দবংশের গৃহদেবতা। চৈত্র মাসের চড়ক ও ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষে বিশেষ উৎসব হয় ও একটি মেলা বসে। পূর্বোক্ত তিনটি শিবমন্দিরের মধ্যস্থলের মন্দিরটি হল পঞ্চরত্ন এবং তার দুই পার্শ্বে ২টি রেখদেউল নির্মিত হয়েছে। মন্দিরগাত্রে প্রতিষ্ঠিত শিলালিপি হ'তে মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়কাল জানা যায়,—

শ্রীশ্রী ৺বিশ্বেশ্বর। শ্রীশ্রী৺ভোলানাথ। শ্রীশ্রী৺শঙ্কর স্মরণঃ।
শকাব্দ ১৭৫৮ শক সন ১২৪৬ সাল তারিখ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ।
৺চুড়ামণি চন্দ্র ৺রূপচন্দ্র চন্দ্র ৺লোহারাম চন্দ্র ৺কল্যাণচন্দ্র চন্দ্র
৺শোভারাম চন্দ্র ৺গোবিন্দহরি চন্দ্র ৺ভোলানাথ চন্দ্র পিতা। মাতা
শ্রীমত্যা দিবামহি দাস্যা প্রীতিরিতৌ ৺গুরুচরণ চন্দ্র তস্য পত্নী শ্রীমত্যা
অন্নপূর্ণা দাস্যা শ্রীমত্যা শশিমণি দাস্যা
শ্রীগুরু চরণে আশ শ্রীরামকানাই দাস
খোদাইকর শ্রীবদনচন্দ্র মিস্ত্রী সাকিম বনপাস।

শ্যামসুন্দর (৭২ ঃ রায়না) ঃ বর্ধমান হ'তে সরাসরি বাস যোগে এই গ্রামে যাওয়া যায়। ১২৮৬ সালে ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত একটি নিবন্ধে জানা যায় যে, এই গ্রামের পূর্বনাম ছিল 'আহার বেলমা'।

গ্রামের পশ্চিমে দেড় কিলোমিটার লম্বা একটি বিল বা জলাভূমি আছে, যা আহার নামে খ্যাত ছিল এবং গ্রামটিও আহার হ'তে 'আহার বেলমায়' রূপান্তরিত হয়। আহারের পশ্চিমভাগে পরিখা বেষ্টিত একটি রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ হ'তে অনুমান করা যায় যে, মধ্যযুগে কোন রাজপুরুষ আহারের খাতটি খনন করেন। প্রাচীন রাজবংশ লুপ্ত হওয়ার পর গ্রামটি আহারের পূর্বভাগে স্থানান্তরিত হয়। আহারের উত্তর সীমায় 'রাজমাতার দীঘি' নামক প্রায় ২০০ বিঘা আয়তনের একটি পুষ্করিণী আছে এবং দীঘির পূর্বপাড়ে একটি মসজিদও নির্মিত হয়েছিল। অতীতের বাদশাহী সড়কের নিকট অবস্থিত হওয়ায় এই স্থানের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল বলে মনে হয়।

আহার বেলমা গ্রামটি বর্তমানে শ্যামসুন্দরে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশালাক্ষ বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর বিগ্রহের নামে গ্রামের নাম আহার বেলমার পরিবর্তে শ্যামসুন্দর হয়েছে। বিশালাক্ষ বসু প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরের মন্দির চত্বরের মধ্যে কয়েকটি মন্দিরে শ্যামসুন্দর, জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা, সাবিত্রী-সত্যবান, রাম-সীতা, শীতলা, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, প্রস্তরনির্মিত দুর্গামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। টেরাকোটা অলঙ্করণের পরিবর্তে স্টাকো পদ্ধতিতে অলঙ্করণ সৃষ্টি করা হয়েছে। গ্রামের মধ্যে টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দির ও একটি দোলমঞ্চ আছে। প্রতি বৎসর ২১শে পৌষ গ্রামদেবী রক্ষাকালীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। রাস ও দোল উৎসবও দর্শনীয়। রথযাত্রা উপলক্ষে রথের মেলায় প্রচুর জনসমাগম হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, গ্রামের মধ্যে বহুকাল পূর্বে বিশালাক্ষ বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "শ্যামসুন্দর কলেজ" হ'ল এই গ্রামের গৌরবের নিদর্শন।

শ্যামারূপার গড় (মৌজা বিষ্ণুপুর ৪৪ ঃ কাঁকসা) ঃ দুর্গাপুর হতে মদনদীঘি যাওয়ার পর উত্তর-পূর্বমুখে হাঁটাপথে বা নিজস্ব যানে বিষ্ণুপুর গ্রামে যাওয়া যায়। বিষ্ণুপুর গ্রাম হতে দু' কিলোমিটার পূর্বে এবং গৌরাঙ্গপুর হতে ১'৫ কিলোমিটার দক্ষিণে শ্যামারূপার গড়ের অবস্থিতি। এতদঞ্চল পরিদর্শনের ইচ্ছা থাকলে ৩/৪ জন একত্রে যাওয়াই সুবিধাজনক।

বিষ্ণুপুর গ্রামের দক্ষিণে ঘন জঙ্গলের মধ্যে উঁচু ঢিবির উপর শ্যামারূপার গড়ের মধ্যে দেবী শ্যামারূপের মৃন্ময়ী মূর্তি আছে। কথিত আছে যে, দেবী শ্যামারূপা ছিলেন ইছাই ঘোষের আরাধ্যা কুলদেবী। শ্যামারূপা ও ইছাই ঘোষ সম্পর্কে বহু কিম্বদন্তী শোনা যায়। দেবীর আদি মূর্তি ছিল স্বর্ণ নির্মিত এবং পরবর্তীকালে ঐ মূর্তি অপহৃত হওয়ায় মৃন্ময়ী মূর্তিতেই দেবীর নিত্যপূজা হয়। বর্ধমানের রাজারা সেনপাহাড়ী পরগণা অধিকার করার পর শ্যামারূপার সেবাপূজার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থা করেন। বাংলা ১৩৬০ সালে প্রাচীন মন্দির ভেঙ্গে ফেলে নূতন দালান মন্দিরে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন-স্বরূপ নক্সাকাটা ইঁট আজও জঙ্গলের মধ্যে দেখা যায়। ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত কোটাল-

পুকুর, চৌকিগড়, লোহাটারপুরী, গড় গোপালপুর-এর অবস্থিতি এই জঙ্গলের মধ্যে ছিল এবং এই সকল স্থানে ইছাই ঘোষের সেনানিবাস ছিল বলে কথিত আছে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দেবীর বিশেষ পুজো উপলক্ষে সন্নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকেরা মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। মনস্কামনা পূর্ণের জন্য ভক্তেরা মন্দিরের পার্শ্ববর্তী গাছের ডালে ঢেলা বেঁধে দেয়। স্থানীয় লোকের নিকট শোনা যায় যে, মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণের পূর্বমুহূর্তে গভীর জঙ্গল থেকে এখনো ভীষণ শব্দে যেন কামান গর্জন করে উঠে এবং এই শব্দ শোনার পর স্থানীয় অঞ্চলের পুজোমণ্ডপে সন্ধিপুজোর বলি দেওয়ার প্রথা আছে।

সগড়ভাঙ্গা (দুর্গাপুর) ঃ দুর্গাপুর নোটিফায়েড এলাকার মধ্যে অবস্থিত সগড়ভাঙ্গা-গোপীনাথপুর একটি প্রাচীন পল্লী। বাঁকুড়া জেলার জগন্নাথপুর গ্রাম হ'তে গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় এখানে বসবাসের পর হ'তে স্থানটী গোপীনাথপুর নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, পূর্বে কাঠের গুঁড়ি কেটে গরুর গাড়ীর চাকা তৈরী করা হত। এই চাকাকে সগড়চাকা বলা হ'ত। এতদঞ্চলে জলার কাদায় কাঠের চাকা আটকে গিয়ে অনেক সময় ভেঙে যেত ; তাই জলাটিকে সগড়ভাঙ্গার জলা বলা হ'ত। কালক্রমে গ্রামটিও সগড়ভাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়। গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে এখানে আগমন করেন এবং তিনি এতদঞ্চলের জমিদারী লাভ করেছিলেন। তাঁর পুত্র দুর্গাচরণ ১৭১৫ শকাব্দে শিবের মন্দির নির্মাণ করে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া কালিকাদেবীর মন্দিরে প্রস্তরনির্মিত কালী মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা ও সেবাইত হলেন চট্টোপাধ্যায় পরিবার। একসময়ে দেবীকে কেন্দ্র করে একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

সমুদ্রগড় (১৮০ ঃ পূর্বস্থলী) ঃ সমুদ্রগড় স্টেশনের অনতিদূরে ভাগীরথীর তীরে গ্রামটি অবস্থিত। অতীতে গঙ্গার প্রবাহের বিশালতার জন্য সম্ভবতঃ স্থানটি সমুদ্রগড় নামে আখ্যা পেয়েছিল। যদিও অনেকে সমুদ্রগুপ্তের নামের সঙ্গে জড়িয়ে স্থান-নাম ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তথাপি এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। আবার সমুদ্রসেন নামক এক স্থানীয় জমিদারের কথা শোনা যায়। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে সমুদ্রগড়ের উল্লেখ আছে। সাতশইকা পরগণার জমিদার রঞ্জিত ভট্টাকুর নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণকে অর্থ সাহায্য করে বাকি খাজনার দায় হ'তে তাঁকে উদ্ধার করেন। কিন্তু নবাবের রোষে তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। এই জমিদার বংশে হিন্দু মুসলমান দুই ধারাই বর্তমান। রাজবাড়ীর বহির্ভাগে দালান মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণ, বুড়োশিব ও সিদ্ধেশ্বরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ও সেবাপুজোর ব্যবস্থা আছে। অনুরূপভাবে রাজবাড়ীর মধ্যে মহরম উৎসব পালিত হয়। আজও সমুদ্রগড়ে বুড়োমা নামে দশভুজা মৃন্ময়ী মূর্তি রাজবাড়ীর বাইরে দুর্গাদালানে পুজো করা হয়।

সমুদ্রগড়ের বিশেষ প্রসিদ্ধি হ'ল ন্যায়শাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক বুনো রামনাথের

বাসস্থান ও তাঁর চতুষ্পাঠীর জন্য। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত সমুদ্রগড়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল। এখানে শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ ও লছমনজীউর সেবা-পূজো বহুকাল ধরে চলে আসছে। নবাবী আমলে প্রধান সড়ক পথের উপর অবস্থিত হওয়ায় জলপথ ও স্থলপথে ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য সমুদ্রগড়ের গুরুত্ব ছিল। সমুদ্রগড়ের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির মধ্যে বিবিরহাটে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি ইছামৎ খাঁর জননী নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদ সংলগ্ন পুষ্করিণীটিও এই ধর্মশীলা রমণীর ব্যয়ে খনিত হয়েছিল। মুসলমান পাড়ায় একটি প্রাচীন মাদ্রাসা আছে। গ্রামের একটি প্রাচীন মন্দিরে বুড়োশিব অধিষ্ঠিত আছেন। আর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্য নির্মিত হয়েছে গৌড়ীয় মঠের মন্দির। সমুদ্রগড়ে রাজবাড়ীর সুযোগ্য সন্তান মুকুল খান-এর নিকট এখানকার প্রাচীন ঐতিহ্য ও জমিদার বংশের কথা জানা যায়। মুকুল খান-এর গৃহের সন্নিকটে তাঁতি পুকুরের পাড়ে একটি কাঁঠাল গাছ আছে। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ঐ গাছে একটিমাত্র কাঁঠাল ফলে এবং পরদিন ঐ কাঁঠালটি মুকুল খান কর্তৃক দেবী সিদ্ধেশ্বরীর পূজার জন্য প্রেরিত হয়। সমুদ্রগড়ের ১·৫ কিলোমিটার পূর্বে ভাগীরথীর প্রাচীন খাতের সন্নিকটে একটি নীলকুঠির অস্তিত্ব রয়েছে এবং এই নীলকুঠির বর্তমান মালিক পাঁচুগোপাল রায়চৌধুরী। নদীয়ারাজের দেওয়ান দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের দৌহিত্র বংশ এখনও এখানে বসবাস করছেন এবং এই বংশের নবম পুরুষ ভব রায়ের সাহায্য পেয়ে সমুদ্রগড় দর্শন ও তথ্য সংগ্রহের সুযোগ ঘটেছে। বিশ্বাস ও পালিত বংশ বহুকাল ধরে এখানে বসবাস করছেন।

সর (৯৫ ঃ আউসগ্রাম) ঃ গলসী হ'তে ৩ কিলোমিটার উত্তরে সর বা সরবৃন্দাবন গ্রামের অবস্থিতি। এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক সারঙ্গমুরারি প্রভুর শ্রীপাট আছে। সারঙ্গদেবের শিষ্য মুরারিমোহন এই শ্রীপাট স্থাপন করেছিলেন। সরগ্রামের গোস্বামীরা তাঁর বংশধর। এই গ্রামে সারঙ্গদেবের প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভ মূর্তি আজও সেবাপূজো পাচ্ছেন। প্রতি বৎসর কোজাগরী পূর্ণিমার দিন থেকে ১০ দিন ধরে সারঙ্গদেবের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে রাধাবল্লভ মন্দির প্রাঙ্গণে মহোৎসবের সময় দূর-দূরান্তর থেকে বৈষ্ণবগণ সমাগত হ'ন। এছাড়া এই মন্দির প্রাঙ্গণে স্নানযাত্রা উৎসব ও দোল উৎসব পালিত হয়। রাধাবল্লভের দালান মন্দিরটি খুব প্রাচীন বলে মনে হয়। উক্ত মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে গেছে। গ্রামে প্রবেশের মুখে এক বিরাট পুষ্করিণীর তীরে একজোড়া শিখরদেউল রয়েছে। অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর সন্নিকটে একজোড়া শিখরদেউল ও দুটি আট-চালা মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। সেন পরিবারের দুর্গামন্দিরটি প্রায় ধ্বংসের পথে ; আর নারায়ণ মন্দিরটি ইতিমধ্যেই ধ্বংস হয়ে গেছে। গ্রামের উত্তরভাগে ৬০ ফুট উচ্চ শিখরদেউলের মধ্যে গ্রামদেবতা সরেশ্বর নামে অধিষ্ঠিত আছেন।

সরেশ্বরনাথের মন্দির সন্নিকটে অষ্টকোণাকৃতি বিশিষ্ট পীড়াদেউলে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এছাড়া রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ৭টি মন্দিরের মধ্যে ৪টি রেখ-

দেউল ও ৩টি পীড়াদেউল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে শিবমন্দিরের চত্বরের মধ্যে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে বৈদ্যনাথ রায় তাঁর মাতার নামে একটি দুর্গামণ্ডপ নির্মাণ করেছিলেন। বহুকাল ধরে সরেশ্বরনাথের গাজন উৎসবটি চলে আসছে। মাঘ মাসে শাহা ফরিদ পীরের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে একটি মেলা হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার পরের মঙ্গলবারে জাঁকজমক সহকারে রক্ষাকালীর পূজা হয়। রক্ষাকালী পূজার বিচিত্র প্রথা হল এই যে, পূজার দিনের মধ্যেই মৃন্ময়ী দেবী মূর্তি নির্মাণ করে রাত্রে পূজা হয় এবং পরদিন ভোরে দেবীকে বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

সরডাঙ্গা (৬৫ ঃ পূর্বস্থলী) ঃ পূর্বস্থলী স্টেশনের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে, সরডাঙ্গা গ্রামের অবস্থিতি। এই গ্রামে 'ইউরিয়া ষ্টিবামাইসিন' নামক কালাজ্বরের ঔষধের আবিষ্কার কর্তা স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর পৈত্রিক বাসস্থান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, উপেন্দ্রনাথ ছিলেন কেশব ভারতীর ভ্রাতৃবংশের লোক।

সরপী (৩৪ ঃ ফরিদপুর) ঃ উখরার দু'কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সরপী গ্রামে দুর্গাপুর হ'তে সরাসরি পেঁছান যায়। অতীতে জঙ্গলমহলের মধ্যে এতদঞ্চলের জমিদার রায়চৌধুরীরা এখানে বসতি স্থাপন করেন। জমিদার অর্জুন রায়চৌধুরী নবাব সরফরাজ খানের নিকট জমিদারী বন্দোবস্ত নিয়ে সরফপুর গ্রামের পত্তন করেন, যা অপভ্রংশে সরফ হ'তে সরপীতে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্জুন রায়চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর গ্রামের পূর্বভাগে 'রামসায়র' নামে দীঘি খনন করেন এবং দীঘির পাড়ে ল্যাটেরাইট পাথরের দু'টি শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। রামেশ্বরের সপ্তম পুত্র কল্যাণচন্দ্র লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির নির্মাণ পূর্বক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির নিদর্শন হ'ল, রামেশ্বরের অপর এক পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক ১৬৭৭ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত গোপালজীউর নবরত্ন মন্দির। মন্দিরের সম্মুখভাগে উন্নতমানের টেরাকোটা অলঙ্করণ আছে।

সাতগাছিয়া (৮১ ঃ মেমারি) ঃ বর্ধমান শহর হ'তে ৫২ কিলোমিটার দূরে মেমারি-কালনা বাস-রাস্তার ধারে অবস্থিত সাতগাছিয়া একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বহুকাল পূর্বে বল্লুকা নদী এই গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হ'ত এবং বল্লুকা নদীর চড়ার উপর সম্ভবতঃ গ্রামটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সাতগাছিয়া গ্রামের পুরাকীর্তির অন্যতম নিদর্শন হ'ল ১৭৩২ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত দোলমঞ্চটি। এছাড়া সিংহবাহিনীর আটচালা মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। শিবের পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও বেশ প্রাচীন। অতীতে এই গ্রামের চতুষ্পাঠীতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি অধ্যাপনা করতেন এবং তাঁরা গ্রামে গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। এই গ্রামের সন্নিকটে কালনা যাবার পথে ১৭৫৩ শকাব্দে মহারাজা তেজচন্দ্র একটা শিবমন্দির ও স্নানভাবাটী নির্মাণ করেছিলেন।

সাতদেউলিয়া (মৌজা-আঝাপুর ২০ ঃ জামালপুর) ঃ মসাগ্রাম স্টেশন হ'তে

দু' কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে সাতদেউলিয়া গ্রামের অবস্থিতি। সাতদেউলিয়া গ্রামে খ্রীস্টীয় নবম শতকে যে শিখরদেউলটি নির্মিত হয়েছিল তার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের জন্য দূর-দূরান্তর হ'তে পণ্ডিত ও গবেষকরা এখানে উপস্থিত হ'ন। বাঁকুড়া জেলার বহুলারা ও বর্ধমান জেলার সাতদেউলিয়ার ইস্টক নির্মিত দুটি প্রাচীন শিখরদেউল ব্যতীত সমগ্র বঙ্গদেশে অপর কোন মন্দিরের নিদর্শন জানা যায় নাই। প্রাচীন বাঙলার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের স্মারক চিহ্নস্বরূপ শিখরদেউল দু'টি বিখ্যাত। ওড়িষার রেখদেউল রীতিতে বিন্যস্ত এই মন্দিরটি অলঙ্কৃত ইষ্টক নির্মিত ও পঞ্চ-রথাকৃতির মন্দিরের প্রবেশদ্বারে ক্রমবর্ধমান খিলানের ব্যবহার, অপূর্ব কারুকার্য এবং বহির্গাত্রে চৈত্য-গবাক্ষের মনোরম বিন্যাস উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি প্রায় ৮০ ফুট উচ্চ ও দেওয়াল প্রায় ৯ ফুট চওড়া।

নবম শতকে নির্মিত এই জৈন দেবালয়টি সম্ভবতঃ কোন তীর্থঙ্করের উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়েছিল। দেউলের উপরিভাগে একখণ্ড প্রস্তরের উপর ১৪১টি তীর্থঙ্করের মূর্তি ক্ষোদিত আছে, যার ঊর্ধ্বভাগে উপবিষ্ট আছেন বৃষভবাহনসহ স্বয়ং ঋষভ-নাথ। বর্তমানে ক্ষোদিত প্রস্তরখণ্ডটি বেহালার সরকারী মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। সাতদেউলিয়ায় একটি উৎসর্গ মন্দির সহ বহু জৈন মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল যার একটা অংশ বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত থাকলেও অধিকাংশের কোন সন্ধান জানা যায় না। শোনা যায়, অতীতে এই স্থানে ৭টি দেউল ছিল, সেকারণে স্থাননাম হয়েছিল সাতদেউলিয়া। বর্তমানে একটিমাত্র দেউল অবশিষ্ট আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, অত্র স্থানের বাসিন্দারা সকলেই মুসলমান, কিন্তু মন্দিরটির রক্ষনাবেক্ষণের ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতার সীমা নাই।

সাতসৈকা : মন্তেশ্বর থানার উত্তর-পূর্বাংশ ও পূর্বস্থলী থানার দক্ষিণাংশ নিয়ে সাতসৈকা পরগণা গঠিত হয়েছিল। 'আইন-ই-আকবরী'তে সরকার সুলেমানাবাদের অন্তর্গত সাতসৈকা পরগণার উল্লেখ আছে। এই পরগণার নামকরণের পশ্চাতে রয়েছে সম্ভবতঃ সূর্য উপাসক সপ্তশতী বা শাকদ্বীপি বা গ্রহবিপ্র নামক আচার্য ব্রাহ্মণগণের বসবাসের জন্য।

সাদিপুর (৭ ঃ জামালপুর) ঃ মসাগ্রাম রেলস্টেশন হ'তে বাসে ৪ কিলোমিটার দূরে বটতলামোড়ে নেমে সেখান হ'তে দামোদর নদের পূর্বতীরের বাঁধ বরাবর এক কিলোমিটার হেঁটে গেলে খেয়াঘাটে পেঁছান যায়। অতঃপর দেশী নৌকায় দামোদর পার হ'য়ে পশ্চিম তীরে অবস্থিত সাদিপুর গ্রামে যাওয়া যায়। সাদিপুরের প্রাচীন নাম ছিল অনন্তবাটি। বড়িশা হ'তে আগত মিত্র বংশীয় কায়স্থ নন্দরাম ও কৃষ্ণপ্রাণ নামক ভ্রাতৃদ্বয় এই গ্রামে আগমন করেন এবং তাঁদেরই আমলে এই গ্রামের প্রসিদ্ধি। প্রায় ৪০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত মদনমোহনের মন্দির, যা একালে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে গেছে। মন্দিরের উত্তরভাগে জমিদারের তিনতলা অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষও রয়েছে। প্রধান প্রবেশপথ অতিক্রম করে দ্বিতীয়

প্রবেশপথের উপর পঙ্খের কাজ করা সুন্দর একজোড়া ময়ূর রয়েছে। এর উপর ব্যবহৃত নীল রঙ ময়ূর দুটিকে আরও সুন্দর করেছে। প্রবেশপথ দুটি অতিক্রম করলে মূল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের নিকট যাওয়া যায়। মন্দির গাত্রের দেওয়ালের একাংশ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। ঐ দেওয়ালের কারুকার্য অতীব সুন্দর ছিল। সম্মুখভাগে ৪ জোড়া থাম ও ১০ ফুট দূরে আরও ৪ জোড়া থাম ছিল। মূল মন্দিরের আয়তন ছিল ৩৫ ফুট × ৩০ ফুট। মন্দিরের বহির্ভাগে আয়তাকার ৫ ফুট গভীর তিনটি চৌবাচ্চায় মদনমোহনের ৫২ ভোগের প্রসাদ ঢালা হত, তন্মধ্যে একটি বাদে অবশিষ্টগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। মূল মন্দিরের পূর্বভাগে ৫০ ফুট × ৩০ ফুট আয়তনের বিশাল নাটমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় যার উচ্চতা ছিল ১৫ ফুট। নাটমন্দিরের পোড়ামাটির তৈরী কয়েকটি ভেনটিলেটর-এর অস্তিত্ব রয়েছে। নাট-মন্দিরের পাশে ঘড়িঘরের উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে একটি ঘড়ি ছিল। ঘড়িটি বর্তমানে রাসমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মূল মন্দিরে বটকৃষ্ণ, মদনমোহন, নারায়ণশিলা ও শ্রীরাধিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরের অবস্থা জীর্ণ হওয়ায় বিগ্রহগুলি ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে রাসমঞ্চে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘড়িঘরের সম্মুখে ৬ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটি কূপের অস্তিত্ব আছে। রাসমঞ্চে গ্রথিত মদনমোহন মন্দিরে শিলালিপি হ'তে মন্দিরের নির্মাণকাল জানা যায়,—

"শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন সদা জয়তি।
শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৬৮৮॥
বস্বষ্ট রসচন্দ্রাব্দে শকে শ্রীমান্দার হাবঃ।
সার্দ্ধং শ্রীনন্দরামেন কৃষ্ণপ্রাণেন ব্রত কৃতং॥

তাহলে মন্দির নির্মাণের কাল পাওয়া যাচ্ছে,—

বসু = ৮ অস্ট = ৮ রস = ৬ চন্দ্র = ১

অঙ্কস্য বামাগতি ধরে ১৬৮৮ শকাব্দ বা ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে এই শ্রীমন্দির নির্মিত হয়েছিল। নন্দরাম ও কৃষ্ণপ্রাণ দুই সহোদরের নাম মন্দিরলিপিতে ক্ষোদিত আছে। কৃষ্ণ-প্রাণের কোন পুত্র সন্তান ছিল না এবং বর্তমান বংশধর নরেন্দ্রমোহন মিত্র নন্দরামের শাখা। বর্তমানে মদনমোহন মন্দিরের উত্তরাংশে এক বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে রাসমঞ্চে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাসমঞ্চের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মোহনদীঘি নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণী এবং পাড় হ'তে পুষ্করিণীর মধ্যস্থল পর্যন্ত একটি লোহার শিকল রয়েছে। প্রবাদ যে, বর্গী হাঙ্গামার সময় ধনরত্ন লুকিয়ে রাখার জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গ্রামের পূর্বপাড়ায় গোপালজীর আটচালা মন্দির এবং গোপাল মন্দিরের নিকট রাধাবল্লভজীউর পঞ্চরত্ন মন্দিরে কষ্টিপাথরের রাধাবল্লভের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত লিপি হতে জানা যায় যে, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে এককড়ি লাহা কর্তৃক মন্দিরটি সংস্কৃত হয়েছিল এবং এর মিস্ত্রী ছিল বর্ধমানের রামধন দাশ। গ্রামের উত্তরভাগে নাটমন্দিরসহ একটি প্রাচীন আটচালা মন্দিরে শিবলিঙ্গ নিত্য

পূজা পাচ্ছেন। এই মন্দিরটি পাতলা ইঁটের তৈরী। মন্দিরের শিলালিপি হ'তে জানা যায়, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে মন্দিরটির সংস্কার সাধন করা হয়েছিল।

ওঁ
৺মহাদেব জীউ
সন ১৩৩৮ সাল, ২৮শে ভাদ্র
শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মিত্র
মেরামত করিয়া দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত সাদিপুরে রাধারমণ, সিংহবাহিনী, শ্রীধর, পঞ্চানন, শীতলা, মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, কালী, রক্ষাকালী, রূপঠাকুর, লক্ষ্মী, নৃসিংহ, লক্ষ্মী-জনার্দন, কাশীনাথ শিব, ভুবনেশ্বর শিব, ধর্মরাজ প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে স্নানযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হ'তে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসবটি সার্বজনীন ও প্রাচীন।

সারগাড়িয়া (৫৩ ঃ কালনা) ঃ ধাত্রীগ্রাম রেলস্টেশন হ'তে বাসযোগে সারগাড়িয়া গ্রামে পেঁছান যায়। এই গ্রামে একটি মনসাবৃক্ষ বা সিজবৃক্ষের নীচে পাকা বেদীতে বার মাস শীতলাদেবীর নিত্যসেবা ও মানসিক পূজা হয়। এখানে বহু পূর্ব হতে শীতলাদেবীর পূজার প্রচলন আছে। বৈশাখ মাসে শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে দেবীর বাৎসরিক পূজা হয়। মৃন্ময়ী মূর্তিটি হ'ল গর্দভ পৃষ্ঠের উপর সমাসীনা চতুর্ভুজা, রক্তবসনা উগ্র মূর্তি এবং তাঁর ডান দিকের নিম্নহস্তে সম্মার্জনী ধৃত আছে। বাৎসরিক পূজার দিন বলিদানসহ সাড়ম্বরে দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

সারগাছি (৪ ঃ মেমারি) ঃ মণ্ডলগ্রামের দু' কিলোমিটার পশ্চিমে সারগাছি গ্রামের অবস্থিতি। এই গ্রামে রঙিলা ফকির সাহেবের কবরস্থানের উপর ইষ্টক নির্মিত বেদী আছে। গ্রামস্থ হিন্দু মুসলমান সকলেই পীরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানায়। প্রায় ৬০/৭০ বছর ধরে প্রতি বৎসর ২৪শে চৈত্র তারিখে রঙিলা ফকিরের তিরোধান উৎসব পালিত হয়।

সারুল (১১৬ ঃ গলসী) ঃ গলসী হ'তে ৩ কিলোমিটার পূর্বে সারুল গ্রামের অবস্থিতি। সারুল গ্রাম-নাম সম্পর্কে ডক্টর সত্যনারায়ণ দাস মন্তব্য করেছেন যে, জলবাচক শব্দ হ'তে সারুলে রূপান্তরিত হয়েছে। গ্রামটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু। গ্রামের প্রবেশপথে ভট্টাচার্য পরিবারের আরাধিত ধর্মরাজের শিলামূর্তি আছে। একটু দূরে একটি দালান মন্দিরে বিশালক্ষী দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। একটি শিলাখণ্ডের উপর দেবীর চোখ আঁকা আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় দেবীর বিশেষ বাৎসরিক পূজা হয় এবং এই সময়ে শ্রীধরপুরের চাঁদ রায় ধর্মঠাকুরের নিকট হ'তে পোড়ামাটির ঘোড়া আনার পর বিশালাক্ষী দেবীর পূজা শুরু হয়। গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির নিদর্শন হ'ল মুখোপাধ্যায় পরিবারের নির্মিত সুউচ্চ শিখরদেউলটির। অপূর্ব এই মন্দিরের

স্থাপত্যরীতি। মনে হয় মন্দিরটি অন্ততঃপক্ষে ৩০০ বছরের প্রাচীন। এই মন্দিরের পশ্চাৎভাগে বেশ খানিকটা উপরে একজোড়া টেরাকোটা মিথুন মূর্তি আছে। এই মন্দিরের ভিত্তিস্থল এরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে যে, আশু সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে প্রাচীন শিখরদেউলটি অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। এ বিষয়ে গ্রামবাসীগণের ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। রায় পরিবারের কুলদেবতা রাধাকৃষ্ণ একটি দালান মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সমস্ত বৈষ্ণব উৎসবগুলি এখানে পালিত হয়। গ্রামের মধ্যস্থলে অপর একটি প্রাচীন শিখরদেউলে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এছাড়া জোড়া শিবের পীড়াদেউলে তারকেশ্বর ও জগদীশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মন্দির দুটির সম্মুখভাগে টেরাকোটা অলঙ্করণ রয়েছে। গ্রামের মধ্যস্থলে চাটুজ্যে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একজোড়া পঞ্চরত্ন মন্দিরে শিবলিঙ্গের নিত্যপূজো হয়। উক্ত মন্দিরদ্বয়ের বিপরীত দিকে একজোড়া শিখরদেউলে শিবলিংগ প্রতিষ্ঠিত আছেন। কালিকা দেবীর মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে গেছে।

সালালপুর (সাঁচড়া ১৯ ঃ জামালপুর) ঃ মসাগ্রাম অথবা পাল্লারোড স্টেশনে নেমে রিক্সাযোগে ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে এগিয়ে গেলে সালালপুর গ্রামে পৌঁছান যায়। অনেকের মতে শ্যালকপুর হ'তে গ্রামনাম হয়েছে। মনে হয়, এই গ্রাম পত্তনের সময় সালাল নামক কোন ব্যক্তির নাম জড়িত থাকায় গ্রামনামটি সালালপুর হয়েছে। সালালপুর গ্রামে উল্লেখযোগ্য উৎসব হল বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবারে অনুষ্ঠিত কালীপুজো। গ্রামস্থ ডোম সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি কালীপুজোর প্রথম প্রবর্তন করেন। আড়াই কোদাল পরিমিত মাটি নিয়ে দেবীর মূর্তি গড়া হয় এবং রাত ১২টা থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত পুজো চলে। এখানে ধর্মঠাকুর, মনসা, চণ্ডী ও শীতলার পুজো হয়। নাথ বা যুগী সম্প্রদায়ের লোকেরা শীতলা পুজোর প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা স্থান ত্যাগ করায় এটি সার্বজনীন পুজোর রূপ নিয়েছে। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি হ'তে পৌষসংক্রান্তি পর্যন্ত ঘরে ঘরে টুসু পুজো হয়। নানা রকমের ফুল ও অন্যান্য উপাদানে মালসা সাজিয়ে টুসু গান গাওয়ার রীতি আছে। ১লা মাঘ গ্রামের পশ্চিমভাগে দামোদর নদীতে টুসু ভাসানের উপলক্ষে একটি মেলা হয়, যা টুসু মেলা নামে পরিচিত। গ্রামের পশ্চিম সীমানায় বাঁধের কাছে পীরতলা নামক স্থানে একটি আস্তানা আছে এবং এই পীরের সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষেরা পীরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানায়।

সাহেবগঞ্জ (ভাতাড়) ঃ বর্ধমান হ'তে গুসকরা যাবার বাস-রাস্তায় সাহেবগঞ্জের অবস্থিতি। একালের ভাতাড় থানা ১৯১০ সালে প্রকাশিত বর্ধমান জেলা গেজেটিয়ারে সাহেবগঞ্জ থানারূপে পরিচিত ছিল এবং সাহেবগঞ্জ ছিল থানার সদর কার্যালয়। শোনা যায়, এখানে চিপ সাহেবের নীলকুঠি ও বাণিজ্য কুঠির থাকায় অত্র স্থানটি সাহেবগঞ্জ নামে খ্যাতি লাভ করে। লুপ লাইনে রেলপথের প্রচলন হ'লে গুসকরার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ঐ সময় হতেই গুসকরার গঞ্জটি ধীরে ধীরে প্রসার

লাভ করে এবং যাতায়াতের অসুবিধার জন্য সাহেবগঞ্জের গুরুত্ব একেবারেই কমে যায়।

সাঁকো (১৫৪ ঃ গলসী) ঃ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে বর্ধমান-গলসী বাস-রাস্তায় সাঁকো স্টপেজে নেমে গ্রামে পেঁছান যায়। সাঁকো গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে মতবাদ এই যে, অতীতে শঙ্খবণিক সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে "সাঁকো হইতে আইসে বেণে নামে শঙ্খ দত্ত" উল্লেখ হ'তে অনুমান করা যায় যে, একসময়ে এই গ্রামটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল। অতীতে একটি নদী-খাত দিয়ে দামোদরের সঙ্গে সাঁকোর যোগাযোগ ছিল, বর্তমানে ঐ খাতের কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু গ্রামের লা-ঘাটা বা নৌকা বাঁধার ঘাটটি অতীতের বণিক বসতির স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রয়ে গেছে। এখানে আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথিতে শঙ্খেশ্বরী নামক মনসা-দেবীর পূজা হয়। উনবিংশ শতকে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত শিখরদেউলে শিবলিঙ্গ নিত্যপূজা পাচ্ছেন। এছাড়া গ্রামের মধ্যে দু'টি আটচালা শিবমন্দির আছে। পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চটি একালে জীর্ণ দশাগ্রস্ত হলেও একসময়ে এটি আকর্ষণীয় ছিল বলে মনে হয়। গ্রামের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বস্তু হ'ল হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সূর্য মূর্তি। বাংলা ১২১২ সালে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দক্ষিণ ভারত হ'তে এই মূর্তি নিয়ে এসেছিলেন এবং বর্ধমানের মহারাজার অর্থানুকুল্যে বিগ্রহের জন্য একটি দালান মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এই সূর্য বিগ্রহটি সাঁকো গ্রামে 'ঊষাদিত্য' নামে প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ রাঢ়ে কেবলমাত্র সাঁকো গ্রামে এখনও সূর্য পূজা হচ্ছে। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর পর শুক্লাসপ্তমী তিথিতে 'ঊষাদিত্যের' বিশেষ বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে হোম, বিগ্রহ সহ গ্রাম প্রদক্ষিণ, পরমান্ন বিতরণ ও অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের যে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ঊষাদিত্যের প্রসাদ নিয়ে যাওয়ার রীতি আছে। মৃত্তিকা গহ্বর হ'তে প্রাপ্ত বিষ্ণু বাসুদেবের মূর্তিটি ভাস্কর্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন! অতীতে সাঁকো গ্রামে সংস্কৃত চর্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল এবং কয়েকটি টোলের মধ্যে ধর্মদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীর খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। সাঁকো গ্রামে মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক স্যার প্রতাপচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদের জন্য তিনি ম্যাক্সমুলারের নিকট হ'তে অভিনন্দন পেয়েছিলেন এবং তাঁকে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সাঁচড়া (১৯ ঃ জামালপুর) ঃ মসাগ্রাম স্টেশন হ'তে ৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সাঁচড়া গ্রামের অবস্থিতি। 'শ্রীপাট নির্ণয়' গ্রন্থ হ'তে জানা যায় যে, এখানে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট ছিল। এই গ্রামে ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে একটি লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। বেলে পাথরে নির্মিত এই মূর্তিটি দ্বাদশ বাহু সমন্বিত ও মাথায় আটটি সর্প ছত্র শোভিত; মূর্তিটির দুই পাশে দুটি দণ্ডায়মান মূর্তি ও দুইদিকে হস্তীর উপর উপবিষ্ট সম্ভবতঃ দুটি যক্ষ মূর্তি। পাদপীঠ হতে সর্পছত্র পর্যন্ত উচ্চতা হল ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি প্রস্থ।

পণ্ডিতেরা এই ভাস্কর্যটি নবম শতকের তৈরী বলে অনুমান করেছেন। তবে মূর্তিটি অত্যন্ত বিরল পর্যায়ভুক্ত ভাস্কর্যের অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সাঁড়া (৯৫ : মঙ্গলকোট) : কাটোয়া হ'তে মাজিগ্রাম বাস-রাস্তার উপরে সাঁড়ী গ্রামের অবস্থিতি। এই বর্ধিষ্ণু গ্রামটি অজয় নদের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে গ্রাম-দেবতা ক্ষেত্রপালের অধিষ্ঠানক্ষেত্র। ঝুলন পূর্ণিমায় ক্ষেত্রপালের বাৎসরিক পূজা ও ঐ উপলক্ষে মেলায় বহু জনসমাগম হয়।

সাঁওতা (১২৩ : মঙ্গলকোট) : বর্ধমান-কাটোয়া ছোট রেলপথে সাঁওতা স্টেশনে নেমে দু' কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামনাম সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসীদের দাবী এই যে, গ্রামস্থ শাকতাই চণ্ডীর নাম হ'তে অপভ্রংশে সাঁওতা নামকরণ হয়েছে। গ্রামে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে ধুমধাম সহকারে সাঁওতা চণ্ডীর বাৎসরিক পূজা হয়। এখানে প্রাচীন কোন মন্দিরের অস্তিত্ব না থাকলেও আনন্দমোহন কোঁয়ারের প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির আছে।

সিঙ্গারকোন (১৩৯ : কালনা) : কালনা-বৈঁচি ও পাণ্ডুয়া-সিঙ্গারকোন রাস্তা দুটির সংযোগস্থলে সিঙ্গারকোন গ্রামটি অবস্থিত। কালনা ও বৈঁচি উভয় স্থান হ'তে এই গ্রামের দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে কিম্বদন্তী আছে যে, সিঙ্গা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র যে কোনায় (স্থানে) নির্মিত হ'ত তা সিঙ্গারকোনা, যার পরিবর্তিত রূপ হ'ল সিঙ্গারকোন। এই গ্রামের গোস্বামী পরিবার হ'ল বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ও বর্ধিষ্ণু পরিবার। তাঁদের আদি নিবাস ছিল মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত যবগ্রামে। গোস্বামী বংশের কমললোচন ভট্টাচার্য ছিলেন শক্তির উপাসক ও মহাসাধক। প্রবাদ যে, তাঁর আরাধ্য দেবী কালিকা তাঁকে কন্যারূপে সেবা করায় নিজেকে মহা-অপরাধী ভেবে দেবীমূর্তি বিসর্জন দিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। কমললোচন শ্যামাদাস ও মোহনানন্দ নামে দুই শিশু পুত্রকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে রেখে আসেন। আচার্যপত্নী মোহনানন্দকে স্বীয় স্তন-দুগ্ধে লালনপালন করেন। জ্যেষ্ঠ শ্যামাদাস পাঠ সমাপনান্তে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে শ্যামাদাস আচার্য নামে বর্ধমান জেলার মতিশ্বর গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। কালক্রমে শ্যামাদাসের বংশ ভৈটা, পালসিট, বিজুড়, নবগ্রাম, ময়নাগড় প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করে। সিঙ্গারকোনের গোস্বামী বংশ হ'ল মোহনানন্দের শাখা। তিনি কষ্টিপাথরের রাধাকান্ত বিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তাঁর পুত্র গোপালাচার্য রাধিকা মূর্তি স্থাপন করেন। একটি জোড়বাংলা মন্দিরে রাধাকান্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দির গাত্রে টেরাকোটা অলঙ্করণের কাজ রয়েছে, যদিও বহু অংশে অলঙ্করণগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। মন্দিরের গঠনপদ্ধতি ও টেরাকোটা অলঙ্করণ দেখে অনুমান করা যায় যে, অন্ততঃপক্ষে ২৫০ বৎসর পূর্বে এটি নির্মিত হয়েছিল। রাধাকান্তের জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, গোষ্ঠযাত্রা, ঝুলন, রাস, ফুলদোল ও দোলযাত্রা উৎসবে মুখরিত হয়ে থাকে সমগ্র গ্রামটি। সিঙ্গারকোনের দোলযাত্রা হ'ল এ অঞ্চলের

সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব এবং তিন সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। দোলের দিন বিগ্রহকে দোলমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি মূল মন্দিরে ফিরে যান। দোলের দিন দুপুরে অন্নভোগের পরিবর্তে ফল মিষ্টান্ন সহযোগে ভোগ দেওয়া হয় এবং ঐ দিন রাত্রে তাঁকে অন্নভোগ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, দোলের মেলার দ্বিতীয় দিনে অপরাহ্ন পর্যন্ত মেলায় পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথিতে মোহনানন্দের তিরোভাব উপলক্ষে তমালতলায় চার দিনব্যাপী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শাক্ত সাধনায় এই গ্রাম পিছিয়ে নেই। চক্রবর্তী বংশের তিন সহোদর তান্ত্রিক পদ্ধতিতে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনটি দেবীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, যাঁরা একত্রে বুড়ীমা নামে খ্যাত। লক্ষ্মী, সরস্বতী সহ দেবী দুর্গা একত্রে বুড়ীমার প্রতীক। গ্রামে পথেরকালী ও সিদ্ধেশ্বরী দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। গ্রাম-প্রান্তে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে রয়েছেন শ্মশানকালী। আষাঢ় মাসে অমাবস্যা তিথিতে দেবীর বিশেষ বাৎসরিক পুজো ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে সত্যপীরের থান ও পূর্বভাগে রয়েছে বুড়োশিবের মন্দির। হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকে সত্যপীরের নিকট মানত করে ও সিন্নি চড়ায়। চৈত্র মাসে বুড়ো শিবের গাজন উৎসব হয়। শিবমন্দিররূপে কথিত একটি পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন মন্দিরের টেরাকোটা অলঙ্করণ দেখে এর প্রাচীনত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া এখানে দু'টি মসজিদও আছে। বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে সিঙ্গারকোনের খ্যাতি বহুকালের। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। গ্রাম সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদটিও অতি সুন্দর,—

"গান, বাজনা, সুজন
এই নিয়ে সিঙ্গারকোন।"

সিঙ্গি (১২১ঃ কাটোয়া)ঃ কাটোয়া হ'তে সরাসরি বাসযোগে সিঙ্গি গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামের প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ হ'ল পয়ার ছন্দে মহাভারতের রচনাকার কাশীরাম দাসের পৈত্রিক বাসভূমির জন্য। কাশীরাম দাসের পৈত্রিক বাসস্থানের অবস্থান বিষয়ে তাঁর অনুজ গদাধর দাসের উল্লেখ হ'তে জানা যায় যে, এই উত্তরবাঢ়ীয় কায়স্থ বংশটি অন্ততঃপক্ষে দশ পুরুষ ধরে এখানে বসবাস করতেন। গদাধর 'জগৎমঙ্গল' কাব্যে তার স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন—

"অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ বাম পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥"

গ্রামের মধ্যে একটি পুরাতন গৃহকে কাশীরাম দাসের ভিটে বলে আখ্যা দেওয়া হয়। গ্রামের মধ্যস্থলে একসময়ে দ্বাদশটি শিবমন্দির স্থাপিত হয়েছিল। শিবমন্দির-গুলি ধ্বংস হলেও মন্দিরের ভিত্তিস্থল হ'তে এই প্রমাণ মেলে এবং শিবলিঙ্গগুলি

পুরোহিতের গৃহে একত্রে রেখে নিত্য সেবাপূজা করা হচ্ছে। এখানে বুড়োশিবের নবরত্ন মন্দিরটি বাংলা ১২৩৫ সালে গঙ্গানন্দ শর্মা কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। অতীতে গাজনের সময় আক্রা-বিষ্ণুপুর হ'তে একটি শিবলিঙ্গ এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হত; পরে দাঁইহাটের নবীন ভাস্কর কর্তৃক বুড়ো শিবলিঙ্গ নির্মিত হয় এবং গাজনের সময় বুড়োশিবকে গ্রামের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া রত্নেশ্বর শিবের চারচালা মন্দিরটি ১৮৬৪ শকাব্দে নির্মিত হয়েছিল। বর্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি হ'তে জানা যায় যে, প্রাচীন মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় এই নূতন মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। গ্রামের মধ্যে রামতনু চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক নির্মিত একটি দালান মন্দিরে আনন্দময়ী কালিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। আনন্দময়ীর মন্দিরের বহির্ভাগে একটি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তিকে ষষ্ঠীদেবীজ্ঞানে গ্রামবাসীরা পূজা করে। গ্রামের উত্তর-পূর্বভাগে একটি প্রাচীন ও বিশাল বটবৃক্ষ রয়েছে। এই বৃক্ষটি ক্ষেত্রপাল-বৃক্ষ নামে পরিচিত এবং বৃক্ষের নীচে বহুকাল ধরে ক্ষেত্রপালের পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে ষোড়শোপচারে জাঁকজমক সহকারে ক্ষেত্রপালের বাৎসরিক পূজা হয়। বলিদান হল ক্ষেত্রপাল পূজার অন্যতম অঙ্গ। ক্ষেত্রপালের কোন বিগ্রহ নেই—পূজা হয় ঘটে ও যন্ত্রে। বুড়োশিবকে কেন্দ্র করে প্রতি বৎসর শিবরাত্রিতে বিশেষ উৎসব ও চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সিজনা (২৬ঃ মন্তেশ্বর)ঃ কুসুমগ্রাম হ'তে ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে সিজনা গ্রামের অবস্থিতি। কিছুকাল পূর্বে এইখানে একটি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই প্রস্তরনির্মিত বিষ্ণুমূর্তিটি একাদশ-দ্বাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয় এবং বর্তমানে মূর্তিটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, কাশিম-বাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্ত নন্দীর আদি বাসস্থান ছিল সিজনা গ্রামে।

সিমুলিয়া (৭৮ঃ মঙ্গলকোট)ঃ কৈচর ও নিগনের মধ্যে সিমুলিয়া স্টপেজে নেমে এই গ্রামে যাওয়া যায়। অনেকে দাবী করেন যে, ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত সিমুলাগড় হ'ল একালের সিমুলিয়া গ্রাম, কিন্তু উক্ত মন্তব্যের গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিমুলিয়া গ্রামে গন্ধেশ্বরী দেবীর নিত্য সেবাপূজা হয়। মনে হয়, নিকটবর্তী উজানি গ্রামে গন্ধবণিকদের গৃহে গন্ধেশ্বরী দেবী পূজিত হতেন এবং উজানির পতনের পর দেবীর কোন সন্ধান জানা যায় না। বহুকাল পরে সিমুলিয়া-বাসী কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ উপানন্দ চট্টোপাধ্যায় দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কেশেদীঘি হতে দেবীকে উদ্ধার করেন। এই মহিষমর্দিনী মূর্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, দেবীর দক্ষিণ পদ মহিষের উপর এবং বাম পদ সিংহের উপরে স্থাপিত। দেবীমূর্তি সারা বছর জলের মধ্যে রাখা হয়, কেবলমাত্র আষাঢ় নবমী ও মকর সপ্তমী তিথিতে জল হতে তুলে পূজার পর পুনরায় জলে রাখা হয়। প্রায় ২৫ বছর পূর্বে জল-নিমজ্জিত অবস্থায় মূর্তিটি চুরি যায় এবং পুনরায় প্রস্তরনির্মিত

নূতন মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। দেবী গন্ধেশ্বরী ও চন্দ্রনাথ ভৈরবের সেবাপূজার জন্য বর্ধমানের রাজা কিছু চাকরান জমির বন্দোবস্ত করেন। প্রতি বৎসর আষাঢ় নবমী ও মকরসংক্রান্তিতে ষোড়শোপচারে হোম ও বলিদানসহ দেবীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে আষাঢ় মাসে একটি মেলা বসে।

সিয়ারশোল (১৭ঃ রাণীগঞ্জ)ঃ রাণীগঞ্জ রেলস্টেশন হ'তে পাকা-রাস্তা ধরে অথবা গ্রাণ্ড ট্রাণ্ড রোড হ'তে রাণীগঞ্জের পথে এই গ্রামে যাওয়া যায়। সিয়ারশোল গ্রামের প্রসিদ্ধি শুরু হয় কাশ্মীর হ'তে আগত গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের আগমনের পর হ'তে। ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারা গোবিন্দপ্রসাদ প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হ'ন। এই অর্থের দ্বারা বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে জমিদারী ক্রয় করেন। গোবিন্দপ্রসাদ স্বগৃহে দামোদরচন্দ্রের মন্দির ও কয়েকটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সময়েই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা শুরু হয়। এখানে চড়ক উৎসব বাদ দিলে বারমাসে তের পার্বণ লেগে আছে। তম্মধ্যে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসব উল্লেখযোগ্য। দেবীর নামগুলিও বড় বিচিত্র—যথা, হাজরাবুড়ি, চাটুজ্যেবুড়ি, হারাবুড়ি, খাঁজিবুড়ি ইত্যাদি। নাম-অন্তে বুড়ি শব্দ থাকায় অনুমান করা যায় যে, এখানে একসময়ে চণ্ডী পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল—তাই দেবীর নামের পরে বুড়ি শব্দ যুক্ত হওয়ায় চণ্ডীপূজার প্রাচীন ধারাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সিয়ারশোলে রথের সময়ে পূর্বে কাষ্ঠনির্মিত রথ ছিল। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে পণ্ডিত জিয়নলাল মালিয়া একটি পিতলের রথ নির্মাণ করেন এবং এর নির্মাতা ছিলেন কলিকাতার প্রসাদচন্দ্র দাশ। এখানে বছরের বিভিন্ন সময়ে ধর্মরাজ, গণেশ জননী, বিশ্বকর্মা, কালী, রক্ষাকালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শোনা যায়, সাধক বামাক্ষ্যাপা কাঞ্জিলাল পরিবারের দুর্গামণ্ডপে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। বর্ধমানের কবি কাজী নজরুল ইসলাম সিয়ারশোল বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

সিংহপাড়া (মৌজা-ফরিদপুর ও করুরি ঃ বর্ধমান)ঃ বর্ধমান হ'তে কাষ্ঠকুড়ুম্বা যাওয়ার পথে বর্ধমান হ'তে ২১ কিলোমিটার দূরে সিংহপাড়া স্টপেজে নেমে গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামে মোরাইচণ্ডী দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন, কিন্তু মোরাইচণ্ডীর পূজা হ'ল মনসা পূজার নামান্তর। প্রতি বৎসর আষাঢ় নবমীতে মোরাইচণ্ডী দেবীর বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়, পুনরায় শ্রাবণ মাসে ঐ স্থানেই মনসা দেবীর পূজা হয়। গ্রামে কোন একসময়ে আষাঢ় মাসে কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় আষাঢ় নবমীতে পূজা শুরু হয়েছিল। রামনবমীতে অনুষ্ঠিত হয় রাম রাজার পূজা। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে অমাবস্যায় শ্মশানকালীর পূজা হয়। শ্মশানকালীর পূজার সঙ্গে মনসা দেবীর পূজার কোন যোগসূত্র আছে, কারণ ঐ সময়ে পূজার বেদীতে একটি সর্পমূর্তি রাখা হয়। শ্মশানকালীর বেদীর পাশে যে পুকুরটি রয়েছে তার জল গ্রামের কোন লোক ব্যবহার করে না—শ্রাবণ মাসে মনসা

পূজার সময় সারা গ্রাম ঘুরে গৃহস্থের বাড়ী হ'তে চিঁড়া সংগ্রহ করা হয়। পূজার দিনে অরন্ধন পালিত হয় এবং ঐ দিন গ্রামের সকল লোক একত্রে বসে চিঁড়া আহার করে।

সিংহারী (৩৮ : পূর্বস্থলী) : পূর্বস্থলীর পাঁচ কিলোমিটার দূরে সিংহারী গ্রামের অবস্থিতি। অতীতে এই গ্রামটি সিংহলদী নামে পরিচিত ছিল। একালে অখ্যাত গ্রামরূপে গণ্য হলেও চতুর্দশ শতকে সংস্কৃত চর্চার জন্য গ্রামের প্রসিদ্ধি ছিল। যশোহর জেলার সরশুনা নিবাসী আচার্য কাঞ্চন পাকড়াশী অধ্যাপনার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করেন এবং চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্বক স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কাঞ্চন আচার্যের পুত্র মহাযোগী বাসুদেব ভট্টাচার্য মা ভবানীর কৃপা লাভের নিমিত্ত ভাগীরথীর তীরে সাধনস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। বাসুদেবের পৌত্র সার্বানন্দ তন্ত্রশাস্ত্র ও শক্তি সাধনার উচ্চমার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং তিনি বাংলা দেশের অন্তর্গত ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার মেহারগ্রামে সাধনপীঠ স্থাপন করেছিলেন।

সীতাহাটী (১১৬ : কেতুগ্রাম) : নৈহাটির সন্নিহিত উত্তরে সীতাহাটী গ্রামের অবস্থিতি। সীতাহাটী গ্রামে বর্তমান শতকের প্রথমভাগে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনে সেন বংশীয় রাজা বল্লালসেন ও তাঁর মাতা বিলাস দেবীর নাম উল্লেখ আছে। উক্ত তাম্রশাসন হ'তে জানা যায় যে, বল্লালসেন মাতা বিলাসদেবীর পুণ্য কর্মের জন্য সূর্য গ্রহণ উপলক্ষে হেমাশ্ব মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ বর্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তর রাঢ় মণ্ডলে বল্লহিট্ট বা বর্তমান বালুটিয়া গ্রামটি বরাহদেব শর্মার প্রপৌত্র ভদ্রেশ্বর শর্মার পৌত্র বাসুদেব শর্মাকে ভুমিদান করেছিলেন। সেই রাজবংশের বিখ্যাত ভুমি-দানের দলিল আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য সীতাহাটী গ্রামের প্রসিদ্ধি।

সুগাছি (১১৭ : কাটোয়া) : কাটোয়া হতে বাসযোগে ৬নং রাজ্য সড়ক ধরে দেয়াসিন স্টপেজে নেমে দক্ষিণ-পূর্বমুখে হাঁটা-রাস্তা ধরে সুগাছি গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে শিবলিঙ্গ ধর্মরাজ নামে প্রসিদ্ধ। মায়েরা লোকপ্রচলিত বিশ্বাসের ফলে সন্তানের জন্মের পর ধর্মরাজের পূজা দিয়ে ও মানত করে ঔষধ গ্রহণ করলে আরোগ্য করে থাকে। বৈশাখ মাসে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে একদিনের জন্য মেলা বসে।

সুবলদহ (১৯৪ : রায়না) : দামোদরের পশ্চিমভাগে অবস্থিত সুবলদহ গ্রামে পৌঁছাতে হ'লে বর্ধমান-দামিন্যার বাস-পথে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। এই গ্রামে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে বিনোদবিহারী বসুর পুত্র বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তাঁর বংশধরেরা বর্তমানে এই গ্রামে বসবাস করেন না, তথাপি রাসবিহারী বসুর পৈত্রিক বাসস্থানটিকে স্থানীয় লোকেরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

সুয়াতা (৯০ : আউসগ্রাম) : মানকর-গুসকরা বাস-রাস্তার উপর সুয়াতা গ্রামের অবস্থিতি। সুয়াতার স্থাননাম সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে। অনেকের মতে, জাতকের 'জনপদকল্যাণী' সূত্রে বর্ণিত রাঢ়ের অন্তর্গত শ্বেতক নগরীর সঙ্গে এই স্থানটি অভিন্ন

মনে করেন, কিন্তু উক্ত মন্তব্য সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুয়াতার সঙ্গে গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজাদের সম্পর্ক সুদীর্ঘকালের। এই গ্রামের খ্যাতির মূলে বহমন শাহ্‌ নামক একজন ধর্মপ্রাণ পীরের কাহিনী জড়িত আছে। জনশ্রুতি এই যে, সৈয়দ বহমন শাহ্‌ চতুর্দশ শতকে রাঢ়ে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। সুয়াতার সন্নিকটবর্তী অমরারগড়ে শিবাখ্যা মন্দিরে দেবীর সম্মুখে নরবলি হ'ত এবং তিনি এই প্রথা বন্ধ করতে সচেষ্ট হ'লে সদ্‌গোপ রাজাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। যুদ্ধে বহমন শাহ নিহত হন। সুয়াতা গ্রামের পাশে বহমন শাহের মাজার আছে। বহমন শাহ্‌ এতদঞ্চলের মধ্যে জাগ্রত পীর। প্রতি বৎসর তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষে পৌষসংক্রান্তি ও উত্তরায়ণের দিন বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উরস উৎসবের মেলায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দলে দলে লোক সুয়াতায় আগমন করেন। কেহ্‌ কেহ্‌ মন্তব্য করেন যে, বহমন শাহের মাজারটি একটি বৌদ্ধ স্তূপের উপর নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

গ্রামের উত্তরভাগে মসিদডাঙ্গা নামক স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণের কথা জানা যায়। সম্ভবতঃ মসজিদডাঙ্গা মসিদডাঙ্গায় পরিণত হয়েছে। মঙ্গলকোটের মসজিদের অনুরূপ কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের ৩টি প্রস্তরস্তম্ভ আজও সুয়াতায় দেখা যায়। গ্রামের মধ্যে ঘোষ পরিবারের শিবমন্দির ও লক্ষ্মী-জনার্দন মন্দির আছে। বাৎসরিক উৎসবের মধ্যে চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বহমন শাহের মাজারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল হ'ল, আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নামাঙ্কিত কোন মসজিদের ৩টি প্রতিষ্ঠালিপি। প্রতিষ্ঠালিপিগুলি মাজারের মধ্যে গাঁথা আছে। মসিদডাঙ্গার মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'লে প্রতিষ্ঠালিপিগুলিকে মাজারের মধ্যে সংরক্ষিত করা হয়। প্রস্তরখণ্ডের উপর ক্ষোদিত হিজরা ৯০২ অব্দে একটি, অপরটি হিজরা ৯০৮ অব্দে দুটি প্রতিষ্ঠালিপি ক্ষোদিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠালিপিগুলির বিষয়বস্তু নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

(১) কুলিল্লাহুম্মা সালেকাল মুলকে তুতিল মুলকা মান তাশা-ও ওয়া তানজে-উল মুলকা মিম্মান তাশা-ও ওয়া তুয়েজু মান তাশা-ও বে ইয়াদিকাল্‌ খায়ের ইন্নাকা আলা কুল্লে শাইয়েন্‌ কাদির। তুলেকুল লায়লা ফিন্‌ নাহারে ওয়া তুলেজুন নাহারে ফিল্‌।

(২) লায়লে ওয়া তুমরেজুল হাইয়ে মিনাল মাইয়্যেড়ে ওয়া তুখরেজুল মাইয়্যেড়ে মিনাল হাইয়ে ওয়া তারজুকু মান তাশা-ও বে গায়রে হিসাব···আস্‌সুলতানোল আদেলেল বাজেলো সাইয়েদুস সাদাত আবুল মোজাফ্‌ফর আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌ আস্‌সুলতান কাতেকহু কাজী মিনাজ সানাতা এস্‌না ও তেসআ মায়াতেন।

আল্লাহুম্মা তুলাল আমারেস সুলতানেল আহাদে ওয়াজ জামানে বেল আদালে ওয়াল এহসানেল মাওইয়াদে বে তায়েদেল মিনানেল মোজাহেদু ফি সাবিলির রাহমানে খালিফাতুল্‌ লাহে বেল হিজ্‌জাতে অল বোরহানোস সুলতানে।

(১) কালাল্লাহো তায়ালা মান জা'আ বেল হাসানাতে ফালাহু আশরো আমছালোহা বনেআ হাজেহি সাকাইয়াতোস সুলতানোল সুয়াজ্জাম আলবোকাররাম।

(২) আলা উদ্ দুনিয়া ওয়াদ্ দীন আবুল মোজাফ্ফর হুসেন শাহ আস সুলতান এবনে সাইয়েদ আশরাফ আল্ হোসায়নী খালাদা আল্লাহ মালাকাহু ওয়া সুলতানাহু ফি সানাতেন সেত্তা আশরো ওয়া তেসয়া মাইয়াতেন।

সুহারী (১৫০ : বর্ধমান) : শক্তিগড় স্টেশন হ'তে ৪ কিলোমিটার উত্তরে সুহারী গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামের পূর্বপাড়ায় মাটির চালাঘরে কালুরায় নামক ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তি অধিষ্ঠিত আছেন। কালুরায়ের পূর্ব অধিষ্ঠানক্ষেত্র ছিল নিকটবর্তী কাশিয়াড়া গ্রামে। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় কালুরায়ের গাজন হয়। গাজনে ২০/২৫ জন সন্ন্যাসী বা ভক্ত হ'তে দেখা যায়। ৪ দিন ধরে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে কালুরায়ের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। নন্দলাল পণ্ডিত ও এই বংশের অন্যান্যেরা ধর্মরাজের দেয়াসী। শেষ দিন অর্থাৎ চড়কের দিন কালুরায়ের সম্মুখে ধর্মমঙ্গলের নবখণ্ড পালা গাওয়া হয়। বৈশাখ মাস ব্যতীত অন্যান্য সময়ে বিগ্রহের নিত্যসেবা ও শীতল হয়, কিন্তু বৈশাখ মাসে বৈকালে ক্ষীর, ছানা, ফলমূল দিয়ে প্রত্যহ গা-তোলানী হ'য়ে থাকে। চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের শেষ মঙ্গলবারে রক্ষাকালীর পূজা হয়। গ্রামের মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল, কোঙার পরিবারের রাজরাজেশ্বরের আটচালা মন্দির। মন্দিরের সম্মুখভাগে অপূর্ব টেরাকোটা অলঙ্করণের দ্বারা মন্দিরটিকে সাজান হয়েছে। তবে সংস্কারের অভাবে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত এই মন্দিরটি জীর্ণদশাগ্রস্ত হতে শুরু হয়েছে। রাজরাজেশ্বর মন্দিরের অনতিদূরে লক্ষ্মী জনার্দন বিগ্রহ একটি আটচালা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। এছাড়া কোঙার পরিবারের শিবমন্দিরটির টেরাকোটা অলঙ্করণ দেখার মত।

সেনপাহাড়ী : কাঁকসা থানার উত্তরাংশ ও অজয় নদের দক্ষিণভাগে অবস্থিত বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগটি সেনপাহাড়ী পরগণা নামে খ্যাত। কোন কোন বিবরণ হতে জানা যায় যে, অজয় নদের উভয়তীর সেনপাহাড়ী পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আইন-ই-আকবরী (২য় খণ্ড)-তে উল্লিখিত আছে যে, সেনপাহাড়ী পরগণা সরকার মান্দারনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক বর্ধমানের জমিদার কৃষ্ণরাম রায়কে প্রদত্ত ফরমানে সেনপাহাড়ী গড়ের উল্লেখ আছে। মহিমারঞ্জন চক্রবর্তীর মতে ত্রিষষ্ঠিগড় বা ঢেকুরগড় সেনপাহাড়ী গড়ের নামান্তর। কাঁকসা থানার গৌরাঙ্গপুর গ্রামের উত্তরে অজয় নদ সংলগ্ন উচ্চ ভূখণ্ডের মধ্যে বর্ধমানের রাজা চিত্রসেন রায় সেনপাহাড়ীর দুর্গটি সংস্কার করেছিলেন। 'বর্ধমান রাজবংশানুচরিত' গ্রন্থ হ'তে জানা যায় যে, রাজা চিত্রসেন গোপভূমের সদ্গোপ জমিদারদের পরাস্ত করে গোপভূম পরগণা স্বীয় অধিকারে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে বিরোধের সময় রাজা ত্রিলোকচাঁদ রায় কিছুকাল এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানি কর্তৃক দুর্গটি বিজিত হ'লে অধিকৃত কামানগুলি

কলিকাতা ও বর্ধমানে নিয়ে আসা হয় এবং দুর্গটিকে ধ্বংস করা হয়।

সেলিমাবাদ (৩০ : জামালপুর) মসাগ্রাম রেলস্টেশনে নেমে পশ্চিমমুখে তারকেশ্বরগামী বাসযোগে সেলিমাবাদে যাওয়া যায়। জামালপুরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সেলিমাবাদ গ্রামে মোগল আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসন কার্যালয় ছিল। 'আইন-ই-আকবরী'তে উল্লিখিত আছে সরকার সুলেমানাবাদের সদর কার্যালয় ছিল এই স্থানে। অধ্যাপক হেনরি ব্লকম্যানের মতে সুলেমানাবাদ হ'তে স্থানটি শাহজাদা সেলিমের নামানুসারে সেলিমাবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। অতীতে জামালপুরের পরিবর্তে সেলিমাবাদে থানা কার্যালয় অবস্থিত ছিল। এখানে মোগল আমলে একটি মসজিদ নির্মিত হ'লেও বর্তমানে তার কোন চিহ্ন নেই। সেলিমাবাদের অতীত গৌরবের কিছুই অবশিষ্ট নাই ; কিন্তু মুকুন্দরামের বর্ণনায় অত্রস্থানের খ্যাতি আজও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম।

সেহাড়া (৫৫ : রায়না) : বর্ধমান হ'তে আরামবাগের পথে বাসযোগে সরাসরি সেহাড়া গ্রামে পেঁছান যায়। ধর্মমঙ্গলের কবি রামকান্ত রায়ের জন্মস্থান ছিল সেহাড়া গ্রামে এবং তিনি ১১৯৭ বঙ্গাব্দে ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। কবির মতে, গ্রামদেবতা বুড়োরায় বাঞ্ছারাম সরকারের বাড়ীর নিকট একটি বাবলাতলায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। বুড়োরায় কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে রামকান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। কবির নিজস্ব উক্তি হ'তে কয়েকটি কথা জানা যায়,—

"নিবাস সেহাড়া গ্রাম পুরুষ বিস্তর।
সামিল সমরশাহি পরগণা ভিতর॥
জয় জয় বুড়োরায় বাবলা দেহারা।
রাজ-রাজেশ্বর প্রভু রাখেন সেহাড়া॥
এগার শ সাতানয় সালের আশ্বিনে।
আরম্ভ করিনু শুক্লা একাদশীর দিনে॥"

সোমাইপুর (১৫২ : আউসগ্রাম) : আউসগ্রামের সন্নিহিত পূর্বে সোমাইপুর গ্রামের অবস্থিতি। এই গ্রামে সোমেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছেন এবং শিবের নামানুসারে গ্রামটি সোমগ্রাম বা সোমপুর নামে পরিচিত ছিল যা অপভ্রংশে সোমাই-এ রূপান্তরিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে এই গ্রামে হটী বিদ্যালঙ্কার নামে এক বিদুষী মহিলা জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে পিতৃহারা ও স্বামীহারা হ'য়ে শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কাশীতে চলে যান। সেখানে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। সে-যুগে হটী বিদ্যালঙ্কার ছিলেন বর্ধমানের তথা বাঙালীর গর্ব। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে এই বিদুষী মহিলা কাশীধামে পরলোকগমন করেন।

হাটগোবিন্দপুর (১৩৬ : বর্ধমান) : বর্ধমান হ'তে কালনা রোড ধরে এই গ্রামে পেঁছান যায়। গ্রামটি অতি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু। এখানে শ্রাবণ মাসে

মনসা পূজা উপলক্ষে মনসার ঝাঁপান অনুষ্ঠিত হয় ও এই সময়ে একটি মেলা বসে। গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি নিদর্শনের মধ্যে সপ্তদশ শতকে নির্মিত শ্রীধরের আটচালা মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরটির সম্মুখভাগে টেরাকোটা অলঙ্করণ আছে। অষ্টাদশ শতকে নির্মিত অষ্টনায়িকা দুর্গার আটচালা মন্দিরটির স্থাপত্যরীতি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এছাড়া একটি পঞ্চরত্ন মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

হালাড়া (৫০ : জামালপুর) : মসাগ্রাম রেলস্টেশন থেকে তারকেশ্বরের পথে বাসযোগে হালাড়া গ্রামে যাওয়া যায়। উনবিংশ শতকে পূর্ণানন্দ সেন নামক জনৈক ব্যক্তি পাথুরিয়াঘাটার রাজা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জমিদারীতে দেওয়ানের কাজ করতেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। পূর্ণানন্দ এই গ্রামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তন্মধ্যে অষ্টধাতু নির্মিত বিপদভঞ্জনী বিগ্রহ স্থাপন করেন। পূর্ণানন্দের প্রতিষ্ঠিত মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বিগ্রহটিও সম্ভবতঃ অপহৃত হয়েছে। ঐ স্থানে একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে সাড়ম্বরে পূজিত হয় ও এই উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

হিজলগড়া (৪০ : জামুরিয়া) : জামুরিয়ার ৪ কিলোমিটার পূর্বে হিজলগড়া গ্রামের অবস্থিতি। গ্রামের মধ্যে একটি প্রাচীন মন্দিরে অনাদিনাথ, বুড়োশিব, আবালেশ্বর শিব, ধর্মরায়, বুড়োরায় ও বাণেশ্বর শিবের শিলাখণ্ড পূজিত হয়। শেঠ উপাধিধারী ধীবরেরা বিগ্রহগুলির দেয়াসী এবং ঘোষাল ব্রাহ্মণেরা হলেন পূজারী। ডক্টর অমলেন্দু মিত্র রচিত 'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর গ্রন্থে হিজলগড়ার ধর্মঠাকুর-গুলির গাজনের উল্লেখ আছে। বৈশাখের নৃসিংহ চতুর্দশীতে পূজা শুরু হয় এবং ত্রয়োদশীর দিন হ'ল ধর্মে ঠাকুরের বারের দিন। ভক্তেরা মন্দিরের সন্নিকটে কালাপুকুরে স্নান সমাপন করে নিকটস্থ শিব ও হনুমানজীর পূজা করেন। সেখান হ'তে তারা এক পায়ে দৌড়ে গাজনতলা পর্যন্ত আসে এবং শিবমন্দিরে গিয়ে দু'টি লোহার দণ্ডে পা ঝুলিয়ে অধোমুখে শিব পূজা করে। ঐ দিন রাত্রি দু' ঘটিকার সময় বাঁশের ঝাড়ে বাঁশে হাত দিয়ে জাগরণ হয় এবং সেই বাঁশের তৈরী টোকায় পূজোর দিন ভোর রাত্রে ধর্মরাজকে স্নান করান হয়। এই অনুষ্ঠানটির নাম হ'ল 'মুকতোলা'। চতুর্দশীর দিন পূজা ও হোম হয়। এই দিন পার্শ্ববর্তী গ্রাম হ'তে উপবাস করে বহু ভক্ত হাজির হন এবং মানসিক অনুযায়ী 'হোলাবাণ' অথবা দণ্ডী দেয়, আবার অনেকে 'শিবকুড়ি' নামক স্থান হ'তে গড়াগড়ি দিতে দিতে ধর্মের মন্দির পর্যন্ত আসে। ঐ দিন ভোরে পুনরায় 'মুকতোলা' হয়। ভক্তেরা কাঠে আগুন ধরিয়ে ঐ অঙ্গার নিয়ে লোফালুফি খেলা করে। এই দিন 'সগড়বাণ' নামে বাণ আসে। একজন ভক্তা শিবকুড়ি থেকে উপর দিকে পা বেঁধে অধোমুখে আগুনে আহুতি দিতে দিতে মন্দিরে আসে। পূর্ণিমার দিন কোন পূজা হয় না। দোলায় ধর্মরাজকে চড়িয়ে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্নান শেষে বিগ্রহগুলিকে বাণেশ্বরে চড়িয়ে আনা হয়। একাদশীর

দিন পূজা ও বলিদানের পর বিগ্রহগুলিকে স্বস্থানে স্থাপন করা হয়।

হিজলনা (৩৩ ঃ রায়না) ঃ বর্ধমান থেকে সদরঘাটে দামোদর পার হ'য়ে দামোদরের দক্ষিণ তীরের বাঁধ ধরে ৪ কিলোমিটার পূর্বে এগিয়ে গেলে হিজলনা গ্রামে পৌঁছান যায়। সম্ভবতঃ হিজল বৃক্ষ হ'তে গ্রামনামের উৎপত্তি হয়েছে। গ্রামের মধ্যে একই স্থানে ৫টি পুরাতন শিবমন্দির ছিল, তম্মধ্যে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ও অপরগুলি জীর্ণদশাগ্রস্ত। টেরাকোটা অলঙ্করণগুলি মন্দির-গাত্র হ'তে খসে পড়ছে। এছাড়া গ্রামের মধ্যে একটি ধর্মরাজের মন্দির ও অপর একটি নারায়ণ মন্দির আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজের গাজন উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

হীরাপুর (১৮ ঃ হীরাপুর) ঃ হীরাপুর থানার সদর কার্যালয় হীরাপুরে পৌঁছাতে হ'লে আসানসোল হ'তে বাসে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। এখানে শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর মাণিকচাঁদ ঠাকুর মদনগোপাল বিগ্রহকে একটি মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মদনগোপাল মন্দিরের সম্মুখে মাণিকচাঁদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, তিনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ।

হাঁসুয়া (৬ ঃ বুদবুদ) ঃ বুদবুদের ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে ৭নং গেট হ'তে দক্ষিণমুখে সেনানিবাসের মধ্যে হাঁসুয়ার অবস্থিতি। মনে হয় রাজার কালী হংসেশ্বরী দেবীর নামানুসারে স্থাননাম হয়েছিল হাঁসুয়া। সমগ্র অঞ্চলটি সেনানিবাসের এলাকাধীন হলেও ক্ষেত্রপাল বিগ্রহের জন্য এই স্থানটি সেনানিবাসের আয়ত্তাধীন নয়। একটি দালানমন্দিরের মধ্যে দুটি পাশাপাশি কক্ষে পাষাণময়ী হংসেশ্বরী কালিকাদেবীর মূর্তি ও হংসেশ্বর শিব বহুকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরটি কতকাল পূর্বে নির্মিত হয়েছিল সেকথা জানা যায় না। তবে একটি লিপি হ'তে জানা যায় যে, মহারাজ কুমার অভয়চাঁদ মহ্‌তাব ১৩৪৮ সালে এই মন্দির পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। হাঁসুয়ার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হ'ল ক্ষেত্রপালের পূজা। একটি তেঁতুল বাগানের মধ্যে কাঠের বেদীর উপরে ভৈরব মূর্তিটি ক্ষেত্রপালরূপে পূজিত হন। ভৈরবের পাশে ভগ্ন দেবীমূর্তিকে চণ্ডীর ধ্যানে পূজা করা হয়। প্রতিদিন বহু নরনারী ক্ষেত্রপালের কাছে সন্তান কামনা ও শিশুদের রোগমুক্তির আশা নিয়ে পূজা দিতে আসেন। মানত পূর্ণ হ'লে পূজা ও ছাগ বলির ব্যবস্থা আছে।

মানত শোধের জন্য একটি বিচিত্র প্রথা ক্ষেত্রপালতলায় দেখা যায়। নরনারীর মনস্কামনা পূর্ণ হ'লে পিতলের ঘণ্টা বেঁধে দিয়ে আসা হয়। এগুলি ৫০ গ্রাম হ'তে শুরু করে ৫ কিলোগ্রাম পর্যন্ত ওজনের হয়। এই স্থানে বিভিন্ন আকৃতির ঘণ্টা অন্ততঃপক্ষে ৭/৮ হাজার ঝোলান আছে। স্থানীয় সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনীয়ররা ঘণ্টাগুলিকে সুসজ্জিতভাবে টাঙানর ব্যবস্থা করেন। ক্ষেত্রপালের নিকট পোড়ামাটির হাতী ও ঘোড়া মানতের প্রথা আজও দেখা যায়। ক্ষেত্রপালের পূজা প্রবর্তন সম্পর্কে জানা যায়, স্থানীয় সদগোপ সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পূজা শুরু করেন এবং কোটা নিবাসী মধুসূদন চক্রবর্তী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পৌরোহিত্য করতে স্বীকার করে-

ছিলেন। ক্ষেত্রপাল ভৈরবের মাথার উপর আছে তিনটি সর্প ছত্র। ভৈরবের পার্শ্বে ভগ্ন শিলামূর্তি চণ্ডীর ধ্যানে পূজিত হন। ক্ষেত্রপালের দুই পাশে রক্ষিত আছে একজোড়া বড় আকারের সাদা ঘোড়া ও একজোড়া ষাঁড়। প্রতিদিন বহু নরনারী সন্তান কামনা ও শিশুদের রোগ মুক্তির কামনায় এখানে পূজা দিতে আসেন। মানত পূর্ণ হলে মানত শোধের পূজা ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবারে বিশেষ পূজা হয় এবং প্রতি বৎসর দশহরার দিন ও ১লা মাঘ ক্ষেত্রপালের বিশেষ পূজার দিন বহু জনসমাবেশ হয়। বলিদান সম্পর্কে কোন বিধি-নিষেধ নাই। বৎসরের যে কোন দিন মানত শোধের পূজায় ছাগ বলি দেওয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায়

দেখি পুরী বর্ধমান

(১)

বর্ধমান জেলার সদর শহর বর্ধমানের অবস্থিতি হল ২৩° ১৪′ উত্তর অক্ষাংশ রেখা ও ৮৭° ৫১′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখায়। জেলা সদর ব্যতীত দু'টি মহকুমার কার্যালয়ও এই শহরে অবস্থিত আছে। শহরের উত্তরভাগে চাঁদা নদী, দক্ষিণভাগে দামোদর নদ এবং পশ্চিম ও মধ্যভাগ দিয়ে বাঁকা নদী প্রবাহিত। অতীতে শহর এলাকার বিস্তৃতি অধিক না হলেও একালে ২৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে বর্ধমান পৌরসভা গঠিত হয়েছে। এই পৌরসভার অধীনে ২৯টি ওয়ার্ডে ২,৪৪, ১৪১ জন লোক বসবাস করে। মোট ২১টি মৌজা নিয়ে বর্ধমান শহরাঞ্চল গঠিত হয়েছে ; যথা,—

আলমগঞ্জ (৩১)	ইছলাবাদ (৭৫)	ইদিলপুর (২৪)
কানাইনাটশাল (৭৬)	খাজা আনোয়ারবেড় (৩৫)	গোদা (৪১)
গোপালনগর (৭৮)	জগৎবেড় (৩৪)	ফকিরপুর (২৫)
বর্ধমান (৩০)	বাবুর বাগ (৪০)	বালিডাঙ্গা (৩৫)
বাহির সর্বমঙ্গলা (৪২)	বেচারহাট (৭৯)	ভাতছালা (৩৭)
মীরছোবা (৩৩)	রাধানগর (৩৯)	লাকুড়ি (২৯)
শাঁকরীপুকুর (৩৮)	সাধনপুর (৬৯)	কাঞ্চননগর (২৬)

কিন্তু ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের চিত্র ছিল অন্যরূপ অর্থাৎ প্রথম বর্ধমান পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় মুরাদপুর, রাধাগঞ্জ, শ্যামবাজার, টিকরহাট, লাকুড়ি, কাঞ্চননগর, খাজা আনোয়ারবেড়, নিষ্কিরবাজার, নীলপুর ও রসিকপুর পল্লী নিয়ে পৌর এলাকা গঠিত হয়েছিল।

বর্ধমান শহরের পল্লী পরিচিতি ছিল হাট বা গঞ্জের নামে, যা আজও সনাক্ত করা যায়। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের রেভেনিউ সার্ভে মানচিত্রে রাজবাড়ীর পূর্বভাগের অঞ্চলটি মোরাদপুর নামে পরিচিত ছিল। কাঞ্চননগর পল্লী সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পল্লী এবং কাঞ্চননগর হল প্রাচীন বর্ধমান শহর। কাঞ্চননগরের কাষ্ঠগোলা ঘাট ও রেনেলের সার্ভে মানচিত্রে চিহ্নিত রাস্তাগুলির সংযোগস্থল দেখে একথা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। ঐ প্রাচীন পথটি সদরঘাটে বাদশাহী সড়ক হতে বাম ভাগে কাঞ্চননগর ও তালিতগড়কে পাশে রেখে আলমপুর ও বনপাস হয়ে দিগনগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে সদরঘাটে কৃষকসেতু নির্মাণের ফলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বর্ধমান শহরের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। অতীতে বর্ধমান ছিল একটি জনবহুল শহর। বুকানন হ্যামিলটন বর্ধমানকে বার্মিংহাম অপেক্ষা অধিক জনবহুল শহর বলে মন্তব্য করেছেন। আবার ওয়াল্টার হ্যামিল্টনের বর্ণনা হতে জানা যায়,—

"BURDWAN—A town in the province of Bengal, the capital of the (preceding) district, and head-quarters of the government establishment; sixty miles N.N.W. from Calcutta; lat. 23°14' N., lon. 87°57' E. In 1814, when its circumstances were investigated by Mr. Bayley, 7,651 houses were found inhabited by Hindoos, and 2,154 by Mahomedans, total 9,805; which, at the rate of five and a half persons to each dwelling, gave a total population of 53,927 persons. The Burdwan raja has a palace (a vast heavy pile of buildings) here, where he usually resides, and also spacious gardens, laid out after the native fashion; but with a sort of summer-house fitted up after the English manner by the side of a magnificent tank. (W. B. Bayley, Fullarton. & c.)"

কিন্তু রেভাঃ লঙের বিবরণে জানা যায় যে, এই শহরের গৃহসংখ্যা ছিল ৯৭০০ এবং মোট ৪০,০০০ লোক বসবাস করত। ভোলানাথ চন্দ্রের 'Travel of a Hindoo' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, 'Travellers have hardly done justice to Burdwan, the reality of which exceeds all that is chanted in ballad or song. In all directions the scenery fully justifies its ancient poetical appellation of *koosumapoor or the city of Flora.*' অতঃপর শহরটি একটি অস্বাস্থ্য স্থানরূপে পরিগণিত হতে শুরু হয়। উপর্যুপরি দামোদরের বন্যা, বর্ধমানজ্বর, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের ফলে ক্রমশঃ শহরটির অতীত গৌরব একসময়ে লুপ্ত হয়ে যায়। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে গেলেও একালের বর্ধমান কিন্তু ক্রমবর্ধমান ; বর্ধমান শহরের জনসংখ্যা হতে একথা প্রমাণিত হয়।

সময়কাল (খ্রীস্টাব্দ)	জনসংখ্যা	সময়কাল (খ্রীস্টাব্দ)	জনসংখ্যা
১৮১৪	৫৩,৯২৭	১৯৩১	৩৯,৬১৮
১৮৬৯	৪৬,১২১	১৯৪১	৬২,৯১০
১৮৭০	৪২,০০০	১৯৫১	৭৫,৩৭৬
১৮৭২	৩২,৩১২	১৯৬১	১,০৭,৮৮১
১৯০১	৩০, ৫২২	১৯৭১	১,৪৩,৩১৮
১৯১১	৩৫,৯২১	১৯৮১	১,৬৭,৩৬৪
১৯২১	৩৪, ৬১৬	১৯৯১	২,৪৪,১৪১

শহরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে প্রধানতঃ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, বাইপাস রোড ও বিজয়চাঁদ রোডকে কেন্দ্র করে। এই শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির মধ্যে রাসবিহারী ঘোষ রোড, কালনা রোড, সদরঘাট রোড, আলমগঞ্জ রোড, তেজগঞ্জ রোড,

নীলপুর রোড, আর. বি. চ্যাটার্জি রোড, ডি. ডি. তেওয়ারী রোড, মহম্মদ ইয়াসিন রোড, শ্যামলাল রোড, নলীনাক্ষ বসু রোড, সুভাষ পল্লী রোড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাঁকানদী শহরটিকে প্রায় দু'ভাগে বিভক্ত করেছে, তাই উত্তর ও দক্ষিণভাগে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য কয়েকটি সেতু নির্মিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,—গোবিন্দ সেতু (লাকুড়ি), রাজগঞ্জ সেতু, রাধাগঞ্জ-আলমগঞ্জ সেতু, সর্বমঙ্গলা সেতু, বীরহাটের সেতু, নূতনপল্লীর সেতু, ইছলাবাদের সেতু ইত্যাদি। ইছলাবাদ ও শাঁখারী-পুকুর হাউসিং এস্টেটে দুটি কাঠের সেতু আছে। অতীতে বাঁকানদী ছিল বর্ধমান শহরের প্রাণস্বরূপ, তাই নদীর তীরে জনসাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত কয়েকটি ঘাটও নির্মিত হয়েছিল যথা,—ময়ূরমহলে অপর্ণা ঘাট, শ্যামবাজারে গড়গড়া ঘাট ও সর্ব-মঙ্গলা ঘাট প্রাচীনত্বের দাবীদার।

বর্ধমান শহরের অবস্থিতি হল একটি বিরাট কৃষি অঞ্চলের মধ্যে। ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগের মানচিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কৃষি অঞ্চলের মধ্যে তিনটি বিন্দুতে বর্ধমান, কাটোয়া ও কালনা শহর গড়ে উঠেছিল। তাই শহর তিনটিতে কৃষি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলি অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ও রেলপথ সম্প্রসারণের ফলে বর্ধমান শহরের অর্থনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্যে মৌলিক পরিবর্তন এসেছিল। যদিও ঐ সময়ে বর্ধমানের মহারাজার হস্তে শহর নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল। মহারাজা তেজচন্দ্রের আমলে বর্ধমান শহরে ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা নেওয়ার কথা সমসাময়িককালের সংবাদপত্রে সেসকল তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

"নূতনগঞ্জ—শ্রীশ্রীযুত মহারাজ তেজচন্দ্র রায় বাহাদুর আপন বাটীর পশ্চিমে এক নূতন গঞ্জ করিয়াছেন সেখানে দোকানি পসারি অনেক২ লোককে দোকান করিবার কারণ ছয় মাস সুদ ব্যতিরেকে টাকা কর্জ দিতেছেন ইহাতে প্রতিদিন দোকানি বাড়িতেছে এবং তিনি আপন দেশে যেং দ্রব্য পাওয়া যাইত না তাহাও কলিকাতা মোকাম হইতে আনাইয়া তাহার দোকান করাইয়াছেন। ঐ গঞ্জের নাম রাধাগঞ্জ ঐ গঞ্জের দক্ষিণে বঙ্কেশ্বরী নামে নদী আছে সেই নদী পার হইবার কারণ পাকা এক পুল প্রস্তুত করাইতেছেন অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই।" (১৭ জুলাই ১৮১৯)।

বর্ধমান শহরে ব্যবসাবাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য মহারাজা তেজচন্দ্রের অপর একটি পরিকল্পনার কথা জানা যায়,—"নদী মিলন—মহারাজ শ্রীযুত তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর এই বাসনা করিয়াছেন যে আপনার নূতন রাধাগঞ্জ বাঢ়াইবার কারণ খড়ী নদী কাটাইয়া গৌর নদীতে আনাইয়া পশ্চাৎ ঐ গৌর নদী কাটাইয়া আপন গঞ্জের নিকটবর্তী বঙ্কেশ্বরী নদীতে মিশ্রিতা করাইবেন…সে কর্ম সিদ্ধ হইলে দিন২ তাঁহার রাজধানী শহরের বৃদ্ধি হইবেক। (২১ আগস্ট ১৮১৯)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৭৭০ ও ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে দামোদর নদের ভয়াবহ বন্যার ফলে বর্ধমান শহর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শহর রক্ষাকল্পে বেলকাশের কাছে বাঁধ দিয়ে বাঁকা নদীকে দামোদরের মূল ধারা হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে বাঁকা নদীর জলধারা হ্রাস পাওয়ায় গলসী থানার গৌর নদীর সঙ্গে বাঁকা নদীকে যুক্ত করা হয়েছিল। 'বর্ধমান রাজবংশানুচরিত' গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, মহারাজা বর্ধমান শহরে ২৩টি রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে মহতাবচাঁদের আমলে রাজবাড়ী নির্মিত হলে রাজবাড়ীর পূর্বভাগে জহুরীপটী ও কাপড়পটীতে দোকান বসান হয়েছিল।

বর্ধমান হল কৃষি অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যকেন্দ্রিক শহর। হুগলী, বীরভুম, বাঁকুড়া, ও বর্ধমানের এক বিস্তৃত অঞ্চলের উপর নির্ভর করে বাণিজ্যকেন্দ্র বা গঞ্জ গড়ে উঠেছে। এই শহরে ক্ষুদ্র শিল্প ব্যতীত কোন বড় কলকারখানা নাই। উৎপাদনের ক্ষেত্রে তেল কল, চাল কল ও কোল্ড স্টোরেজগুলির গুরুত্ব অসীম। পরিবহন ও ক্ষুদ্রশিল্প শহরের অর্থনীতিতে প্রাধান্য পেয়েছে। চাকুরীজীবী মানুষের সংখ্যাও কম নয়। শহরের বিস্তৃতি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে—ফলে গৃহ সমস্যা ও রাস্তাঘাটের সমস্যা বেশ প্রবল আকার ধারণ করছে। জেলা পরিষদ ও পৌরসভা তাঁদের সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের দ্বারা সমস্যাগুলি পূরণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রধান সমস্যা হল কেন্দ্রীভূত বাজার নিয়ে। শহর এলাকার বিস্তৃতি প্রায় ২৪ বর্গকিলোমিটার হলেও মূল বাজারটি রয়েছে স্টেশন সংলগ্ন স্থান হতে বড়বাজারের মধ্যে ; তাই এই অঞ্চলের গৃহ সমস্যা, দোকান, রাস্তাঘাট ও যানবাহনের সমস্যা অন্যান্য এলাকা হতে প্রবলতর। শিক্ষার ক্ষেত্রে পঞ্চাশের দশক অপেক্ষা বর্তমানে শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও উত্তরোত্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্কুল-কলেজের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। এই শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি মেডিকল কলেজ, একটি হোমিপ্যাথি কলেজ, ৪টি কলেজ, ৩৮টি উচ্চ বিদ্যালয় (মাদ্রাসা সহ) ও ১০৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও শহরে বহিরাগত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। অন্ততঃপক্ষে আরও দু'টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা আশু প্রয়োজন।

নগরজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য মানুষকে শহরমুখী করে। শহরে কর্মসংস্থানের সুযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বাসগৃহ ও প্রাত্যহিক জীবনের সুযোগসুবিধার জন্য পল্লী-অঞ্চল হতে মানুষ পৌর আকর্ষণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শহরের ন্যায় বর্ধমানের পৌর আকর্ষণ জেলার ও পার্শ্ববর্তী জেলার মানুষের কাছে ক্রমশঃ প্রবল হচ্ছে। পৌর জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য আশানুরূপ না হলেও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শহর অপেক্ষা ন্যূন নয় এবং সেকারণেই ১০০ বছরের মধ্যে এই শহরের জনসংখ্যা প্রায় ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যার বিচারে বর্ধমান হল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে (কলিকাতা বাদে) ৬ষ্ঠ বৃহত্তম শহর।

(২)

বর্ধমান শহরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আলোচনা করার পূর্বে এই শহরের প্রাচীনত্ব বিষয়ে ইতিপূর্বেই বিশদভাবে (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৭-১০১) আলোচনা করা হলেও বর্তমান ক্ষেত্রে দুই এক কথা বলা যায়। প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক-ভুগোল-

এর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ রাজধানীর নামে জনপদের পরিচিতি ছিল। স্থাননামের ক্ষেত্রে এরূপ বহু নিদর্শন দেখা যায়। হুয়েন সাঙের বিবরণে রাজধানীর নামে জনপদ পরিচিতি আছে। বর্ধমান জনপদের প্রাচীনতম পরিচিতি পাওয়া যায় মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবীপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বৃহৎ সংহিতা, ভবিষ্যপুরাণ ও বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায়। বর্ধমানপুরের সর্বপ্রথম উল্লেখ আছে হর্ষবর্ধনের বাঁশখেরা লিপিতে। এই ছাড়া 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক গ্রন্থে বর্ধমাননগর ও হরিকেলরাজ কান্তিদেবের চট্টগ্রাম তাম্রশাসনে বর্ধমানপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির বিবরণে আছে, গঙ্গারিডি-কলিঙ্গের রাজধানী ছিল পার্থেলিস। সেণ্ট মার্টিনের মতে অতীতের পার্থেলিস শহর হ'ল একালের বর্ধমান। টলেমির 'Treity of Geography' গ্রন্থে উল্লেখিত ব্রহ্মান নামক স্থানকে অনেকে বর্ধমান নামে উল্লেখ করলেও এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাঁরা এই শহরকে ঈশ্বরপুর বলে অনুমান করেছেন তাঁরা কোন প্রাচীন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। কুসুমপুর নামেরও কোন প্রাচীন প্রমাণ মেলে না। কল্পসূত্রে অস্থিক গ্রামের উল্লেখ আছে এবং টীকাকার উক্ত স্থানটিকে বর্ধমানের স্বপক্ষে চিহ্নিত করেছেন। পূণম চন্দ বৃদ্ধি চন্দ চট্টো কৃত কল্পসূত্রের হিন্দি অনুবাদে আছে—"অর্ট্ঠিয় গামু—বর্ধমান বঙ্গাল মেঁ হৈ"। কথাসরিৎসাগরে বর্ধমান স্থাননামের উল্লেখ কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, তন্মধ্যে কলিঙ্গ হ'তে পাটলিপুত্র যাওয়ার পথে অবস্থিত বর্ধমান হ'ল আলোচ্য শহর।

মোগল যুগে বর্ধমান শহরের উল্লেখ আছে আবুল ফজলের 'আকবরনামা' গ্রন্থে। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে সরকার শরিফাবাদের অন্তর্গত মহাল বর্ধমানের সদর কার্যালয় ছিল এখানেই। বাংলার ইতিহাসের বহু উত্থানপতনের সাক্ষী হ'ল বর্ধমান শহর। তবে এই শহরের শ্রীবৃদ্ধি শুরু হয় বর্ধমানের রাজাদের আমলে। রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থ হ'তে জানা যায়, বর্তমান রাজবাড়িটি ছিল অতীতের বর্ধমান দুর্গ। শাহজাদা আজিম-উস-শান বর্ধমান শহরের তিন বৎসরকাল বসবাসের সময় দুর্গের মধ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। শের আফগান ও মেহেরউন্নিসার কাহিনী বর্ধমানের লোকেরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে জানতে চায়। শের আফগান ইছলাবাদে বসবাস করতেন বলে অনেকে মনে করেন। মধ্যযুগে বাঁকা নদীর পশ্চিমাংশে হিন্দুদের বসবাস ছিল অধিক সংখ্যায় এবং রাজপুরুষ ও তাঁদের কর্মচারী-বৃন্দ বসবাস করতেন বর্ধমান দুর্গ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে। রাজবাড়ীর পূর্বভাগের পল্লীটির নাম ছিল মোরাদপুর। বর্ধমানের রাজারা বৈকুণ্ঠপুর হ'তে প্রথমে কাঞ্চননগরে বারদুয়ারি নামক স্থানে বসবাস করতেন। উক্ত স্থানে জমিদার কীর্তিচাঁদ রায় বিষ্ণুপুরে বিজয়ের স্মারক চিহ্নরূপে একটি তোরণ নির্মাণ করেছিলেন, যার অস্তিত্ব একালেও আছে। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থে রাজাদের কাঞ্চন-নগরে বসবাসের উল্লেখ আছে।

১৭২২ খ্রীস্টাব্দে চাকলা বর্ধমানের সদর কার্যালয়রূপে বর্ধমান শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজেরা বর্ধমান শহরে কালেক্টরের অফিস স্থাপন করে। পরবর্তীকালে প্রশাসন ও রাজস্ব আদায়ের কার্যালয় ব্যতীত বিচার কার্যের জন্য জেলা জজের আদালত স্থাপিত হয়। রাজা ত্রিলোকচাঁদ রায় ও মহারাজা তেজচন্দ্রের আমলে বর্ধমান দুর্গের একাংশে তাঁদের বাসভবন নির্মাণ করেন। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও বর্ধমানের রাজারা আধুনিক বর্ধমান শহরের গোড়াপত্তন করেন। সেই সময়ে কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা প্রধানতঃ বর্তমান কোর্ট এলাকা, বাঁকা নদীর উভয় তীরে বীরহাটের সন্নিহিত অঞ্চলে ও নীলপুরে বসবাস করত। আধুনিক সংজ্ঞায় শহররূপে বর্ধমানের বিকাশ ঘটে ১৮৬৫ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে। তবে প্রকৃতপক্ষে পৌর প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম শুরু হয় ১লা মে তারিখে। বর্ধমান পৌরসভার গৌরবোজ্জল স্মরণীয় দিনটি হ'ল ১৮৮৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর। নবগঠিত পৌরসভা ছিল জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত সর্বপ্রথম পৌরসভা পরিচালনার নূতন কমিটি এবং রায় বাহাদুর নলিনাক্ষ বসু হলেন প্রথম নির্বাচিত পৌরপতি।

বর্ধমান শহর মধ্যযুগের ইতিহাসের বহু স্বাক্ষর বহন করছে। দায়ুদ খাঁর পরাজয়, মোগল বাহিনীর বর্ধমান অধিকার, নবাব কতলু খাঁর বর্ধমান অধিকার, মানসিংহ কর্তৃক পুনরাধিকার, শাহজাহানের বিদ্রোহ, মেহেরউন্নিসা ও শের আফগানের প্রণয় কাহিনী, বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা, শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহ, রাজকন্যা সত্যবতীর বীরত্ব কাহিনী, আজিম-উস-শানের বর্ধমানে ৩ বৎসর অবস্থান, জুম্মা মসজিদ নির্মাণ, কলিকাতা হস্তান্তরের দলিল সম্পাদন, ফারুক সায়র-এর ভাগ্যের পরিবর্তন ও বন মসজিদ নির্মাণ, বর্গী হাঙ্গামা এবং পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাগুলি এই শহরের বুকে সংঘটিত হয়েছিল। সাধক ও সুফি পীর বহরাম ও ভক্তপ্রবর কমলাকান্ত বর্ধমানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছেন। একালের বর্ধমান শহরকে দেখে শহরের অতীত অবস্থানের কথা চিন্তা করা যাবে না। দামোদর, বাঁকা, বেহুলা নদী এই শহরটির প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল রচনা করেছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্ধমান ছিল একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে বর্ণিত আছে,— 'আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার।'

মনে হয়, উক্ত বর্ণনায় কিছু অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে। কোন কোন ছাপা গ্রন্থে পাওয়া যায়,— 'আট হাট সোর গোল বত্রিশ বাজার।'

বর্ধমান শহরের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগের পল্লী নামগুলি অনুসন্ধান করলে 'আট হাটের' সন্ধান মিলবে, যথা,—টিকরহাট, কোটালহাট, কাজিরহাট, নবাবহাট, পোদ্দারহাট, গোলাহাট, বীরহাট ও বেচারহাট। পোদ্দারহাট হল একালের খাজা আনোয়ার বেড়, আর বোরহাট হ'ল কোটালহাটের অপর নাম। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বর্ধমান শহর এই পল্লীগুলির মধ্যে বিস্তৃত ছিল। বর্তমান রাজবাড়ীটি হল অতীতের

বর্ধমান দুর্গ, একথা গোলাম হোসেন সলিমের 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর ফৌজদারের কার্যালয়টির কোন গুরুত্ব না থাকায় বর্ধমান দুর্গ পরিত্যক্ত হয়েছিল। বর্ধমানের জমিদার একাধারে স্থানীয় শাসক ও রাজস্ব আদায়ের কার্য পরিচালনা করতেন। মহারাজা ত্রিলোকচাঁদ পরিত্যক্ত দুর্গটি অধিকার করে স্বীয় বসতবাটি ও লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু মহারাজা তেজচন্দ্রের সময়কাল পর্যন্ত তাঁরা যে কাঞ্চননগরে বসবাস করতেন, সেকথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। বর্ধমান দুর্গের আশে-পাশে কয়েকটি বাজারের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা, রেকাবী বাজার, মোগলটুলি, বহরাম বাজার, মহাজনটুলি। বিদেশী বণিকেরা এই সকল বাজারে মাল ক্রয় বিক্রয় করত এবং মহাজনটুলিতে শেঠেদের গদিতে হুণ্ডি ভাঙান হ'ত।

১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাংলার নবাবীর বিনিময়ে নবাব মীরকাশিম খান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম উপঢৌকন দেওয়ায় বর্ধমানে একজন রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করে পাঠান হয়। রেসিডেণ্ট ও কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা হিন্দু ও মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা থেকে একটু দূরে বসবাস করতেন। রাজবাড়ীর পূর্বভাগের এলাকাটির নাম ছিল মোরাদপুর এবং মোরাদপুরের পূর্বপ্রান্তে বিদেশীরা বাসস্থান নির্মাণ করেছিল। রেভারেণ্ড লঙের বিবরণে জানা যায় যে, গোলাপবাগের সন্নিকটে একটি গীর্জা নির্মিত হয়েছিল। বর্ধমান শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় নিউ মিলিটারী রোড নির্মাণের পর, যা পরবর্তীকালে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে চিহ্নিত হয়েছে। স্টেশন সংলগ্ন রাস্তার ধারে ছিল একটি মিলিটারী শিবির বা এনক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড। বর্তমানে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড হল 'স্পন্দন' নামে ফুটবল খেলার মাঠ। নবাবী আমলে বর্ধমান-কালনা, বর্ধমান-কাটোয়া, বর্ধমান-দিগনগর ও বর্ধমান মেদিনীপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায় রেনেলের মানচিত্রে। বর্ধমান শহরের আশেপাশে কয়েকটি স্থানে নীলকুঠি ও রেশমকুঠি স্থাপিত হয়েছিল। কোন স্থানকে জানতে হলে তার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে নগর পরিক্রম করে একালের অবস্থার পর্যবেক্ষণের গুরুত্বের কথা স্মরণ করে নগরদর্শন শুরু করুন।

(৩)

শহরের দ্রষ্টব্য স্থান

দূর থেকে বর্ধমান শহর দর্শনে অভিলাষীদের প্রথমে রেলস্টেশনে পৌঁছাতে হ'বে। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী ছিল একটি স্মরণীয় দিন ; হাওড়া হ'তে রাণীগঞ্জের পথে গুরুত্বপূর্ণ এই রেলস্টেশনটির যেদিন শুভ উদ্বোধন হয়েছিল। ৩টি মাত্র ছোট ছোট ঘর নিয়ে রেলস্টেশনের সূচনা। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে নূতন

রেল ইয়ার্ড, কর্মচারীদের বাসস্থান ও স্টেশন ভবন নির্মাণ করা হয়। স্টেশন পার হয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ডানদিকে দেখা যাবে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড খেলার মাঠ। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলে রাস্তার বাঁ দিকে একটি গুরুদ্বার চোখে পড়বে। প্রায় ৫০/৬০ বৎসর পূর্বে বর্ধমানের জনৈক সিভিল সার্জেন শিখ সম্প্রদায়ের জন্য একটি গুরুদ্বার নির্মাণ করেন। অতীতে এই স্থানে একটি অনাথ আশ্রম ছিল। গুরুদ্বার থেকে দক্ষিণমুখে অগ্রসর হওয়ার পর বর্ধমান পৌরসভার কার্যালয়টি দেখা যায়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কালেক্টারের অফিসের মধ্যে পৌরসভার কার্যালয় ছিল। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে গীর্জার একাংশ ২৫ টাকায় ভাড়া নিয়ে কার্যালয় স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্তীকালে পুরাতন পোস্ট অফিসের বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং ঐ স্থানেই একটি বাজার ছিল। শোনা যায় ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা মে পৌরসভার কোন পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে যোগসাজসে অগ্নিসংযোগ করা হ'লে সমস্ত অফিসটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। পৌরসভার প্রতিনিধি লালা নির্মলপ্রকাশ নন্দের অর্থ সাহায্যে নূতন পৌর ভবন নির্মিত হয় এবং আজও সেখানেই পৌরভবনের সদর কার্যালয় অবস্থিত আছে।

গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের বামভাগে রয়েছে একটি সুউচ্চ মন্দির এবং এই মন্দিরে কালিকা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কালীমন্দিরের পিছনে রয়েছে বিশাল বাস স্ট্যাণ্ড। বাস স্ট্যাণ্ডটির নাম তিনকোনিয়া বাস স্ট্যাণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে বাসযোগে যাওয়ার জন্য এখানে অপেক্ষা করতে হয়। বাস স্ট্যাণ্ড ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলে কেবলমাত্র কালনাগামী বাসের জন্য রাস্তার উপর আর একটি বাস স্ট্যাণ্ড চোখে পড়বে। এই স্থান হতে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে দক্ষিণমুখে যাওয়ার সময় দেখা যাবে একটি সুউচ্চ তোরণ। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাবের রাজ্যাভিষেকের সময় বাংলার লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর বোর্দিলিয়ন বর্ধমান শহরে উপস্থিত ছিলেন। পরবৎসর জানুয়ারী মাসে, বিজয়-চাঁদের আমন্ত্রণে বড়লাট লর্ড কার্জনের আগমন উপলক্ষে একটি সুউচ্চ সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল। এই তোরণের নাম ছিল 'স্টার অব ইণ্ডিয়া'। পরে কোন একসময়ে বড়লাটের নামানুসারে তোরণটি 'কার্জন গেট' নামে অভিহিত হয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে নির্মাতার নামানুসারে তোরণটির নামকরণ করা হয় 'বিজয় তোরণ'। বিজয় তোরণের সম্মুখভাগে একটি বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যে রয়েছে জেলা পরিষদ, ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জজ ও অন্যান্য সরকারী কার্যালয়। আর তোরণের পশ্চিমভাগে বিজয়চাঁদ রোড ধরে সোজাসুজি রাজবাড়ীতে পেঁছান যায়।

বিজয়চাঁদ রোড ধরে পশ্চিমমুখে রাণীগঞ্জ মোড় পার হ'য়ে রাস্তার ডানদিকে বর্ধমানের সদর থানা কার্যালয় দেখা যায়। থানার বিপরীত ভাগে রয়েছে উদয়-চাঁদ জেলা গ্রন্থাগার। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে মহারাজা উদয়চাঁদের নামে এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে মহারাজা আফতাবচাঁদ রাজ লাইব্রেরী

প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে যেস্থানে রূপমহল সিনেমা রয়েছে তার পিছনেই ছিল রাজ লাইব্রেরী। জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির পর রাজ লাইব্রেরীর অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়েছে। উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণের মধ্যে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের কার্যালয় আছে। থানা হ'তে একটু পশ্চিমদিকে এগিয়ে বামভাগের গলিতে কিছুটা অগ্রসর হলে দেখা যাবে, ১৭১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট নূরানী মসজিদ। নূরানী মসজিদের সামনেই ছিল নবাব-দোস্ত কাম্রেম লেনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির। বড়বাজারে রাস্তার উপরে রয়েছে ঊনবিংশ শতকের তৈরী এক গম্বুজ বিশিষ্ট বড়বাজারের মসজিদ। বর্ধমানের শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দে গুরু নানকের বর্ধমান আগমনের কথা বলেন। গড়গড়ার নিকটে শিখদের প্রাচীন গুরুদ্বারে লিখিত বিবরণ হতে এ তথ্য জানা যায়। বর্ধমান শহরের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে খ্রীস্টান মিশনারি স্কুলটির প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। খোসবাগানের নিকটে একখণ্ড জমি ক্রয় করে ১৮৩২ সালে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের জন্য এই জুনিয়ার ইংরাজী বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল; অবশ্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মিশনারিরা সুকৌশলে ধর্মান্তরকরণের কাজটিও সম্পন্ন করায় সেকালে বিদ্যালয়টি তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয় নাই।

খোসবাগানে ছিল রাজাদের সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান এবং এতদঞ্চলে বাঈজি ও গণিকারা বসবাস করত। পরবর্তীকালে খোসবাগান একটি ব্যবসা প্রধান এলাকারূপে গড়ে ওঠার ফলে গণিকাদের মহাজনটুলিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এই পল্লীর মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি পুরাতন উপাসনালয় আছে। বর্ধমান শহরের আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্যগুলির মধ্যে রাজবাড়ী হ'ল অন্যতম। দূর হ'তে একটি টাওয়ারের উপর স্থাপিত বড় ঘড়িটি নজরে পড়ে, কিন্তু ঘড়িটি বন্ধ হ'য়ে গেলেও রাজবাড়ীর অস্তিত্বকে ঘোষণা করছে। জহুরীপাটিকে বাঁ দিকে রেখে উত্তর-পশ্চিমমুখে এগিয়ে গেলে রাজবাড়ীর উত্তর ফটক চোখে পড়বে। রাজপ্রাসাদের প্রবেশের মুখে সুউচ্চ তোরণদ্বারটির জন্য এলাকাটি উত্তর ফটক নামে পরিচিত। তোরণদ্বার পার হয়ে সম্মুখে অবস্থিত যে বিশাল অট্টালিকাটি চোখে পড়বে তা ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদ কর্তৃক নির্মিত, 'মহতাব মঞ্জিল' নামে প্রসিদ্ধ। মহতাব মঞ্জিলের পূর্বভাগে আছে 'মুবারক মঞ্জিল'। বর্তমান রাজপ্রাসাদটি যে অতীতে বর্ধমান দুর্গের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ইটালীয় স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত 'মহতাব মঞ্জিল' একসময়ে দর্শকদের নিকট বিস্ময়ের বস্তু ছিল। বর্তমানে রাজপ্রাসাদে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজাধিরাজ বিপুল ভুসম্পত্তি সহ রাজপ্রাসাদটিও দান করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট অফিসের প্রবেশপথের মাথায় শ্বেত পাথরের উপর ক্ষোদিত লিপি হ'তে 'মহতাব মঞ্জিলের' প্রতিষ্ঠার তারিখ জানা যায়।

"মহ্‌তাব মঞ্জিল"

This building was commenced in 1849 and was finished occupied, and named by me in 1851.

Sd/Mahatab Chand
Maharajadhiraj Bahadur
Burdwan

বিজয়চাঁদ রোডের পশ্চিম প্রান্তে কাপড়পট্টী ও সোনাপটি পার হয়ে সুউচ্চ তোরণ চোখে পড়বে। তোরণের সম্মুখে রাজা বনবিহারী কাপুরের আবক্ষ মর্মর মূর্তি স্থাপিত আছে। তারপর অজ্ঞমান কাছারী বাড়ী এবং তার পশ্চিমে বসত বাড়ী এবং সর্বশেষ ভাগে প্রসাদ নির্মিত হয়েছিল। বর্তমান রাজপ্রাসাদ নির্মাণের পূর্বে রাজা ত্রিলোকচাঁদ রাজবাড়ী ও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অসমাপ্ত কার্য তেজচন্দ্র ও মহ্‌তাবচন্দ্রের আমলে সম্পূর্ণ হয়। সোনাপট্টী পার হ'য়ে একটি সুউচ্চ তোরণদ্বার অতিক্রম করে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। মন্দির চত্বরের উত্তরভাগের গৃহে রাজবাড়ীর বর্তমান সুযোগ্য বংশধর ডক্টর প্রণয়চাঁদ মহ্‌তাব বর্ধমান শহরে অবস্থানকালীন সময়ে বসবাস করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের প্রবেশপথের সামনে ধ্বংসপ্রাপ্ত রাসমঞ্চটির অস্তিত্ব রয়েছে। একটি সুউচ্চ ও সুদৃশ্য দালান মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণজীউ অধিষ্ঠিত আছেন। লক্ষ্মীনারায়ণজী বা কেশব রায় হ'লেন রাজপরিবারের গৃহদেবতা। এই মন্দির চত্বরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে রাজ-পরিবারের কুলদেবী চণ্ডিকামাতার শিলামূর্তি রক্ষিত আছে। ঝুলন পূর্ণিমার পূর্ব-দিন চতুর্দশী তিথিতে চণ্ডিকামাতার মহেচ্ছা পূজায় বর্ধমানের ক্ষত্রিয়গণ অংশগ্রহণ করেন। মূল মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা ত্রিলোকচাঁদ। এই মন্দিরটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, মন্দিরের নিম্নভাগ ভূগর্ভে অবস্থিত এবং সিঁড়ি দিয়ে নেমে শিবলিঙ্গ দর্শন করতে হয়। পূর্বতন রাজবাড়ীর মধ্যে বালিকা বিদ্যালয় ও উইমেনস্‌ কলেজ স্থাপনের জন্য রাজপরিবার গৃহটি দান করেছেন। মহারাজা তেজচন্দ্রের একমাত্র পুত্র প্রতাপচাঁদকে বর্ধমানের রাজবাড়ী হ'তে সুকৌশলে বিতাড়িত করে তাঁকে জাল রাজা প্রতিপন্ন করেছিলেন পরাণবাবু। পরাণ-চাঁদ কাপুর ছিলেন মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাবচাঁদের পিতা। পরাণবাবুর বসত বাড়ী বা দেওয়ানের বাড়ী ছিল আমড়াতলা গলিতে। দেওয়ান বাড়ীতে ১২৩২ সালে শ্রীশ্রী৺মদনমোহনজীউ ঠাকুরবাড়ী স্থাপিত হয়েছিল, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পরাণ-চাঁদ কাপুর। এই সুবিশাল প্রাসাদোপম গৃহে পুরাতন বাণীপীঠ বিদ্যালয় ছিল ও বর্তমানে পোস্ট অফিস আছে।

রাজপরিবারের অপর একটি বিগ্রহ রয়েছে নূতনগঞ্জে। এই মন্দিরবাড়ীটি রাধাবল্লভ জীউর মন্দির নামে খ্যাত। "১৭৪২ শকাব্দে মহিষী কমলকুমারীর সহিত মহীপতি তেজচন্দ্র শ্রীমনভগবৎ-প্রীত্যর্থে-স্বশক্তি রাধাবল্লভ মূর্তি স্থাপন করিয়াছেন।"

উক্ত মন্দিরের পূর্বভাগে "১৭৪১ শকাব্দে কমলকুমারীর সহিত নৃপতিকুলমান্য বর্ধমানাধিরাজ দানবীর শিবভক্ত ভুপতি তেজচন্দ্র মহাদেব-প্রীত্যর্থে সশক্তি রাজরাজেশ্বর নামক শিব স্থাপন করিয়া ১৭৪২ শকাব্দে সর্বশুভ বিধাত্রী-অন্নদাত্রী-অন্নপূর্ণা স্থাপন করিয়াছেন।" রাধাবল্লভ মন্দির দর্শনান্তে প্রত্যাবর্তনের সময় সম্মুখভাগে ইতালীয় স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত এক প্রাসাদোপম গৃহ দেখা যায়। এই গৃহে বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। রাজ কলেজের পশ্চাদ্ভাগে আহিরী-মহলে ১৩০৬ সালে মহারাজা বিজয়চাঁদের আমলে 'বিজয় চতুষ্পাঠী'র প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে এই চতুষ্পাঠীটি সরকারী অনুদানে পরিচালিত হচ্ছে। অধ্যক্ষ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য সহ ৩ জন অধ্যাপক ও ১৪ জন আবাসিক ছাত্র সহ ৭০ জন ছাত্র অধ্যয়নে রত আছেন। মহারাজা তেজচন্দ্রের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ভারত চতুষ্পাঠী'। শোনা যায়, পায়রাখানা গলিতে এই চতুষ্পাঠীর গৃহ ছিল। বর্ধমানের রাজারা ভারত চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতবর্গের দ্বারা মহাভারত, রামায়ণ, চাহার দরবেশ, কমলাকান্তের পদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। 'সত্য-প্রকাশ' নামক মুদ্রণ কার্যালয়টি লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির বাড়ীতে স্থাপিত হয়েছিল।

রাজবাড়ীর চত্বরের মধ্যে পায়রাখানা গুলিতে খক্কর সাহেবের মাজারে হিন্দু মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধা জানান। এই মাজারটি দেখে স্বাভাবিকভাবে কৌতূহল জাগে যে, রাজবাড়ীর মধ্যে মাজার নির্মাণের কারণ কি? বিভিন্ন তথ্যসূত্র হ'তে জানা যায় যে, পীর খক্কর সাহেব পীর বহরামের পূর্বে বর্ধমানে এসেছিলেন এবং তাঁর দেহত্যাগের পর দুর্গের একাংশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল; সেকারণে, নূতন রাজবাড়ী নির্মাণের পর সমাধিস্থলটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করে দেওয়া হয়। খক্কর সাহেব কাবুল হ'তে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বর্ধমানে এসেছিলেন। প্রতি বৎসর ১৭ই ফাল্গুন বাৎসরিক উরস উৎসব পালিত হয়। এই আস্তানাটি দেখাশোনার জন্য ওয়াকফ কমিটি আছে। বর্ধমানবাসী নূরুল ইসলাম ও আরো অনেকে এর পরিচালনা করেন। পায়রাখানা গলির দক্ষিণভাগে রাজা বনবিহারী কাপুরের কন্যাশক্তিদেয়ী ১৩০৭ সালে রাধারমণজীউ ও শক্তিদুলালজীউর মূর্তি সহ একটি সুবৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণের নিকট এই দেবগৃহটি শক্তিবিবির মন্দির নামে খ্যাত। পায়রাখানা গলির দক্ষিণভাগের পল্লীটির নাম 'ময়ূরমহল'। মনে হয় আদিতে এই পল্লীটির নাম ছিল মেহের মহল। মেহের মহল নামকরণের সার্থকতা এই যে, হয়ত বর্ধমানে অবস্থানকালীন সময়ে মেহেরউন্নিসা ও তাঁর স্বামী শের আফগান এতদঞ্চলে বসবাস করতেন। পায়রাখানা গলির মধ্যে পশ্চিমমুখে এগিয়ে গেলে বর্ধমানের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জুম্মা মসজিদ দেখা যাবে। শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহ দমনের সময় সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র শাহাজাদা আজিম-উস-শান বর্ধমান শহরে তিন বৎসর অবস্থানকালীন সময়ে ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে দুর্গের মধ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি জুম্মা মসজিদ নামে খ্যাত।

মসজিদ লিপিতে সম্রাটের নাম ক্ষোদিত আছে। এই রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গেলে রাজবাড়ীর পশ্চিমভাগে অবস্থিত একটি মসজিদ দেখা যায়। শোনা যায়, এই মসজিদটি রাজবাড়ীর মধ্যে ছিল এবং রাজাদের ব্যয়ে মসজিদটির স্থানান্তরিত করা হয়েছে। শিলালিপি হতে জানা যায় যে, হিজরা ১২৮০ অব্দে হাজীবুদ্ধু নামক একধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

জহুরীপটী পার হ'য়ে ডানদিকের গলি-রাস্তায় মিঠাপুকুর যাওয়ার পথ। মিঠা-পুকুরে নারায়ণী শক্তিবাড়ীতে (মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাবচাঁদের দ্বিতীয়া পত্নী) ১৩০৬ সালে ৩০শে ফাল্গুন সোনার কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টধাতুর ভুবনেশ্বরী কালিকামূর্তি ও মহাদেবের মূর্তি দুটি পৃথক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবীমূর্তির পাশে একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন দেখা যায়। মিঠাপুকুর পল্লীর মধ্যে আছে হাতিপুকুর। এই পুষ্করিণীতে রাজবাড়ীর হাতিদের স্নান করান হ'ত। উত্তর ফটকের সামনে শুলীপুকুরের পাড়ে রাজার ঘোড়াশালা ছিল এবং ফিটনের ঘোড়াগুলি ঐ আস্তাবলে রাখা হত। অতীতে কোম্পানির আমলে শুলীপুকুরে একটি জেলখানা ছিল। জহুরীপটির আস্তাবলে অশ্বারোহী সৈন্যদের ঘোড়া রাখার জায়গা ছিল। রাজবাড়ীর পশ্চিম দিকে ছিল ভেরীখানা। এখানে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র সহ বাদ্যকরদের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। আরও দক্ষিণ দিকে বাঁকা নদীর উপর নির্মিত সেতুটি তেজচন্দ্রের আমলে তৈরী হয়েছিল বলে দাবী করা হয়, কিন্তু সেতুটি দেখে মনে হয় যে, এটি পূর্বে নির্মিত কোন সেতুর সংস্কার করে তেজচন্দ্রের নামে প্রতিষ্ঠাফলক লাগান হয়েছে।

রাজবাড়ীর দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে পুরাতন চক এলাকায় যাওয়া যায়। জুম্মা মসজিদ দেখে চক এলাকার দিকে এগিয়ে গেলে চোখে পড়বে কালমসজিদ। মসজিদের রঙ কালচে ধরনের হওয়ায় এরূপ নামকরণ হয়েছে। মসজিদের ক্ষোদিত শিলালিপি হ'তে জানা যায় যে, শের শাহের আমলে এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। পুরাতন চক এলাকার দক্ষিণভাগে অবস্থিত আছে এক বিশাল সমাধিক্ষেত্র। স্থানীয় লোকের নিকট এই সমাধিক্ষেত্রটি পীর বহরাম নামে খ্যাত। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে পারস্য দেশীয় এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান সিংহল যাত্রার উদ্দেশে বর্ধমান শহরে আসেন। সেই সময়ে উক্ত স্থানে যোগী জয়পাল নামক এক হিন্দু সাধকের সাধনভজনের স্থল ছিল। জয়পাল আশ্রয় দিলেন পীর বহরামকে। পীর বহরামের দেহত্যাগের পর জয়পালের বাগানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় এবং তাঁর দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে সম্রাট আকবর সমাধি গৃহটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সমাধি ভবন৷ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্রাট পুরাতন চক, ফকিরপুর ও মির্জাপুর মৌজা দান করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে শেখ বক্তিয়ারকে সমাধি ভবনের মুতওয়ালি নিযুক্ত করা হয়। সমাধি ভবনের প্রতিষ্ঠা-লিপি হ'তে এ সকল তথ্য জানা যাবে (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬-৯০)। পীর বহরামের সমাধিক্ষেত্রে দু'জন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সমাধি অবস্থিত আছে। এঁদের মধ্যে

প্রথমজনের পরিচয় হ'ল—ভারত সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রথম স্বামী শের আফগান এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হ'লেন বাংলার সুবেদার কুতুবুদ্দিন কোকা, যিনি সম্রাটের আদেশে নূরজাহানকে জোর পূর্বক আগ্রায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং এর ফলশ্রুতিস্বরূপ দুজনেই সাধনপুরের মাঠে নিহত হ'ন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সমাধির উপর ক্ষোদিত লিপিতে যে সাল, তারিখের উল্লেখ আছে সেটি ভুল। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরি' গ্রন্থে আছে যে, ১৬০৭ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে মে উভয়েই নিহত হয়েছিলেন। সমাধি চত্বরের বাইরে একটি পরিত্যক্ত কূপ দেখিয়ে বলা হয় যে, এটি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে উল্লিখিত সুড়ঙ্গপথ।

রাধাগঞ্জের পুল পার হয়ে আলমগঞ্জের রাস্তা ধরে দক্ষিণ পূর্বমুখে এগিয়ে গেলে খাজা আনোয়ার বেড় নামক পল্লী অবস্থিত। বেড়ের প্রসিদ্ধি হ'ল নবাববাড়ীর জন্যে। শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় পরবর্তী পর্যায়ের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উড়িষ্যার রহিম শাহ। রহিম শাহ সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনা করার সময় আজিম-উস-শানের উজীর খাজা আনোয়ার এই স্থানেই নিহত হ'ন এবং তাঁকে বেড়ের নবাব-বাড়ীতে সমাধিস্থ করা হয়। এই সমাধি ভবনটি সম্রাট ফারুক শায়র নির্মাণ করেছিলেন। সমাধি ভবন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব খাজা আনোয়ারের কন্যা বংশের উপর অর্পিত হয় এবং তাঁরা বেড়ের নবাব বলে পরিচিতি লাভ করেন। সমাধি ভবনের মধ্যে নির্মিত মসজিদ, অট্টালিকা ও একটি সুন্দর বাগান ছিল। নবাব-বাড়ির ভিতর একটি পুকুরের মধ্যস্থলে রয়েছে মনোরম জলটুঙ্গি, যা একটি সেতুর দ্বারা পশ্চিম-পারের সঙ্গে যুক্ত আছে। নবাব-বাড়ীর শৌখিন মানুষেরা পূর্ণিমার রাতে এখানে জলসা বসাতেন এবং এই কাহিনী কিম্বদন্তী হয়ে আছে। বেড়ের উত্তরভাগে রয়েছে একটি কালীমন্দির। ভারতী দেবী নামে এক সিদ্ধ সাধিকা এই মন্দিরটি তাঁর মাতামহীর নামে উৎসর্গ করেন। স্থানীয় মানুষের কাছে এটি ভারতী দেবীর কালীবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী মহিলা ছিলেন। বোরহাট পল্লীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি এই কথাই ঘোষণা করছে।

আলমগঞ্জের দক্ষিণভাগে একটি নির্জন স্থানকে সতীর মাঠ নামে চিহ্নিত করা হয়। অতীতে এই স্থানে সতীদাহ হ'ত বলে স্থানটি এই নামে পরিচিত। কোন দু'জন সতীর দাহস্থলের উপর স্মারকচিহ্নস্বরূপ দু'টি ইষ্টক নির্মিত সমাজ রয়েছে। সতী মন্দিরের উত্তরে একটি দক্ষিণমুখী মন্দিরে কালিকা দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। বর্ধমান শহরে আরও একটি সতী মাঠের সন্ধান পাওয়া যায়। বীরহাটা ব্রিজ থেকে পূর্বমুখে ইছলাবাদের পথে একটু এগিয়ে গেলে বাঁকা নদীর তীরে সতীদাহ হ'ত এবং এই স্থানটিকেও সতী মাঠ বলে। এখানেও একটি স্মারকচিহ্ন রয়েছে।

তেজগঞ্জ রোড ধরে চালকল এলাকার মধ্যে (ফকিরপুর) বর্ধমানেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৩৭৯ সালে ২৫শে শ্রাবণ বাঁকা নদীর দক্ষিণে আলমগঞ্জ পল্লীর

ভিখারী-বাগানে স্বর্গীয় চারুচন্দ্র দে-র কৃষিক্ষেত্র সংলগ্ন উচ্চ ভূখণ্ড খনন করার সময়ে ৩৫০ মন ওজনের একটি শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই শিবলিঙ্গটি বর্ধমানেশ্বর নামে বিখ্যাত। শিবলিঙ্গের উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি ও ব্যাস প্রায় ৬ ফুট এবং গৌরী-পট্টের পরিধি হ'ল প্রায় ১৮ ফুট। কয়েক বৎসর পূর্বে নির্মল ঝিলের কাছে বাঁকা নদীর খাত সংস্কার করার সময় এক টন ওজনের একটি কালো পাথরের ষাঁড় আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেকের মতে দেবাদিদেব ও তাঁর বাহনটি দ্বাদশ শতকের শিল্পকর্মের নিদর্শন। এই স্থানে শিবরাত্রিতে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বাইপাস অতিক্রম করে তেজগঞ্জের দক্ষিণ অংশের একটি দালান মন্দিরের মধ্যে অধিষ্ঠিতা আছেন প্রস্তরনির্মিত একটি কালী-মূর্তি। এই মন্দিরটি মহারাজা তেজচন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরের সম্মুখভাগে সামান্য টেরাকোটা অলঙ্করণ রয়েছে। কালী মন্দিরের দক্ষিণে নাটমন্দির ও নাটমন্দিরের দক্ষিণে একটি চারচালা মন্দিরে কালভৈরব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর বৃষভবাহন সহ কালভৈরব মূর্তি ক্ষোদিত আছে। কালীমন্দির দেখে তেজগঞ্জের মধ্যে একটি জঙ্গল অধ্যুষিত স্থানে গড়ের চিহ্ন দেখা যায়; তবে গড়ের খাতের কিয়দংশ ব্যতীত আর কিছু লক্ষিত হয় না। বাইপাস রাস্তা ধরে উত্তরমুখে দু' কিলোমিটার এগিয়ে গেলে কাঞ্চননগরের রথতলা দেখা যাবে। রথতলা হ'তে পশ্চিমমুখে ইডেন ক্যানেল পার হয়ে কাঞ্চননগর ও উদয়পল্লীতে বারদ্বারি দেখে (বিশেষ বিবরণ ২১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) পুনরায় রথতলায় ফিরে আসতে হ'বে। রথতলা হ'তে একটু এগিয়ে গেলে বামভাগে লাকুর্ডি পল্লীতে যাওয়া যাবে। লাকুর্ডির মশানে অধিষ্ঠিত আছেন দুর্লভাকালী। পরিব্রাজক ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান ভ্রমণের সময় দুর্লভাকালীকেই বিদ্যাসুন্দর কালী বলে উল্লেখ করেছেন। লাকুর্ডিতে সর্বপ্রথম ২২০০০০ টাকা ব্যয়ে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে প্রথম জলকল প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজা আফতাব-চাঁদ এই কার্যের জন্য ৫০০০০ টাকা দান করেছিলেন। দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টার পর ভূগর্ভে পাইপ বসিয়ে রাস্তায় ও গৃহস্থের বাড়ীতে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে পৌরপিতা ছিলেন বর্ধমান কোর্টের উকিল রায় বাহাদুর নলিনাক্ষ বসু। জল-কলের জন্য এত অধিক আবেদন পত্র জমা পড়েছিল যে, একদিন বার লাইব্রেরীতে বসে নলিনাক্ষ বসুকে চিন্তিত দেখে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটুকরো কাগজে লিখলেন,—

> 'একি হল উপসর্গ, ঘরে ঘরে সংসর্গ
>
> জল যোগান হ'ল বুঝি দায়।
>
> রায় বাহাদুর টাক ফুরফুর
>
> গাড়ু গামছা হাতে নিয়ে ভাবছেন উপায় ॥'

ইন্দ্রনাথের কবিতা শুনে উকিল মহলে সেদিন খুব হাসির ধুম পড়েছিল।

লাকুর্ডি দেখে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দিকে এগিয়ে বামভাগের রাস্তা ধরে বর্গী হাঙ্গামার সময় বর্ধমান শহরকে রক্ষা করতে একটি গড় নির্মিত হয়েছিল। এই গড়ের

নাম ছিল তালিতগড় বা মহব্বতগড়। গড়টি ধ্বংস হ'য়ে গেলেও মাটির প্রাচীরের কিছু কিছু অংশ এখনও দেখা যায়। এখনও দুই একটি জায়গায় ৫০ ফুট চওড়া ও ৩০ ফুট উচ্চ প্রাচীরের অস্তিত্ব রয়েছে। বর্ধমান 'রাজবংশানুচরিত' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে এই গড় পাহারা দেওয়ার জন্য ১৩ জন অশ্বারোহী ও ৪৯ জন পাইক নিযুক্ত ছিল। তালিতগড় হ'তে প্রত্যাবর্তনের পথে নবাবহাটে ১০৯টি শিবমন্দির দেখার জন্য সিউড়ি রোডের দিকে এগিয়ে যান। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে মহারাণী বিষণকুমারী দেবী নবাবহাটে ১০৯টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (বিশেষ বিবরণ ২৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। শিবমন্দিরগুলি দর্শন করে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে স্টেশনের দিকে প্রত্যাবর্তনের পথে কমলসায়র চোখে পড়বে। মহারাজা তেজচন্দ্র তাঁর পঞ্চম মহিষী কমলকুমারীর নামে এক সুবৃহৎ সায়র ও একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তবে মন্দিরটির কোন অস্তিত্ব নাই। এই পল্লীতে মহারাজার ব্যয়ে একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হ'তে জানা গেল যে, মহারাজা গোলাপবাগ প্রস্তুত করার সময় উক্ত স্থানে মুসলমান অধিবাসীদের কমলসায়র পল্লীতে বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং মহারাজের অর্থানুকূল্যেই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। পল্লীবাসী আবদুল করিমের নিকট হ'তে জানা গেল যে, বর্তমানে এখানকার মুসলমান বাসিন্দাদের অর্থ সাহায্যে মসজিদের ব্যয়ভার বহন করা হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, রমনার বাগানের পূর্বে হাজিপোতা নামক পল্লীর মুসলমান বাসিন্দারা কমলসায়রে এসেছিল, কিন্তু হাজিপোতার পুরাতন মসজিদের অস্বিত্ব এখনও আছে। কমলসায়র দেখে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে স্টেশনের পথে লক্ষ্মীপুর পল্লীতে জোড়া মন্দির চোখে পড়বে। প্রথম শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কৃপাময় চৌধুরী এবং দ্বিতীয় মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন পণ্ডিত নাথুন চতুর্বেদী। তিনি এই মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান, রাধাকৃষ্ণ, শিব ও মহাকাল ভৈরব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র পণ্ডিত রামবিলাস চতুর্বেদী এই স্থানে বিশ্বকল্যাণ আশ্রম ও লক্ষ্মী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় পরিচালনা করেন।

শহরের উত্তর-পশ্চিমে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দক্ষিণভাগে এক সুবিশাল রমণীয় উদ্যান চোখে পড়বে। এই উদ্যানটি গোলাপবাগ নামে খ্যাত। গোলাপবাগের মধ্যে রয়েছে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী ও বিশাল অট্টালিকা। মহারাজা উদয়চাঁদ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে এটি দান করেন এবং এই স্থানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়তনগুলি গড়ে উঠেছে। গোলাপবাগের পূর্বে রয়েছে একটি রমণীয় উদ্যান, যা রমণার বাগান নামে খ্যাত। বর্তমানে এই উদ্যানটি রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের হাতে আছে। রমনার উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বিজয়ানন্দ বিহার'। উদ্যানটি দেখে একটি আশ্রমের কথা মনে হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে মহারাজা মহ্‌তাবচাঁদ এক সময়ে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন এবং আশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল তাঁরই। মহর্ষিও মধ্যে মধ্যে বর্ধমানে এসে রমনার বাগানে উপাসনা করতেন ; তবে আশ্রমটির

নূতন রূপদান করেছিলেন মহারাজা বিজয়চাঁদ। আশ্রম মধ্যস্থ একটি স্তম্ভলিপি হ'তে জানা যায় যে, ১৩২২ সালে এই আশ্রমটি নূতনভাবে সাজান হয়। বিজয়ানন্দ বিহার বা বিজয়মঞ্জিলের মধ্যে মহারাজা বিজয়চাঁদ ও মহারাজা উদয়চাঁদের সমাধি রক্ষিত আছে। রমনার বাগানের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল।' বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় সরকার ও জাপানের 'গেটো অপটি-ক্যাল 'ম্যানুফ্যাকচারিং' কোম্পানীর সহযোগিতায় পুরোপুরি কম্পিউটার চালিত তারামণ্ডলটির উদ্বোধন হ'ল ১৯৯৪ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে। একসঙ্গে ৯০ জন দর্শকের বসার উপযুক্ত আসন আছে। তারামণ্ডলের অনতিদূরে গড়ে উঠেছে একটি সর্বাধুনিক বিজ্ঞান কেন্দ্র। এই বিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রায় ৫০০ রকমের ছোট বড় সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। রসায়নের উপর এত আধুনিক প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে যা ভারতবর্ষের অন্যত্র দেখা যায় না এবং জীববিদ্যা সম্পর্কিত কেন্দ্রটি বিশেষত্বের দাবী রাখে। এই ধরনের বিজ্ঞান কেন্দ্র অন্যান্য স্থানে তৈরী হ'লে বিজ্ঞানপ্রেমী মানুষদের বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়িয়ে তুলবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রমনার বাগানের দক্ষিণ অংশের নাম আনন্দবাগ; আর গোলাপবাগের দক্ষিণভাগে তারাবাগে গড়ে উঠছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কর্মীবৃন্দের আবাসস্থল। তারাবাগের আরও দক্ষিণে রয়েছে রবীন্দ্রভবন নামে একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ এবং এই অঞ্চলেই আছে মোহনবাগান নামক একটি ফুটবল খেলার মাঠ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, অতীতে জেলা স্তরে বর্ধমানের ফুটবল দলটির নাম ছিল বনবিহারী একাদশ।

এবার কৃষ্ণসায়রের তীরে ফেরা যাক। বর্ধমানের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সায়র ও বাগ (বাগান)-এর সম্পর্ক নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। ভারতচন্দ্র উল্লেখ করেছেন,—

"বর্ধমান মহাস্থান
চৌদিকেতে পুষ্পবন।"

হয়ত সেকারণেই অনেকের মতে বর্ধমানের নাম হ'ল কুসুমপুর। বর্ধমানের ৪টি বিখ্যাত সায়রের মধ্যে গোলাপবাগের সন্নিকটে অবস্থিত কৃষ্ণসায়র হ'ল সর্বপ্রধান। কৃষ্ণসায়রের তীরে গড়ে উঠেছে একটি মনোরম উদ্যান। ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের জমিদার কৃষ্ণরাম রায় হ্রদতুল্য এই পুষ্করিণীটি খনন করান। এই স্থানে ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পুত্র জগৎরাম রায় আততায়ীর হস্তে ছুরিকাহত হয়ে নিহত হন। খোসবাগানের উত্তরভাগে কৃষ্ণরামের পিতা ঘনশ্যাম রায় একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করান এবং এটি শ্যামসায়র নামে পরিচিত। শ্যামসায়রের তীরে বিজয়চাঁদ হাসপাতাল, রাজ কলেজ, হরিসভা, ঈশানেশ্বর শিবমন্দির, রামকৃষ্ণ আশ্রম সহ টুকিটাকি অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু আছে। ফ্রেজার রোড ধরে উত্তরমুখে এগিয়ে গেলে আর একটি হ্রদতুল্য পুষ্করিণী চোখে পড়বে। বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদ রায় স্বীয় জননী ব্রজকিশোরী দেবীর নামে ১৭০৯ খ্রীস্টাব্দে রাণী সায়র খনন করান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, রাণী

সায়রের তীরে নবাব আলীবর্দি অবস্থানরত সময়ে ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল গভীর রাত্রে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কররাম নবাব শিবির আক্রমণ করেন। আরও বহু নামী ও অনামী সায়র বা দীঘি বর্ধমান শহরে আছে। কেবলমাত্র সায়রই নয়—বর্ধমানের সুদৃশ্য বাগিচাগুলি একসময়ে শহরটিকে অপরূপ সৌন্দর্যময় করে তুলেছিল। বাগিচাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল, মেহেদীবাগান, খোসবাগান, বাবুরবাগ, গোলাপবাগ, রমনার বাগান, মতিবাগ, আনন্দবাগ, সুন্দরবাগ, শালবাগান, আঞ্জীরবাগান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজবাড়ী হ'তে ডি. ডি. তেওয়ারী রোড ধরে মহান্ত অস্থলে পৌঁছান যায়। অষ্টাদশ শতকে পাঞ্জাবের খাড়া নামক স্থান হ'তে নরহরিদেব নামে একজন সিদ্ধপুরুষ দামোদরজীউ শিলা বিগ্রহসহ বাঁকা নদীর তীরে রাজগঞ্জ পল্লীতে অস্থলের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রায় ২৫০ বছর ধরে সগৌরবে অস্থলটি পরিচালিত হওয়ার পর রাজনৈতিক কারণে এটি বন্ধ হয়ে গেছে। অস্থলের মধ্যে অবস্থিত মন্দির ও বসবাসের গৃহগুলি জীর্ণদশাপ্রাপ্ত হয়েছে। মহান্ত অস্থলের দক্ষিণভাগে বাঁকা নদীর তীরে বর্ধমানের শ্মশানঘাট, যা নির্মল ঝিল নামে পরিচিত। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে লালা নির্মল প্রকাশ নন্দে সর্বসাধারণের জন্য এটি নির্মাণ করেছিলেন এবং এটি হ'ল বর্তমানে সরকারী শ্মশানঘাট। নির্মল ঝিলের বিপরীত তীরে অর্থাৎ বাঁকা নদীর দক্ষিণভাগে বর্ধমানের মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য একটি সমাধিস্থল নির্দিষ্ট আছে। মহান্ত অস্থল দেখে বোরহাটে সিদ্ধসাধক কমলাকান্তের কালীবাড়ী যাওয়া যায়। চান্না গ্রামে মাতুলালয়ে সিদ্ধিলাভ করে অম্বিকাবাসী কমলাকান্ত ভট্টাচার্য মহারাজা তেজচন্দ্রের অনুরোধে বর্ধমানে আগমন করেন। মহারাজা বোরহাট পল্লীতে একটি কালীমন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। কালীমন্দিরের পিছনে আছে কমলাকান্তের পঞ্চমুণ্ডির আসন। বোরহাটে ছিল রাজাদের পুরাতন জেলখানা এবং বর্ধমানে সাঁজোয়াল নিযুক্ত হয়ে নবকৃষ্ণ মুন্সী জেলখানার পাশেই একটা বাটীতে বসবাস করতেন। বোরহাটে ভারতীদেবীর বালিকা বিদ্যালয়ের কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে গোদা নামক পল্লী। কথিত আছে যে, গদাধর নামে একজন সামন্ত রাজা এই অঞ্চলে বাস করতেন এবং তিনি মুসলমানদের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। গোদা পল্লীতে ৫টি মসজিদ আছে। তম্মধ্যে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট বড় মসজিদ ও এক গম্বুজ বিশিষ্ট শাহান মসজিদটি প্রাচীনত্বের দাবী রাখে।

তিনকোনিয়া বাস-স্ট্যাণ্ড হ'তে কালনা রোড ধরে পূর্বমুখে এগিয়ে গেলে প্রথমে চোখে পড়বে ঋষি অরবিন্দের নামাঙ্কিত অরবিন্দ স্টেডিয়াম। আরও পূর্বে রয়েছে পীরপুকুর। পীরপুকুরের সন্নিকটেই আছে জনৈক পীরের দরগা। কালনা রোডে রেল-গেট পার হ'য়ে ১০ মিনিট হাঁটা-পথে এগিয়ে গেলে খাঁপুকুর পল্লীতে সম্রাট ফারুক্‌ সায়র-এর আমলে নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি বিশাল মসজিদ দেখা যায়।

মসজিদের দক্ষিণ পাশেই রয়েছে শেখ বায়াজিদের আস্তানা ও মাজার। শেখ বায়াজিদের ভবিষ্যৎবাণী সফল হওয়ায় ফারুক সায়র সম্রাট হওয়ার পরে এই মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। অতীতে জনবসতি বিহীন এলাকার মধ্যে এই মসজিদটি অবস্থিত হওয়ায় সাধারণের নিকট এটি বন মসজিদ নামে পরিচিত ছিল। বন মসজিদ হ'তে দু' কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আছে সরকারী কৃষি খামার।

তিনকোনিয়া হ'তে বাসে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও সদর ঘাটের পথে দামোদরের তীরে পেঁছান যায়। 'কৃষক সেতু' নির্মাণের ফলে হুগলী, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়েছে। সদরঘাট রোড ও বাইপাসের সংযোগস্থলের নিকট নির্মিত হয়েছে 'পূর্তভবন'। এই বিশাল ভবনে জেলাস্তরের বহু সরকারী অফিস ও ব্যাঙ্কের শাখা আছে। পূর্তভবন যাওয়ার কিছুটা আগে রাস্তার ডানদিকে 'অভয়ানন্দ গিরি'র প্রতিষ্ঠিত 'ওঁ ক্লীং কালীমন্দির' অবস্থিত। বাকসিদ্ধ অভয়ানন্দ পূর্বাশ্রমে ছিলেন নাড়ুগ্রাম নিবাসী এবং তিনি নিকটবর্তী ভুবিলা গ্রামে মাটির নীচে বসে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। ত্রিবেণী ও নাড়ুগ্রামে আশ্রমের শাখা আছে এবং ত্রিবেণীতে তিনি 'মৌনবাবা' নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর দেহান্তের পর ভক্তানন্দ গিরি আশ্রমের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হ'ন।

সদরঘাট ও বিবেকানন্দ কলেজ রোডের সংযোগস্থলে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে বিবেকানন্দ কলেজ। কলেজ অতিক্রম করে সরিষাডাঙ্গা রোড ধরে বেচারহাট পল্লীতে যাওয়া যায়। বেচারহাট পল্লীর পূর্বাংশে রয়েছে রেসকোর্স। অষ্টাদশ শতকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ ও নীলকর সাহেবেরা এই মাঠে পোলো খেলতেন। এখানে মহারাজা মহতাবচাঁদ ও বিজয়চাঁদের আমলে রাজবাড়ীর আস্তাবলের ঘোড়াদের প্রশিক্ষণের স্থান ছিল। রেসকোর্সের উত্তরভাগে গোপালনগর পল্লীতে আছে পুলিশ লাইন। পুলিশ লাইন হতে ভাতছালায় মহারাণী স্টেডিয়াম দেখে পুনরায় শহরে ফিরে আসুন।

বীরহাটায় বাঁকা ব্রীজের সন্নিকটে তেলমাড়ুই পল্লী। নলিনাক্ষ বসু রোড ধরে পশ্চিমমুখে এগিয়ে কুমার প্রতাপচাঁদের নামে প্রতাপেশ্বর শিবের দালান মন্দির অতিক্রম করে বাঁকা নদীর উত্তর তীরে এক সুবিশাল মন্দির চত্বর চোখে পড়বে। এটি হল বর্ধমান শহরে অন্যতম আকর্ষণীয় নগরদেবী সর্বমঙ্গলার অধিষ্ঠানক্ষেত্র। রাধানগর পল্লীর দক্ষিণে বাঁকা নদীর উত্তরে এক সুবিশাল চত্বরের মধ্যে একটি নবরত্ন মন্দিরে দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। বর্ধমান শহরের প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গে এই স্থানটি ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত। শোনা যায়, মূর্তিটি বাহির সর্বমঙ্গলা পল্লীতে এক চুনারীর গৃহে রক্ষিত ছিল। দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে মহারাজা চুনারীর গৃহে গমন করেন কিন্তু তৎপূর্বেই বাঁকুড়া নিবাসী দু'জন ব্রাহ্মণ চুনারীকে কিছু অর্থ দিয়ে দেবী মূর্তি সহ বাঁকুড়ার পথে গমন করেন। মহারাজাও চুনারীর গৃহে মূর্তি হস্তান্তরের সংবাদ শুনে অশ্বারোহণে ব্রাহ্মণদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। ব্রাহ্মণেরা মূর্তি দিতে অস্বীকৃত

হওয়ায় মহারাজা তাঁদের পুরোহিত পদে বরণ করে দেবীকে বর্ধমানে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। সর্বমঙ্গলা দেবীর জনশ্রুতি যা হোক না কেন সর্বমঙ্গলা দেবী বর্ধমান শহরে কয়েকশ বছর ধরে অধিষ্ঠিতা আছেন। বর্ধমানের রাজারা দেবী-কে প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তাঁরা বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন মাত্র। সর্বমঙ্গলার প্রাচীনত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে,—

'বর্ধমানে বন্দো দেবী সর্বমঙ্গলা।
অধিষ্ঠান হন দেবী ঠিক দুপুর বেলা॥"

এছাড়া রামানন্দ যতির 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে, মাণিক গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গলে' ও ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে সর্বমঙ্গলা দেবীর উল্লেখ আছে। সর্বমঙ্গলা মন্দির প্রাঙ্গণে আটচালা শিবমন্দির দুটি রাজা চিত্রসেনের আমলে ও মহারাজা তেজচন্দ্রের আমলে ৩টি শিবমন্দির নির্মিত হয়েছিল। সেকারণে অনুমান করা যায় যে, চিত্রসেনের পূর্বে তাঁর পিতা কীর্তিচাঁদ রায় এই নবরত্ন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। একটি কোষ্ঠিপাথরের উপর ক্ষোদিত অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি সর্বমঙ্গলা নামে পূজিত হ'ন। জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির পর মহারাজা উদয়চাঁদ ও বর্ধমানের বিশিষ্ট নাগরিকদের উদ্যোগে একটি ট্রাস্টি বোর্ডের পরিচালনাধীনে দেবীর সেবা-পূজা হচ্ছে। সর্বমঙ্গলা মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উত্তরভাগে ধনেশ্বরী শক্তিদেবী ও ধনেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৭৯৬ শকাব্দে ২রা আষাঢ় মহারাজা মহতাবচাঁদের কন্যা ধনদেয়ী দেবী (স্বামী গোপীনাথ মেহরা) এই শক্তিমূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরের মধ্যে কারুকার্যখচিত একটি পিতলের রথ আছে। মহালয়া হ'তে লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত নবরাত্র উপলক্ষে বিশেষ পূজা হয়।

সর্বমঙ্গলা মন্দিরের সন্নিকটে পরাণচাঁদ কাপুরের দ্বিতীয় পুত্র তারাচাঁদের একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা ছিল। অপুত্রক তারাচাঁদ এই অট্টালিকাসহ তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহতাবচাঁদের আনুকূল্যে উইল সম্পাদন পূর্বক দান করেন। সেকারণে তারাচাঁদের এই গৃহটি 'উইলবাড়ী' নামে প্রসিদ্ধ। এই গৃহে একসময়ে রাজঅতিথি-শালা ছিল। প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমীতে সাড়ম্বরে গোপাল বিগ্রহের উৎসব পালিত হয়। 'উইল বাড়ীর' কাছে ছিল রাজাদের খাজাঞ্চিখানা। এই পল্লীতে ১৩৭১ সালের ২৮শে চৈত্র ভারত সেবাশ্রম সংঘের অনুমোদিত 'বর্ধমান হিন্দু মিলন' মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ছোট নীলপুর পল্লীতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের মুখ্য কার্যালয় অবস্থিত।

বহিলাপাড়ায় ছিল রাজার গোশালা। অনেকের মতে 'বয়েল' রাখার জন্য বয়েল-পাড়া হতে অপভ্রংশে বহিলা হয়েছে। অনুরূপভাবে যেখানে বিজয় চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই স্থানের নাম ছিল আহিরী মহল এবং চতুষ্পাঠীর পাশে একটি গোশালা ছিল। টোলের পাশে শ্যামসুন্দরের মন্দির বাড়ীকে এখনও গোহাল বাড়ী বলা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বর্ধমানের প্রাচীন গীর্জাটি হেড পোস্ট অফিসের পাশে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে মহারাজার নিকট বাৎসরিক ১২টাঃ ৫০পঃ খাজনা বন্দোবস্ত পূর্বক ফাদার জ্যাকুইস এই গীর্জা নির্মাণ করেছিলেন। লঙের বিবরণে ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে বৈকুণ্ঠপুর পল্লীতে নির্মিত গীর্জাটি ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বিজয়তোরণের পূর্বভাগে রয়েছে এক সুবিশাল চত্বর। এই চত্বরটিকে কোর্ট কম্পাউণ্ড বলা হয়। বর্ধমান শহরে সর্বপ্রথম কালেক্টরের অফিস স্থাপিত হয়েছিল বীরহাটা পুল পার হয়ে বাঁকা নদীর উত্তর ধারে। পরবর্তীকালে জেলা জজ ও কালেক্টরের অফিস কার্জন গেটের কাছে স্থানান্তরিত হয়। একালের রেজিস্টারার-এর অফিস অতীতে জেলা শাসক ও কালেক্টরের অফিস; আর তার পাশের বাড়ীটিতে জেলা জজের আদালত ছিল। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান জজ কোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জেলাগুরের অফিস-আদালতগৃহ জে. সি. ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে এবং শহরের পাওয়ার হাউটি ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। বর্ধমান জেলা পরিষদের সদর কার্যালয় এই প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। সভাধিপতি হলেন জেলা পরিষদের সর্বোচ্চ কর্ণধার। সম্প্রতি-কালে কোর্ট প্রাঙ্গণের মধ্যে নির্মিত হয়েছে একটি সুসজ্জিত ও ১৫০০ দর্শকের আসন বিশিষ্ট আধুনিক সাংস্কৃতিক মঞ্চ। কোর্ট প্রাঙ্গণের দক্ষিণভাগে টাউন স্কুল অবস্থিত। জেলা পরিষদ অফিসের পূর্বভাগে 'অরবিন্দ পাঠভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতীতে এই স্থানের পূর্ব ভাগে নীলকর সাহেবদের সুইমিং ক্লাব ছিল এবং মহারাজা আফতাবচাঁদের দাক্ষিণ্যে ক্লাব হাউসটি নূতনভাবে নির্মিত হওয়ায় এটি আফতাব ক্লাব নামে পরিচিত ছিল। পুনর্বাসন দপ্তরের অফিস চত্বরের মধ্যে সুইমিং পুলের অস্তিত্ব আছে এবং গোটা এলাকা একটি পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল। কোর্ট প্রাঙ্গণের দক্ষিণে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর বর্ধমান জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের অফিস এবং সমবায় ব্যাঙ্কের দক্ষিণে বংশগোপাল টাউন হ'ল অবস্থিত। বর্ধমান পৌরসভা কর্তৃক এই টাউন হলটি পরিচালিত হয়। বংশগোপালের নন্দে ছিলেন মহারাজা আফতাবচাঁদের পিতৃদেব। নন্দে পরিবার এই সুদৃশ্য ভবনটি ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে ২৫শে মে তারিখে বর্ধমানের জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পৌরসভাকে দান করেছিল। সম্প্রতিকালে নূতনভাবে সংস্কার করে টাউন হ'লের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনা হয়েছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল (বয়েজ) অবস্থিত। অষ্টাদশ শতকে এই বাড়ীতে ছিল নীলকুঠির অফিস। নীলকর সাহেবদের অনেকেই এখানে বসবাস করতেন। শোনা যায়, চলদীঘির পাড়ে নীলকুঠি ছিল। কিছুটা এগিয়ে গেলে রাস্তার বাঁদিকে (কালীবাজার) সুউচ্চ মন্দিরের মধ্যে বীরহাটার বিখ্যাত কালিকাদেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। শোনা যায়, দেবী পূর্বে স্থানীয় ডাকাতদের আরাধ্যা দেবী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে চট্টোপাধ্যায় পরিবার দেবীর সেবাপূজার ভার গ্রহণ করেন।

কাছারী রোডের পূর্বভাগে এক বিশাল চত্বরের মধ্যে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের বহু সমাধি রয়েছে। এখানে ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে হরনেট মেরী নামে একজন ইউরোপীয়ান মহিলাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এই সমাধি প্রাঙ্গণটি দেখে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে যে, যে শহরে এত অধিক সংখ্যক সমাধি রয়েছে সেই সকল খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের শহরের কোন অঞ্চলে বসবাস করতেন ? নীলকুঠি, রেশমকুঠি, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর পদস্থ অফিসারগণ বর্ধমান শহরে দীর্ঘকাল বসবাস করলেও একালে তাদের কোন স্মৃতিচিহ্ন নেই, কিন্তু স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধানের দ্বারা এবং রেভারেণ্ড লঙ ও ফরাসী প্রকৃতিবিদ ভিক্টর জাঁকম-র প্রতিবেদনে সাহেবদের বর্ধমান শহরে বসবাসের স্থানগুলি অনুমান করা যায়। বর্ধমানের সাহেব বাসিন্দারা প্রধানতঃ নীলপুর, বীরহাটা ব্রিজের উভয় পার্শ্ব, বাঁকা নদীর তীর হ'তে কোর্ট চত্বর পর্যন্ত ও সাধনপুর পল্লীতে বসবাস করতেন।

বাঁকা নদীর ধারে বিদেশীদের জন্য একটি হোটেল ছিল। আর বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা শাসকগণ সাধনপুরের বাংলোয় বসবাস করেন। সাধনপুর পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিজয়চাঁদ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। বর্ধমান কাটোয়া ন্যারোগেজ রেলপথ ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে যাত্রী বহনের অনুমতি লাভ করে। বর্ধমান মূল স্টেশনের পূর্বভাগে এই ছোট রেলের স্টেশনটি অবস্থিত। রেলস্টেশন হ'তে কিছুটা উত্তরমুখে এগিয়ে গেলে বাজেপ্রতাপপুর পল্লী। জনশ্রুতি এরূপ যে, জাল প্রতাপচাঁদ বর্ধমান শহরে আবির্ভূত হ'য়ে অত্র স্থানে অবস্থান করার জন্য স্থানটি বাজেপ্রতাপপুর নামে অভিহিত হয়েছে। শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে ইছলাবাদের পূর্বাংশে অবস্থিত মোগল আমলের মসজিদটি সম্পর্কে উল্লেখ করা উচিত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হিজরা ১১১৫ অব্দে (১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ) সৈয়দ তাহির তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন এবং এই মসজিদে সম্রাটের নাম ক্ষোদিত আছে। সামসুদ্দিন আহমদের মতে, শের আফগান ও মেহের-উন-নিশা ইছলাবাদেই বসবাস করতেন, কিন্তু একথার সত্যাসত্য যাচাইয়ের কোন উপায় নেই।

আড়াই লক্ষ লোক বর্ধমান শহরে বসবাস করেন এবং অধিকাংশ জনগোষ্ঠী এসেছে নিকটবর্তী কৃষিপ্রধান অঞ্চল থেকে। তাই বর্ধমানের সংস্কৃতিতে গ্রাম্যপরিবেশের কিছুটা ছাপ রয়েছে। বর্ধমান শহরের সংস্কৃতি বর্ধমান জেলার সংস্কৃতির একটা প্রধান অঙ্গ এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। তাই শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শনের পর বর্ধমান শহরের উৎসবগুলির সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যায়। অতীতে বর্ধমানের উৎসবগুলি রাজাদের অর্থানুকুল্যে জাঁকজমক সহকারে অনুষ্ঠিত হ'ত, কিন্তু জমিদারী প্রথা বিলোপের পর উৎসবগুলির ধারা আজও চলমান হলেও জৌলুসহীন। বর্ধমানের রাজারা অবাঙ্গালী হলেও বর্ধমানের লোক-উৎসবে তাঁরা একাত্ম হ'তে সক্ষম হয়েছিলেন। এই শহরে বহু পাঞ্জাবী পরিবার বসবাস করেন এবং তাঁরাও পাল-পার্বণ ও উৎসবে বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশে গেছেন।

নগর দেবী সর্বমঙ্গলা হলেন বর্ধমানের ধর্ম ও উৎসবের আকর্ষণীয় বিগ্রহ। প্রতিদিন অগণিত জনসাধারণ পূজার ডালি নিয়ে মন্দিরে উপস্থিত হন। এখনও মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হয় এবং মহাষ্টমীর দিন সর্বমঙ্গলা বাড়ীতে কামান দাগা হয়। নবাবহাটের শিবক্ষেত্রে ও আলমগঞ্জে বর্ধমানেশ্বরকে কেন্দ্র করে মহাসমারোহে শিবরাত্রির উৎসব পালিত হয়। এই শহরের দোলযাত্রা অনুষ্ঠানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল, পূর্ণিমার পরের দিন দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণজীর মন্দিরে ও অন্যান্য মন্দিরে মহাসমারোহে ঝুলন ও জন্মাষ্টমী পালিত হয়। অন্যান্য স্থানে ঝুলনে মাটির পুতুল গড়ে থাকা সাজান হয়, কিন্তু বর্ধমান শহরে দু-এক স্থলে মাটির পুতুলের পরিবর্তে অনুরূপভাবে মানুষকে সাজান হয়। সাধারণের কাছে এটি 'মানুষ ঝুলন' নামে পরিচিত। নবান্নের সময় পৃথকভাবে কোন অনুষ্ঠান হয় না। বর্ধমানের পুরানো মানুষেরা অন্নপূর্ণা পূজার পরিবর্তে নবান্নের দিন সর্বমঙ্গলা বাড়ীতে পূজা দেন।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা সাড়ম্বরে ঈদ ও মহরম পালন করেন। আজও এখানে পীর বহরাম ও খক্কর সাহেবের মাজারে উরস উৎসব পালিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, অন্যান্য স্থানের ন্যায় উৎসবের সময় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিদ্বেষ বা রেষারেষি দেখা যায় না। খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মানুষরাও যীশু খ্রীস্টের আবির্ভাব দিনটিকে স্মরণ করেন। অতীতে রাজগঞ্জের অস্থলে সমস্ত বৈষ্ণব উৎসবগুলি পালিত হ'ত, কিন্তু অস্থল বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায় উৎসবগুলিরও সমাপ্তি ঘটেছে। এখানে মহাসমারোহে কালীপূজা হয় যার মধ্যমণি হ'ল বোরহাটে, কমলাকান্তের কালী। কাঞ্চননগর যাওয়ার পথে একটি বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণকে রথতলা বলা হয়। রাজাদের আমলে মহাসমারোহে রথযাত্রা উৎসব পালিত হ'ত এবং হাতী দিয়ে এই রথ টানা হ'ত। রথযাত্রা উৎসবের সেই জৌলুস আর নেই, কিন্তু রথতলায় গেলে রাজার রথ ও রাণীর রথ দেখা যাবে। বাণিজ্য-কেন্দ্রিক এই শহরে প্রচুর দোকানপাট থাকলেও বছরের কয়েকটি সময়ে মেলা বসে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল আষাঢ় মাসে শিল্প ও বাণিজ্য মেলা, শ্রাবণ মাসে কাপড়ের মেলা ও পৌষ-সংক্রান্তিতে ঘুড়ির মেলা হয়। প্রতি বৎসর বর্ধমান শহরে উদয় অভিযান গোষ্ঠীর উদ্যোগে বইমেলা ও সরকারী উদ্যোগে স্বাস্থ্যমেলা হয়। কলিকাতা ব্যতীত মফঃস্বলের অন্যান্য স্থানে বইমেলা বিরল।

বর্ধমান শহরে লোকধর্ম অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত দেখতে হ'লে সদরঘাটে দামোদরের তীরে যেতে হবে। দামোদর হ'ল সাঁওতাল ও আদিবাসী গোষ্ঠীর নিকট অত্যন্ত পবিত্র নদী এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নিকট এই নদী হ'ল 'দেবনদ'। প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তির দিন নিকবর্তী অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষেরা পুণ্যস্নানের জন্য দামোদরের তীরে উপস্থিত হন, আর বর্ধমানের শহরের লোকেরা নানা বিচিত্র রঙের হাজার হাজার ঘুড়ি নিয়ে সদরঘাটে চলে আসেন। এইদিন বৈকালে একটি

মেলা বসে। পৌষসংক্রান্তির দিন সকালে বেড়ের নবাববাড়ীতে স্থানীয় মুসলমান রমণীরা পুণ্যস্নানের জন্য উপস্থিত হ'ন নবাববাড়ীর দীঘিতে। এই দিন সকালে নবাববাড়ীর বাইরে একটি মেলা বসে। পৌষসংক্রান্তির মেলার প্রাচীনত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ১৮৩৮ সালে ২০শে জানুয়ারী সংবাদপত্রে মেলার বিষয় অবগত হওয়া যায়, 'বর্ধমানে মেলা। প্রতি বৎসর উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পরদিবস দামোদর নদের ধারে যেরূপ মেলা হইয়া থাকে এবারে গত শনিবারেও সেইরূপ হইয়াছিল চতুর্দিকে চারি পাঁচ ক্রোশ ব্যবহিতবাসী লোকেরা আসিয়া এই মেলাতে একত্র হয় এবং অনেকে ধর্মজ্ঞানে দামোদরে অবগাহন করতঃ জলপান করিয়া স্ব২ স্থানে প্রস্থান করে। এতদ্ভিন্ন বহুলোক মেলা দর্শনার্থে আসিয়া থাকেন। গত দিবস বেলা চারি ঘণ্টার পরে শ্রীযুত যুবরাজ অমাত্যগণ সহ গাড়ী আরোহণ পূর্বক মেলাস্থলে সমাগত হইয়া নদের ধারে২ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার আহ্লাদার্থ অনেক টাকার সোলার পক্ষী ইত্যাদি ক্রীত হইল অনন্তর শ্রীযুত পাদ্রী সাহেবও সুযোগ বুঝিয়া ঐ লোকারণ্যের মধ্যে খ্রীস্টের মঙ্গল সংবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মেলাতে আশ্চর্য এই যে বলদাকৃস্ট গাড়ীর উপর অনেক পাল্কি বসান গিয়াছিল এবং প্রত্যেক পাল্কিতে হিন্দু মোছলমান সাধারণ পাঁচ ছয় জন স্ত্রীলোক বসিয়া খড়খড়ীয়ার ছিদ্র দিয়া কৌতুক দেখিতে ছিলেন কিন্তু খেদের বিষয় এই যে চোরেরা গোলের মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের আভরণ কাটিয়া নিয়া বহু প্রাণীকে রোদন করায়। কস্যচিৎ পাঠকস্য।'

বর্ধমান শহরে দু'টি সারস্বত প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রয়াত ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুকুমার সেন বাঁকাহাটা কালীতলায় স্বীয় বাসভবন "সুবাস্তু"তে ১৩৪৪ সালে 'বর্ধমান সাহিত্যসভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর জীবিতকালে এই বাসগৃহটি সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যপ্রেমীদের আকর্ষণীয় স্থান ছিল। খোসবাগানে বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের কার্যালয় আজও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হয়। তিনকোনিয়া বাস স্ট্যাণ্ডের পিছনে আছে ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত লায়নস ক্লাব, যার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন ডাক্তার সোমেশ্বর ঘোষ।

বর্ধমান শহর দর্শন করতে হলে অন্ততঃপক্ষে হাতে তিন দিন সময় থাকা অবশ্যক। আহার ও বাসস্থানের জন্য কোন সমস্যা নাই। যে কোন সময় এখানে উপস্থিত হলে হোটেল মিলবে বিজয়তোরণের সন্নিকটবর্তী এলাকায়। আর যদি কোন পূর্বপরিকল্পনা থাকে তাহলে জেলা পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। সাধনপুরে জেলা শাসকের বাংলোর পাশে অতীতের ডাকবাংলোটিতে গড়ে উঠেছে 'বর্ধমান ভবন'। স্বল্প ব্যয়ে এখানে থাকার ব্যবস্থা আছে। বর্ধমান ভবনে একটি কক্ষ সংরক্ষিত আছে। শোনা যায় ঐ কক্ষের নীচে একটি সুরঙ্গ পথ আছে।

বর্ধমান শহরে খ্যাত ও স্বল্পখ্যাত দ্রষ্টব্য বস্তু বা পল্লীর অভাব নাই। কিন্তু প্রচার বিমুখতার জন্য দর্শকেরা এগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে। একদা রাজবাড়ীকে কেন্দ্র করে অগ্রস্থানে যে সাংস্কৃতিক

পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল তার রূপান্তর ঘটলেও এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা পুরনো দিনগুলির কথা স্মরণ করে অতীতের সুখস্মৃতি রোমন্থন করেন। একালে শহরের বিস্তৃতি ও পৌরপ্রশাসনের কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক নগরজীবনের ধারা, শিক্ষার প্রসার ও কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্য অর্থনীতির সমন্বয় ঘটায় জনজীবনের উপর যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিকতার ছাপ পড়তে শুরু হয়েছে। আসানসোল ও দুর্গাপুর, মহানগরীর সংজ্ঞায় বর্ধমান অপেক্ষা অধিক জনবহুল হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, পুরাকীর্তি ও লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য বর্ধমান শহরের গুরুত্ব অধিক। তাই অতীত ও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে বর্ধমান শহরের প্রতি আকর্ষণ অনুভবের কারণে 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প'-এ বর্ধমানকে সঠিকভাবেই 'যশস্বিন' বলা হয়েছে। অপরপক্ষে শত্রুপুরী হলেও ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর তাঁর লেখনীতে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্ধমান শহরের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন বিদ্যাসুন্দর কাব্যে,—

'দেখি পুরী বর্দ্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ।
রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর
ভাল বটে জানিনু বিশেষ॥'

পরিশিষ্ট ১

প্রসিদ্ধ মন্দির তালিকা

প্রস্তরনির্মিত ঃ

বরাকর	শিব	রেখদেউল	৮ম শতক
	শিব	ঐ	১৩শ ,,
	শিব	ঐ	১৪৬১ খ্রীস্টাব্দ
	শিব	ঐ	১৪৬১ ,,
গড়ুই	বিষ্ণু	ঐ	১৫শ শতক
আড়া	শিব	ঐ	ঐ
খুদিকা	শিব	ঐ	ঐ
বীরভানপুর	শিব	ঐ	১৭শ শতক
দেবীপুর	কল্যাণেশ্বরী	পীড়াদেউল	ঐ
ছোট দিঘরী	রঘুনাথ	রেখদেউল	ঐ
শীতলপুর	পরিত্যক্ত	ঐ	ঐ
উখরা	শ্যামরায়	ঐ	১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দ
	সীতারাম	ঐ	১৭৪০ ঐ
	শিব	ঐ	১৮৩৬ ঐ
খান্দরা	রাধামাধব	পঞ্চরত্ন	১৭২১ ঐ
	লক্ষ্মীনারায়ণ	ঐ	১৯০২ ঐ
কুমারডিহি	শিব	রেখদেউল	১৬৬১ ঐ
সরপি	শিব	ঐ	১৮শ শতক
	শিব	ঐ	ঐ

ইষ্টকনির্মিত ঃ

সাতদেউলিয়া	জৈন	রেখদেউল	৯ম শতক
গৌরাঙ্গপুর	ইছাই ঘোষের দেউল	ঐ	১৫শ ঐ
কুলিনগ্রাম	শিব	চারচালা	১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দ
	গোপাল	রেখদেউল	১৭শ শতক
আমাদপুর	গোপাল	ঐ	১৫৭২ খ্রীস্টাব্দ
	মদন গোপাল	ঐ	১৭৩০ ঐ
	রাধামাধব	ঐ	১৭৯২ ঐ
বৈদ্যপুর	কৃষ্ণ	ঐ	১৫৯৮ ঐ
	শিব	ঐ	১৭৫৩ ঐ

	শিব	নবরত্ন	১৮০২ ঐ
বাঘনাপাড়া	কৃষ্ণবলরাম	চারচালা	১৬১৬ ঐ
দোগাছিয়া	গোপীনাথ	আটচালা	১৬৫৪ খ্রীস্টাব্দ
রাইগ্রাম	বরাহবিষ্ণু	জোড়বাংলা	১৬৮৪ ঐ
মুলগ্রাম	লক্ষ্মীনারায়ণ	আটচালা	১৬৯২ ঐ
শাকারী	গোবিন্দ	পঞ্চরত্ন	১৬৭০ ঐ
	সিংহবাহিনী	ঐ	১৭৬২ ঐ
	শিব	আটচালা	১৭৬১ ঐ
বৈকুণ্ঠপুর	গোপেশ্বর শিব	রেখদেউল	১৭৩২
	কীর্তিশ্বর শিব	আটচালা	ঐ সমসাময়িক
ক্ষীরগ্রাম	যোগাদ্যা	রথাকৃতি ও গম্বুজ	১৮শ শতক
কুড়মুন	বুড়োশিব	আটচালা	১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দ
	ইন্দ্রাণী	দালান	১৮শ শতক
হাটগোবিন্দপুর	শ্রীধর	আটচালা	১৭শ শতক
	অষ্ট নায়িকা	ঐ	১৭৫২ খ্রীস্টাব্দ
পুতুণ্ডা	দামোদর	ঐ	১৭৪৯ ঐ
সুহারী	রাজরাজেশ্বর	ঐ	ঐ সমসাময়িক
বর্ধমান	সর্বমঙ্গলা	নবরত্ন	১৮শ শতক
	লক্ষ্মীনারায়ণ	মণ্ডপ	ঐ
	ঈশানেশ্বর	রেখদেউল	
	রাধাবল্লভ	মণ্ডপ	১৮২০
	মদনগোপাল	ঐ	১৮৩২
কাঞ্চননগর	কঙ্কালেশ্বরী	নবরত্ন	১৮শ শতক
নবাবহাট	১০৯ শিবক্ষেত্র	আটচালা	১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ
সরপি	গোপাল	নবরত্ন	১৭৫৫ ঐ
রায়না	শ্রীধর	আটচালা	১৭২৭ ঐ
কামারপাড়া	বুড়োশিব	রেখদেউল	১৭শ শতক
	দেউলেশ্বর শিব	অষ্টকোণ রেখ	১৮২৬ খ্রীস্টাব্দ
কাটোয়া	গৌরাঙ্গ	একরত্ন	১৮৭২ ঐ
সর	সরেশ্বর শিব	রেখদেউল	১৮শ শতক
সারুল	শিব	ঐ	ঐ
গোহগ্রাম	রাধাদামোদর	ঐ	১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ
গলসী	শিব	ঐ	১৮শ শতক
মল্লিকপুর	দুর্গা	মণ্ডপ	১৯শ শতক

চকদীঘি	দুর্গা	মণ্ডপ	১৯শ শতক
কালনা	লালজি	পঁচিশ রত্ন	১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দ
	কৃষ্ণচন্দ্র	ঐ	১৭৫১ ঐ
	গোপাল	ঐ	১৭৬৬ ঐ
	সিদ্ধেশ্বরী	জোড়বাংলা	১৭৪০ ঐ
	অনন্ত বাসুদেব	আটচালা	১৭৫৪ ঐ
	দোলমণ্ড		১৭৫৩ ঐ
	প্রতাপেশ্বর	রেখদেউল	১৮৪৯ ঐ
	১০৯ শিবক্ষেত্র	আটচালা	১৮০৯ ঐ
কয়রাপুর	শিব	রেখদেউল	১৯শ শতক
নন্দী	শিব	ঐ	ঐ
দেবীপুর	লক্ষ্মীজনার্দন	ঐ	১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দ
মানকর	রাধাবল্লভ	অষ্টকোণ রেখ	১৭২৮ ঐ
	দেউলেশ্বর	রেখদেউল	১৮শ শতক
পলাশী	বুড়োশিব	ঐ	১৭৮২ খ্রীস্টাব্দ
দিগনগর	শিব	ঐ	১৭৮৩ ঐ
গোতান	সিংহবাহিনী	আটচালা	১৭৬২ ঐ
খণ্ডঘোষ	রাধাবল্লভ	একরত্ন	১৮শ শতক
	শিব	রেখদেউল	১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দ
জৌগ্রাম	শিব	ঐ	১৮ শতক
	রাধাকান্ত	আটচালা	১৭ ঐ
	শ্রীধর	ঐ	১৭৪৩ ,,
শ্রীবাটী	৩টি শিব	রেখদেউল	১৮৩৬ ,,
সিঙ্গি	বুড়োশিব	নবরত্ন	১৮২৮ ,,
গ্রাম কুলটি	শিব	আটচালা	১৭৬০ ,,
	শিব	,,	১৭৯৩ ,,
অমরার গড়	মন্দিরক্ষেত্র		১৮শ শতক
	শিবাক্ষা	দালান	,,
মৌখিরা	৪টি শিব	রেখ	,,
কালিকাপুর	জোড়াশিব	,,	১৮৩৮
সীতাহাটী	শিব	,,	১৭৬০
বোড়	বলরাম	পীড়া	১৮শ শতক
দাঁইহাট	শিব	রেখদেউল	,,
সিঙ্গারকোন	রাধাকান্ত	জোড়বাংলা	,,

পরিশিষ্ট ২

বর্ধমান জেলার লোকসংখ্যা ঃ ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দ

(প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যভিত্তিক)

ব্লক	লোকসংখ্যা	ব্লক	লোকসংখ্যা
বর্ধমান (১)	১৪৫, ৭৯৯	রানীগঞ্জ	১,২৪,১১২
বর্ধমান (২)	১. ৩০, ৬৪৩	জামুরিয়া (১)	১,৩৯,৭৮৮
গলসী (২)	১, ১৯, ১৫৬	জামুরিয়া (২)	৮১,৮৩৫
ভাতাড়	২, ১৫, ৮২২	সালানপুর	১,৪২,৪৩৩
আউসগ্রাম (১)	৯৮, ১৩৪	বরাবনি	১,০০,৩১০
আউসগ্রাম (২)	১, ১৯, ০২১	কুলটি শহর	২,৪৮,৯৮৭
মেমারী (১)	১, ৮৬, ২৩৩	রাণীগঞ্জ শহর	৬৫,৫২৯
মেমারী (২)	৯৬, ৩৩৮	আসানসোল কর্পোরেশন	৪,৮২,০৬০
খণ্ডঘোষ	১. ৪৮. ৫৩৬		
জামালপুর	২, ১১, ৯১৪	কাটোয়া (১)	১,৩০,৬৪৬
রায়না (১)	১, ৪৩, ৬১২	কাটোয়া (২)	১,০৫,৭২৪
রায়না (২)	১, ২১, ১৯৫	কেতুগ্রাম (১)	১,২৫,৪৫১
বর্ধমান শহর	২, ৪৪, ১৪১	কেতুগ্রাম (২)	৯৪,৮৩৩
মেমারী শহর	৮, ৩৩৩	মঙ্গলকোট	২,০৫,৩৬২
গুসকরা শহর	২৭, ০০৪	কাটোয়া শহর	৫৫,৫৩৫
দুর্গাপুর-ফরিদপুর	৯১, ২৭৬	দাঁইহাট শহর	২০,৩৪৯
গলসী (১)	১, ৪৭, ৮০৬	কালনা (১)	১,৫৭,০৭৪
কাঁকসা	১, ২৮, ৪৬০	কালনা (২)	১,২৮,২১৭
অণ্ডাল	১, ৫২, ৫৫২	পূর্বস্থলী (১)	১,৫২.০৪৮
পাণ্ডবেশ্বর	১, ৩৩, ৮৯৩	পূর্বস্থলী (২)	১,৫৭,৫৮৯
দুর্গাপুর নটিফায়েড এরিয়া	৪, ১৫, ৯৮৬	মন্তেশ্বর	১,৮৪,৪৪৭
		কালনা শহর	৪৭,০৬৫

	মোট	স্ত্রী	পুরুষ	অনুপাত
তপশিলীভুক্ত গোষ্ঠী	১৬, ৭১, ২৮৫	৭, ৮০, ৬৫০	৮, ৯০, ৬৩৫	২৭'৭০
তপশিলীভুক্ত উপজাতীয় গোষ্ঠী	৩, ৮৪, ১০৩	১, ৮৩, ৪২৩	২,০০, ৬৮০	৬'৩০
অন্যান্য জনগোষ্ঠী	৩৯. ৭৯,৩১৮	১৮,৯৩,৪০৭	২০,৮৫,৯১০	৬৬'০০
মোট জনসংখ্যা	৬০, ৩৪,৭০৬	২৮, ৫৭, ৪৮১	৩১, ৭৭, ২২৫	১০০

পরিশিষ্ট ৩

রেলপথে বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব

	হাওড়া	বর্ধমান	আসানসোল	কাটোয়া
বর্ধমান	১০৭	—	১০৬	৫৩
আসানসোল	২১৩	১০৬	—	১৬০
দুর্গাপুর	১৭১	৬৪	৪২	১১৭
কাটোয়া	১৪৪	৫৩	১৫৯	
কালনা	৮২	৬৫*	১৮০*	৬২
রাণীগঞ্জ	১৯৪	৮৭	১৯	১৪০
বরাকর	২৩১	১২৪	১৮	১৭৭
চিত্তরঞ্জন	২৩৮	১৩১	২৫	১৮৪
মেমারী	৮২	২৫	১৩১	৬২*
গুসকরা	১২৮	২১	১২৭	৫৫*
অণ্ডাল	১৮৭	৮০	২৬	১৩৩
গলসী	১৩০	২৩	৮৩	৭৬
থানা	১২০	১৩	৯৩	৬৬
দাঁইহাট	১৩৭	৬০	১৬৬	৭
পূর্বস্থলী	১১৩	৮৪	১৯০	৩১
সমুদ্রগড়	৯৭	৬০*	১৭০*	৪৭
বলগোনা	১৩৩	২৬	১৩২	২৭
শ্রীখণ্ড	১৫১	৪৫	১৫১	৭
ঝামটপুর	১৫৭	৬৬	১৭২	১৩
কুলটি	২২৪	১২০	১৪	১৭৩
শক্তিগড়	৯৬	১১	১১৭	৬৪
কাঁদড়া	১৬৪	৭৩	১৭৯	২০
পাঁচুন্দি	১৫৭	৬৬	১৭২	১৩
পানাগড়	১৫৫	৪৮	৫৮	১০১
দেবীপুর	৭৫	৩২	১৩৮	৮৫
অগ্রদ্বীপ	১৩১	৬৬	১৭২	১৩
জোগ্রাম	৬৫	৩০	১৩৬	৮৩
নবদ্বীপ	১০৫	৬৬	১৭২*	৩৯
ব্যাণ্ডেল	৪০	৬৭	১৭৩	১০৪

* সড়ক পথের দূরত্ব (কিলোমিটার)

বর্ধমান (৩য়) ২৪

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

[ইংরাজী]

Abul Fazal-I-Allami Ain-I-Akbari, Vol. I, Tr. H. Blochmann ; Vol. II, Tr. H. S. Jarrett, Ed. Sir J. N. Sarkar, Calcutta.

Archaeological Survey of India—Epigraphia Indica, New Delhi, Vols I, V, VI, VIII, IX, XII, XV, XXI, XXII, XXIII, XXVI.

Epigraphia Indo-Moslemia, 1935-36.

Epigraphipa Indica : Arabic and Persian Suppl. 1975.

Banerjee, J. N.—Development of Hindu Iconography, Cal., 1956.

Banerjee, R. D. Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture, New Delhi, 1985.

Bhattacharjee, A. K. A Corpus of Dedicatory Inscriptions from Temples of West Bengal, Calcutta, 1982.

Blochmann, H. Contribution to the Geography and History of Bengal (Mohammadan Period), Calcutta, 1968.

Campbell, A. Claude. Glimpses of Bengal, Calcutta, 1907.

Campbell, Sir George. Memoir of My Indian Cover, London, 1893.

Chakrabarty, Monamahan A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal (1757-1916), 1918, Calcutta.

Chatterjee, Suniti Kumar—Kirata Jana krti 1974.

Chanda, R. P. Indo Aryan Races, Calcutta, 1969.

Chunder, Bholanath. Travell of a Hindoo (in 2 Vols.), Calcutta, 1868.

Dalton, E T. Descriptive Ethnology of Bengal, Calcutta, 1973.

Dasgupta, S. B. Obscure Religious Cults, Calcutta, 1969.

Dasgupta, Prodosh Temple Terracotta of Bengal, Calcutta, 1971.

Dey, N. L. The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, London, 1927.

Dutta, Bimal Kumar Bengal Temples, New Delhi, 1975.

Frazer, Sir James G. The Golden Bough (Abriged), London, 1967.

Ganapati Shastri, T. Ed. Aryya Manjusrimulakalpa, Trivandrum, 1920.

Ghulam Husain Salim Riyazu-S-Salatin, Calcutta, 1903.

Govt. of Bengal, List of Ancient Monuments in Bengal, 1896.

Govt. of West Bengal, Dist. Census Hand Book, Barddhaman, 1981.

Hamilton, Walter East Indian Gazetteer of Hindustan, London, 1828.

Hazra, R. C. Studies in the Upapurans (in 2 Vols.) Calcutta.

Hill, S C. India Record Series (in 3 Vols.), 1906.

Hunter, W. W. Statistical Account of Bengal, Vol. IV, London, 1876 & Imperial Gazetteers of India, Vol. IX, London, 1908.

Law, B. C. The Historical Geo. of Ancient India, Paris, 1968.

Long, The Rev. James Hand Book of Bengal Missions, London, 1848

Selections from Unpublished Records of Government, Calcutta, 1973.

Majumber, N. G. Inscriptions of Bengal, Vol. 3, Rajshahi, 1929.

Majumdar, Dr. R. C. History of Ancient Bengal, Calcutta, 1971.

History of Mediaeval Bengal, Calcutta,

Ed. The History and Culture of the Indian People, in II Vols., Bombay.

Ed. History of Bengal, Vol. I, Dacca, 1943.

Hastings, James Encyclopaedia of Religion and *Ethics* (Vol. VIII).

Majumdar Sastri, S. N. Cunningham's Ancient Geography of India, Calcutta, 1924.

Macdonell & keith—Vedic Index of Names and Subjects, 1982.

McCutchan, David J. Late Mediaeval Temples of Bengal, Calcutta.

Michell, George Ed. Brick Temples of Bengal (From the Archives of David McCutchan), Princeton, 1983.

Mitra, Asok Dist. Census Hand Book. Burdwan, Calcutta, 1953.

The Tribes and Castes of West Bengal, Calcutta, 1951.

Morgan, L. H. Ancient Society, Calcutta, 1949.

Niyogi, Puspa Brahmanic Settlement in different Sub-divisions of Ancient Bengal, Calcutta, 1967.

Oldham, W. B. Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District, Calcutta, Edition 1891 & 1894.

Peterson, J. C. K. Bengal District Gazetteers, Burdwan, Calcutta, 1910.

Risley, H. H. Tribes and Castes of Bengal, Calcutta, 1981.
Rogers, A. Tuzuk-I-Jahangiri, Ed. H. Beveridge, New Delhi, 1989.
Roy Chaudhuri, P. C. Temples and Legends of Bengal, Bombay, 1967.
S Levi & others Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India, 1975.
Sanyal, Hitesh Ranjan Social Mobility in Bengal, Calcutta, 1981.
Sarkar, Sir Jadunath Ed. History of Bengel, Vol. 2, Dacca, 1948.
Sen, B. C. Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal, Calcutta, 1942.
Shamsud-din Ahmed Inscriptions of Bengal, Vol. 4., Rajshahi, 1960.
Sinha, B. P. Decline of the Kingdom of Magadh, Patna, 1954.
Sircar, D. C. Sakta Pithas, Delhi, 1973.
Indian Epigraphical Glossary, Delhi, 1966.
Stwarts, Charles The History of Bengal, Calcutta, 1903.
Wattars, Thomas. On Yuan Chowang's Travels in India, Delhi.
Wilson, C. R. The Early Annals of the English in Bengal, Vol. I. Calcutta, 1895 ; India Record Series, (in 2 Vol.), 1905.

[বাংলা]

অধিকারী, ইন্দু—বাংলার লোকধর্ম্ম ও উৎসব পরিচিতি, কলিকাতা, ১৯৮৯।
আহমদ, ওয়াকিল—বাংলার লোকসংস্কৃতি, ঢাকা, ১৯৭৪।
কবিরাজ, কৃষ্ণদাস—চৈতন্যচরিতামৃত (সাঃ অকাঃ সং), নূতন দিল্লী, ১৯৭৭।
করণ, সুধীরকুমার—সীমান্ত বাংলার লোকযান, কলিকাতা, ১৯৬৬।
কুমার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ—বংশ পরিচয় (১৫ খণ্ডে), কলিকাতা।
গাঙ্গুলী, মানিকরাম—ধর্মমঙ্গল (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ১৯৬০।
গোলাম সাকলায়েন—পশ্চিমবঙ্গের পীর ও সাধু-সন্ত প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৮৭।
ঘোষ, বিনয়—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১ম খণ্ড, ৪র্থ খণ্ড ১৯৭৬।
ঘোষ, শরৎচন্দ্র—সদগোপ তত্ত্ব (১ম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৩৮।
চক্রবর্ত্তী, ঘনরাম—শ্রীধর্ম্মমঙ্গল (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ১৯৬২।
চক্রবর্ত্তী, মুকুন্দরাম—চণ্ডীমঙ্গল (সাহিত্য অকাঃ), নূতন দিল্লী, ১৯৯২।
চট্টোপাধ্যায়, নিবারণ—কাটোয়ার ইতিহাস (তারিখবিহীন), কাটোয়া।
চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার—কল্পসূত্র (অনুঃ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৩।

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ—লোকায়ত দর্শন, কলিকাতা, ১৩৭৫।
চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র—জাল প্রতাপচাঁদ, কলিকাতা, ১৮৮৩।
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৭৩।
চট্টোপাধ্যায়, ডঃ তুষার—সঃ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি (পঃ বঃ সরকার)।
চৌধুরী কামিল্যা, ডঃ মিহির—রাঢ়ের গ্রাম দেবতা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।
আঞ্চলিক দেবতা লোক সংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।
দত্ত, অক্ষয়কুমার—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, কলিকাতা, ১৩১৪।
দত্ত, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ—বাঙ্গালার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৮৩।
দাস, উপেন্দ্রকুমার—শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা (২ খণ্ড), বিশ্বভারতী, ১৩৭৩।
দাস, ডঃ সত্যনারায়ণ—বাংলার দ্রাবিড় শব্দ, কলিকাতা, ১৯৯৩।
বীরভূম জেলার গ্রামনাম, কলিকাতা, ১৯৮৫।
দাস, হরিদাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, নবদ্বীপ, ৪৭১ চৈতন্যাব্দ।
দাস ও মুখোপাধ্যায়—পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী আন্দোলন, কলিকাতা, ১৯৭৭।
দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র—প্রাগৈতিহাসিক বাংলা, কলিকাতা ১৯৮১।
দাশগুপ্ত, শশিভূষণ—ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৭২।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার—পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৭০।
বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন—মধ্যযুগের বাঙ্গালা, কলিকাতা, ১৩৩০।
বন্দ্যোপাধ্যায়, জীতেন্দ্রনাথ—পঞ্চোপাসনা, কলিকাতা, ১৯৬০।
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ—সংবাদপত্রের সেকালের কথা (২ খণ্ড) কলিকাতা।
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস—বাঙ্গালার ইতিহাস (২ খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৭১।
বসাক, রাধাগোবিন্দ—রামচরিত (মূলসহ অনু : কলিকাতা, ১৩৬০।
বসু, আশীষ—বাংলায় ভ্রমণ (২য় খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৪০।
বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ—বাংলার লৌকিক দেবতা, কলিকাতা ১৯৮৭।
বসু, নগেন্দ্রনাথ—বিশ্বকোষ (২২ খণ্ড), ১ম সংস্করণ, কলিকাতা।
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড), কলিকাতা, ১৩০৩।
বর্ধমানের পুরাকথা, কলিকাতা, ১৩২১।
সঃ কবি বিজয়রামের তীর্থমঙ্গল, কলিকাতা, ১৩২২।
ভট্টাচার্য, আশুতোষ—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৫।
বাংলার লোকশ্রুতি, কলিকাতা, ১৩৯২।
ভট্টাচার্য, জ্ঞানানন্দ—পূর্বস্থলীর ক্রমবিবর্তন, ১৯৮০
ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র—বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান (১ম), কলিকাতা, ১৯৫৮।
ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ—ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৮৪।
ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ—হিন্দুদের দেবদেবী (৩ খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৯২।
মণ্ডল, ডঃ সুশীলা—বঙ্গদেশের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৩।

মাইতি, ডঃ প্রদ্যোতকুমার—বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি, কলিকাতা, ১৯৮৮।
মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার—নবজ্ঞানভারতী, কলিকাতা, ১৯৫৮।
মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস—বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, বর্ধমান, ১৩২১।
ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য—সমাজ বিজ্ঞানীয় ভূগোল, কলিকাতা, ১৯৭৭।
মুখোপাধ্যায়, সুখময়—সুলতানী আমলের দু'শ বছর, কলিকাতা, ১৯৬২।
মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ—গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৭২।
মিত্র, অশোক—সঃ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৫ম খণ্ড (বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলা), নিউ দিল্লী, ১৯৮২।
মিত্র, অমলেন্দু—রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর, কলিকাতা, ১৯৭২।
মিত্র, সতীশচন্দ্র—যশোর খুলনার ইতিহাস (২ খণ্ড), কলিকাতা।
রায়, নিখিলনাথ—মুর্শিদাবাদ কাহিনী, কলিকাতা, ১৯৮৩।
রায়, নীহাররঞ্জন—বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), কলিকাতা, ১৯৮০।
রায় বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র—পূজাপার্বণ, বিশ্বভারতী।
সরকার, ডঃ দীনেশচন্দ্র—শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৮২।
সান্যাল, ডঃ হিতেশরঞ্জন—বাংলার কীর্তনের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮৯।
সুর, ডঃ অতুল—বাংলার সামাজিক ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮০।
বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, কলিকাতা।
সেন, দীনেশচন্দ্র—বৃহৎ বঙ্গ (২য় খণ্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪২।
সেন, ডঃ সুকুমার—বঙ্গভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৭৪।
—প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, কলিকাতা, ১৯৬২।
সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল—স্বদেশীয় ভারতবিদ্যা পথিক, কলিকাতা, ১৩৭৯।
সেনগুপ্ত, পল্লব—পূজা পার্বণের উৎস কথা, কলিকাতা, ১৯৮৪।
সেনগুপ্ত, শঙ্কর—বাংলা ও বাঙালীর পরিচয় (১ম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৮১।
সেনগুপ্ত, সুবোধ—সঃ বাঙালী চরিতাভিধান, কলিকাতা, ১৯৭৬।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম ও নবম অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী দেখুন।

পত্র-পত্রিকা

Calcutta Review.
Journal of Asiatic Society of Bengal.
Ancient India (A.S.I.).
Indian Archaeology : A Review (A.S.I.)
Indian Historical Quarterly.
Indian Antiquary.
Jain Journal, Calcutta.
Heritage of Burdwan, Burdwan University.
Indian Bradshaw (Latest Edition).
অষ্টম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (স্মারক গ্রন্থ), বর্ধমান, ১৩২১।
বর্ধমান সম্মিলনী, হীরক জয়ন্তী সংখ্যা।
বর্ধমান সম্মিলনী, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা।
বর্ধমান পরিচিতি (স্মারক গ্রন্থ), বর্ধমান, ১৯৫৪।
'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'।
'প্রবাসী' পত্রিকা।
'ভারতবর্ষ' পত্রিকা।
'মাসিক বসুমতী' পত্রিকা।
'কৌশিকী'।
লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা।
'আনন্দ সাহিত্য পত্রিকা,' উত্তরপাড়া।
গণকণ্ঠ (বিভিন্ন সংখ্যা)।
শ্রীযোগাদ্যাবাণীপীঠ পত্রিকা (প্লাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা), ক্ষীরগ্রাম, ১৯৬৯।
রাজকলেজ পত্রিকা (শতবর্ষ সংখ্যা), বর্ধমান।
মেড়তলার ভট্টাচার্য বংশ।
বর্ধমান পৌরসভা (শতবর্ষ সংখ্যা)।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি' রচনার সময় তথ্য সংগ্রহের জন্য গ্রামে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণের সময় বহু জ্ঞানীগুণী ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হয়েছে এবং যাঁদের সাহচর্যে তথ্য সংগ্রহের কাজ অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়েছে। আবার অনেকে পরবর্তী পর্যায়ে বহু তথ্য প্রেরণ করায় গ্রাম-বিবরণী প্রণয়নের ক্ষেত্রে নূতন নূতন তথ্য সন্নিবেশিত হওয়ার সুযোগ ঘটেছে। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তির সহৃদয়তায় গ্রন্থ রচনা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে বলে মনে করি তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং আশা করি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ক্ষেত্রে জেলাবাসীদের সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হব না।

অমিয়কুমার ভট্টাচার্য	নাসিগ্রাম ও খান্দড়া
অসিতকুমার চৌধুরী	সারুল ও সাঁকো
অরবিন্দ ভট্টাচার্য	জৌগ্রাম
পুলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	মসাগ্রাম
নজরুল রহিম	নবগ্রাম
সুকুমার ঘোষ	নিশিরাগড়
সৈয়দ আব্দুল হালিম	ওয়ারিশপুর
শঙ্করকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	সাদিপুর
মদনমোহন মুখোপাধ্যায়	বোড় বলরাম
সত্যেন মাজিলা	বর্ধমান
আসগর আলি	কুড়মুন
তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়	বৈঁচি
ডঃ কালিচরণ দাস	কাটোয়া
দীপঙ্কর চৌধুরী ও সনৎকুমার চক্রবর্তী	ক্ষীরগ্রাম
ভব রায়	সমুদ্রগড়
দেবশঙ্কর মোদক	বড়শুল
সুস্মিত সামন্ত	বর্ধমান
মহাপ্রসাদ গাঙ্গুলী	বেলাঢ়ী
রাখালচন্দ্র গোস্বামী	সিঙ্গারকোন
বৈদ্যনাথ সিংহরায়	চকদীঘি
সমীরকুমার সিংহরায়	চকদীঘি
রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও মধুসূদন সেনগুপ্ত	কেতুগ্রাম
শরদিন্দু সামন্ত	নন্দীগ্রাম
মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	নন্দীগ্রাম

মুক্তিপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়	সিঙ্গি
দুর্গাপদ রায়	উড়ো
পূরবী ঘোষ	সালালপুর
নারায়ণচন্দ্র কোঙার	সাঁওতা
দয়াময় চট্টোপাধ্যায়	সিয়ারসোল
গোবর্ধন বৈরাগ্য	পালায়
সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ	আহিরা
মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়	কোঁয়ারপুর
শ্রীকান্ত বসু	কামালপুর
অনাথবন্ধু দে	বাবলাডিহি
মনসুর আলি	কুলুট
সমীর নন্দী	রায়ান
শরৎ রায়	ইলসরা
চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়	বালিজুড়ী
সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	উথরা
অজিতকুমার চক্রবর্তী	পাটশুঁড়ি
নরেন্দ্রকুমার রায়	দেনুড়
তপোময় ঘোষ	শিবলুন
স্নেহাশিস যশ	সুহারী
সুধীরকুমার চক্রবর্তী	পুতুণ্ডা
কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়	পর্বতপুর
নিমাই পরামাণিক ও শিবপদ চক্রবর্তী	পাঁচড়া
বিষ্ণুপদ ঘোষ	শঙ্করপুর
মোহিতমোহন কুমার	শীতলপুর
সুধীরকুমার দাস	কামারপাড়া
সুকৃতিরঞ্জন দত্ত	মেমারী
খোকন মল্লিক	জামনা
নৃপেন মণ্ডল	সুয়াতা
অসিতবরণ দাস	ছোড়া
উদয়নারায়ণ দে	সিংহপাড়া
নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়	দামিন্যা
সুধীরচন্দ্র মণ্ডল	বরাকর
নির্মল মুখোপাধ্যায়	আখড়া

নির্ঘণ্ট

বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি

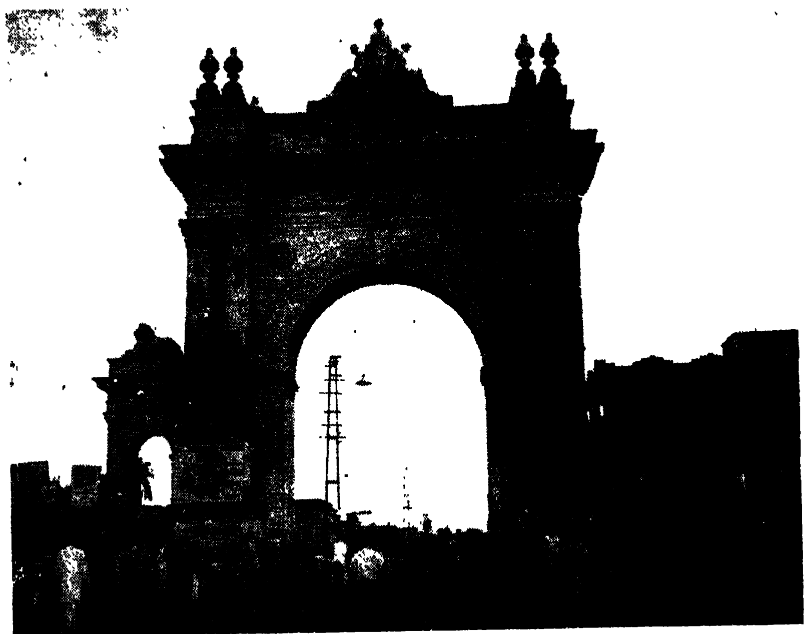
গ্রন্থ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

'দুর্লভ পাণ্ডিত্যের অধিকারীদের তুলনায় একেবারেই অপরিচিত যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর লেখা 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বইয়ের ১ম খণ্ড হাতে নিয়ে কিছুটা সংশয় জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু বইটি পড়ার পর মুখবন্ধ লেখক অশোক মিত্রের মত আমরাও বলতে পারি, 'বিশেষ চমৎকৃত বোধ করেছি। নিষ্ঠা অধ্যবসায় সততা ও গবেষণা কাজে উত্তমশ্রেণীর উদ্যমের প্রমাণ' এই বইতে পাওয়া গেছে। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী পেশায় একজন ব্যাঙ্ককর্মী কিন্তু তাঁর যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে, বইটি পড়ার পর, কোনো সংশয় থাকে না।' **দেশ**

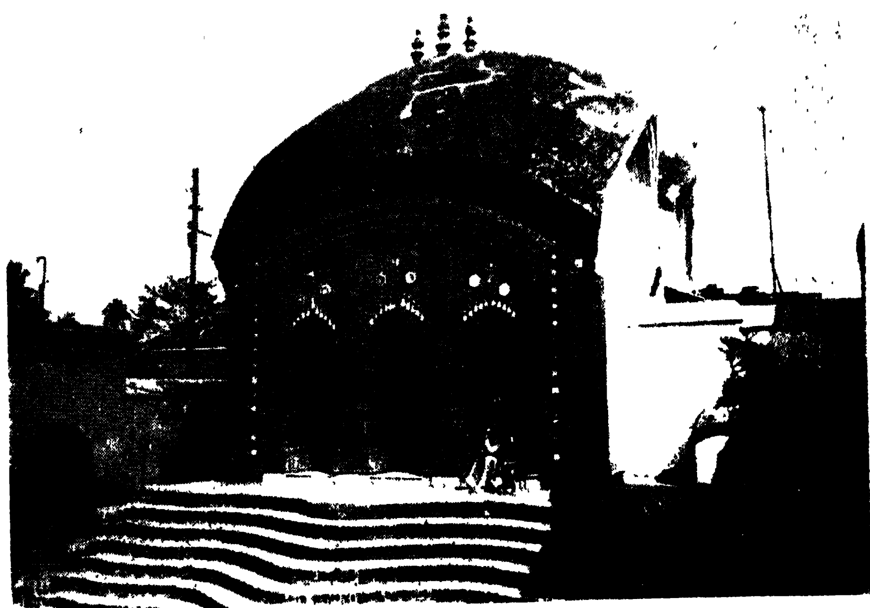
'যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী পেশাদার ঐতিহাসিক না হলেও যে গ্রন্থটি রচনা করেছেন, তার আদর্শ কিংবা আদল প্রচলনির্ভর হলেও, যে কোনও পেশাদার ঐতিহাসিকের পক্ষেই তা দিগ্‌দর্শক। এ গ্রন্থে অত্যন্ত ব্যাপক, পরিশ্রমসাধ্য, এবং সৎ গবেষণার সুন্দর নিদর্শন রয়েছে। আটটি সুরচিত অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ গ্রন্থে বহু প্রমাণ সহ বিবৃত হয়েছে দেশ পরিচিতি, ভূমি পরিচিতি, নদনদী, প্রাগৈতিহাসিক অবস্থা, প্রাচীন ইতিহাস, পথঘাটের ইতিবৃত্ত এবং "বিস্মৃত" গঙ্গারিডি। নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি সুনির্বাচিত। রেনেলের দুর্লভ মানচিত্র আছে, আছে ৪৬টি মূল্যবান আলোকচিত্র। সমগ্র রচনাতে সুগভীর জিজ্ঞাসার সঙ্গে আন্তরিক দরদের সংমিশ্রণ সুস্পষ্ট।' **আনন্দবাজার**

'প্রথম খণ্ডের রেশ টেনে বলা যায়—বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতির লেখক শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর গবেষণা ব্যাপক এবং গভীর। প্রত্যেকটি অধ্যায় সুলিখিত এবং বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। বর্গী হাঙ্গামা, রাজবংশের কথা, ভূমি-রাজস্ব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদি অধ্যায়ের মধ্যে লেখকের মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে গবেষকদের কাজে লাগবে। বিশেষত ভূমিরাজস্ব ও ভূমিসংস্কার অধ্যায়টি শুধুমাত্র বর্ধমানের ইতিহাস নয়—বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একটি অনবদ্য অবদান। পাদটীকা ও নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জীর মধ্যে লেখকের কঠোর পরিশ্রমের পরিচয় মেলে। তৃতীয় খণ্ডের জন্য পাঠকেরা অবশ্যই ব্যগ্রব্যাকুল থাকবেন। গ্রন্থটি জেলার ইতিহাস হলেও, বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস জানার জন্যও অবশ্যপাঠ্য।' **গণশক্তি**

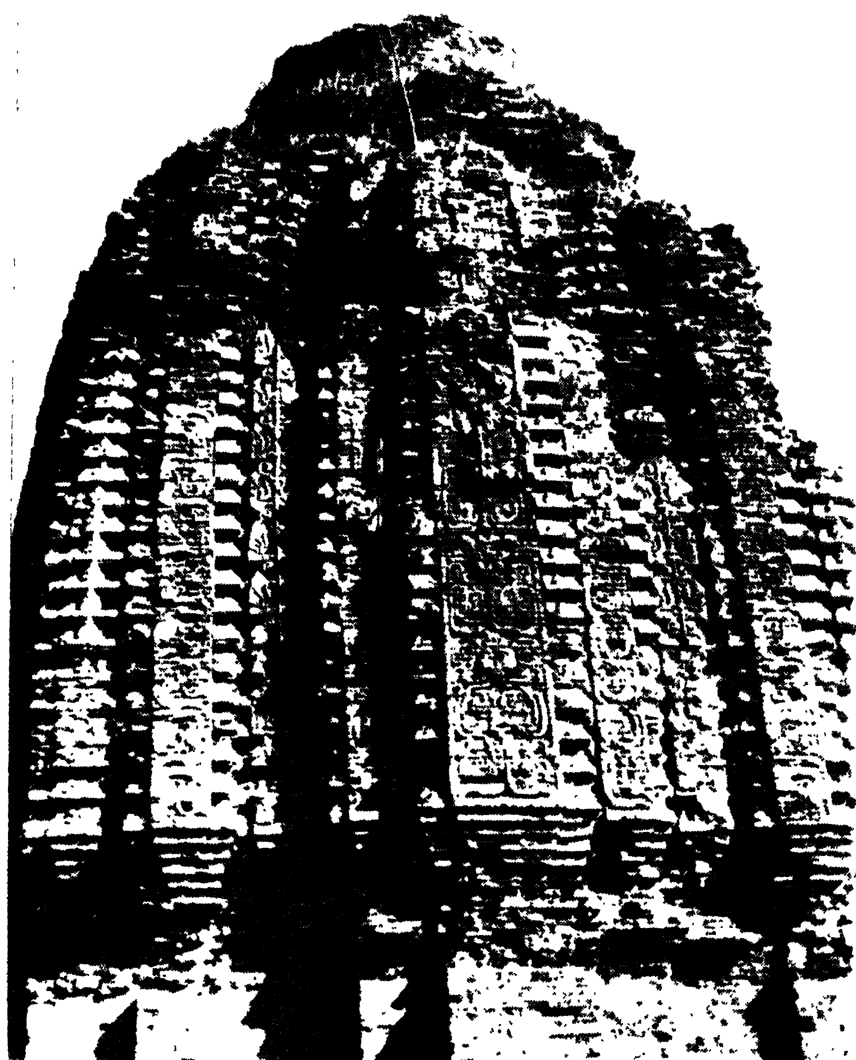
'শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি'-র দ্বিতীয় খণ্ডের এই বিস্তৃত বিষয়বস্তু যে কেবল একটি জেলার বিবরণকেই তুলে ধরেছে তা বললে অবিচার করা হবে। সমগ্র বাঙলার ইতিহাসের ধারাপথে একটি জেলার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়কে উপলব্ধি করতে গিয়ে আমরা যেন একটি পূর্ণাঙ্গ ভূখণ্ডের প্রতিচ্ছবিকেই উপলব্ধি করি। বর্ধমানের ইতিহাসকে কেবল বর্ধমানবাসীদের উপযোগী করেই রচিত হয়নি। সমস্ত বাঙলাভাষী পাঠকের কাছেই গ্রন্থটি মর্যাদা পাবে।' **প্রতিদিন**



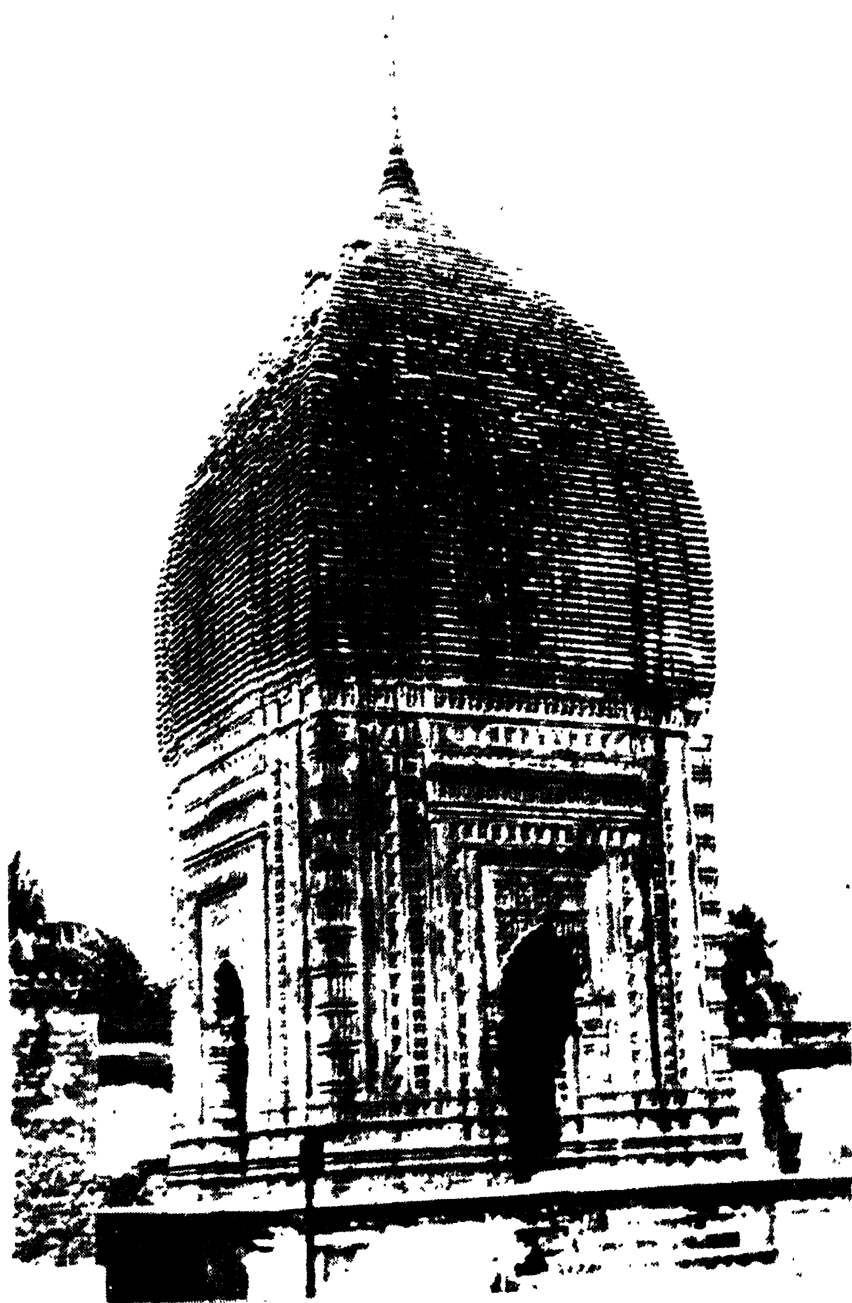
(১) বিজয়তোরণ, বর্ধমান



(২) সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, কালনা



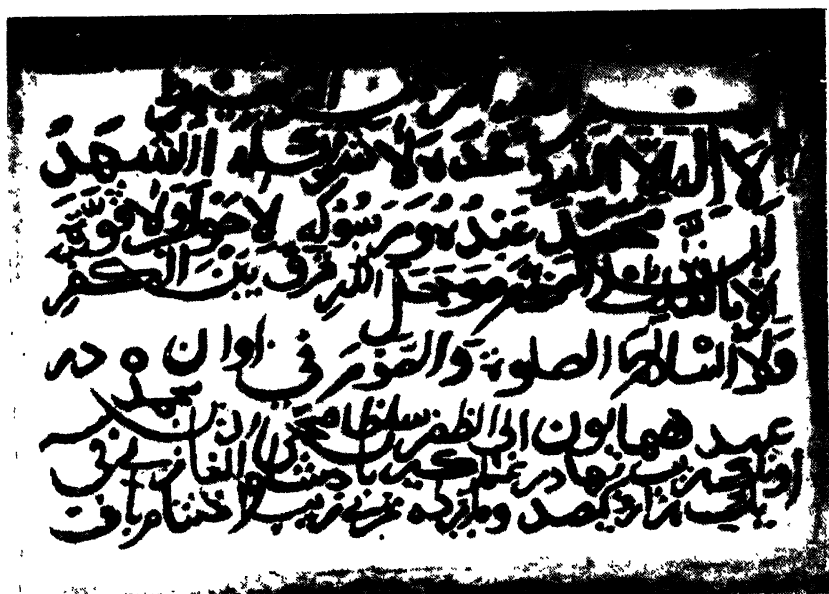
(৩) জৈন মন্দিরের অলঙ্করণ, সাতদেউলিয়া



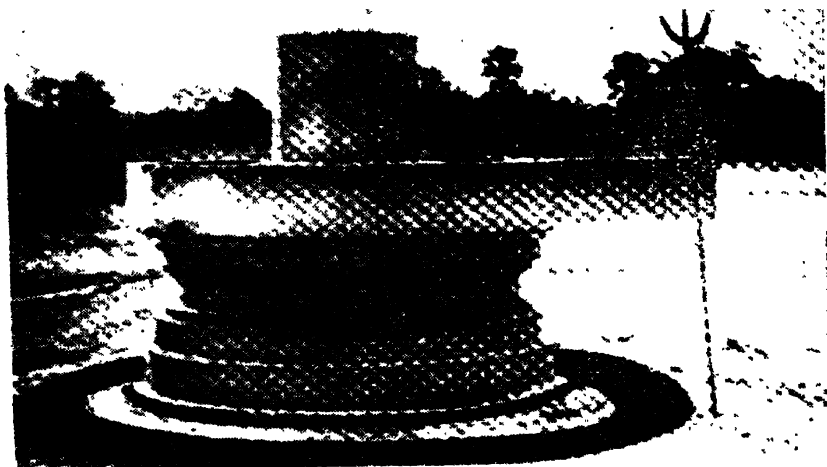
(৪) প্রতাপেশ্বর শিবমন্দির, কালনা



৫) প্রতাপেশ্বর শিবমন্দিরেব টেরাকাটা অলঙ্করণ



(৮) জুম্মা মসজিদের শিলালিপি, বর্ধমান



ভাঙ্গ, বর্ধমান

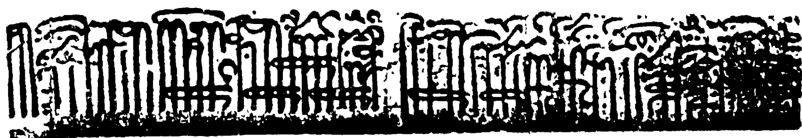
(৭) পঁচিশচূড়া মন্দির : লালজি, কালনা

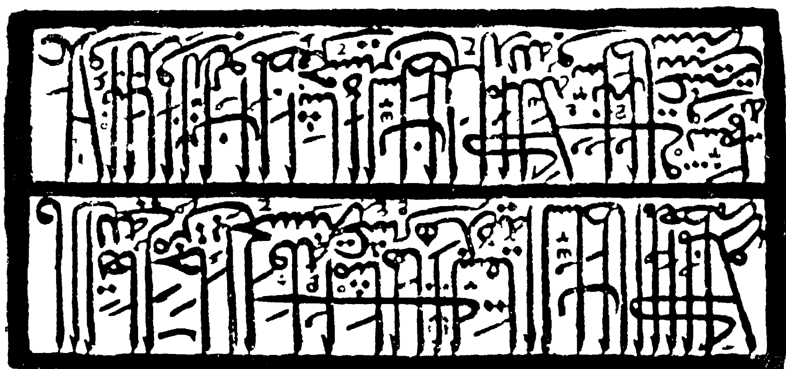


(৯) পঞ্চরত্ন মন্দির, একযার



(১০) প্রতাপ দেউল জগদানন্দপুর







(১১) মসজিদ লিপি, কালনা



(১২) মসজিদের টেরাকোটা অলঙ্করণ, মঙ্গলকোট



১৩। টেরাকোটা ফলকে রাসলীলা, কান্তজির



১৪। রাসমঞ্চ, দিনাজপুর